গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী

(গোবিন্দ কর্ম্মকারের করচার এবং চৈতন্যদেবের দক্ষিণাত্যভ্রমণের বিস্তৃত আলোচনা সহিত)

শ্রীসতীশচন্দ্র দে প্রণীত

মূল্য দুই টাকা চারি আনা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র। ১১ রায় ষ্ট্রীট,
এলগিন রোড ডাকঘর, কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত এবং এই ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

সংক্ষেপ।

কৃষ্ণদাসকবিরাজলিখিত চৈতন্যচরিতামৃত—চৈঃ চঃ।

বৃন্দাবনদাসরচিত চৈতন্যভাগবত—চৈঃ ভাঃ।

রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন-সম্পাদিত গোবিন্দদাসের করচা (Cal. University Ed.) —গোঃ কঃ।

কবিকর্ণপূরবিরচিত চৈতন্যচরিত-মহাকাব্য—চৈঃ চঃ মঃ।

ঐ চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক—চৈঃ চঃ নাঃ।

ঐ গৌরগণোদ্দেশদীপিকা—গৌঃ গঃ দীঃ।

ঐ আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ—আঃ বৃঃ চঃ।

রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন-কৃত অনুবাদ—রাঃ বিঃ কৃত অনুবাদ।
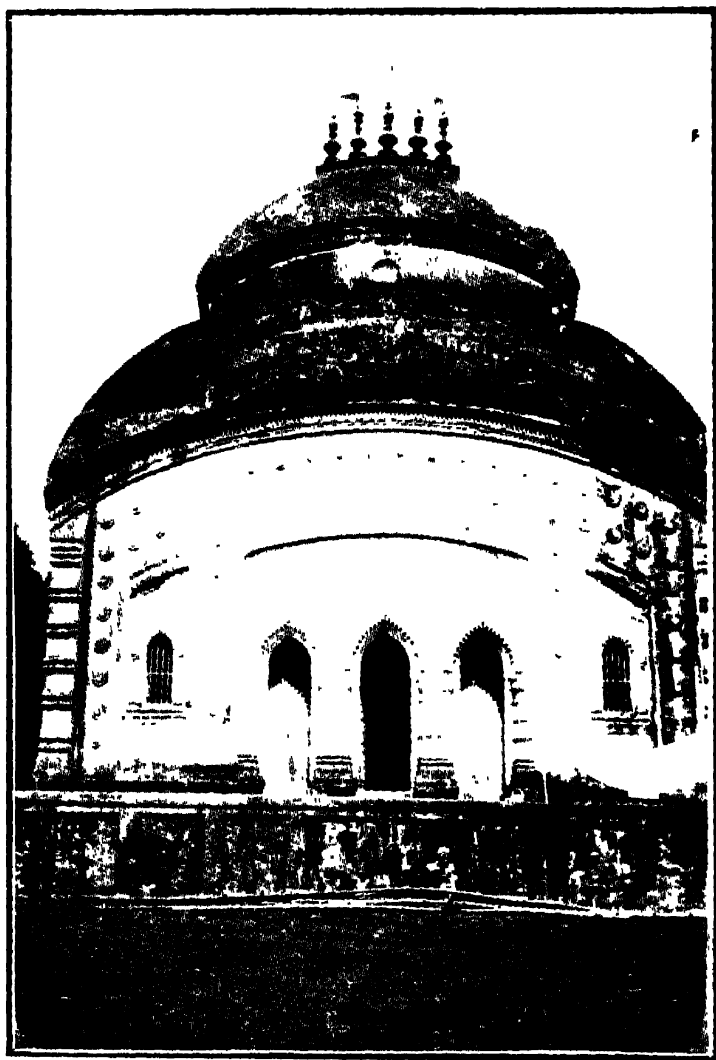
কাঁচরাপাড়ার শ্রীকৃষ্ণদেবের মন্দির

ভূমিকা

আমার এই গ্রন্থরচনার প্রথম উদ্দেশ্য—আমাদিগের গ্রামের ন্যায় বিশিষ্ট পল্লীগ্রামের বর্ত্তমান অবনতির কারণ নির্দ্ধারণ এবং কি উপায় অবলম্বনকরিলে পুনরায় এই প্রকার গ্রামের উন্নতি হইতে পারে তাহার নির্দ্দেশ। দ্বিতীয়তঃ কাঁচরাপাড়া-গ্রামের অধিবাসিগণ (যাঁহারা গ্রামে বাস করিতেছেন এবং যাঁহারা বিদেশে আছেন) গ্রামের মঙ্গলের জন্য যাহাতে তাঁহারা বিশেষ চেষ্টা করেন, এ বিষয়ে তাঁহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করা। তৃতীয়তঃ কাঁচরাপাড়ানিবাসী—সেনশিবানন্দ, কবি-কর্ণপূর, জগদানন্দপণ্ডিত, শ্রীনাথপণ্ডিত (কৃষ্ণদেব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাতা), বাসুদেবদত্ত প্রভৃতি গৌরাঙ্গদেবের ভক্তমণ্ডলীর বিষয় জনসাধারণকে জ্ঞাপন। চতুর্থতঃ কাঁচরাপাড়ানিবাসী বিখ্যাত কবিবরদ্বয়ের—কর্ণপূরের এবং ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তের গ্রন্থাবলীর কথঞ্চিৎ সমালোচনা এবং তাঁহাদিগের স্মৃতি-বার্ষিকীর অনুষ্ঠান। আমার পঞ্চম উদ্দেশ্য চৈতন্য-দেবের দাক্ষিণাত্যভ্রমণবিষয়ক গোবিন্দদাসের করচার ঐতিহাসিকতার বিষয়ে পুনরালোচনা এবং কবিকর্ণপূরবিরচিত চৈতন্যচরিত-মহাকাব্য এবং চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক, কৃষ্ণদাসকবিরাজরচিত চৈতন্যচরিতামৃত এবং গোবিন্দদাসের করচাতে লিখিত চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্যভ্রমণের স্থানগুলি-নির্দ্ধারণ এবং আমার শেষ ও মুখ্য উদ্দেশ্য—ভগবৎপ্রতিম চৈতন্যদেবের কাঞ্চনপল্লীতে শুভপদার্পণের এবং তাঁহার কাঞ্চনপল্লীনিবাসী ভক্তগণের স্মৃতিবার্ষিকীর অনুষ্ঠান।

আমার এই পুস্তক রচনাবিষয়ে ব্যাঁটরানিবাসী ব্যবহারাজীব পরম-বৈষ্ণব পরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। আমার

মধ্যমা পুত্রবধূ শ্রীমতী ইন্দিরা আমাকে অনেক সাহায্যকরিয়াছেন। অনেক বিদেশী ভদ্রলোক চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্যভ্রমণবিষয়ক সংবাদ আমাকে দিয়াছেন।

আমার সহিত আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব কিম্বা ছাত্রত্বসূত্রে সম্বদ্ধ অনেকের নাম আমি করিয়াছি এবং আমার নিজের সম্বন্ধে অনেক কথা (reminiscences) লিখিয়াছি, তাহা পুস্তকের প্রধান আলোচ্য বিষয়ের অঙ্গীভূত (relevant) না হইলেও, আশা করি পাঠকবর্গ কিছু মনে করিবেন না। পূর্ব্বতন ও আধুনিক কাঞ্চনপল্লী-নিবাসীর নাম-সঙ্কলনে ভ্রান্তিথাকা সম্ভব, তাহা আমি স্বীকার করিতেছি।

১১ রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা;
২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩।

শ্রীসতীশচন্দ্র দে

প্রার্থনা।

যাঁহাদিগের আত্মা ভগবৎসকাশে অবস্থান করিয়া মানবের প্রকৃষ্ট মঙ্গলবিধানে সর্ব্বদা তাঁহাদিগের শক্তি নিয়োজিত করিতেছেন, সেই ঈশ্বর-প্রতিম চৈতন্যদেব এবং তাঁহার কাঞ্চনপল্লীনিবাসী পূতচরিত্র ভক্তমণ্ডলী—শিবানন্দসেন, তৎপুত্র কবিকর্ণপূর, কৃষ্ণদেববিগ্রহ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীনাথপণ্ডিত, চৈতন্যদেবের বিশেষ স্নেহের পাত্র জগদানন্দ-পণ্ডিত এবং মানবপ্রীতির মূর্ত্তপ্রতীক বাসুদেবদত্ত—গ্রন্থকারের, গ্রন্থকারের আত্মীয়, বন্ধু ও ছাত্রবর্গের হৃদয়ে স্বদেশপ্রীতি এবং ভগবদ্ভক্তি সঞ্চারিত করুন এবং গ্রন্থকারের পৌত্র শ্রীমান্ অবন্তীভূষণের উপর তাঁহাদিগের অজস্র কৃপা বর্ষণকরুন—ইহাই গ্রন্থকারের বিনীত ও আন্তরিক প্রার্থনা।

অথ বত লোভ-কোপ-মদ-মৎসর-কাম-মোহা
বিদধতি তাবদেব হি জনস্য মলিম্লুচতাং,
গৃহমপি তাবদস্য পরমেশ্বর! বন্ধগৃহং,
তব চরণাব্জয়োর্ন খলু যাবদয়ং নিরতঃ—আঃ বৃঃ চঃ-৭ম-১৭৫

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মৎসরতা
উৎপাদয় প্রভো! তার চিত্তে মলিনতা,
কারাগারসম হয় তাহার ভবন;
তব পাদ-কমলে যে না লয় শরণ।

বিষয়-সূচী

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

পরিশিষ্ট

পৃঃ ৩৮০—মল্লিকার্জ্জুন-শিব, অহোবল-নৃসিংহ এবং ত্রিপদী-সম্বন্ধে কুম্ভকোণমের নাগরাজশর্ম্মা মহাশয় লিখিয়াছেন—Śri Śaila is a Śivakshetra; the name of the Deity is Mallikārjūneśvara. It is in the Kurnool District. Tirupati Hills form the mouth, the Ahobila the centre and Śri Śaila the tail of the unitary range of hills according to tradition.

পৃঃ ৩৯১—আমাদিগের সন্দেহ হয় যে চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত অধিকাংশ তীর্থগুলি বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ডের অষ্টমঅধ্যায়ে বর্ণিত নিত্যানন্দের তীর্থভ্রমণ হইতে কৃষ্ণদাসকবিরাজ সংগ্রহকরিয়াছেন। কৃষ্ণদাসকবিরাজ ও বৃন্দাবনদাসের ভারতবর্ষের মানচিত্র-জ্ঞান একই প্রকার ছিল। আমরা উভয় বৃত্তান্তে যে তীর্থগুলি আছে তাহাই চৈতন্যভাগবত হইতে উদ্ধৃত করিলাম—মৎস্যতীর্থ, শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী, ত্রিতকূপ, বিশালা, পম্পা, ভীমরথী, সপ্তগোদাবরী, বেণ্বাতীর্থ, কার্ত্তিক, শ্রীপর্ব্বত (মহেশ ও পার্ব্বতী ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর বেশে এখানে অবস্থান করিতেন), বেঙ্কটনাথ, কামকোষ্ঠীপুরী, কাঞ্চীপুরী, কাবেরী, শ্রীরঙ্গনাথ, ঋষভপর্ব্বত, দক্ষিণমথুরা, কৃতমালা, তাম্রপর্ণী, মলয়পর্ব্বত, অগস্ত্যমলয়, পঞ্চ-অপ্সরা সরোবর, গোকর্ণ, আয্যাদ্বৈপায়নী, নির্ব্বিন্ধ্যা, পয়োষ্ণী, তাপী (তাপ্তী), রেবা (নর্ম্মদা), মাহিষ্মতী, সূর্পারক, সেতুবন্ধ, ধনুতীর্থ, রামেশ্বর, গোদাবরী, জিয়ড়-নৃসিংহ, ত্রিমল্ল, কূর্ম্মনাথ, নীলাচল।

পৃঃ ৪১১—ত্রিপাত্র—তিরুপাত্তুর—মাদুরাজেলান্তর্গত মেলুরের বোর্ড হাইস্কুলের হেডমাষ্টার রামনাথআয়ার মহাশয় লিখিয়াছেন—"There is a Śiva-temple at Tirupāttur which is nearly 400 years old. The name of the God is not Chandeś́vara but Śristhaleś́vara. In that temple there is a Sannadhi or shrine (literally *presence*) dedicated to Bhairava, which is very famous"। 'সন্নধি' বোধহয় সন্নিধি অর্থাৎ সৎ অর্থাৎ সাধুদিগের স্থান। শিবের আট প্রকার ভৈরব (অর্থাৎ ভয়ঙ্কর) মূর্ত্তি আছে—অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রুদ্ধ, উন্মত্ত, কপালী, ভীষণ ও সংহার। তিরুপাত্তুরের অথবা ত্রিপাত্রের এই ভৈরবমূর্ত্তি বোধহয় চণ্ডমূর্ত্তি অথবা চণ্ডেশ্বর। কিম্বা গোবিন্দ 'শ্রীস্থলেশ্বর' শুনিতে 'চণ্ডেশ্বর' শুনিয়াছিলেন, কারণ তিনি তামিল, তেলেগু, মারহাট্টাপ্রভৃতি ভাষা বুঝিতে পারিতেন না এবং তাহাদিগকে 'খিস্-মিস্' (দুর্বোধ্য ভাষা) আখ্যা দিয়াছিলেন। শ্রীস্থলেশ্বরের (অর্থাৎ লক্ষ্মীস্থানের ঈশ্বর) মন্দির বরগুণপাণ্ডীয়ের সময়ে পুনর্গঠিত হইয়াছিল। Mr. Rāmanātha Iyer has written "In our parts (Madura District) the temple of a God or Goddess is always called Sannadhi. Thus a temple dedicated to Śri Rāma is called Rāmasannadhi' and so on. Bhairava is a form of Śiva. There are eight kinds of Bhairava. This God Bhairava is famous at Tirupāttur and many people call their sons Bhairava in honour of the God."

রামনাথআয়ার মহাশয় অনুসন্ধান করিয়া লিখিয়াছেন যে তিরু-গোকর্ণমের বৃহদম্বাদেবী অষ্টভুজা নহেন, তিনি চতুর্ভুজা ; তাহা হইল গোবিন্দ সম্ভবতঃ পুদুকোটারাজ্যের বীরচীরই (অথবা বীরচীলই) গ্রামের (৪১২ পৃঃ দেখুন) অষ্টভুজা মহিষমর্দ্দিনী-দেবীর কথা বলিয়াছেন।

পৃঃ ৪১৯—ত্রিবঙ্কুরের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অধ্যক্ষ মহাশয় লিখিয়াছেন—

"The Indian name of the hills between Tinnevelly District and Travancore is Sahyādri. Travancore is the anglicised form of Śri-Vālumkote or the country where prosperity reigns. This name is found from the 18th century. There is a place called Rāmapuram on the hillside in North Travancore. Padmanābhapuram, south-east of Trivandrum, was the old capital of the kings of Venad, who subsequently became the rulers of Travancore, and they have been ruling the state as the vassals and servants of that God (Padmanābhasvāmi whose temple is at Trivandrum)".

পৃঃ ৪৩৭—বিজাপুর—Dr. N. P. Chakravarti (Archaeologist) has written—"There is no hill at the present city of Bijapur nor is there any temple of Haragauri. At Torvi about three miles and a half from Bijapur there are shrines on a hillock. The principal shrine is that of Nara-

simha, but there are shrines of Śiva and Pārvatī also."

পৃঃ ৪৬২—চৈতন্যদেব কর্ত্তৃক কুষ্ঠরোগ-আরোগ্য—এই সম্বন্ধে ডাক্তার এবং থিয়সফিষ্ট্ শ্রীযুক্ত নৃত্যলাল মুখোপাধ্যায় আমাদিগকে বলিয়াছেন যে 'দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির (will-power) সাহায্যে and প্রাণশক্তি (life-principle vital force or never-force)—প্রয়োগে সকল প্রকার ব্যাধি আরোগ্যকরা সম্ভব ; কিন্তু এরূপ প্রত্যেক রোগ নিরাময়-করণে চিকিৎসকের নিজের জীবনীশক্তির ব্যয় হয় এবং সেইজন্য তিনি অধিক রোগীকে আরোগ্য করিতে সক্ষম হন্ না। মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে কর্ণেল অল্‌কটের Diary হইতে নিম্নলিখিত ছত্রগুলি পাঠাইয়াছেন—

Old Diary leaves—3rd series—1883-7, by Colonel H. S. Olcott—page 22—

'At Bombay I received orders from my Gurus to suspend all healings until further advices, and that the narratives, which must have sorely tried their feelings, will henceforth practically cease. The prohibition came none too soon for I am persuaded that myself should have become paralysed, if the strain had been kept up. One morning at Madras, just before starting on the present journey, I found my left forefinger devoid of sensation—a clear warning to be careful ; and between Madras and Bombay, it had taken me

much longer and demanded far greater exertions to effect cures than it had previously. There was also a much larger percentage of failures. This is not to be wondered at, for, after treating one way or another some 8000 patients within the twelve months, the sturdiest psychopath, let alone a man of fifty-odd, might be expected to have come to the last volt in his vital battery."

Page 85 (ibid)—

"Although I thought before leaving Adyar that I had done with my healings, I let myself tempted to take, at H. P. Blavatsky's request, the cases of Russian ladies, whom we met at Lady Caithness' house on the evening of the 25th March—a Princess, a Countess and a Baroness ; the second a cousin of H. P. B's ; the last one a playmate of her childhood. The princess had a stubborn remnant of a stroke of hemiplegia, which for twelve years, had prevented her raising her left hand to her head and using her left foot properly. Within a half-hour I freed both limbs from their bonds. The Countess was extremely deaf ; after a treatment of fifteen minutes she could hear ordinary conver-

sations and was enchanted to be able to enjoy the music of a concert that evening, as she had not for years. The third lady I relieved of a minor spinal trouble."

বাঁ্যাটরানিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ পরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আমাদিগকে বলিয়াছেন যে প্রতিবৎসর—মণ্ডল অষ্টপ্রহর হরিসঙ্কীর্ত্তন ও মহোৎসবের আয়োজন করিতেন। তিনি বিখ্যাত——বাবাজীর শিষ্য ছিলেন। প্রায় পোনের বৎসর হইল মহোৎসবের কিছু পূর্ব্বেই তিনি Pneumonia রোগদ্বারা আক্রান্ত হইলেন। অধিবাসের দিন অর্থাৎ মহোৎসবের পূর্ব্বদিন তাঁহার রোগের কোন উপশম হইল না। পরম বৈষ্ণব——বাবাজী ও পরেশবাবু মণ্ডল মহাশয়কে ঐদিন দেখিতে যাইলেন। রোগীর দেহের উত্তাপ ১০৩ ডিগ্রী এবং তিনি অতিশয় দুর্ব্বল, তাঁহাদিগের বোধ হইল। পরেশবাবু রোগীর এক হাত তাঁহার হাতদ্বারা বুলাইতে লাগিলেন। বাবাজী রোগীর আর এক হাত তাঁহার দুই হাতদ্বারা প্রায় কুড়ি মিনিট চাপিয়া রহিলেন। পরেশবাবু নিজশরীরে সে সময়ে আনন্দস্রোত-প্রবাহ অনুভব করিলেন। তদনন্তর রোগী বিছানাতে বসিয়া জপের মালা চাহিলেন। মালা দশমিনিট জপ করিয়া, তিনি তরমুজের সরবত পানকরিলেন। দেখা গেল তাঁহার রোগের কোন চিহ্ন আর নাই।

...............চট্টোপাধ্যায় কোনও স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার Hip এবং Intestinal Tuberculosis হওয়াতে তিনি মরণাপন্ন হন। ডাক্তারেরা আরোগ্যের সমস্ত আশা ছাড়িয়া দেন। তাঁহার মাতা তারকেশ্বরে তিনদিন "হত্যা" দিয়া

একটী ঔষধ প্রাপ্ত হন; তাহাতে তিনি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গত বৎসর Blood-pressure রোগে মারা গিয়াছেন। তিনি অধ্যাপক ধূর্জ্জটী মুখোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক বিমল মুখোপাধ্যায়ের আত্মীয় ছিলেন।

বাঁ্যাটরার লক্ষ্মীনারায়ণ-বিদ্যালয়ের শিক্ষক তুলসীচরণ দে মহাশয় বলিয়াছেন যে তাঁহার পিতামহের কঠিন রক্ত-আমাশয় হইলে, যখন নানাপ্রকার চিকিৎসায় কোন উপকার হইল না, তখন তুলসীবাবুর পিতামহী তারকেশ্বরে "হত্যা" দিয়া একটী ঔষধ পাইয়াছিলেন। সেই ঔষধ খাইয়া তুলসীবাবুর পিতামহ সম্পূর্ণরূপে নীরোগ হইয়াছিলেন।

চৈতন্যদেবের প্রসাদদ্বারা কুষ্ঠরোগী নিরাময় হওয়া, খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকের স্পর্শদ্বারা রোগী নীরোগ হওয়া, কর্ণেল অলকটের স্পর্শদ্বারা রোগ দূরীভূত হওয়া, লুর্ডস্-নগরে রোগী আশীর্ব্বাদদ্বারা রোগশূন্য হওয়া, বৈষ্ণব বাবাজীর স্পর্শদ্বারা রোগী ব্যাধিশূন্য হওয়া এবং স্বপ্নাদিষ্ট ঔষধদ্বারা রোগ দূরীভূত হওয়া—এ সমস্তই আধ্যাত্মিক শক্তি-প্রয়োগের ফল আমরা বলিতে বাধ্য। কিন্তু কি করিয়া ইহা হয় আমরা এখনও পর্য্যন্ত সম্যক্ বুঝিতে সক্ষম হই নাই। আমাদিগের অজ্ঞতা কতকগুলি শব্দের (mesmerism, hypnotism, faithcure, ঝাড়ান, 'হত্যা' দেওয়া) দ্বারা আমরা কেবল আবৃত করিতে শিখিয়াছি।

ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে চৈতন্যদেবের, কতিপয় খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকের, কর্ণেল অলকটের, বৈষ্ণববাবাজী প্রভৃতির রোগ দূর করিবার শক্তি ছিল। এ শক্তি তাঁহাদিগের জন্মগত (innate) কিম্বা ধর্ম্মকার্য্যদ্বারা অর্জ্জিত। তারকেশ্বরে "হত্যা" দ্বারা যিনি ঔষধপ্রাপ্ত

হন, তিনিও সে সময়ে তাঁহার ঈশ্বরের উপরে অকৃত্রিম নির্ভরতার জন্য এই প্রকার শক্তি অর্জ্জনকরেন এবং সামান্য ঔষধে ইহা সঞ্চারিত করিতে সমর্থ হন। চৈতন্যদেব তাঁহার প্রসাদে এই শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। এই শক্তির স্বরূপ কি আমরা জানি না। ইহাকে তাড়িত শক্তি, স্নায়বিক শক্তি, প্রবল ইচ্ছাশক্তি, আধ্যাত্মিক শক্তি প্রভৃতি নামে আমরা অভিহিত করি। চৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন যে আদি নারায়ণকে তিনি নীরোগ করেন নাই; শ্রীকৃষ্ণ করিয়াছেন (পৃঃ ৪৬৩)। ইহা চৈতন্যদেবের ন্যায় যশোলিপ্সাবিহীন ভগবদ্‌ভক্তের উপযুক্ত কথা। যখন অনেক রোগী দেবঘরে সমবেত হইল, তিনি এইস্থান ত্যাগ করিলেন। ইহার কারণ আমরা অনুমান করি—(১) সকল রোগীর আদিনারায়ণের মত ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল না; (২) চৈতন্যদেবের যশোরাশির চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হওয়া, তিনি একেবারেই পছন্দ করিতেন না; (৩) তাঁহার নীলাচল-যাত্রার বিলম্ব হইলে ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের পক্ষে বাধা উপস্থিত হইত; (৪) তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তি ক্ষয় হইলে ভক্তিধর্ম্মপ্রচার ও ক্ষুন্ন হইত।

কিন্তু এই শক্তি যে প্রকারেই অর্জ্জিত হউক, সর্ব্বদা সংকার্য্যে প্রযুক্ত হয় না। সম্মোহন-শক্তি এই শক্তিরই রূপান্তর আমরা মনে করি (পৃঃ ৪৬৫ দেখুন)।

পৃঃ ৪৬৭ এবং ৪৯৫—কৃষ্ণদাসকবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য-৮ম-১৮৭) লিখিত আছে :যে চৈতন্যদেব রামানন্দরায়কে বিষয় (রাজকার্য্য) ছাড়িয়া নীলাচলে যাইতে বলিলেন। কিন্তু গোবিন্দদাসের করচাতে লিখিত আছে (পৃঃ ২২)—

প্রভু কহে "রায়! আমি কিছুই না জানি।
কহ কহ কৃষ্ণকথা তব মুখে শুনি॥

বিরক্ত বৈষ্ণব তুমি, ওহে রামরায়।
কহ কহ কৃষ্ণ-তত্ত্ব জুড়াক হৃদয়॥"
শুনিয়া প্রভুর বাণী রামানন্দরায়।
দৈন্যভাবে দুটীহাত যোড়করি কয়।
"বার বার কেন ছল, জগৎ-ঈশ্বর?
কৃপাকরি এ দাসেরে কর অনুচর॥

*　　　　*　　　　*

অধম জনেরে দয়া কর, জগন্নাথ।
হৃদয়ে বৈরাগ্য দিয়া লহ মোরে সাথ॥"

*　　　　*　　　　*

প্রভু কহে, "রামানন্দ এবে আমি যাই।
নীলাচলে গিয়া তুহু থেকো মোর ঠাঁই।"

কৃষ্ণদাসকবিরাজ ও গোবিন্দকর্ম্মকারের বিবরণের মধ্যে অনেক বিভেদ আছে। কৃষ্ণদাসকবিরাজ বলিতেছেন যে চৈতন্যদেব রামানন্দকে প্রতাপরুদ্রের কার্য্য ছাড়িতে অনুরোধকরিলেন; কিন্তু গোবিন্দ বলিতেছেন যে রামানন্দই অনেক মিনতি করিয়া চৈতন্যদেবকে বলিলেন যে তিনি যেন তাঁহাকে (রামানন্দকে) তাঁহার অনুচর করেন। ইহার উত্তরে চৈতন্যদেব বলিলেন যে নীলাচলে গিয়া তিনি যেন তাঁহার সহিত থাকেন। এই সকল কথাবার্ত্তা রাজমহেন্দ্রী অর্থাৎ গোদাবরীতীর্থে—রামানন্দরায়ের কার্য্যস্থানে—হইয়াছিল।

দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাগমনের সময়ে বিদ্যানগরে রামানন্দরায়ের সহিত চৈতন্যদেবের দ্বিতীয় সাক্ষাৎ কৃষ্ণদাসকবিরাজ (মধ্য-৯ম-১৫৯)

ও গোবিন্দ (পৃঃ ৮০) বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষ্ণদাসকবিরাজ লিখিয়াছেন যে রামানন্দ চৈতন্যদেবকে বলিলেন যে প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে (রামানন্দকে) নীলাচলে থাকিতে আজ্ঞা দিয়াছেন এবং তিনি দশদিন পরে কার্য্য সমাধানকরিয়া নীলাচলে যাইবেন। গোবিন্দ লিখিয়াছেন--

প্রভু বিদ্যানগর আইলা অতঃপর।
রামানন্দ দেখা করে যোড় করি কর॥
রামানন্দরায় আসি প্রণাম করিলা।
হাত ধরি তুলি প্রভু তারে কোল দিলা॥
পরম বৈষ্ণব রায় দূরে পিছাইয়া।
কান্দিতে লাগিল বহু বিনয় করিয়া॥

ইহার পরে চৈতন্যদেব তাঁহাকে নীলাচলে আসিতে আজ্ঞা দিলেন। রামানন্দ বলিলেন যে কিছুদিন পরে তিনি নীলাচলে যাইবেন। রামানন্দের সহিত চৈতন্যদেবের প্রথম সাক্ষাৎ ও দ্বিতীয় সাক্ষাতের মধ্যে প্রায় এক বৎসরের ব্যবধান ছিল। এই সময়ের ভিতরে তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগকরিবার এবং নীলাচলে অবস্থান করিবার অনুমতি উৎকলরাজ-প্রতাপরুদ্রের নিকট হইতে সংগ্রহকরিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ৩রা মাঘ, ১৫১২ খৃষ্টাব্দে, দাক্ষিণাত্যভ্রমণ হইতে নীলাচলে চৈতন্যদেবের প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কিছুদিন পরেই রামানন্দ তাঁহার সহিত তথায় মিলিত হইয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাসকবিরাজ (চৈঃ চঃ-মধ্য-৭ম-৪৫) লিখিয়াছেন যে সার্ব্বভৌম চৈতন্যদেবকে বলিলেন—

রায়রামানন্দ আছে গোদাবরীতীরে।
অধিকারী হয়েন তিহোঁ বিদ্যানগরে॥

তাহার পরে গোদাবরীতীরে (গোদাবরীতীর্থে-রাজমহেন্দ্রীতে) রামানন্দের সাক্ষাৎ হইল এবং রাধাকৃষ্ণধর্ম্মসম্বন্ধে দশ রাত্রি ধরিয়া অনেক কথাবার্ত্তা হইল (মধ্য-৮ম)। তাহার পরে কবিরাজমহাশয় লিখিয়াছেন যে বিদ্যাপুরের লোক নিজেদের ধর্ম্মমত পরিত্যাগকরিয়া বৈষ্ণব হইল (মধ্য-৮ম-১৮৯)। তাহার পরে দাক্ষিণাত্যভ্রমণ হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমনের সময়ে রামানন্দের সহিত চৈতন্যদেবের বিদ্যানগরে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ হইয়াছিল (মধ্য-৯ম-১৫৯)।

• কৃষ্ণদাসকবিরাজ পরে (অন্ত্য-৯ম-৩৯) লিখিয়াছেন যে উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্র বলিয়াছিলেন যে তিনি রামানন্দকে রাজমহেন্দ্রার রাজা করিয়াছেন। অতএব কৃষ্ণদাসকবিরাজের মতে বিদ্যানগর, বিদ্যাপুর ও রাজমহেন্দ্রা (অথবা রাজমহেন্দ্রী অথবা গোদাবরীতীর্থ) একই স্থান। সেইজন্য কৃষ্ণদাসকবিরাজের মতানুসারে বিদ্যানগর বিজয়-নগরম্ (**Vizianagaram**) হইতে পারে না, কারণ বিজয়নগরম্ রাজমহেন্দ্রীর প্রায় ১৬৩ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত।

গোবিন্দ বলিয়াছেন (করচা পৃঃ ২১) যে সার্ব্বভৌম চৈতন্যদেবকে রামানন্দের সহিত গোদাবরীতীরে মিলিতে বলিয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি গোদাবরীতীরে আসিয়া রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তথায় একরাত্রি অতিবাহিত করিলেন (পৃঃ ২২)। পরদিন রামানন্দ নিজের কার্য্যে যাইলেন এবং চৈতন্যদেব ত্রিমন্দনগর-অভিমুখে যাত্রা করিলেন (পৃঃ ২৩)। গোবিন্দ লিখিয়াছেন (পৃঃ ৮০) যে রামানন্দের সহিত চৈতন্যদেবের দ্বিতীয় সাক্ষাৎ রায়পুর ও রত্নপুরের মধ্যে বিদ্যানগরে হইয়াছিল। ইহা হইতে মনে হয় যে গোবিন্দের মতে গোদাবরীতীরে (গোদাবরীতীর্থে অথবা রাজমহেন্দ্রীতে) রামানন্দের কার্য্যস্থান এবং মধ্যপ্রদেশের বিদ্যানগরে

তাঁহার পারিবারিক বাসস্থান ছিল। রাজমহেন্দ্রী রায়পুরের প্রায় ৩০০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। কর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে রামানন্দের সহিত চৈতন্যদেবের প্রথম সাক্ষাৎ গোদাবরীতারে হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে (৭ম-৪, ১১)। দাক্ষিণাত্য হইতে চৈতন্যদেবের প্রত্যাগমনের সময়ে রামানন্দের সহিত গোদাবরীতীরে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ বর্ণিত হয় নাই। কর্ণপূরের চৈতন্যচরিতমহাকাব্যে (১২শ সর্গ-৯৯, ১৩০, ১৩১ ; ১৩শ সর্গ-৩৫-৪৯) লিখিত আছে যে চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্যগমনের সময়ে গোদাবরীতীরে যাইলেও রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, কিন্তু দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাগমনের সময়ে গোদাবরীতীরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কবিকর্ণপূর বিদ্যানগর কিম্বা বিদ্যাপুরের নাম করেন নাই।

শতকরা প্রায় নব্বই স্থলে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান ভূগোলের সহিত গোবিন্দের ভৌগলিক বৃত্তান্তের সামঞ্জস্য আছে। মধ্যপ্রদেশ লইয়াই দেখা যাউক – বরোদা, নর্ম্মদানদী, দোহদ, কুক্ষী, আমঝোরা, মন্দুরা, মণ্ডলনগর, দেবঘর, শিবানী (Seoni), মলয়পর্ব্বত (Maikal Range), চণ্ডীপুর, রায়পুর, বিদ্যানগর, রত্নপুর (Ratanpur), মহানদী, স্বর্ণগড় (S'ārangarh), সম্বলপুর, ভ্রমরানগরী (Bamrā), প্রতাপনগরী, দাসপাল (Daspalla), রসালকুণ্ড (Russelkonda), ঋষিকূল্যানদী, আলালনাথ। এই তেইশটী স্থানের ভিতর আমরা কেবল তিনটী স্থান নির্দ্ধারণকরিতে সক্ষম হই নাই; সেই তিনটী স্থান—চণ্ডীপুর[১] বিদ্যানগর ও প্রতাপনগরী[২]। দ্বিতীয়তঃ গোবিন্দলিখিত স্থানসকলের অনু-

১। সম্বলপুর গেজেটীয়ারে গৌড়জাতিকর্ত্তৃক সমলাইদেবী ও চণ্ডীদেবীর পূজার কথা বর্ণিত আছে। চণ্ডীপুরে চৈতন্যদেবের চণ্ডীমূর্ত্তিদর্শনের কথা আছে।

২। দীনেশসেন মহাশয় (গোঃ কঃ ভূমিকা, পৃঃ ৫৮) লিখিয়াছেন—'প্রতাপনগরে

ক্রম ভারতবর্ষের মানচিত্রের অনুক্রমের সহিত অধিকাংশস্থলেই মিলে। কিন্তু কৃষ্ণদাসকবিরাজ ইত্যাদিলিখিত স্থানগুলির অনুক্রম অধিকাংশ স্থলেই মিলে না। কৃষ্ণদাসকবিরাজবর্ণিত শতকরা পঞ্চাশটী তীর্থ নির্দ্ধারণকরা সুকঠিন। এইজন্য আমরা গোবিন্দের বর্ণনা কৃষ্ণদাস-কবিরাজপ্রভৃতির বর্ণনা অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য মনে করি (পৃঃ ৩৭৭, ৯০, ৩৯১, ৫২১ এবং ৫২৬ ও দেখুন)। চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্যভ্রমণ ১৫১২ খৃষ্টাব্দে শেষ হইয়াছিল (পৃঃ ২৭০)। গোবিন্দের করচা সেই সময়ে লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু কৃষ্ণদাসকবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ একশতাব্দীর পরে রচিত হইয়াছিল (পৃঃ ৫২৬)। করচা চৈতন্যচরিতামৃত অপেক্ষা যে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য, তাহার ইহাও অন্যতম কারণ।

পৃঃ ৪৬৮—গোবিন্দ বলিয়াছেন যে সম্বলপুরের দশক্রোশ দূরে বহুবৈষ্ণবঅধ্যুষিতা ভ্রমরানগরী ছিল। ভ্রমরানগরী সম্ভবতঃ 'বমরা' রাজ্যান্তর্গত নগর। সম্বলপুরজেলার পূর্ব্বেই বমরা-রাজ্য। সম্বলপুর নগর ও বমরারাজ্যের মধ্যে অর্থাৎ সম্বলপুরের পূর্ব্বাংশে এই সকল গ্রাম আছে—চারটী গৌরপাড়া, পাঁচটী গৌরপল্লী, বামনপল্লী, সনাতন-পল্লী, বৈরাগ্যপল্লী, বংশীতলা, গুরুপল্লী, দোলপুর, গোপালমোহননদী, গোপালপল্লী, দুইটী হরিপল্লী ইত্যাদি। ৪টী গৌরপাড়া এবং

গৌরবিগ্রহ আছে। প্রতাপরুদ্র এই বিগ্রহ স্থাপনকরেন।' আমরা Survey Department এর মানচিত্রে অনেক অন্বেষণকরিয়াছি, 'প্রতাপনগর' পাই নাই। সম্বলপুরের ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট্ সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় এবং দাসপাল্লাগড়ের পোষ্টমাষ্টার বিঃ মিশ্র মহাশয় লিখিয়াছেন যে ঐ প্রদেশে প্রতাপনগর বলিয়া কোন গ্রাম নাই। ময়ূরভঞ্জের (বালেশ্বরের নিকট) প্রতাপপুর আছে, গঞ্জামজেলায় বহরমপুরের নিকট প্রতাপপুর আছে, কিন্তু গোবিন্দের প্রতাপনগর এই দুইটীর কোনটী হইতে পারে না।

৫টী গৌরপল্লী দেখিয়া আমরা মনে করিতে পারি যে গৌরাঙ্গদেবের আগমনের জন্য এই সকল গ্রামের এই নাম হইয়াছিল। কিন্তু ইহা নিশ্চিতরূপে বলিতে আমরা অক্ষম। কারণ এই প্রদেশে গৌর অথবা গৌড় বলিয়া গোপজাতি আছে (Sambalpur Gazetteer)। তাহারা এই সকল গ্রামে বাস করে বলিয়া এ নামের উৎপত্তি হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু গৌরপল্লী ইত্যাদির সহিত সনাতনপল্লীপ্রভৃতি বর্ত্তমান থাকায় আমরা এ প্রদেশ বৈষ্ণব-অধ্যুষিত বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি। উড়িষ্যাপ্রদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচারের বিষয় Orissa Feudatory States Gazetteer এ লিখিত আছে, "Vaishnavism, which in its present form spread in Orissa with the advent of Gangetic Dynasty in the 12th Century and is the prevailing religion to this day, cannot boast of any remains of antiquarian interest."

দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন (গোঃ কঃ ভূমিকা, পৃঃ ৫৮) যে সম্বলপুরে তদবধি (গৌরাঙ্গদেবের গমনঅবধি অর্থাৎ ১৫১১ খৃষ্টাব্দ হইতে) মহাপ্রভুর বিগ্রহের পূজা চলিতেছে। সম্বলপুর Gazetteerএ লিখিত আছে যে সম্বলপুরের নাম এই নগরের প্রথম রাজা বলরামদেব-স্থাপিতা সমলাইদেবী হইতে হইয়াছে। সমলাইদেবীর মন্দিরব্যতীত গোপালজী-মঠে জগন্নাথের বৃহৎ মন্দির আছে। ইহা ব্যতীত ব্রহ্মপুর-মন্দিরে বিষ্ণুর দশ অবতারের প্রতিমূর্ত্তি আছে। এই গেজেটীয়ারে গৌরাঙ্গদেবের মন্দিরের বিষয় উক্ত হয় নাই।

বমরা রাজ্যের বর্ত্তমান রাজধানী দেওগড়। কিন্তু সম্বলপুর ও দেওগড় নগরের মাঝে বমরাগড় (ভ্রমরাগড় ?) বলিয়া একটী গ্রাম আছে। ইহা গোবিন্দের ভ্রমরানগরী হইতে পারে। ইহা সম্বলপুরের

প্রায় ১৫ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। গোবিন্দ বলিয়াছেন যে ভ্রমরানগরী সম্বলপুর-নগর হইতে দশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। গৌরপাড়া ইত্যাদি গ্রামসকল সম্বলপুরের পূর্ব্বভাগে এবং বমরারাজ্যের পশ্চিম অংশে তি হইতে কুড়ি ক্রোশের মধ্যে অবস্থিত।

শোণপুররাজ্যে বোমরাজ (Bomraj) বলিয়া একটী গ্রাম আছে। ইহা সম্বলপুরনগরের প্রায় ৩৫ মাইল দক্ষিণে। আমরা বমরাগড়কে ভ্রমরানগরী বলিতেছি, কারণ যদিও ইহার সম্বলপুর হইতে দূরত্ব বোমরাজঅপেক্ষা অল্পই কম, তত্রাচ ইহার নিকটেই গৌরপল্লী, সনাতনপল্লী, দোলপুর প্রভৃতি বৈষ্ণবধর্ম্মজ্ঞাপক অনেকগুলি স্থান আছে। বর্ত্তমান বমরারাজ্য (Bamrā State) সম্বলপুর-নগর হইতে প্রায় ১২ মাইল পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে। সম্বলপুরের প্রায় ৪৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে রায়রাখোল রাজ্যে বোমুর (Bomur) বলিয়া একটী গ্রাম আছে। সম্বলপুর হইতে ভ্রমরা দশক্রোশ দূর গোবিন্দ বলিয়াছেন। আনু-মানিক দশক্রোশ ১৪।১৫ ক্রোশও হইতে পারে; কিন্তু ২২।২৩ ক্রোশ হইতে পারে না।

পৃঃ ৪৮৯—বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন যে চৈতন্যদেব যখন নীলাচলে আসিয়াছিলেন, তখন প্রতাপরুদ্র বিজয়নগরে যুদ্ধ করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন—চৈঃ ভাঃ—অন্ত্য-৩য়—

> যে সময়ে ঈশ্বর আইলা নীলাচলে।
> তখনে প্রতাপরুদ্র নাহিক উৎকলে॥
> যুদ্ধরসে গিয়াছেন বিজয়ানগরে।
> অতএব প্রভু নাহি দেখিলা সে বারে॥
> ঠাকুর থাকিয়া কতদিন নীলাচলে।
> পুনঃ গৌড়দেশে আইলেন কুতূহলে॥

চৈতন্যদেব ১৫১০ খৃষ্টাব্দ, ফাল্গুনমাসে পুরীতে আগমন করিয়াছিলেন (পৃঃ ২৬৯)। ৭ই বৈশাখ, ১৫১০ খৃষ্টাব্দে তিনি দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়াছিলেন এবং ৩রা মাঘ, ১৫১২ খৃষ্টাব্দে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন; তিনি ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে বিজয়াদশমীতে গৌড়যাত্রা করিয়াছিলেন এবং ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে চৈত্র মাসের শেষে নীলাচলে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন।

বৃন্দাবনদাস চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্যভ্রমণ লিপিবদ্ধ করেন নাই। চৈতন্যদেব নীলাচলে প্রথম আসেন ১৫১০খৃষ্টাব্দের ফাল্গুনমাসে; সে সময়ে প্রতাপরুদ্রের সহিত বিজয়নগররাজের যুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই। বিজয়-নগররাজ উৎকলের দক্ষিণাংশ ১৫১২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে আক্রমণকরেন (পৃঃ ৪৮১)। চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্যভ্রমণ হইতে ১৫ ২ খৃষ্টাব্দ, ৩রা মাঘে নীলাচলে আসিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যহইতে চৈতন্যদেবের নীলাচলে আগমনের সময়ে প্রতাপরুদ্র বিজয়নগররাজের সহিত যুদ্ধ-ব্যপদেশে বিজয়নগরে গিয়াছিলেন, বৃন্দাবনদাস বোধহয় এই কথা বলিতেছেন। বৃন্দাবনদাস পরে বলিয়াছেন যে প্রতাপরুদ্রের সহিত চৈতন্যদেবের প্রথম সাক্ষাৎ তাঁহার রামকেলি হইতে নীলাচলে প্রত্যা-গমনের পরে অর্থাৎ ১৫১৫ খৃষ্টাব্দের চৈত্রমাসের পরে হইয়াছিল।

পৃঃ ৫২৮—চৈতন্যদেবের উপদেশাবলী—আত্মসংযম—এই স্থানে আমরা পুনরুক্তি হইবে বলিয়া চৈতন্যদেবের অসাম্প্রদায়িকতা (পৃঃ ৩৭০), বৈরাগ্য, পরদুঃখকাতরতা, অহিংসা, অসাধারণ মানবপ্রীতি, নৈতিক সাহস, সত্যপ্রিয়তা, এবং অকপটতা আর বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করি নাই। তাঁহার সত্যপ্রিয়তা আমরা (পৃঃ ২২১) আলোচনাকরিয়াছি। মানবের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবনতির জন্য ব্যথিত হইয়া তিনি সমস্ত মানবকে ভক্তিধর্ম্ম বিতরণকরিবার অভিপ্রায়ে বৈরাগ্যব্রত

অবলম্বনকরিয়াছিলেন (পৃঃ ২১১)। বলিদানপ্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া অহিংসা ও সর্ব্বজীবে দয়া তিনি প্রদর্শনকরিয়াছিলেন (পৃঃ ৪৪৪)। ভর্গদেবের ও আদিনারায়ণের রোগ আরোগ্যকরিয়া (পৃঃ ৩৬৯, ৪৬৩) একটী ভিখারিণীর অভাব নিজে ভিক্ষাপূর্ব্বক দূর করিয়া (পৃঃ ৪০২), নিজের খাদ্য আর একটী ভিখারিণীকে দান করিয়া (পৃঃ ৪৬২), কণ্ডুক্লিষ্ট সনাতনকে আলিঙ্গনকরিয়া (পৃঃ ১৯), পরমবৈষ্ণব হরিদাসযবনের ও দস্যু নারোজীর আত্মার কল্যাণের নিমিত্ত ভিক্ষাপূর্ব্বক মহোৎসব করিয়া (পৃঃ ২২২,৪৪৬), পন্থভীল, নারোজী প্রভৃতি দস্যুউদ্ধারে নিজের বিপদ্‌কে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া (পৃঃ ৩০৯, ৩০৩), জনমতের বিরুদ্ধে সত্যবাই, লক্ষ্মীবাই, বারমুখী এবং ইন্দিরা প্রভৃতি মুরারিগণকে ধর্ম্মপথে আনয়নকরিয়া (পৃঃ ২৮৫, ২৯২, ২৯৭), দুষ্ট তীর্থরাম, নাগোর-নগরের প্রহারোদ্যত দুরাত্মা ব্রাহ্মণ, ঘোগার দুষ্ট বালাজী, রসালকুণ্ডের দুরাত্মা মাডুয়া-ব্রাহ্মণ প্রভৃতির উদ্ধার-কার্য্যে সর্ব্বপ্রকার অপমান সহ্য করিয়া (পৃঃ ২৮৫, ৪০৭, ২৯৪, ৩২০), চৈতন্যদেব অসামান্যা ক্ষমা ও মানবপ্রীতি প্রদর্শনকরিয়াছিলেন। কাজীর ভীতিপ্রদর্শন অগ্রাহ্য করিয়া হরিসঙ্কীর্ত্তন (পৃঃ ৫০২), লোকমতবিরুদ্ধে পতিতাদিগের উদ্ধার, নিজের ক্রটীস্বীকার (পৃঃ ৩৪৩), শূদ্র গোবিন্দকে পরিচারকনিয়োগ (পৃঃ ৩২৭), শূদ্র রামানন্দরায় প্রভৃতির নিকট ভক্তিধর্ম্মশিক্ষা (পৃঃ ২৮০) এবং আচণ্ডালে ভক্তিধর্ম্মবিতরণ (পৃঃ ২৮৫) প্রভৃতি কার্য্য তাঁহার নৈতিক সাহস এবং পুরুষকার বিশদভাবে পরিস্ফুট করিয়াছিল।

পৃঃ ৫৪০—হরিনামসঙ্কীর্ত্তন—ভগবানের নামজপ এবং নামসঙ্কীর্ত্তন এই দুইটীর মধ্যে বিভেদ আছে। নামজপ একলাই করা যায়; কিন্তু নামসঙ্কীর্ত্তনে একজনের অধিক লোক এবং সঙ্গীতের আবশ্যকতা হয়।

সঙ্গীত মানবহৃদয়ের উপরে সাতিশয় প্রভাব বিস্তারকরে; কিন্তু সঙ্গীত শেষ হইলে এই প্রভাব হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। সঙ্গীতে বাদ্যযন্ত্র এবং অধিক লোকের আবশ্যকতা থাকার নিমিত্ত ইহার ক্রমাগত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু নামজপ ভক্তের নিজের ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে এবং ইহার প্রভাব সঙ্গীতের তুলনায় অল্প হইলেও, স্থায়ী হয়। চৈতন্যদেব বলিয়াছেন (পৃঃ ৫৪১)—

"প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সভাকার॥
এক কৃষ্ণনাম করে সর্ব্বপাপক্ষয়।
নববিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হইতে হয়॥"

চৈতন্যদেব অবশ্য বলিয়াছেন যে কেবল ভগবানের নাম লইলেই হইবে না। প্রথমতঃ উত্তম হইতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ তৃণের ন্যায় সুনীচ অর্থাৎ অভিমানহীন হইতে হইবে।

আমরা দেখিতে পাই যে চৈতন্যদেব নামজপে ও হরিসঙ্কীর্ত্তনে ব্যাপৃত থাকিলেও জ্ঞানচর্চ্চা এবং মানবের মঙ্গলের জন্য বিবিধপ্রকার কার্য্য সম্পাদনকরিতে বিস্মৃত হন নাই (পৃঃ ৩৬২)। কিন্তু হরিসঙ্কীর্ত্তন, জ্ঞানচর্চ্চা, সর্ব্বজীবের হিতসম্পাদনের অশেষ উপকারিতা থাকিলেও, ভগবানের নামজপকে চৈতন্যদেব শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছিলেন কেন? কৃষ্ণনাম "জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডালে সভারে উদ্ধারে" তিনি বলিলেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা সক্ষম নই। এ প্রশ্নের উত্তর যাঁহারা প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত তাঁহারাই দিতে পারেন। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিদ্বারা যাহা অনুমানকরিতে সমর্থ হইয়াছি তাহাই এখানে বিবৃত করিব—

প্রথমতঃ কৃষ্ণ, হরি, শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতি ভগবানের নাম

কতকগুলি বিশেষ শব্দের সমষ্টি। আমাদিগের সংস্কৃত মন্ত্রগুলিও বিশেষ শব্দের সমষ্টি। রোমান্ ক্যাথলিকেরাও মালা গণনা করিয়া ভগবানের নাম জপকরেন। এই সকল শব্দের ক্রমাগত উচ্চারণের সহিত আধ্যাত্মিক শক্তিবিকাশের নিকট সম্বন্ধ থাকিতে পারে। দুই চারিজন প্রকৃত ভক্তের নিকট শুনিয়াছি যে এই সকল শব্দ-সমষ্টির বিভিন্ন প্রকারের আধ্যাত্মিক শক্তি আছে।

দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজনীয় সাংসারিক কার্য্যসম্পাদনের অব্যবহিত পরেই যদি আমরা ভগবানের নাম জপকরি তাহা হইলে কুচিন্তা আমাদের মনে স্থান পায় না এবং ক্রমাগত ভগবানের নাম জপকরিতে করিতে ভগবানের প্রতি প্রেম না হইয়া থাকিতে পারে না। যিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য নিয়ত ব্যাপৃত আছেন, তাঁহাকে স্মরণকরিয়া আমরা কথঞ্চিৎ পরিমাণে আমাদের কৃতজ্ঞতা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিতে পারি।

তৃতীয়তঃ সাংসারিক কার্য্য হইতে অবসরের সময়ে ভগবানের নামজপ ব্যতীত প্রত্যেক দিন নামজপের অন্ততঃ একটী নির্দ্দিষ্ট সময় থাকা আবশ্যক আমাদিগের মনে হয়। এইরূপ নির্দ্দিষ্ট সময় থাকিলে আমাদিগের মনে হইবে যে প্রতিদিন আমাদিগের ভগবান্‌কে স্মরণ করা এবং তাঁহাকে আমাদিগের কথঞ্চিৎ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকরা আমাদের অতিশয় আবশ্যকীয় সাংসারিক কার্য্যসম্পাদন অপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয়। আদর্শ ভগবদ্ভক্ত চৈতন্যদেবের মতে যেমন ভগবানের —জগন্নাথদেবের——প্রসাদ সর্ব্বসময়েই আদরের সহিত গ্রহণীয়, সেইরূপ ভগবানের নামজপ মানবের সর্ব্বদাই আগ্রহের সহিত করণীয়।

দস্যু পন্থভীলকে ক্রোড়ে স্থাপনপূর্ব্বক তাহার কর্ণে হরি-নাম দিয়া (গোঃ কঃ পৃঃ ২৯), চণ্ডপুরের তর্কপ্রয়াসী বৈদান্তিক ঈশ্বরভারতীকে স্পর্শকরিয়া (ঐ ৪৭), ঘোগার দুষ্ট বালাজীর কর্ণে হরি-নাম প্রদান

করিয়া (ঐ ৬৬), রসালকুণ্ডের দুরাত্মা মাড়ুয়া-ব্রাহ্মণের কর্ণে 'হরি-নাম সুধা ঢালিয়া দিয়া' (ঐ ৮৩) এবং অধিকাংশ স্থলে অপূর্ব্ব হরি-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি পাপীর হৃদয়ে সঞ্চারণপূর্ব্বক, তাহাদিগের দেহ ও মনকে চৈতন্যদেব মোক্ষলাভের উপযোগী করিয়া দিতেন। তিনি যখন কর্ণে হরি-নাম দান করিতেন, তখন হরি-নামের শক্তির সহিত তাঁহার নিজের শক্তি সংযুক্ত হইয়া পাপীর আধ্যাত্মিক উন্নতি সত্বরেই সম্পাদিত করিত।

গ্রন্থকারের শেষ বক্তব্য।

এই পরিশিষ্টই এই গ্রন্থের শেষ-ভাগ। যদি এই পুস্তকের কোন অংশ সুধীগণের প্রশংসা অর্জ্জনকরিতে সক্ষম হয়, তাহা কেবল ঈশ্বরপ্রতিম চৈতন্যদেবের, গ্রন্থকারের স্বর্গীয়া পিতৃস্বসাঠাকুরাণীর এবং গ্রন্থকারের স্বর্গগতা মাতৃদেবীর কৃপানিমিত্ত হইবে ইহা গ্রন্থকারের দৃঢ় বিশ্বাস। প্রশংসা-অর্জ্জন গ্রন্থকারের চরম লক্ষ্য নয়। গ্রন্থকার মুমুক্ষুর প্রধান অবলম্বন শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি-প্রাপ্তির আশায় ইঁহাদিগের, বিশেষতঃ, দয়ার অবতার চৈতন্যদেবের, চরণপ্রান্তে উপনীত হইয়াছে এবং পাপীর এই পরম মিত্রের—

"তোমার কঠিন হিয়া, মরুস্থলী-প্রায়,
রসাল হউক আজি কৃষ্ণের কৃপায়।"—গোঃ কঃ পৃঃ ৮৩—

এই আশ্বাস-বাক্য সাগ্রহে প্রতীক্ষাকরিতেছে।

এই গ্রন্থ সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে আমার একটী বক্তব্য আছে। চৈতন্যদেব নৌকাহইতে কাঞ্চনপল্লীর কোন্‌স্থানে অবতরণ করিয়াছিলেন, শিবানন্দসেনের, বাসুদেবদত্তের, জগদানন্দপণ্ডিতের এবং

শ্রীনাথ পণ্ডিতের কাঁচরাপাড়ার কোন কোন স্থানে গৃহ ছিল, তাহা এক্ষণে নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। কিন্তু চৈতন্যদেবের পরমভক্ত শিবানন্দ-সেন, কবিকর্ণপূর এবং শ্রীনাথপণ্ডিতসেবিত কৃষ্ণদেববিগ্রহ. কাঞ্চন-পল্লীতে এখনও আছেন এবং কলিকাতার বদান্য মল্লিকমহাশয়গণ নির্ম্মিত সুন্দর মন্দিরে এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার দৈনিক পূজা সম্পন্ন হইতেছে। অবশ্য চৈতন্যদেবের সময়ে কৃষ্ণদেবের মন্দির কাঁচরাপাড়ার অন্য স্থানে ছিল এবং পরে ভাগিরথীর গর্ভে নিমগ্ন হইয়াছিল। সেইজন্য আমি মনে করিয়াছিলাম যে কৃষ্ণদেবের বর্ত্তমান মন্দিরের দক্ষিণ প্রাচীরের বহির্গাত্রে চৈতন্যদেবের পদার্পণের এবং শিবানন্দসেন, কবিকর্ণপূর, জগদানন্দপণ্ডিত, শ্রীনাথপণ্ডিত এবং বাসুদেবদত্তের স্মৃতিবিষয়ক একটী প্রস্তরফলক চৈতন্যদেবের কাঁচরাপাড়ায় পদার্পণের দিনে অর্থাৎ আগামী কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে (পৃঃ ২৭৪ দেখুন) কাঁচরাপাড়ানিবাসী এবং প্রবাসীদের বিশেষতঃ কৃষ্ণদেবের সেবায়েত অধিকারীমহাশয়দিগের সাহায্যে স্থাপিত করিতে চেষ্টা করিব। "সাহায্যের" অথ "অর্থসাহায্য" নয়। আমি সহানুভূতিকে "অর্থসাহায্য" অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্ জ্ঞানকরি। কাঁচরাপাড়া হইতে প্রাপ্ত ১৯৩৩, ১৮ই মার্চ্চের পত্র হইতে—এ কার্য্যে কোন আপত্তি হইবে না—এইরূপ আশাকরিয়াছিলাম ; কিন্তু গত ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩ তারিখের কাঁচরাপাড়া হইতে প্রাপ্ত একটী পত্রে জ্ঞাত হইলাম যে এ কার্য্যে কৃষ্ণদেবের সমস্ত সেবায়েত সম্মত হইবার সম্ভাবনা নাই। এই ঘটনা স্মৃতিবার্ষিকী-অনুষ্ঠানের প্রধান অন্তরায় বলিয়া আমি বিবেচনা করি।

প্রস্তর-ফলকে যাহা লিখিত হইত—

"১৪৩৩ শক (১৫১৪ খৃঃ) কার্ত্তিক কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে ঈশ্বরপ্রতিম

গৌরাঙ্গদেবের কাঁচরাপাড়ায় পদার্পণের এবং তাঁহার কাঁচরাপাড়ানিবাসী পরমভক্ত শিবানন্দসেন, তৎপুত্র কবিকর্ণপূর, কৃষ্ণদেব (রাই) বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীনাথপণ্ডিত, জগদানন্দপণ্ডিত ও বাসুদেবদত্তের সামান্য স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এই প্রস্তরফলক কৃষ্ণদেব (রাই) বিগ্রহের সেবায়েত অধিকারীমহাশয়দিগের বিশেষতঃ ৺মধুস্থদনমুখোপাধ্যায়ের পুত্রসকলের এবং কাঁচরাপাড়ানিবাসী এবং বিদেশী গৌরাঙ্গভক্তগণের আগ্রহে এবং কাঁচরাপাড়ার সতীশচন্দ্রদের সামান্য সাহায্যে স্থাপিত হইল—(১লা কার্ত্তিক, কৃষ্ণচতুর্দ্দশী, ১৩৪০ সাল, ১৯৩৩ খৃঃ)।

গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী।

এক্ষণে আমরা দেখিতে পাই যে প্রাদেশিক রাজধানীর এবং জেলার কেন্দ্রীয় নগরগুলির ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে এবং পল্লীগ্রামগুলি ক্রমে ক্রমে অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছে। অবশ্য দুই-একটী পল্লীগ্রাম কোনও বিশেষ ব্যবসায়ের কেন্দ্র হইয়া অধঃপতন হইতে রক্ষা পাইতেছে। কলিকাতার উত্তরে হালিসহর পর্য্যন্ত এবং ভাগীরথীর পশ্চিম পারে হাওড়া হইতে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত পাটের, কাগজের, কাপড়ের ও রংয়ের কলের জন্য পল্লীগ্রামগুলির অনেক উন্নতি হইয়াছে এবং শ্রমজীবীদিগের অবস্থানের জন্য এই সকল স্থান জনবহুল হইয়াছে। এইরূপ কলিকাতার দক্ষিণেও ভাগীরথীর উভয় পার্শ্বে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত পাট ও তূলার কল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার জন্য কতকগুলি পল্লীগ্রামের সমধিক উন্নতিসাধন হইয়াছে। কিন্তু এই সকল গ্রাম ব্যতীত অবশিষ্ট গ্রামগুলি ম্যালেরিয়ার আক্রমণে প্রায় জনশূন্য হইয়াছে।

সমগ্র বাঙ্গালীজাতির উন্নতি পল্লীগ্রামগুলির উন্নতির উপরে অনেকাংশে নির্ভর করে। এই সকল পল্লীগ্রাম মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক এবং কৃষককুলের বাসস্থান এবং ইঁহারাই জাতির মজ্জাস্বরূপ। বাঙ্গালীর অধঃপতন নিবারণকরিতে হইলে এই সকল পল্লীগ্রামের উন্নতিবিধান করিতেই হইবে।

আমরা প্রথমে দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী বিশেষ পল্লীগ্রামের কিরূপ অবনতি হইয়াছে তাহার বর্ণনা করিব এবং তাহার পরে কি উপায়ে বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতি হইতে পরে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিব।

আপনারা বোধ হয় কাঁচরাপাড়ার নাম শুনিয়াছেন। গণ্ডগ্রাম অর্থাৎ বৃহৎ পল্লীগ্রাম বলিয়া এক সময়ে ইহার খ্যাতি ছিল। এখানে এক সময়ে বহু মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের জন্মভূমিকে বিখ্যাত করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের প্রিয় পার্ষদ সেন শিবানন্দ ও তাঁহার পুত্র পরম বৈষ্ণব এবং প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার কবিকর্ণপুর, গৌরাঙ্গদেবের প্রিয়তম ভক্ত বাসুদেব দত্ত, 'প্রভাকর' সম্পাদক কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, 'অজ্ঞানতিমিরনাশক'-প্রণেতা বৈদ্যনাথ আচার্য্য, 'জ্ঞানার্ণব'গ্রন্থ রচয়িতা প্রেমচাঁদ কবিরত্ন, 'অদ্ভুত রামায়ণ' ও 'তুলসীদাসের রামায়ণ'এর অনুবাদক হরিমোহন সেনগুপ্ত, বিখ্যাত নৈয়ায়িক সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিমচাঁদ শিরোমণি [১], প্রসিদ্ধ কবিরাজ চণ্ডীচরণ রায়, কবিরাজ কৃষ্ণদাস সেন এবং কবিরাজ কৃষ্ণাভরণ এই গ্রামকে অতীতকালে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

বিখ্যাত সরকারী চিকিৎসক (পরে উত্তরপাড়ানিবাসী)

১। নিমচাঁদ শিরোমণি মহাশয় সম্ভবতঃ ১৮৩৮ সালে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম মধুমালতী ছিল। শিরোমণি মহাশয়ের মৃত্যুর অন্ততঃ এগার বৎসর পর পর্য্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন এবং কলিকাতায় বাস করিতেন। আমাদের বর্ত্তমান বাসস্থানের উত্তরে যে আমাদের প্রাচীর-বেষ্টিত বাগান আছে—যাহাকে আমরা নহবৎখানার বাগান বলি, ঐ স্থানে শিরোমণি মহাশয়ের একটী বাঁশের ঘর ও টোল ছিল। পরে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হইলে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। এখনও শিরোমণি-মহাশয়ের দুর্গাপূজার বোধনের বেলগাছ আমাদের এই নহবৎখানার বাগানের ভিতর বর্ত্তমান আছে। সেই গাছের বেলের ন্যায় ভাল বেল সচরাচর দৃষ্ট হয় না।

৺ সূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায়, বিখ্যাত অধ্যাপক ৺ বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের মাতুল, মেডিক্যাল কলেজের কেমিক্যাল এগ্জামিনার ৺ তারাপ্রসন্ন রায়, যোধপুরের রাজার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ৺ নবীনচন্দ্র গুপ্ত, খ্যাতনামা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক ৺ ব্রজেন্দ্রকুমার রায় এবং তাঁহার চারি পুত্র কবিরাজ ৺ রাজেন্দ্রকুমার রায়, কবিরাজ ৺ দেবেন্দ্রকুমার রায়, কবিরাজ ৺ নৃপেন্দ্রকুমার রায় এবং কবিরাজ গিরীন্দ্রকুমার রায়, বিখ্যাত ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সুহৃদ্ এবং উচ্চশিক্ষিত বঙ্গের প্রথম ডিষ্ট্রিক্ট পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ৺ জগদীশনাথ রায় এবং তাঁহার পুত্র কলিকাতার রেজিষ্ট্রার ৺ রাধানাথ রায় এম্-এ, (কলিকাতায় সিমলাতে জগদীশনাথ রায় নামীয় একটী লেন আছে), কবি ৺ ঈশ্বর-চন্দ্র গুপ্তের ভাগিনেয় 'শ্রীমদ্ভাগবত', 'যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ'এর বঙ্গানুবাদক ও 'কাঁচরাপাড়া' পত্রিকা সম্পাদক কবিরাজ ৺ শশিভূষণ রায় এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কবিরাজ ৺ গিরিজাভূষণ রায়, কাঁচরাপাড়া ও চুঁচুড়াপ্রবাসী কবিরাজ এবং সুকবি ব্রজবল্লভ রায় কাব্যকণ্ঠবিশারদ, প্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺ উপেন্দ্রনাথ বরাট্, তাঁহার পুত্র বাঁকীপুরের বিখ্যাত সরকারী চিকিৎসক সনৎকুমার বরাট্ এম্-এ, এল্-এম্-এস্ ও তৎপুত্র অজিতকুমার বরাট্ এম্-বি, অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জন জয়কৃষ্ণ দাশগুপ্ত, সিভিল সার্জ্জন রাধারমণ ঘোষ, অবসরপ্রাপ্ত সরকারী ডাক্তার গোপাল-চন্দ্র ঘোষ, বহুদর্শী এবং দেশহিতৈষী চুঁচুড়া কলেজের শিক্ষক ৺ কৈলাসচন্দ্র ঘোষ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং দেশহিতৈষী ৺ সূর্য্যকুমার সেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিশাস্ত্রের অধ্যাপক এবং গ্রন্থকার সতীশচন্দ্র রায় এম্-এ, এবং তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র বিলাতপ্রত্যাগত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক বঙ্কিমচন্দ্র রায়, সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের ভাগিনেয় কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর

বর্ত্তমান কলেক্টর হরিচরণ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, এবং তাঁহার ভ্রাতা উত্তরপাড়া কলেজের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক পান্নালাল মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিলাতপ্রত্যাগত ইংরাজীভাষার বিশিষ্ট অধ্যাপক জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মধ্যপ্রদেশের সহকারী জজ্ সিদ্ধেশ্বর ঘোষ, কলিকাতা সিমলার হ্যালোপ্যাথি চিকিৎসক বটকৃষ্ণ রায়, বাঁকুড়ার সরকারী ডাক্তার বলাইচন্দ্র রায়, চুঁচুড়ার প্রসিদ্ধ কবিরাজ জগদীশচন্দ্র রায়, কলিকাতা গ্রে ষ্ট্রীটের কবিরাজ ৺ মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত (মল্লিক), অবসরপ্রাপ্ত সরকারী চিকিৎসক ধর্ম্মপ্রবণ নৃত্যলাল মুখোপাধ্যায় এবং বিলাতপ্রত্যাগত পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ও বর্ত্তমানে কলম্বো ইউনিভার্সিটি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক যতীশচন্দ্র দে প্রভৃতি বর্ত্তমান যুগেও কাঁচরাপাড়ার খ্যাতি বর্দ্ধন করিয়াছেন।

পূর্ব্ব-বাঙ্গালা-রেলওয়ের কাঁচরাপাড়া ষ্টেশান হইতে তিন মাইল দূরে উত্তর-পশ্চিম দিকে কাঁচরাপাড়া গ্রাম অবস্থিত। হালিসহর, মল্লিকের বাগ এবং গোলাবাড়ী গ্রাম ইহার দক্ষিণে। এই সকল গ্রাম এবং কাঁচরাপাড়ার মধ্যে মল্লিক-সাহেবের বা বাগের খাল এক সময়ে ভাগীরথীর সহিত যমুনা-নদীকে সংযুক্ত করিয়াছিল। এক্ষণে এই যমুনা-নদীর এবং এই বাগের খালের অবস্থা শোচনীয়। লর্ড রোণাল্ড্সের আমলে এই দুইটী জলপ্রণালীর সংস্কারের কথা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই হয় নাই।

কাঁচরাপাড়া, কাঞ্চনপল্লী এবং কাঞ্চনপাড়া নামে বিবিধ গ্রন্থে অভিহিত হইয়াছে। শিশির ঘোষ মহাশয়ের 'অমিয়-নিমাই-চরিতে', মুরারিলাল অধিকারী মহাশয়ের 'বৈষ্ণব দিগ্-দর্শনীতে', নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় বিরচিত 'বৈষ্ণবাচার দর্পণে', অমূল্যচরণ রায় ভট্ট

মহাশয় লিখিত 'বৈষ্ণব চরিতাভিধানে', নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের 'বিশ্বকোষে' কাঁচরাপাড়া, সেন শিবানন্দ, তৎপুত্র কবিকর্ণপূর এবং বাসুদেব দত্ত নামা চৈতন্যদেবের প্রিয়তম ভক্তমণ্ডলীর আবাসস্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে।

শিবানন্দ সেনকে চৈতন্যদেব অতিশয় স্নেহ করিতেন। গৌরাঙ্গদেবের নীলাচলে অবস্থানকালে প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময়ে গৌড়ের ভক্তমণ্ডলীকে সঙ্গে করিয়া পুরীতে সেন মহাশয় লইয়া যাইতেন। শিবানন্দ সেনের তিন পুত্র : জ্যেষ্ঠ—চৈতন্য দাস, মধ্যম—রামদাস এবং কনিষ্ঠ পরমানন্দদাস। এই পরমানন্দদাস যখন শিশু, তখন সস্ত্রীক শিবানন্দ সেন তাঁহাকে লইয়া নীলাচলে গমন করেন এবং পরমানন্দ মহাপ্রভুর সুন্দর পদাঙ্গুষ্ঠ লেহন করেন—যথা চৈতন্যচরিতামৃতে (অন্ত্য, দ্বাদশ পরিচ্ছেদে)—

"শিবানন্দ তিন পুত্র গোসাঞিকে মিলাইলা।
শিবানন্দ সম্বন্ধে সভায় [১] বহু কৃপা কৈলা॥
ছোট পুত্র দেখি প্রভু নাম পুছিল।
পরমানন্দদাস নাম সেন জানাইল॥

*   *   *

শিবানন্দ সেই বালক যবে মিলাইল।
মহাপ্রভু পদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিল॥"

যখন পরমানন্দদাসের বয়স সাত বৎসর, তখন শিবানন্দ তাঁহাকে পুনরায় নীলাচলে চৈতন্যদেব-সকাশে লইয়া গিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গদেব ইঁহাকে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে বলিলে, পরমানন্দ (পুরীদাস) কিছুতেই কৃষ্ণনাম-উচ্চারণ করিলেন না, কিন্তু নিম্নলিখিত শ্লোক

১। সবায়।

আবৃত্তি করিয়া গোপীগণের কর্ণভূষণ বর্ণনাকরিলেন এবং কৃষ্ণের জয়গান করিলেন। এইজন্য তাঁহার নাম কবিকর্ণপূর হইয়াছিল (চৈঃ চঃ—অন্ত্য—১৬শ পরিচ্ছেদে)—

কবিকর্ণপূরকৃত আর্য্যাশতকে—

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণোরঞ্জনমুরসোমহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি ॥

(কর্ণদ্বয়ের নীলপদ্ম, নয়নযুগলের কজ্জল এবং বক্ষঃস্থলের মহেন্দ্র-মণিমালা এবং ব্রজরমণীদিগের অখিল ভূষণস্বরূপ শ্রীহরির জয় হউক।)

আর একবার শিবানন্দ পুরীদাসকে দূর হইতে এইরূপে চৈতন্য-দেবের সহিত পরিচিত করাইয়া দিয়াছিলেন—

পশ্য পশ্য অয়ময়ং—
বিদ্যুদ্দামদ্যুতিরতিশয়োৎকণ্ঠকণ্ঠীরবেন্দ্রঃ
ক্রীড়াগামী কনকপরিঘদ্রাঘিমোদ্দামবাহুঃ।
সিংহগ্রীবো নবদিনকরদ্যোতবিদ্যোতিবাসাঃ
শ্রীগৌরাঙ্গঃ স্ফুরতি পুরতোবন্দ্যতাং বন্দ্যতাং ভোঃ ॥

চৈঃ চঃ নাটক—১০ম অঙ্ক—২৬।

(দেখ দেখ, যাঁহার অঙ্গশোভায় সৌদামিনীসমূহ ও গমনে মৃগপতি এবং আজানুলম্বিত বাহুযুগলে কাঞ্চনদণ্ড পরাজিত হইয়াছে, সেই সিংহগ্রীব শ্রীগৌরচন্দ্র নবোদিত দিনমণির ন্যায় অরুণবসনে অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছেন। অহে! তোমরা ইঁহাকে প্রণাম কর।)

—রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের অনুবাদ।

কবিকর্ণপূর নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করিয়াছিলেন—চৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্য (১৫৪২ খৃঃ), আনন্দবৃন্দাবন চম্পূ, চৈতন্যচন্দ্রোদয়

নাটক (১৫৭২ খৃঃ), গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা (১৫৭৬ খৃঃ), শ্রীচৈতন্য-শতক, স্তবাবলী, কৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা, কেশবাষ্টক, অলঙ্কারকৌস্তভ[১] ও আর্য্যাশতক। ইঁহার প্রধান গ্রন্থগুলি বিস্তৃতভাবে পরে বর্ণনা করিব।

বাসুদেব দত্তকেও চৈতন্যদেব অতিশয় অনুগ্রহ করিতেন। বাসুদেব সম্বন্ধে গৌরাঙ্গদেব বলিয়াছিলেন—

"এ শরীর বাসুদেব দত্তের আমার॥
দত্ত আমা যথা বেচে তথাই বিকাই।
সত্য সত্য ইহাতে অন্যথা কিছু নাই॥
বাসুদেব দত্তের বাতাস্ যার গায়।
লাগিয়াছে তারে কৃষ্ণ রক্ষিবে সদায়॥
সত্য আমি কহি, শুন বৈষ্ণবমণ্ডল।
এ দেহ আমার—বাসুদেবের কেবল॥"

(চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য—৫ম)

চৈতন্যদেবের দয়া ও স্নেহ কখনও অপাত্রে ন্যস্ত হইত না। বাসুদেব দত্ত সম্বন্ধে বৃন্দাবন দাস তাঁহার চৈতন্য-ভাগবতে আরও লিখিয়াছেন—

"জগতের হিতকারী বাসুদেব দত্ত।
সর্ব্বভূতে কৃপালু চৈতন্য-রসে মত্ত॥
গুণগ্রাহী অদোষ-দরশী সবা প্রতি।
ঈশ্বরে, বৈষ্ণবে যথাযোগ্য রতি মতি॥"

(অন্ত্য, ৫ম পরি)

সর্ব্ব-জীবে দয়ার জন্য বাসুদেবের আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হইত। চৈতন্যদেব নিজে 'বিরক্ত' সন্ন্যাসী হইলেও গৃহস্থ বৈষ্ণবদিগকে অমিত-

১ সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরীতে যে অলঙ্কার-কৌস্তুভ আছে, তাহা শ্রীবিশ্বেশ্বর বিরচিত এবং আর্য্যাশতকও শ্রীমুদ্গলাচার্য্য লিখিত।

ব্যয়ী হইতে পরামর্শ দিতেন না। সেই জন্য মিতব্যয়ী শিবানন্দ সেনকে বলিয়াছিলেন যে তিনি যেন তাঁহার প্রতিবাসী বাসুদেবের সম্পত্তির সর্‌খেল্ অথবা তত্ত্বাবধায়ক হয়েন্—

"শিবানন্দ সেনে কহে করিয়া সম্মান,
বাসুদেব দত্তের তুমি করিহ সমাধান [১]।
পরম উদার তেঁহো যে দিনে যে আইসে,
সেইদিনে ব্যয় করে নাহি রাখে শেষে।
গৃহস্থ হয়েন ইঁহো চাহিয়ে সঞ্চয়,
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্বভরণ না হয়।
ইঁহার ঘরের আয় ব্যয় সব তোমা স্থানে,
সর্‌খেল্ হঞা তুমি করিহ সমাধানে॥"

(চৈঃ চঃ, মধ্য, ১৫শ পরিঃ)

শান্তিপুরের অদ্বৈতাচার্য্যকে (খৃঃ ১৪৩৪—১৫৫৭) চৈতন্যদেব (খৃঃ ১৪৮৬—১৫৩৩) ঐকান্তিক ভক্তি করিতেন। আচার্য্যের কমলাকান্ত বিশ্বাস নামে এক সরকার ছিলেন। তিনি উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রকে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন যে আচার্য্য সাক্ষাৎ ঈশ্বর, কিন্তু তাঁহার কিছু ঋণ হইয়াছে। চৈতন্যদেব সেই পত্র ঘটনাক্রমে দেখিতে পাইয়া কমলাকান্তের উপর অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার ভৃত্য গোবিন্দকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন যে কমলাকান্ত বিশ্বাস (বাউলিয়া বিশ্বাস) যেন তাঁহার নীলাচলের বাসস্থানে আর না আইসেন (চৈঃ চঃ, আদি, ১২শ পরিঃ)। ইহা হইতেও আমরা অনুমান করিতে পারি যে গৌরাঙ্গদেব অমিতব্যয়, ঋণ, পরমুখাপেক্ষিতা ও বিষয়ীর নিকট হইতে ধন-প্রার্থনাকে ঘৃণা করিতেন। পরে তিনি কমলাকান্তকে ক্ষমা

১—বন্দোবস্ত।

করিয়াছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য বলিয়াছিলেন যে তিনি ঐ পত্রের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ ছিলেন।

বাসুদেবের মানবপ্রীতি অসাধারণ ছিল। চৈতন্য-চরিতামৃতে (আদি ১০ম পরিচ্ছেদে) আছে—

"বাসুদেব দত্ত প্রভুর ভৃত্য মহাশয়।
সহস্র মুখেতে যাহ গুণ কহিলে না হয়॥
জগতে যতেক জীব তার পাপ লয়া।
নরক ভুঞ্জিতে চাহে জীব ছোড়াইয়া॥"

পুনরায় চৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য—১৫শ পরিচ্ছেদে)—

"তবে বাসুদেবে প্রভু করি আলিঙ্গন,
তার গুণ কহে হৈয়া সহস্রবদন।
নিজ গুণ শুনি বাসুদেব লজ্জা পেয়ে,
নিবেদন করে প্রভুর চরণে ধরিয়ে।
জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার,
মোর নিবেদন এক কর অঙ্গীকার।
করিতে সমর্থ তুমি মহা দয়াময়,
তুমি মন কর তবে অনায়াসে হয়।
জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে,
সব জীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে।
জীবের পাপ লয়ে মুই করি নরক ভোগ,
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভব রোগ।
এত শুনি মহাপ্রভুর হৃদয় দ্রবিলা,
অশ্রু-কম্প স্বরভঙ্গে বলিতে লাগিলা।
তোমার এই চিত্র নহে, তুমি ত' প্রহ্লাদ,

তোমার উপরে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ প্রসাদ।
কৃষ্ণ সেই সত্য করে যেই মাগে ভৃত্য,
ভৃত্যবাঞ্ছা বিনে কৃষ্ণের নাহি অন্য কৃত্য।
ব্রহ্মাণ্ডজীবের তুমি বাঞ্ছিলে নিস্তার,
বিনা পাপ ভোগে হবে সবার উদ্ধার।
অসমর্থ নহে কৃষ্ণ ধরে সর্ব্ব বল,
তোমাকে বা কেনে ভুঞ্জাইবে পাপফল।
তুমি যার হিত বাঞ্ছ সে হৈল বৈষ্ণব,
বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর করে সব।”

বাসুদেব দত্ত বিনয়ের এবং নিঃস্বার্থতার মূর্ত্তপ্রতীক ছিলেন। মুকুন্দ দত্ত বাসুদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, যথা চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে (৮ম অঙ্ক)—

‘এষ বাসুদেবো মুকুন্দস্য জ্যায়ান্ (জ্যেষ্ঠঃ সহোদরঃ)।

মুকুন্দ চৈতন্যদেবের সহাধ্যায়ী ও উচ্চ শ্রেণীর গায়ক ছিলেন—যথা চৈতন্য চরিতামৃতে—(আদি ১০ম পরিচ্ছেদে)—

‘শ্রীমুকুন্দ দত্ত শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী।
যাঁহার কীর্ত্তনে নাচেন চৈতন্য গোসাঞি॥’

বাসুদেব দত্ত কাঁচরাপাড়ায় বাস করিতেন। মুকুন্দ নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের সহপাঠী ছিলেন, সম্ভবতঃ সেই স্থানেই থাকিতেন, কিন্তু চারিমাসের জন্য গৌড়ীয় ভক্তগণের সহিত তিনি নীলাচলে অবস্থান করিতেন—‘প্রতিবর্ষ আইসে সঙ্গে রহে চারি মাস’ (চৈঃ চঃ—মধ্য—১ম)। মুকুন্দ দত্ত চৈতন্যদেবের প্রথম নীলাচল আগমনের সময়ে অন্য পাঁচজন (চৈতন্য ভাগবত মতে ; চৈতন্যচরিতামৃত, অদ্বৈতপ্রকাশাদি মতে আর তিনজন) ভক্তের সহিত গৌরাঙ্গদেবকে অনুসরণ করিয়াছিলেন।

চৈতন্যদেব যখন কুমারহট্টের উত্তরাংশে অর্থাৎ আধুনিক কাঁচরাপাড়াতে

উপনীত হইয়া প্রথমে বাসুদেবের অথবা শিবানন্দের বাটীতে যাইবেন স্থির করিতে পারিতেছিলেন না, তখন বাসুদেব তাঁহাকে শিবানন্দের গৃহেতে প্রথমে যাইতে অনুরোধকরিয়াছিলেন।

কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের নবম অঙ্কে কুমারহট্টে শ্রীবাসের গৃহে এবং তাহার পর কবিকর্ণপূরের পিতা শিবানন্দ সেনের গৃহে এবং তাহার কিছুকাল পরেই নিকটস্থ বাসুদেব দত্তের আবাসে গৌরাঙ্গদেবের আগমনের কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। আমরা ঐ স্থানের সংস্কৃত শ্লোকগুলির রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অনুবাদ নিম্নে দিতেছি।—

"তদনন্তর (গৌরাঙ্গদেব) কুমারহট্টে শ্রীবাস পণ্ডিতের বাটীতে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু গঙ্গাতীর হইতে বাটী গমন পর্য্যন্ত যে যে স্থানে ভগবান্ পদার্পণ করিয়াছিলেন বহুতর লোক তাঁহার পদরেণুগ্রহণের নিমিত্ত নিরন্তর সেই স্থানে হস্তার্পণ করায় প্রায় সকল পথই গর্ত্তময় হইয়াছিল। অনন্তর ভগবান্ শ্রীবাস-গৃহে উত্তীর্ণ হইলে জগদানন্দ অলক্ষিতভাবে শিবানন্দের ভবনে গমন করিলেন, এবং শ্রীবাসের প্রণয়ে ভগবান্ বহুকাল তাঁহার গৃহে থাকিবেন, অতএব শিবানন্দের গৃহে তাঁহাকে আনিতে হইবে, ইহা স্থির করিয়া তাঁহার আগমনের পথ বিবিধ প্রকারে সুসজ্জিত করিলেন। অনন্তর রাত্রিশেষে প্রাচীরের উপরি-ভাগে ও বৃক্ষগণের প্রতি শাখায়, পৃথিবীতে ও প্রত্যেক রাজপথে ও অন্যান্য পথে মনুষ্যগণ অবস্থিত হইয়া "হরি বল, হরি বল" বলিয়া কোলাহল-ধ্বনি করিতেছে, এমন সময়ে ভগবান্ তরণীতে আরোহণ-পূর্ব্বক শিবানন্দের ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এ দিকে জগদানন্দ পথের উভয় পার্শ্বভাগ, কদলীস্তম্ভ, পূর্ণকুম্ভ, নবপল্লব, দীপাবলী দ্বারা শিবানন্দের বাটী পর্য্যন্ত সুশোভিত করিলেন। অনন্তর ভগবান্ সহাস্য

বদনে (ইহা জগদানন্দের কৃত) স্থির করিয়া বামভাগে বাসুদেব-বাটীর পথও সেই প্রকারই দর্শন করিলেন। তখন 'অগ্রে কোন দিকে যাইব' বলিয়া সন্দিহান হইলে, বাসুদেব কহিলেন—ভগবন্! অগ্রে শিবানন্দের ভবন অলঙ্কৃত করুন।[১] তাহা শুনিয়া ভগবান্ তথায় উপনীত হইলে জগদানন্দ চরণ প্রক্ষালনকরিলেন; অনন্তর শিবানন্দের ভগবৎ-সেবা-গৃহে প্রবেশ করিলেন। এদিকে জগদানন্দ তাঁহার কিঞ্চিৎ চরণোদক গৃহসকলের উপরিভাগে এবং কিঞ্চিৎ তাঁহার অন্তঃপুরের পরিজনদিগকে অর্পণ করিলেন। অনন্তর তথায় ক্ষণকাল থাকিয়া বাসুদেবের গৃহে আসিলেন এবং সেই স্থানে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক ভগবান্ যাত্রা করিলে, তাঁহার চরণামৃত গ্রহণের নিমিত্ত অতি ব্যস্ত হইয়া মনুষ্যগণ আকণ্ঠ জলে নিমগ্ন হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ভগবানের করুণার উদ্রেক হইলে অনায়াসে সকলেই তাঁহার চরণজল লাভ করিল। তদনন্তর স্থলপথে সকলেই প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল, কেহই আর নিবৃত্ত হইল না।"

শিবানন্দ সেন গৌরাঙ্গদেবের বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারের একজন প্রধান সহায়ক হইয়াছিলেন। তাঁহার পরিবারবর্গ সকলেই চৈতন্যদেবের ভক্ত ছিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃতে (আদি—১০ম পরিচ্ছেদে) লিখিত আছে

১—কবিকর্ণপূর লিখিত চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে—

রাত্রাবেকোঽপহ্নুতো নৌকয়াসৌ।
তত্তদ্গ্রামস্যোত্তরেণান্যদেশং ॥
আয়াতঃ শ্রীবাসুদেবস্য গেহং।
গত্বা পায়াৎ শ্রীশিবানন্দগেহং ॥—২০শ—১৭

অর্থাৎ রাত্রিকালে একজন চোর (গৌরাঙ্গদেব) নৌকায় সেই গ্রামের (কুমারহট্টের) উত্তর ভাগে (কাঁচরাপাড়াতে) অন্যদেশ (পাণিহাটী) হইতে আসিয়া বাসুদেবের গৃহ বলিয়া গমনকরতঃ শিবানন্দ সেনের গৃহে উপনীত হইলেন।

যে শিবানন্দ, তাঁহার তিন পুত্র ও দুই ভাগিনেয় (বল্লভ সেন ও শ্রীকান্ত সেন) গৌরাঙ্গদেবের একান্ত ভক্ত ছিলেন। সে সময়ে উৎকলের হিন্দু রাজা প্রতাপরুদ্রের সহিত গৌড়ের মুসলমান নৃপতির বিবাদ থাকাতে গৌড়দেশ হইতে নীলাচলের পথ বিপদ্‌সঙ্কুল ছিল এবং ঘাট-রক্ষকেরা (ঘট্টপাল—চৈঃ চঃ নাটক, ১০ম পরিঃ) কর অর্থাৎ শুল্কগ্রহণের সময়ে যাত্রীদিগের প্রতি অত্যাচার করিত। শিবানন্দ বিশেষ ক্ষমতাশালী ও ধনশালী লোক ছিলেন। সম্ভবতঃ গৌড়ের মুসলমান নৃপতিও তাঁহাকে প্রভূত সম্মান করিতেন। এই জন্য চৈতন্যদেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

"প্রতি বর্ষ আমার সর্ব্ব ভক্তগণ লইয়া।
গুণ্ডিচায় আসিবে সবার পালন করিয়া ॥

(চৈঃ চঃ, মধ্য, ১৫শ পরিঃ)

গুণ্ডিচা—নীলাচলে সপ্তদিন জগন্নাথদেবের রথ-অবস্থান-স্থান।

গৌরাঙ্গদেবের এই আদেশ শিবানন্দ শিরোধার্য্য করিয়া প্রতি বৎসর গৌড়ের ভক্তমণ্ডলীকে লইয়া চৈতন্যদেবের নিকটে উপস্থিত হইতেন।—

"কুলীনগ্রামী ভক্তগণ আর খণ্ডবাসী।
শিবানন্দ সেন সনে মিলিলা আসি ॥
শিবানন্দ করে সব ঘাটি সমাধান [১]।
সবার পালন করি সুখে লইয়া যান ॥
সবার সর্ব্বকার্য্য করে দেন বাসাস্থান।
শিবানন্দ জানেন উড়িয়া পথের সন্ধান ॥"

(চৈঃ চঃ—অন্ত্য—১ম পরিচ্ছেদ)

সপ্তগ্রামের ধনবান্ কায়স্থ জমিদার গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র রঘুনাথ

১—ঘট্টপালদিগকে (Toll keeper) শুল্ক দিবার বন্দোবস্ত।

দাস বৈরাগ্য অবলম্বনকরিয়া চৈতন্যদেবের নিকট নীলাচলে গমন করিলে গোবর্দ্ধন শিবানন্দকে লোকদ্বারা বিনয় করিয়া পত্র দিলেন যে তিনি যেন নীলাচল হইতে রঘুনাথকে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বলেন। শিবানন্দের সঙ্গে রঘুনাথের পিতা দুই ভৃত্য ও এক ব্রাহ্মণকে রঘুনাথের প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য চারিশত টাকার সহিত পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা শিবানন্দের সঙ্গ লওয়াতে নীলাচলে পৌছিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু রঘুনাথ দাসকে বৈরাগ্য হইতে এবং চৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব হইতে কেহই নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই।

পথে যদি কাহারও কিছু অসুবিধা হইত, তাহার জন্য শিবানন্দ তিরস্কৃত ও অপমানিতও হইতেন, কিন্তু এই প্রকৃত বৈষ্ণব তাহাতে অণুমাত্র ক্রোধান্বিত হইতেন না। একবার একটী পারঘাটে শুল্ক আদায়কারীর নিকট সমস্ত যাত্রীর জামিন হইয়া তাহার সহিত শুল্ক নির্দ্ধারণে অধিক সময় অতিবাহিত হওয়ার জন্য ভক্তগণের বাসস্থান স্থির করিতে শিবানন্দের কিছু বিলম্ব ঘটিয়াছিল। ইহাতে নিত্যানন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া শিবানন্দকে পদাঘাত করিয়াছিলেন এবং শিবানন্দের পত্নীর (মালতী—বৈষ্ণবাচারদর্পণ, ৩৫১ পৃষ্ঠা) সমক্ষে তাঁহার 'তিন পুত্র মরুক' বলিয়া শাপ দিয়াছিলেন। শিবানন্দ ঘাট হইতে আসিয়া এই রূঢ় বাক্য শ্রবণে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া হাস্যমুখে নিত্যানন্দের বাসস্থান স্থির করিয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। শিবানন্দের ভাগিনেয় শ্রীকান্ত সেন (গরিফায় ইঁহার বাটী ছিল—বৈষ্ণবাচারদর্পণ, ৩৪৭ পৃষ্ঠা) মাতুলের এই অপমানে ক্ষুব্ধ হইয়া ভক্তগণকে ত্যাগ করিয়া একলাই নীলাচলে চৈতন্যদেবের সকাশে গমন করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে আমরা শিবানন্দের বিষয়-বুদ্ধির কথা বলিয়াছি। সেই জন্য

চৈতন্যদেব তাঁহাকে তাঁহার গ্রামবাসী বাসুদেব দত্তের আয়-ব্যয়ের তত্ত্বাবধারণ করিতে বলিয়াছিলেন।

শিবানন্দ মধ্যে মধ্যে তাঁহার স্ত্রী ও তিন পুত্রকে নীলাচলে চৈতন্য-দেবের নিকটে লইয়া যাইতেন। নীলাচলে গৌরাঙ্গদেবকে শিবানন্দ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র চৈতন্যদাস মধ্যে মধ্যে ভিক্ষা দিতেন অর্থাৎ নিমন্ত্রণ করিতেন—

"শিবানন্দের গৌরবে প্রভু করিল ভোজন।
অতি গুরু ভোজনে প্রভুর প্রসন্ন নহে মন॥
আর দিন চৈতন্যদাস কৈল নিমন্ত্রণ।
প্রভুর অভীষ্ট বুঝি আনিল ব্যঞ্জন॥
দধি নেম্বু আর ফুলবড়ি লবণ।
সামগ্রী দেখিয়া প্রভুর সুপ্রসন্ন মন॥
প্রভু কহে এই বালক মোর মত জানে।
সন্তুষ্ট হইলাম আমি ইহার নিমন্ত্রণে॥

(চৈঃ চঃ—অন্ত্য—১০ম)

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে শিবানন্দ সেন, তাঁহার পুত্র কবিকর্ণপূর ও বাসুদেব দত্তের বাটী কুমারহট্টে (কাঁচরাপাড়াতে) ছিল। গৌরাঙ্গ-দেবের আর একজন ভক্তের আবাস সম্ভবতঃ কুমারহট্টে অর্থাৎ হালিসহর কিম্বা কাঁচরাপাড়াতে ছিল। কুমারহট্ট বলিলে এক্ষণের হালিসহর, গোলাবাড়ী, বাগ ও কাঁচরাপাড়া বুঝিতে হইবে। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে (নবম অঙ্কের অনুবাদে) লিখিত আছে—"অনন্তর ভগবান্ (রাঘব পণ্ডিতের আবাস পানিহাটী হইতে নৌকাযোগে আসিয়া কুমারহট্টে) শ্রীবাসগৃহে উত্তীর্ণ হইলে জগদানন্দ অলক্ষিত ভাবে

শিবানন্দের ভবনে গমন করিলেন এবং শ্রীবাসের প্রণয়ে ভগবান্ বহুকাল তাঁহার গৃহে থাকিবেন অতএব শিবানন্দের ভবনে তাঁহাকে আনিতে হইবে, ইহা স্থির করিয়া তাঁহার আগমনের পথ বিবিধ প্রকারে সুসজ্জিত করিলেন···এদিকে জগদানন্দ পথের উভয় পার্শ্বভাগ কদলীস্তম্ভ, পূর্ণকুম্ভ, নবপল্লব, দীপাবলী দ্বারা শিবানন্দের বাটী পর্য্যন্ত সুশোভিত করিলেন। অনন্তর ভগবান্ সহাস্যবদনে (ইহা জগদানন্দের কৃত) স্থির করিয়া বামভাগে বাসুদেববাটীর পথও সেই প্রকারই দর্শন করিলেন, তখন অগ্রে কোন দিকে যাইব বলিয়া সন্দিহান হইলে বাসুদেব কহিলেন, ভগবন্, অগ্রে শিবানন্দভবন অলঙ্কৃত করুন। তাহা শুনিয়া ভগবান্ তথায় উপনীত হইলে জগদানন্দ চরণ প্রক্ষালনকরিলেন। এদিকে জগদানন্দ তাঁহার কিঞ্চিৎ চরণোদক গৃহ সকলের উপরিভাগে এবং কিঞ্চিৎ তাঁহার অন্তঃপুরের পরিজনদিগকে অর্পণ করিলেন।" চৈতন্যচন্দ্রোদয়ে লিখিত বিবরণ হইতে ইহা অনুমিত হয় যে (১) জগদানন্দ শিবানন্দ সেনকে অতিশয় স্নেহ করিতেন, (২) শিবানন্দ সেন ও তাঁহার পরিজন-বর্গের যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন, (৩) চৈতন্যদেবকে তিনি সাতিশয় ভক্তি প্রদর্শনকরিতেন, এবং (৪) শ্রীবাস ও শিবানন্দের বাটীতে তাঁহার সর্ব্বদা গতায়াত ছিল। চৈতন্য-ভাগবতে (অন্ত্য—২য় অধ্যায়ে) বর্ণিত আছে যে যখন গৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাসগ্রহণের পর শান্তিপুরস্থ অদ্বৈতাচার্য্যগৃহ হইতে নীলাচলাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন তখন জগদানন্দ আর পাঁচ জন—নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ দত্ত (বাসুদেব দত্তের কনিষ্ঠ); গোবিন্দ এবং ব্রহ্মানন্দের সহিত চৈতন্যদেবকে অনুসরণ করিয়াছিলেন। সত্যভামার অবতার বলিয়া জগদানন্দের বৈষ্ণবসমাজে খ্যাতি ছিল এবং তিনি চৈতন্যের প্রিয়পাত্র ছিলেন—'পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ' (চৈঃ চঃ—আদি ১০ম পরিঃ)

স্বরূপ-দামোদর, গদাধর, দামোদর পণ্ডিত প্রভৃতির সহিত নীলাচলে থাকিয়া জগদানন্দ চৈতন্যদেবের সেবা করিতেন—

(চৈঃ চঃ—আদি ১০ম পরিচ্ছেদ)।

যখন গৌরাঙ্গদেব দক্ষিণদেশে তাঁহার প্রেম-ধর্ম্ম প্রচারকরিয়া আলালনাথে প্রত্যাগত হইলেন, তখন তিনি নীলাচলের ভক্তমণ্ডলীর নিকট কৃষ্ণদাসকে পাঠাইলেন। কৃষ্ণদাসের নিকট গৌরাঙ্গদেবের আলালনাথে আগমন শ্রবণকরিয়া জগদানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ আলালনাথ অভিমুখে ধাবিত হইলেন—যথা চৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য, ৯ম পরিচ্ছেদে)—

'জগদানন্দ দামোদর পণ্ডিত মুকুন্দ।
নাচিয়া চলিলা দেহে না ধরে আনন্দ॥'

ইহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে জগদানন্দ অন্যান্য কতিপয় গৌড়ীয় ভক্তদিগের সহিত চৈতন্যদেবের জন্য নীলাচলে অপেক্ষা করিতেছিলেন। শিবানন্দ প্রভৃতি অধিকাংশ গৌড়ীয় ভক্ত রথযাত্রার সময়ে নীলাচলে আসিয়া চৈতন্যদেবের সহিত মিলিত হইতেন। কিন্তু জগদানন্দ চৈতন্যদেবের সঙ্গ সাধারণতঃ পরিত্যাগকরিতেন না। যথা—(চৈঃ চঃ মধ্য—১৫শ পরিচ্ছেদে) গৌরাঙ্গদেব—

"এইমত সব ভক্তের কহি সে সে গুণ।
সভাকে [১] বিদায় দিলা করি আলিঙ্গন॥
*　　*　　*
গদাধর পণ্ডিত রহিল প্রভু পাশে।
*　　*　　*
পুরী গোসাঞি জগদানন্দ স্বরূপ-দামোদর।
দামোদর পণ্ডিত আর গোবিন্দ কাশীশ্বর॥

১ সবাকে।

এই সব সঙ্গে প্রভু বৈসে নীলাচলে।
জগন্নাথ দর্শন নিত্য করে প্রাতঃকালে॥"

গৌরাঙ্গদেব মথুরা, বৃন্দাবন, প্রয়াগ ও কাশী হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়েও আঠারনালাতে উপনীত হইয়া নীলাচলস্থিত ভক্তগণকে সংবাদ প্রেরণ করিলে, অন্যান্য ভক্তগণের সহিত জগদানন্দ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন—(চৈঃ চঃ মধ্য—২৫ পঃ)

একবার গৌরাঙ্গদেব শ্রীকান্ত সেনকে বলিয়াছিলেন যে তিনি যেন গৌড়ীয় ভক্তগণকে সে বৎসর নীলাচলে আসিতে নিষেধ করেন এবং তিনি নিজেই পৌষ মাসে শিবানন্দের গৃহে আসিয়া জগদানন্দের আতিথ্য গ্রহণ করিবেন—যথা চৈতন্যচরিতামৃতে (অন্ত্য—২য় পরিচ্ছেদে)—

"শিবানন্দে কহিও আমি এই পৌষ মাসে।
আচম্বিতে যাব আমি তাহার আবাসে॥
জগদানন্দ হয় তাঁহা তিঁহো ভিক্ষা দিবে।
সভাকে কহিও এ বর্ষ কেহ না আসিবে॥"

ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে জগদানন্দ মাঝে মাঝে কাঁচরাপাড়াস্থ শিবানন্দ সেনের বাটীতে আসিয়া দুই, চারিমাস অতিবাহিত করিতেন।[১] কিন্তু গৌরাঙ্গদেব সে পৌষ মাসে নীলাচল পরিত্যাগ করিয়া গৌড়দেশে আসিতে অক্ষম হইয়াছিলেন—

"এইমত মাস গেল গোসাঞি না আইলা।
জগদানন্দ শিবানন্দ দুঃখী বড় হৈলা॥"

(চৈঃ চঃ—অন্ত্য—২য় পঃ)

---

১ সম্ভবতঃ জগদানন্দের বাটী শিবানন্দের গৃহের সন্নিকটে ছিল। তাঁহা=শিবানন্দের বাটীর নিকটে; তিঁহো=তিনি, অর্থাৎ জগদানন্দ।

চৈতন্যদেব বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলে সনাতন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে মথুরা হইতে ঝারিখণ্ডের বনপথ দিয়া নীলাচলে আসিয়াছিলেন। তাঁহার গাত্রে কণ্ডু হইয়াছিল এবং তিনি সেইজন্য হরিদাসের গৃহে অবস্থানের জন্য গিয়াছিলেন। হরিদাসের নিমিত্ত জগন্নাথদেবের প্রসাদ লইয়া হরিদাসের বাসস্থানে চৈতন্যদেব আসিয়া সনাতনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রত্যহ আসিয়া সনাতনকে তিনি সনাতনের নিষেধসত্ত্বেও এইরূপে আলিঙ্গন করিতেন। এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য জগদানন্দকে সনাতন জিজ্ঞাসা করায়, তিনি সনাতনকে বৃন্দাবন যাইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়া চৈতন্যদেব ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন—যথা—চৈতন্যচরিতামৃতে—অন্ত্য—৪র্থ পঃ)

"কালিকার পড়ুয়া জগা ঐছে গর্ব্বী হইল।
তোমাকে হো উপদেশ করিতে লাগিল॥
ব্যবহারে পরমার্থে তুমি তার গুরুতুল্য।
তোমাকে উপদেশ করে না জানে আপন মূল্য॥
আমার উপদেষ্টা তুমি প্রামাণিক আর্য্য।
তোমাকে উপদেশে বালক করে ঐছে কার্য্য॥

* * *

জগদানন্দ প্রিয় মোর নহে তোমা হৈতে।
মর্য্যাদা-লঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে॥
কাঁহা তুমি প্রামাণিক শাস্ত্রে প্রবীণ।
কাঁহা জগা কালিকার পড়ুয়া নবীন॥"

জগদানন্দ শচীদেবীকে আই অর্থাৎ মাতামহী বলিতেন। চৈতন্য-দেবের কোন ভগ্নী ছিলেন কিনা আমরা অবগত নই। 'বৈষ্ণবাচার

দর্পণ' মতে, (৩৫২ পৃঃ) সকল ভক্তই শচীদেবীকে 'আই' বলিতেন। শচীদেবীকে দেখিতে তিনি প্রতি বৎসর নবদ্বীপে যাইতেন এবং চৈতন্যদেব-প্রেরিত বস্ত্র ও জগন্নাথদেবের প্রসাদ তাঁহাকে অর্পণ করিতেন এবং চৈতন্যদেবের জীবনের দৈনিক ঘটনা শচীদেবীর এবং অন্যান্য নবদ্বীপবাসী ভক্তের নিকটে বর্ণনা করিয়া তাঁহাদিগকে আনন্দিত করিতেন (চৈঃ চঃ—অন্ত্য—১২ পঃ)। জগদানন্দ নবদ্বীপে কিছুদিন অবস্থানপূর্ব্বক কাঁচরাপাড়ায় শিবানন্দভবনে গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় নিজেই এক কলস সুগন্ধি চন্দনতৈল প্রস্তুত করিয়া—শিবানন্দ সেন সম্ভবতঃ চিকিৎসাব্যবসায়ী ছিলেন—নীলাচলে উপনীত হইয়াছিলেন এবং চৈতন্যদেবের ভৃত্য গোবিন্দকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে তিনি চৈতন্যদেবের স্নানের সময়ে তাঁহার মস্তকে প্রত্যহ যেন এই তৈল মর্দ্দনকরিয়া দেন। গোবিন্দ চৈতন্যদেবকে জগদানন্দের অনুরোধ জানাইলে তিনি বলিলেন যে সন্ন্যাসীর পক্ষে বিলাসিতার দ্রব্য ব্যবহার অন্যায়।[১] গোবিন্দের নিকট এই সংবাদ শুনিয়া চৈতন্যদেবের সম্মুখে জগদানন্দ তৈলের কলস ভগ্ন করিলেন এবং নিজ বাসগৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া অনাহারে দুই দিন অতিবাহিত করিলেন। তৃতীয় দিবসে গৌরাঙ্গদেব জগদানন্দের আবাসে আসিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন যে সেইদিন জগদানন্দের গৃহে তিনি ভিক্ষা করিবেন অর্থাৎ অতিথি হইবেন। জগদানন্দ তাঁহার জন্য অনেক আয়োজন করিলেন এবং নিজে রন্ধন করিলেন। রন্ধন সমাপ্ত হইলে চৈতন্যদেব বলিলেন যে জগদানন্দ আহার না করিলে তিনি আহার করিবেন না। জগদানন্দ আহার করিতে স্বীকৃত হইলে গৌরাঙ্গদেব

১। চৈতন্যদেব ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন—'মর্দ্দনিঞা এক রাখ করিতে মর্দ্দনে'—চৈ—চ—অন্ত্য—১২ ম—৪০।

আহারে বসিলেন এবং বলিলেন "ক্রোধাবেশে পাকের ঐছে হয় এত স্বাদ" (চৈঃ চঃ—অন্ত্য—১২ পঃ)। জগদানন্দ তাহার পরে চৈতন্য-দেবের জন্য শিমুলতূলা দিয়া একটী ভাল বালিশ প্রস্তুত করিয়া তাঁহার শয্যার জন্য গোবিন্দকে দিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গদেব স্বরূপ-দামোদরকে উপহাস করিয়া বলিলেন যে একটী খাট্‌ও আনয়ন করা আবশ্যক এবং আরও বলিলেন যে "জগদানন্দের ইচ্ছা আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে; সন্ন্যাসী মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন"— (চৈঃ চঃ—অন্ত্য—১৩ পঃ—)

এইরূপে মধ্যে মধ্যে জগদানন্দের সহিত গৌরাঙ্গদেবের কলহ হইত; কিন্তু চৈতন্যদেব জানিতেন যে তাঁহার প্রতি জগদানন্দের অকৃত্রিম স্নেহ ও ভক্তি আছে। তিনিও জগদানন্দকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, যথা—চৈতন্যচরিতামৃতে (আদি—১০ম পঃ—)

"পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ।
লোকে খ্যাতি যেঁহো সত্যভামার স্বরূপ ॥
প্রীতে প্রভুর করিতে চাহে লালন-পালন।
বৈরাগ্য লোক-ভয়ে প্রভু না মানে কথন ॥
দুইজনে খটপটি লাগয়ে কন্দল।
তাঁর প্রীতের কথা আগে কহিব সকল ॥"

ইহার পরে যখন জগদানন্দ একবার মথুরা ও বৃন্দাবন দর্শন করিবার জন্য চৈতন্যদেবের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তিনি প্রথমে অনুমতি দিতে স্বীকৃত হন নাই, কারণ জগদানন্দকে তিনি সাতিশয় স্নেহ করিতেন; কিন্তু স্বরূপ-দামোদরের অনুরোধে তিনি বলিলেন যে যখন জগদানন্দ তাঁহার আই (শচীদেবীকে)[১] দেখিবার জন্য নবদ্বীপে

১। মাতামহী; জগদানন্দ, দামোদর প্রভৃতি চৈতন্যদেবের ভক্তগণ শচীদেবীকে 'আই' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। যথা চৈতন্যভাগবতে (অন্ত্য—৯ম অঃ)—

যাইবেন, সেই সময়ে তিনি যেন সাবধানে ক্ষত্রিয় (সিপাহী)-যাত্রী-দিগের সহিত বৃন্দাবনের দস্যু-সঙ্কুল পথে গমন করেন এবং বৃন্দাবনে উপনীত হইয়া যেন তিনি সনাতনের নিকট অবস্থান করেন (চৈঃ চঃ—অন্ত্য—১৩শ পঃ)। বৃন্দাবনে আসিয়া তিনি সনাতনের অতিথি হইলেন। একদিন যখন তিনি রন্ধন করিতেছেন, তিনি দেখিলেন যে সনাতন মুকুন্দ-সরস্বতীনামা সন্ন্যাসীপ্রদত্ত (চৈতন্যদেবের দত্ত নয়) বহির্ব্বাস মস্তকে বান্ধিয়াছেন। এই দেখিয়াই তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ভাতের হাঁড়ী লইয়া সনাতনকে মারিতে যাইলেন। সনাতন তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিলে জগদানন্দের ক্রোধ প্রশমিত হইল (ঐ)। তাহার পরে জগদানন্দ পুনরায় নীলাচলে আসিয়া চৈতন্যদেবের সহিত মিলিত হইলেন এবং তিনি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। চৈতন্যদেব তিরোভাবের কতিপয় বৎসর পূর্ব্ব হইতেই ভগবদ্বিরহে উন্মত্ত হইতেন এবং সেই সময়ে জগদানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহাকে রক্ষা করিতেন (চৈঃ চঃ—অন্ত্য ১৪শ পঃ)। এই সময়ে গৌরাঙ্গদেব তাঁহার বিচ্ছেদ-হেতু দুঃখিতা জননী শচীদেবীর নিকট জগদানন্দকে প্রেরণ করিয়া-ছিলেন এবং শচীদেবীকে এই কথা বলিতে জগদানন্দকে আদেশ করিয়াছিলেন—যথা চৈতন্যচরিতামৃতে (১৯শ পঃ)—

দামোদর পণ্ডিত আইরে দেখিবারে
গিয়াছিলা। আই দেখি আইলা সত্বরে ॥
* * *
প্রভু বলে "তুমি যে আছিলা তাঁন কাছে।
সত্য কহ আইর কি বিষ্ণুভক্তি আছে ॥"

দামোদর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—

"আইর প্রসাদে সে তোমার কৃষ্ণভক্তি।
যত কিছু তোমার—সকল তাঁর শক্তি ॥"

"তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিল সন্ন্যাস।
বাতুল হইয়া আমি কৈল ধর্ম্মনাশ ॥
এই অপরাধ তুমি না লইহ আমার।
তোমার অধীন আমি তনয় তোমার ॥
নীলাচলে আমি আছি তোমার আজ্ঞাতে।
যাবৎজীব তাবৎ তোমা নারিব ছাড়িতে ॥"

জগদানন্দ নীলাচলে প্রত্যাগমনের সময়ে নিম্নলিখিত হেঁয়ালিটি শান্তিপুরের অদ্বৈত আচার্য্যের নিকট হইতে চৈতন্যদেবের সকাশে লইয়া গিয়াছিলেন—যথা চৈতন্যচরিতামৃতে (অন্ত্য—১৯শ পঃ)

"বাউলকে কহিও লোক হইল আউল (পাঠান্তর—বাউল)
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল ॥
বাউলকে কহিও কাযে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল ॥"

কেহ কেহ ইহার এই প্রকার অর্থ করেন—কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত চৈতন্যদেবকে কহিও যে এ স্থানের লোকেরা কৃষ্ণভক্ত হইয়াছেন, আর ধর্ম্মপ্রচারের আবশ্যকতা নাই; কিন্তু কার্য্যে অর্থাৎ প্রকৃত কৃষ্ণপ্রেমে কেহ মত্ত হন্ নাই। পাগল অদ্বৈতাচার্য্য পাগল চৈতন্যদেবকে এই সংবাদ প্রেরণ করিতেছেন।

কাঁচরাপাড়া গ্রামের বর্ত্তমান নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। বৈদ্যদিগের 'নরহট্ট সমাজ' হইতে বিশ্বকোষ-প্রণেতা অনুমান করেন যে এই গ্রামের নাম পূর্ব্বে 'নরহট্ট' ছিল। কাঁচরাপাড়া গ্রামের নাম চৈতন্যদেবের সময়ে যে কুমারহট্ট ছিল তাহা আমরা পরে কবিকর্ণপূরের 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' হইতে দেখাইব। চৈতন্যদেবের সময়ে

'কুমারহট্ট' বলিলে আধুনিক হালিসহর (শ্রীবাস অথবা শ্রীনিবাস [১], তাঁহার ভ্রাতা শ্রীরাম এবং চৈতন্যদেবের গুরু ঈশ্বরপুরীর বাসস্থান), গোলাবাড়ী ও মল্লিকের বাগ এবং কাঁচরাপাড়া বুঝাইত। আমরা জানি যে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও মল্লিকের বাগে অনেক কুম্ভকারের বসতি ছিল। এক্ষণেও এই গ্রামে সাত-আট ঘর কুম্ভকার আছেন। কাঁচরাপাড়ার হাঁড়ি, কলসী, গামলা, জালা, কূপের পাট প্রভৃতি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দ্রব্য স্থায়িত্ব ও চিক্কণতার নিমিত্ত এক্ষণেও প্রসিদ্ধ। মুসলমান নৃপতিদিগের সময়ে হাবেলীসহর অর্থাৎ হালিসহর একটী বৃহৎ পরগণা ছিল। এক্ষণেও অনেক দলিলে 'কাঁচরাপাড়া, পরগণে হাবেলিসহর' [২] লিখিত আছে।

কিন্তু 'কাঁচরাপাড়া' নাম কোথা হইতে আসিল? বিশ্বকোষে

১। শ্রীবাসের নবদ্বীপেও একটী বাসস্থান ছিল। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ব্বে শ্রীবাস-অঙ্গন তাঁহার ও তাঁহার ভক্তমণ্ডলীর হরি-সংকীর্ত্তনের প্রধান কেন্দ্র ছিল।

২। বর্ত্তমান কাঁচরাপাড়া গ্রামের দক্ষিণাংশ হাবেলীসহর কিম্বা হালিসহর পরগণার অন্তর্গত ছিল এবং কাঁচরাপাড়া বলিয়া কথিত হইত। উত্তরাংশের নাম পাইকপাড়ি ছিল এবং 'আর্শা' (আইনীআকবরীতে আর্শাদ এবং সাতগাঁ বলিয়া মহল আছে। কিন্তু আর্শাদ ও আর্শা এক কি না বলিতে পারি না। হাবেলিসহর মহলের নামও এই পুস্তকে আছে।) পরগণার অন্তর্গত ছিল। যেস্থানে আমাদিগের গঙ্গার ধারের বাগান অবস্থিত অর্থাৎ আমাদিগের বর্ত্তমান বাটীর পশ্চিমদিকে যেখানে ভাগীরথীর চর আরম্ভ হইয়াছে, সেইস্থানে আমাদের পুরাতন বাসস্থান ছিল। তাহার পর যখন গঙ্গার পূর্ব্ব উপকূল ভগ্ন হইতে আরম্ভ হইল, সেই সময়ে যেখানে আমাদের বর্ত্তমান গৃহ, সেইস্থানে আমার প্রপিতামহ রাধামোহন দেব (দে) মহাশয় প্রতিবেশী রামজয় ঘটক মহাশয়ের নিকট হইতে এগার কাঠা জমী ১২৪৯ সালে ক্রয় করিয়া আমাদের বর্ত্তমান বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আমার প্রপিতামহ ১৮৪২ এবং ১৮৫১ খৃঃ অব্দের মধ্যে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ৮ই কার্ত্তিক ১২৪৯ সালের (খৃঃ ১৮৪২) দলিলে এই জমী কিস্‌মৎ পাইকপাড়ি গ্রাম, পরগণা আর্শার অন্তর্গত বলিয়া কথিত হইয়াছে। জেলার (district) অংশ পরগণা। পরগণার অংশ মৌজা। মৌজার অংশ কিস্‌মত অথবা ক্ষুদ্র গ্রাম।

লিখিত আছে যে 'কাচনা' নামে একপ্রকার ঘাস হইতে কাঁচরাপাড়া নামের উৎপত্তি। এ অভিধানে 'কাচনা' শব্দ দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু 'কাচড়াদাম' বলিয়া একপ্রকার জলজ লতা এবং 'কাচনার' (কাঞ্চনপুষ্প) লিখিত আছে। কাচড়াদাম নামীয় জলজ লতা কিংবা কাঞ্চনবৃক্ষের বহুলতা আমরা কাঁচরাপাড়াতে দেখি নাই, কিন্তু কাঞ্চন-পুষ্পের দুই একটী বৃক্ষ কাঁচরাপাড়ায় ছিল এবং বর্ত্তমানেও আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কাঁচরাপাড়ার মাঝেরপাড়াতে একটী কাঞ্চনবৃক্ষকে একটী প্রেতযোনি আশ্রয় করিয়াছিল এই প্রবাদ আমরা বাল্যকালে শুনিয়াছি। সে সময়ে আমরা এক বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির নিকট শ্রবণ করিয়াছিলাম যে তাঁহার বাল্যকালে একটী 'জবরদস্ত গুরুমহাশয়কে জব্দ' করিবার বাসনায় কালিপূজার অমানিশীথে তিনি এই বৃক্ষে আরোহণ করিয়া গুরুমহাশয়ের অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং যখন তাঁহার শিক্ষক মহাকালীর প্রসাদ লইয়া 'কাঞ্চনতলা' দিয়া নিজগৃহে গমন করিতেছিলেন, তখন এই উপযুক্ত ছাত্রটী কাঞ্চনবৃক্ষের ডালগুলি এরূপে আন্দোলনকরিয়াছিলেন এবং এরূপ বিকট চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন যে গুরুমহাশয় 'বাবারে, বাবারে' বলিয়া প্রসাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ গৃহাভিমুখে উৰ্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়াছিলেন এবং শিষ্যপ্রবর বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক প্রসাদ লইয়া নিজ বাসস্থানে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু ছাত্রমহোদয় নিজের কীর্ত্তি দুই একজন সহানুভূতিসম্পন্ন সহপাঠীর নিকট ব্যক্ত করাতে এ সংবাদ ক্রমে ক্রমে গুরুমহাশয়ের নিকট পৌঁছিয়াছিল এবং তিনি সেই রাত্রির ঘটনা, বিশেষতঃ প্রসাদের বিষয় স্মরণ করিয়া তাঁহার ছাত্রপুঙ্গবকে নানা-প্রকারের পুরাতন ও নূতন শাস্তি প্রদানকরিয়া বিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন।

বিশ্বকোষ-প্রণেতা আরও লিখিয়াছেন যে কাঁচরাপাড়াকে কাঞ্চন-পল্লীও বলে। বড়বাজারে অনেক দিন পর্য্যন্ত কাঁচরাপাড়ার নিক্তি বলিয়া একপ্রকার উচ্চশ্রেণীর নিক্তি বিক্রীত হইত। সম্ভবতঃ এখানে অনেক কাঞ্চনব্যবসায়ী বাস করিতেন। সেইজন্য ইহার নাম কাঞ্চন-পল্লী হইয়াছিল।

পল্লী অথবা পাড়া সাধারণতঃ আমরা কোন উদ্ভিদের সহিত সংযুক্ত করি না, কিন্তু জনসঙ্ঘের কিম্বা দেশের অংশের সহিত সংযোগ করি, যেমন কাঁসারীপাড়া, ঘোষপাড়া, মালিপাড়া, মুশলমানপাড়া, অধিকারী-পাড়া, চৌধুরীপাড়া, মালোপাড়া ; পশ্চিমপাড়া, বাজারপাড়া, উত্তর-পাড়া ; বেলগেছে, কাঁকুড়গাছি ইত্যাদি। অবশ্য 'কাঁঠালপাড়া' আছে, সেইজন্য আমরা 'সাধারণতঃ' শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। অধিকন্তু আমরা বাল্যকালে বৃদ্ধ অধিবাসীদিগের নিকট কাচনা-ঘাসের কিম্বা কাচড়াদামের বহুলতা কিম্বা অনেক কাঞ্চনব্যবসায়ীদিগের বাসস্থান বলিয়া যে আমাদের গ্রামের পুরাকালে খ্যাতি ছিল, এ কথা শুনি নাই।

আমরা বলিয়াছি যে চৈতন্যদেবের সময়ে ইহা বৃহৎ কুমারহট্টের একটী অংশ ছিল এবং ইহাকেও কুমারহট্ট বলিত। প্রাচীনকালে কুমারহট্ট বলিতে সম্ভবতঃ বর্ত্তমান মল্লিকের বাগের কুম্ভকারদিগের বসতিস্থানকে বুঝাইত। কুম্ভকারদিগের বসতিস্থানের নিকট একটি বৃহৎ হট্ট অথবা হাঁড়ি, কলসীর বড় হাট বসিত। পরে এই হাটের উত্তরাংশ, (অর্থাৎ বর্ত্তমান কাঁচরাপাড়া) এবং দক্ষিণাংশ (বর্ত্তমান হালিসহর)কেও কুমারহট্ট বলিত। ধান্যের অনেক গোলা রাসমণির ঘাটের সন্নিধানে থাকার জন্য সম্ভবতঃ বাগের পশ্চিমাংশকে গোলাবাড়ী বলিত। তাহার পর এই পল্লীটি (কুমারহট্টের উত্তরাংশ) অনেক বিদ্বান্

ব্যক্তির বাসস্থান বলিয়া এবং সম্ভবতঃ কুমারহট্টের অন্যান্য পল্লীকে পরাস্ত করিবার মানসে—কারণ বাঙ্গালীদিগের 'দলাদলি' চিরদিনের প্রিয় বস্তু—পণ্ডিত অধিবাসীরা কুমারহট্টের এই পল্লীকে 'কাঞ্চনপল্লী'নাম দিয়াছিলেন। ইহা ক্রমে ক্রমে কাঞ্চনপাড়া, কাচনাপাড়া, কাচলাপাড়া, কাঁচরাপাড়া এমন কি কাংলাপাড়াতে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু ইষ্টার্ণ-বেঙ্গল-রেলওয়ে গঠনের পরে কাঁচরাপাড়ার নিকটস্থ দস্যুবহুল, [১] নিবিড় অরণ্য-পূর্ণ বিজপুরে, ষ্টেশান, ডাকঘর এবং কারখানা স্থাপিত হইলে, কাঁচরাপাড়া-অধিবাসী কারখানার 'বড়বাবুরা' (শ্রীনবীনচন্দ্র রায়, প্রসন্নকুমার সেন প্রভৃতি) নিজ গ্রামের খ্যাতিবর্দ্ধন অভিপ্রায়ে বিজপুরকেও কাঁচরাপাড়া আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। সেই অবধি কাঁচরাপাড়া অথবা 'Kanchrapara' নামের আর কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

কাঁচরাপাড়া গ্রামের উত্তরে যমুনার অথবা গুস্তিয়ার বিলের খাত, পূর্ব্বে শিঙে ও ভবানীপুর, দক্ষিণে মল্লিকসাহেবের অর্থাৎ বাগেরখাল, পশ্চিমে ভাগীরথীর খাত এবং চর। নিম্নবঙ্গ যে ভাগীরথী, যমুনা, সরস্বতী ইত্যাদির ব-দ্বীপের অন্তর্গত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রামায়ণে নিম্নবঙ্গের নাম নাই।[২] গুপ্ত-সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত এলাহাবাদ দুর্গস্থিত স্তম্ভের উপরে (সম্ভবতঃ ৩৩০ খৃঃ) যে লিপি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার দিগ্বিজয়ের বর্ণনার ভিতরে 'দবাক' অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ এবং 'সমতট' অর্থাৎ নিম্নবঙ্গ জয়ের বিবরণ আছে।[৩]

১। ২৪ পরগণা জেলা গেজেটিয়ারে বর্ণিত আছে এখানে এক সময়ে ডাকাতে-কালীর মন্দির ছিল। সেখানে নরবলি হইত।

২। লেখকের Stray Thoughts, Part III P. 135.

৩। লেখকের Kalidasa and Vikramaditya, P. 99.

কালিদাস তাঁহার রঘুবংশে নিম্নবঙ্গের অধিবাসীদিগকে সুহ্ম এবং বঙ্গের অধিবাসী বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে রঘু তাঁহার দিগ্বিজয়-ব্যপদেশে এই দুই দেশ জয় করিয়াছিলেন ও বঙ্গাধিবাসীরা তাঁহার সৈন্যের সহিত নৌকা আরোহণকরিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন।[১]

কাঁচরাপাড়া যে ভাগীরথীর চর হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল সে বিষয়ে বিশ্বকোষ-অভিধানে একটী সুন্দর গল্প পাওয়া যায়—"একদা কাঞ্চনপল্লী-নিবাসী একজন তীর্থযাত্রী কাশীধামে একজন দণ্ডাশ্রমী পুরুষকে দর্শন করিতে গিয়া পরস্পর কথাপ্রসঙ্গে পরিচয় দিলেন, 'আমার নিবাস ত্রিবেণীর পরপারস্থিত ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী কাঞ্চনপল্লী'। সিদ্ধপুরুষ কহিলেন, 'কি, ত্রিবেণীর পরপার কাঞ্চনপল্লী? কোন ত্রিবেণী? ত্রিবেণীর পূর্ব্বপারে ত ভেঁপুর নগর।' তীর্থযাত্রী কহিলেন, 'ভেঁপুর-নগর আমার বাসস্থান হইতে প্রায় চারি ক্রোশ পূর্ব্বে।' সাধু বলিলেন 'তবে কি তোমরা গঙ্গাযমুনার মধ্যস্থানে চরের উপর বাস কর? আশ্চর্য্য! ইহার মধ্যে গঙ্গায় চর হইয়া তাহাতে গ্রামের পত্তন হইয়াছে! কালের কি কুটিলাগতি'!" আমরাও শুনিয়াছি যে যখন মাঝেরপাড়ার রাজেন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পুষ্করিণী খনিত হইয়াছিল, সেই সময়ে মৃত্তিকার নিম্ন হইতে নৌকার কাষ্ঠ, হাল, দাঁড় এবং তৈজসাদি বহুবিধ দ্রব্যজাত খনকেরা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

কাঁচরাপাড়ার প্রধান দর্শনীয় বস্তু কৃষ্ণদেবরায়ের মন্দির। এই বিগ্রহটী সেন শিবানন্দ ও তাঁহার গুরু শ্রীনাথ আচার্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদেব-বিগ্রহ কষ্টিপাথরে এবং রাধিকাদেবী অষ্ট-

১। লেখকের Kalidasa and Vikramaditya, P. 103
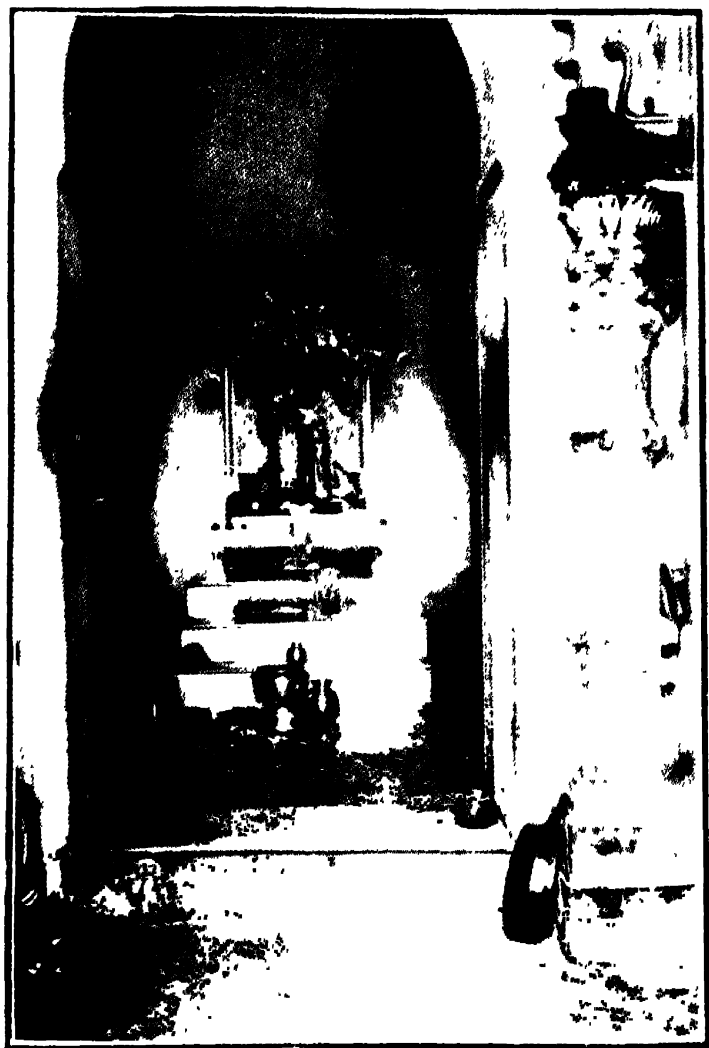
কাঁচরাপাড়ার শ্রীকৃষ্ণদেব বিগ্রহ

ধাতুতে নির্ম্মিত। নিম্নলিখিত শ্লোকটী (সংশোধিত) কৃষ্ণদেবরায় বিগ্রহের পদ্মাসনে ক্ষোদিত ছিল [১]—

স্বস্তি শ্রীকৃষ্ণদেবায় (যঃ) প্রাতুরাসীৎ স্বয়ং কলৌ।
অনুগ্রহায় দ্বিজং কিঞ্চিৎ শ্রীলং শ্রীনাথসংজ্ঞকং॥

শ্রীকৃষ্ণদেবের জয় হউক ; যিনি কলিতে প্রাদুর্ভূত হইয়া শ্রীনাথনামা দ্বিজকে [২] অনুগ্রহ করিয়াছিলেন।

কবিকর্ণপূর তাঁহার গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকাতে লিখিয়াছেন—

"গুরোর্নাম ন গৃহ্লীয়াদিতি শাস্ত্রানুসারতঃ।
শ্রী শ্রীনাথস্য পূর্ব্বাখ্যা ময়া ন প্রকটীকৃতা॥ ২১০
ব্যাচকার পারিপাট্যাদ্ যো ভাগবত-সংহিতাং।
কুমারহট্টে যৎকীর্ত্তি কৃষ্ণদেবো বিরাজতে॥" ২১১

রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় এই দুইটী শ্লোকের নিম্নলিখিত অনুবাদ করিয়াছেন—"শাস্ত্রানুসারে আদিতেই গুরুর নাম উল্লেখ করিবে না, এই হেতু আমি শ্রীশ্রীনাথের পূর্ব্বনাম প্রকাশ করি নাই। যিনি পরিপাটীর সহিত ভাগবতসংহিতা ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং কুমারহট্টে যাঁহার কীর্ত্তি কৃষ্ণদেববিগ্রহরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন"।

ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে শ্রীনাথ কবিকর্ণপূরের গুরু ছিলেন এবং তিনি সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতের সুন্দর ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন এবং কুমারহট্টে কৃষ্ণদেববিগ্রহ স্থাপন তাঁহার

১। এক্ষণে কেবল 'শ্রীনাথসংজ্ঞক' বাক্য কথঞ্চিৎ পাঠ করা যায়।

২। বর্ত্তমান সেবাইতগণ (অধিকারী মহাশয়েরা) বলেন যে শ্রীনাথ তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের মাতামহ ছিলেন। তাঁহার শিষ্য শিবানন্দ সেন স্বপ্নাদেশমত একখানি কাল পাথর ভাগীরথীতে প্রাপ্ত হন্ এবং ইহাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহার গুরুদেবকে অর্পণ করেন।

কীর্ত্তি। আমরা ইহাও অনুমান করিতে পারি যে বর্ত্তমান কাঁচরাপাড়া অথবা কাঞ্চনপল্লী চৈতন্যদেবের সময়ে কুমারহট্টের অন্তর্গত ছিল, কারণ কৃষ্ণদেবমন্দির [১] স্মরণাতীতকাল হইতে কাঁচরাপাড়াতেই অবস্থিত। চৈতন্যচরিতামৃতে (আদি—১০ম পঃ) আছে—

"শ্রীনাথ পণ্ডিত প্রভুর কৃপার ভাজন।
যাঁর কৃষ্ণসেবা দেখি বশ ত্রিভুবন॥" ৮৮

চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে বর্ণিত আছে যে গৌরাঙ্গদেব মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রাজ্যের সীমা অতিক্রমকরিয়া মুসলমান-অধিকৃত গৌড়দেশের সীমা প্রবেশকরিয়াই একটী নৌকার সাহায্যে পাণিহাটীতে পৌঁছিয়া সেখান হইতে পুনরায় কুমারহট্টে শ্রীবাস-ভবনে আসিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি তরণীতে আরোহণপূর্ব্বক শিবানন্দের ভবনাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। যদিও শ্রীবাসের বাটী ও সেন শিবানন্দের বাটী কুমারহট্টের অন্তর্গত, তত্রাচ হালিসহর হইতে কাঁচরাপাড়া আসা সে সময়ে নৌকাতেই সুবিধা হইত। আমরা যখন কাঁচরাপাড়া স্কুলে পড়িতাম, তখন হালিসহর হইতে অনেক ছাত্র নৌকাযোগে কাঁচরাপাড়ার স্কুলে আসিতেন। চৈতন্যদেবের নৌকাতে আসার আর একটী কারন ছিল। এই নৌকাতেই তিনি নবদ্বীপ যাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন।

১। শ্রীনাথ পণ্ডিতের দৌহিত্র-বংশধরগণ বলেন যে শ্রীনাথের পূজাগৃহ কালক্রমে ভাগীরথীগর্ভে নিমজ্জিত হইলে, যশোহরের রাজা কচুরায় একটি মন্দির প্রতিষ্ঠাকরেন। তাহাও গঙ্গাগর্ভে পতিত হওয়ায়, ১৭০৮ শকে বর্ত্তমান সুন্দর মন্দির কলিকাতানিবাসী নয়ন মল্লিকের দুই পুত্র গৌরচরণ ও নিমাইচরণ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহা মন্দিরগাত্রে সংস্কৃতে লিখিত আছে। কচুরায় এবং বর্দ্ধমানের রাজা কৃষ্ণদেবরায়ের পূজার জন্য কিছু ভূমিদান করিয়াছিলেন।

যশোহরাধিপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত-পুত্র কচুরায় কৃষ্ণদেবরায়ের মন্দির, ভোগমন্দির এবং দোলমন্দির প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন এবং নিত্যসেবা-নির্ব্বাহের জন্য কৃষ্ণদেববাটী নামে একটী তালুক প্রদান করিয়াছিলেন। এখনও পর্য্যন্ত এই তালুক কৃষ্ণদেব-রায়ের সেবাইতগণের স্বত্বাধিকারে আছে। এই মন্দির গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত হওয়ার পরে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতানিবাসী ধনী নিমাই-চরণ ও গৌরচরণ মল্লিক মহাশয়েরা এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে বর্ত্তমান সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দেবাবাস নির্ম্মিত করাইয়া দিয়াছিলেন। অসাধারণ শিল্প-নৈপুণ্যের জন্য ইহা বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ দেবসৌধসমূহের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

কলিকাতা উড্, ওয়েলেস্লি, ওয়েলিংটন, কলেজ ও কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট এবং ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড—এক রাস্তাই—কাঁচরাপাড়া গ্রাম ভেদ করিয়া কাঁচরাপাড়া গ্রামের দুই মাইল উত্তরে ঘোষপাড়ায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। ঘোষপাড়া কর্ত্তাভজা-উপাসক-সম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্থান। বিশ্বকোষ-অভিধানে লিখিত আছে যে যিনি কর্ত্তাকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভজনা করেন, তিনিই কর্ত্তাভজা। কর্ত্তাভজাগণ বলেন যে তাঁহাদের ধর্ম্মের আদিপুরুষ, আউলচাঁদ, চৈতন্যদেবের অবতার। গৌরাঙ্গদেব ক্ষীরচোরা গোপীনাথের মন্দিরে অপ্রকট হইয়াছিলেন। তাহার পরে চৈতন্যাবতার আউলচাঁদ ফকিরবেশে ঘোলাডুবলী, উলা, প্রভৃতি গ্রাম হইতে বেজড়া গ্রামে আসিলে বাইশজনকে দীক্ষিত করেন। এই বাইশজন শিষ্যের মধ্যে সদ্গোপজাতীয় ঘোষপাড়ার অধিবাসী রামশরণ পাল এবং কাঁচরাপাড়ানিবাসী গোপজাতীয় কানাই ঘোষের নাম বিখ্যাত। "আউলচাঁদ—দোয়াগরু, সঙ্গে বাইশ ফকির বাছুর তার" এইরূপ চলিত কথার উপমা-দ্বারা এই সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম নিম্নশ্রেণীর মধ্যে

সহজেই প্রচারিত হইয়াছিল। রামশরণ গোবিন্দ ঘোষের কন্যা সরস্বতীকে বিবাহ করেন। এই স্বরস্বতী মৃত্যুর পর 'সতীমা' নামে খ্যাতা হইয়াছিলেন। আউলচাঁদ ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। ঘোষ-পাড়াতে রামশরণ পালের বংশধরগণ এই সম্প্রদায়ের গুরু বলিয়া এখনও তিনচারিশত উচ্চশ্রেণীর এবং নিম্নশ্রেণীর শিষ্যপরিবারবর্গদ্বারা সম্মানিত এবং সেবিত হইতেছেন। দোলের সময়ে প্রায় তিনহাজার শিষ্য ঘোষপাড়াতে সমবেত হন। বিশ্বকোষমতে ইঁহাদিগের মন্ত্রদাতা গুরুর নাম 'মহাশয়' এবং শিষ্যের নাম 'বরাতি'। ইহাতে আরও লেখা আছে "ইঁহাদের বীজমন্ত্রের মূলসূত্র 'গুরু সত্য'।..................যখন এই মন্ত্রেতে প্রগাঢ় ভক্তি............হয়, তখন শিষ্য "কর্ত্তা আউলে মহাপ্রভু, আমি তোমার, তুমি আমার, তোমার সুখে চলি ফিরি, তিলার্দ্ধ তোমাছাড়া নহি, আমি তোমার সঙ্গে আছি। দোহাই মহাপ্রভু ?'............তিনবার এই ষোল আনা মন্ত্র পাইয়া থাকেন। ইঁহাদিগের মতে পরস্ত্রী-গমন, পরদ্রব্য-হরণ ও পরহত্যাসাধন এই তিনটী কায়কর্ম্ম ও ত্রিবিধ কায়কর্ম্মের ইচ্ছারূপ মনঃকর্ম্ম ও মিথ্যাকথন, কটুকথন, বৃথাভাষ ও প্রলাপভাষ এই দশবিধ কর্ম্ম নিষিদ্ধ।......... ... ইঁহারা একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করাকে 'হাঁটা' বলেন। ইঁহারা আপন আপন বাড়ীকে 'বাসা' বলেন; তাহার মর্ম্ম এই যে ঘোষপাড়া সমস্তলোকেরই বাড়ী, আর তাঁহাদিগের নিজ নিজ বাসস্থান কেবল বাসামাত্র। উক্ত সম্প্রদায়ী লোকের নাম ভগবদ্‌জন, তদ্ভিন্ন আর সকল লোকই ঐহিক লোক; ইঁহারা মৃত্যুকে 'দেহরাখা' বলেন। ....ইঁহাদিগের জাতিবিচার ও অন্নবিচার নাই, সকল বর্ণের লোকই এমন কি মুসলমান পর্য্যন্ত.............একবার মূলমন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক এ ধর্ম্মভুক্ত হইলে, ইঁহারা তাঁহার সহিত অন্নপান গ্রহণ করিয়া থাকেন।

মানুষ মানুষের সেব্য ও পূজ্য, তদ্ভিন্ন অপর কোনও দেবদেবীর আরাধনা উপাসনা ইঁহাদের মতে আবশ্যক নহে।"

আমাদের কর্ত্তাভজা-সম্প্রদায়ের কথা অবতারণা করিবার প্রধান কারণ এই যে কাঁচরাপাড়া এই সম্প্রদায়ের একটী শাখার কেন্দ্রস্থল। কানাই ঘোষ মহাশয়ের বিধবা পৌত্রবধূ তাঁহাদিগের সম্প্রদায়ের নিম্নলিখিত বিবরণ আমাদিগকে দিয়াছেন—

"রামশরণ পাল ও কানাই ঘোষ মহাশয় দুই বন্ধু ছিলেন। একদিন দুই বন্ধুতে একস্থানে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। রামশরণবাবুর একটী গরু মরিয়া যাওয়াতে তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ ছিলেন। এমন সময়ে একজন ফকিরবেশী পুরুষ (আউলচাঁদ) আসিয়া গরুটীর গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেই গরুটী বাঁচিয়া উঠিল। এই ব্যাপার দেখিয়া তাঁহারা দুই জনে তখনই সেই ফকিরের অনুসরণ করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলেন না। তৎপরে যখন এইস্থানে একটী ডালিম গাছের নীচে বসিয়া তাঁহারা কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন (ঘোষপাড়ার ডালিম গাছটী এখনও আছে), অকস্মাৎ তাঁহারা একটী স্বর শুনিতে পাইলেন 'আচ্ছা, আমি অমুক দিনে আসিয়া সাক্ষাৎ করিব, আমার জন্য একটী ঘর পরিষ্কারকরিয়া রাখিও।' অতঃপর উঁহারা দুইজনে বাটী ফিরিয়া গেলেন। এই সময়ে ইঁহাদের দুইজনেরই স্ত্রী মারা গিয়াছিলেন। কানাই ঘোষের বাড়ী সেই সময়ে কাঁচরাপাড়ায় গঙ্গার ধারে ছিল।

ইহার পরে রামশরণ পাল ও কানাই ঘোষ মহাশয় কেবল সেই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং রামশরণ বাবুর ঘোষপাড়ার বাড়ীতে একটী ঘর পরিষ্কারকরিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে দুই জনে সেই ঘরের নিকটে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে সেই ফকির এই স্থানে

আসিলেন এবং সেই দিনই ইঁহাদের একান্ত অনুরোধে তাঁহাদিগের দুইজনকে এবং কুড়িজন তাঁহাদের পরিচিত লোককে দীক্ষা দিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিশ জন বলিলেন, 'আমরা সংসারধর্ম্ম করিব না।' ফকির রামশরণ পাল ও কানাই ঘোষ মহাশয়দিগকে বলিলেন, 'তোমরা সংসারধর্ম্ম কর।' রামশরণ পাল বলিলেন, 'যেহেতু আমাকে সংসারী হইতে বলিলেন, আমি কারবার খুলিয়া ধনোপার্জ্জন করিব।' কানাই ঘোষ মহাশয় বলিলেন, 'আমি সংসার করিব কিন্তু গোপনে।' ফকির বলিলেন, 'তোমাদের সাত পুরুষের মধ্যে এই ধর্ম্ম ভাল চলিবে।'

এই ফকিরবেশী মহাপুরুষ কাঁচরাপাড়ার ষষ্ঠীতলার অশ্বত্থ-তলায় আসিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যায় কানাই ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে আহার করিতেন। বাটীর প্রাঙ্গনে একটী স্থান পরিষ্কারকরিয়া তাঁহার আহার্য্য রাখিয়া দেওয়া হইত। তিনি উলঙ্গ অবস্থায় আসিতেন। তাঁহারই নিমিত্ত কানাই ঘোষ মহাশয় কাপড়ের ব্যবসা খুলিয়াছিলেন। প্রত্যহই আহারের:পর তাঁহাকে একখানি নূতন বস্ত্র পরাইয়া দেওয়া হইত, কিন্তু তিনি সকলের অলক্ষিতে কাপড়খানি ফেলিয়া যাইতেন।

কানাই ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ কাঁচরাপাড়া-গ্রামের অভ্যন্তরে নূতন বাটীতে আসিয়া বাস করেন এবং আউলচাঁদের খড়ম, যষ্টি ও কাঁথার কিয়দংশ তাঁহার নূতন গৃহে লইয়া আসেন। ঘোষপাড়ার পালমহাশয়দিগের বাটীতেও এই কাঁথার কিয়দংশ এবং লাঠি ও খড়ম আছে।

পূর্ব্বে কানাই ঘোষ মহাশয়ের কাঁচরাপাড়া-গ্রামের বাটীতে দোলের সময়ে প্রায় তিন হাজার শিষ্য সমাগত হইতেন। কানাই ঘোষ মহাশয়ের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পুত্র রাজেন্দ্রনাথ
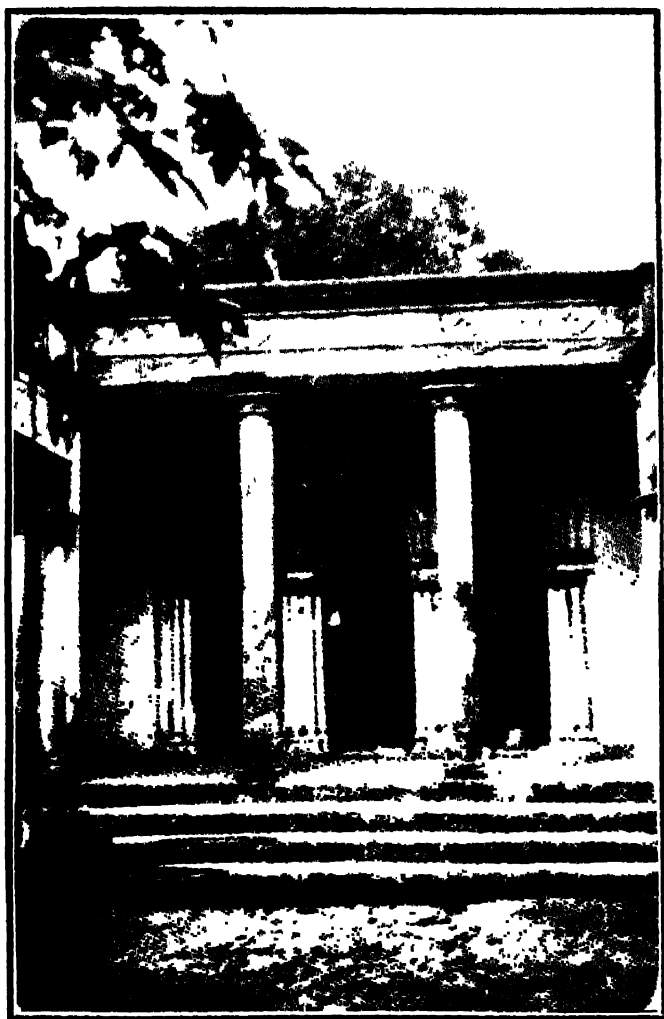
সতীশচন্দ্র দের কাঁচরাপাড়ার বাটীর পূজার দালান

ঘোষ ও রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের তিন পুত্রের মধ্যে শ্রীখগেন্দ্র ঘোষ বর্ত্তমান।"

রাজেন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বিধবা স্ত্রী এই প্রবন্ধলেখকের কাঁচরাপাড়ার বাটীর তত্ত্বাবধারণ করেন। দোলের সময়ে খগেনবাবুর গৃহে প্রায় পাঁচশত শিষ্য এবং রাজেন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বিধবার নিকট অর্থাৎ সতীশচন্দ্র দের (লেখকের) বাটীতে প্রায় পাঁচশত শিষ্য একত্রিত হন। যে দালানের সম্মুখে যাত্রীরা সমবেত হন, তাহার চিত্র দিলাম।

কর্ত্তাভজাধর্ম্ম সম্ভবতঃ চৈতন্যদেবের ধর্ম্মের লোকপ্রিয় সংস্করণ। গৌরাঙ্গদেব তাঁহার ধর্ম্মমত সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মকে শাস্ত্রসঙ্গত করিবার নিমিত্ত অনেক সংস্কৃত-সন্দর্ভ রূপ, সনাতন, জীবগোস্বামী, প্রবোধানন্দ সরস্বতী, কবিকর্ণপূর প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার রচনা করাইতে হইয়াছিল। কিন্তু এই সংস্কৃত গ্রন্থ জনসাধারণের নিকট দুর্ব্বোধ্য। চৈতন্যদেবের ধর্ম্মের সহিত কর্ত্তাভজাধর্ম্মের নিম্নলিখিত সাদৃশ্য বর্ত্তমান আছে—(১) জাতিভেদ অস্বীকার—চৈতন্যদেবের প্রিয়তম ভক্ত ছিলেন হরিদাস যবন। নীলাচলে হরিদাস যবনের নিকট গৌরাঙ্গদেব প্রত্যহ জগন্নাথদেবের প্রসাদ লইয়া যাইতেন। তাঁহার দেহত্যাগের পরে সেই দেহ লইয়া গৌরাঙ্গদেব হরিসঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ও পরে সমুদ্রতীরে বালুকা সরাইয়া তাহা সমাহিত করিয়াছিলেন। কর্ত্তাভজাদিগের উৎসবের সময়ে প্রথমে মুসলমানকে না আহার করাইলে উৎসব অঙ্গহীন হয়। আমরা রাজেন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বিধবার নিকট এই কথা শুনিয়াছি। (২) কর্ত্তাভজাদিগের ধর্ম্মগুরু আউলচাঁদ। ইঁহারা বলেন যে চৈতন্যদেব ক্ষীরচোরা গোপীনাথের মন্দির হইতে অপ্রকট হন এবং পরে আউলচাঁদ সন্ন্যাসীরূপে রামশরণ পাল, কানাই ঘোষ এবং আর কুড়ি জন ভক্তের সমীপে উপস্থিত হন। ইঁহার অনুমতি লইয়া

বাইশ জন শিষ্যমধ্যে কেবল রামশরণ পাল এবং কানাই ঘোষ বৈরাগ্য অবলম্বন করেন নাই এবং গৃহস্থধর্ম্ম পালনকরিয়াছিলেন। (৩) ইঁহাদের ধর্ম্মোপদেশে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না; ইঁহাদের মতে মিথ্যাকথা কহা, মদ্যপান, পরস্ত্রীহরণ ইত্যাদি অতিশয় দূষণীয়। কিন্তু অনেক বাঙ্গালী মনে করেন যে কর্ত্তাভজা-ধর্ম্মাচরণের সহিত নানাবিধ পাপাচারের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। ইহার কারণ এই যে ঘোষপাড়ার দোলযাত্রা উপলক্ষে প্রতি বৎসর একটী বৃহৎ মেলা হইত এবং তাহাতে অনেক বারনারী এবং দুষ্ট প্রকৃতির লোকের সমাগম হইত। ইহার আর একটী কারণ এই যে ঘোষপাড়াতে একসময়ে এই ধর্ম্মের গুরুদিগের কাহারও কাহারও চরিত্র দোষশূন্য ছিল না। ইহা আমরা ডাক্তার চণ্ডীচরণ দাসগুপ্তের (ডাক্তার জেঠামহাশয়ের) নিকট শুনিয়াছি। চণ্ডী বাবু ঘোষপাড়ার বাবুদের বাটীতে চিকিৎসা ব্যপদেশে প্রায় প্রত্যহই যাইতেন। এই সম্প্রদায়ের একজন বর্ত্তমান নেতা গোপালকৃষ্ণ পাল মহাশয়ও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। "It (this religion) does not appear to bear a very high repute amongst Hindus generally"—Nadia Gazetteer। কিন্তু এই সকল দোষজন্য কর্ত্তাভজা-ধর্ম্মকে দায়ী করা চলে না। গৌরাঙ্গদেবের পবিত্র ধর্ম্মেও নেড়ানেড়ী-সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ অনাচার বিদ্যমান আছে। ভগবান্‌কে দাস্য-ভাবে, বাৎসল্যভাবে, সখ্যভাবে, কিম্বা মধুরভাবে ভারতবর্ষে ভক্তগণ উপাসনা করিয়াছেন। রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণকে উপাসনা মধুরভাবে ঈশ্বর-উপাসনার দৃষ্টান্ত। চৈতন্যদেব নীলাচলে অর্থাৎ পুরীতে, গম্ভীরাতে অর্থাৎ কাশীমিশ্রের গৃহের একটী নিভৃত কক্ষে, চারিজন অন্তরঙ্গ ভক্তের সহিত রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণকে উপাসনা করিয়াছিলেন। নিভৃত স্থানে উপাসনার কারণ এই যে এরূপভাবে উপাসনা করিতে হইলে ভক্তের

আধ্যাত্মিক উন্নতির এবং আত্মসংযমের পরাকাষ্ঠা আবশ্যক এবং ইহা জনসাধারণের নিকট আশা করা যাইতে পারে না। কিন্তু বৈষ্ণব-সাধারণ এরূপভাবে উপাসনা করিতে গিয়া অনেকে শ্রীরাধাকৃষ্ণ উপাসনার নিমিত্ত পরকীয়ারস আস্বাদন আবশ্যক, ইহা বিবেচনা করিয়া পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছিল।

রাজেন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বিধবার নিকট আমরা অবগত হইয়াছি যে অনেক শিক্ষিত এবং হিন্দু উচ্চজাতির লোক এই ধর্ম্ম গ্রহণকরিয়াছেন। তিনি বলেন যে কলিকাতার একজন রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিধারী অঙ্কশাস্ত্রের বিখ্যাত স্বর্গগত অধ্যাপক এই ধর্ম্মের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইনি বলেন যে ঘোষপাড়াতে প্রত্যেক শিষ্যের বাৎসরিক 'খাজনা' নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু কাঁচরাপাড়াতে তাঁহার কিম্বা তাঁহার সপত্নী-পুত্র খগেন ঘোষ মহাশয়ের এরূপ খাজনা নির্দ্ধারিত নাই এবং যে শিষ্য যাহা দেন তাহাতেই ইঁহারা সন্তুষ্ট থাকেন। ইনি আরও বলেন যে ঘোষপাড়াতে উচ্ছিষ্ট-ভোজন প্রথা প্রচলিত আছে, কিন্তু কাঁচরাপাড়াতে এই প্রথার প্রচলন নাই। চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি যে চৈতন্যদেবের সময়ে ভক্তের উচ্ছিষ্ট-ভোজন একটী প্রশংসনীয় কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। আমরা জানি যে কাঁচরাপাড়ার কোন কোন ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যজাতীয় ভদ্রলোক রাজেন্দ্র-কুমার ঘোষ মহাশয়ের পরিবারবর্গ দ্বারা স্পৃষ্ট অন্ন গোপনে ভক্ষণ করিতেন এবং জনসাধারণকে ইহা জানিতে দিতেন না এবং বাহিরে ইঁহারা উচ্চজাত্যভিমান প্রকাশ করিতে বিরত হইতেন না।

পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রামটী পাঁচটী পাড়ায় বিভক্ত ছিল। চারিটী পাড়া "ফেরী-ফাণ্ড" (Ferry-Fund) অথবা ব্যারাকপুর গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের পশ্চিমে এবং একটী পাড়া অর্থাৎ মুশলমানপাড়া এই

রাস্তার পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। উল্লিখিত চারিটী পাড়া এই গ্রামের উত্তর দিকে প্রবাহিতা যমুনা অর্থাৎ গুস্তিয়ার খাল হইতে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণদিক্‌স্থ "বাগেরখাল" পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উত্তর দিক্‌ হইতে দক্ষিণ দিকে যাইতে হইলে চৌধুরীপাড়া, মাঝেরপাড়া, মালিপাড়া ও বাজারপাড়া দৃষ্ট হইত। চৌধুরীপাড়াতে জাঁকজমকের সহিত রক্ষা-কালীর, মাঝেরপাড়াতে জগদ্ধাত্রীর এবং মহাকালীর, মালিপাড়াতে ভুবনেশ্বরীর এবং বাজারপাড়ায় রাজরাজেশ্বরীর ও কার্ত্তিকেয়ের প্রত্যেক বৎসর পূজা হইত। এই পূজা উপলক্ষে নিকটস্থ গ্রাম হইতে বহু লোকের সমাগম হইত। প্রত্যেক বারোয়ারীতলাতে একটী ছোট রকমের বাজার বসিত। প্রত্যেক বারোয়ারী পূজার স্থানে সাত আটটী করিয়া সুদৃশ্য উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মিত হইত। এই সকল মাচা হইতে যুবকেরা যাত্রা, পাঁচালী এবং কবির যুদ্ধ দর্শন করিতেন।

এই গ্রামে একটী উচ্চশ্রেণীর এণ্ট্রান্স বিদ্যালয় ছিল। এক সময়ে হালিসহর বলদেঘাটানিবাসী শ্রীতারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ের লোকপ্রিয় হেডমাষ্টার ছিলেন। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের মাতামহের বাটীতে একটী উচ্চশ্রেণীর পাঠশালা ছিল। এই পাঠশালার গুরুমহাশয় ছিলেন উমেশচন্দ্র প্রামাণিক। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র রায় এবং এই প্রবন্ধের লেখক এই দুইটী বিদ্যালয়ে তাঁহাদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

নিম্নলিখিত বিবরণগুলি হইতে সেকালের পল্লীগ্রামের আচার ব্যবহার কিয়ৎপরিমাণে অনুমিত হইবে। প্রথম দুইটী গল্প বিশ্বকোষ অভিধান হইতে সংগৃহীত।—"কাঁচরাপাড়ার কবিরাজী চিকিৎসা বহুদিন হইতেই বিখ্যাত। তন্মধ্যে কবিরাজ চণ্ডীচরণ রায়, রাজা কৃষ্ণদাস সেন ও কৃষ্ণকণ্ঠাভরণের নামই বড় প্রসিদ্ধ। চণ্ডীচরণ রায়ের একটী কূট

চিকিৎসার যে প্রকার জনপ্রবাদ লোকপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে, তাহা অতি অদ্ভুত। পূর্ব্বকালে কোন সময় স্বাধীন ত্রিপুরার রাজা অনিদ্রারোগে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার জন্য কাঞ্চনপল্লীতে চণ্ডীচরণের নিকট আগমন করেন। ভাগীরথীতীরে তাঁহার তাঁবু পড়ে ও চণ্ডীচরণ চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন। তিনি রোগের লক্ষণের সঙ্গে আয়ুর্ব্বেদের ঐক্য করিয়া প্রতিদিন দুইবেলা তাঁহাকে দেখিতে যান। রাজাও এদিকে আপনার আসন্ন মৃত্যু অবধারিত করিয়া তদুচিত ধর্ম্মকার্য্যে ব্রতী হইলেন এবং অপরাহ্ণে পুরাণ শ্রবণকরিতে লাগিলেন। একদিন গভীর নিশীথ সময়ে তাঁহার দুই রাণী, প্রহরী এবং ভৃত্যবর্গ সকলেই নিদ্রাগত, এমন সময় হঠাৎ মেঘগর্জ্জন করিয়া বিলক্ষণ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল এবং তাঁবুর পার্শ্বদেশে একস্থলে স্বল্পমাত্র জল সঞ্চিত হইল। রোগের জন্য রাজার নিদ্রা নাই, দেখেন যে কিরূপে একটী কালসর্প ঐ তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ একটু বেড়াইয়া সেই সঞ্চিত জল পানানন্তর তাঁবুর বাহিরে চলিয়া গেল। রাজা ভাবিলেন, "এই সময় হরি এ অধমের প্রতি অনুকূল হইয়া ঐ সর্পকে প্রেরণ করিয়াছেন, আর তো এ অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য হয় না। বোধহয় আমার এ অসাধ্য উৎকট রোগের কোন ঔষধ নাই; কবিরাজ লজ্জায় পড়িয়া আপন সম্ভ্রমরক্ষার জন্য আমায় কিছু বলিতে পারিতেছেন না, নচেৎ মাসাবধি গত হইল, এ পর্য্যন্ত রোগের কোন ব্যবস্থা হইল না কেন। আরোগ্যলাভ ত সুদূর-পরাহত। যাহা হউক, আজি এই কালসর্পের বিষদূষিত জল পান করিয়া জীবনের সঙ্গে যন্ত্রণার শেষ করিব।" রাজা মনে মনে এইটী স্থির করিয়া সেই কালসর্পের পানাবশেষ পানীয় পান করিলেন এবং আপনার অন্তিমকাল উপস্থিত স্থির করিয়া অন্তকান্তক অনন্তশক্তি ঈশ্বরের স্মরণ মননে চিত্তনিবেশ করিলেন। এই অবস্থায় রাজা যেমন

শয়ন করিলেন, অমনি শ্রান্তিহারিণী নিদ্রাদেবী আসিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণকরিয়া লইলেন। রাজার শ্বাসশব্দে রাণীদিগের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। তাঁহারা প্রথমতঃ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। ক্রমে দাসদাসী সকলকে আহ্বান করিতে করিতে রজনী প্রভাত হইয়া গেল। চণ্ডীচরণ কবিরাজ প্রাতঃস্নানে গমন করিয়া রাজাকে দেখিতে গেলেন এবং অমাত্য ভৃত্য সকলকার নিকট হইতে রাজার বর্ত্তমান অবস্থার কথা অবগত হইয়া নাড়ীপরীক্ষা ও অঙ্গস্পর্শ করিয়া কহিলেন, 'কোন ভয় নাই, আমার কোন বিরুদ্ধ লক্ষণ বোধ হইতেছে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত রাজার আপনা হইতে নিদ্রাভঙ্গ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমরা কেহ যেন উঁহাকে জাগাইও না।' বেলা দ্বিপ্রহর অতীত, রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং এই নিদ্রা সেই কালকূট গরলের আচ্ছন্নতা ভিন্ন আর কিছুই নহে মনে করিয়া কাহারও নিকট কিছু প্রকাশ করিলেন না। বৈকালে নির্দ্দিষ্ট সময়ে কবিরাজ আসিয়া নির্জ্জনে রাজাকে কহিলেন, আমি এতদিন লজ্জা ও ভয়ে আপনাকে কিছু বলিতে পারি নাই; আপনার রোগের যে প্রকার ঔষধ ও অনুপান শাস্ত্রে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা অতি দুর্ঘট ও দুর্লভ। যদি আপনার ইচ্ছা ও অনুমতি হয় বলিতে পারি। রাজা শুনিতে ইচ্ছুক হওয়ায় কবিরাজ কহিলেন যে একখানি প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত আছে যে যদি অমানিশার নিশীথ সময়ে বৃষ্টি হইয়া সেই জল কোন খর্পরে পতিত হয়, সেই জল ভিন্ন এ রোগের ঔষধের আর কোন অনুপান নাই। ইহা শুনিয়া রাজা কবিরাজকে গত রাত্রের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিলেন এবং সেই জলাধার গর্ত্ত খনন করিয়া দেখিলেন যে সেটি কোন শবের মাথার খুলি। ইহাতে রাজা ও কবিরাজ উভয়েরই বিস্ময় উপস্থিত হইল এবং উভয়ের আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। রাজা কবিরাজের সম্মানস্বরূপ বিস্তর

ধনরত্নাদি দানকরিয়া সানন্দ হৃদয়ে স্বদেশে গমন করিলেন। এই অপূর্ব্ব আখ্যানের কতদূর সত্য তাহা আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু চণ্ডীচরণ রায় যে একজন অদ্বিতীয় চিকিৎসক ছিলেন, তাহা অদ্যাপি অনেকে ঘোষণা করেন।...কাঁচরাপাড়া এক সময়ে দৈহিক বলবিক্রম বিষয়েও বিখ্যাত ছিল। বেচারাম অধিকারী নামক এক ব্যক্তি একদা বাহুবলে তালগাছ তুলিয়া ফেলিয়া স্ত্রীলোকদিগের স্নানের পথ পরিষ্কারকরিয়া দিয়াছিলেন এবং একবার একদল নব্য সম্প্রদায়ী-দিগের মধ্যে একজনকে কুম্ভীরে ধরিলে সকলে ঐক্য হইয়া সেই কুম্ভীরকে ডাঙ্গায় তুলিয়াছিলেন। কাঁচরাপাড়ার মৃত্তিকাকে পূর্ব্বে অনেকে বীরমাটি বলিত; কিন্তু এখন সেই বীরভূমি নীরবং হইয়া গিয়াছে।"

পীতাম্বর সরকার মহাশয় মাঝেরপাড়ার চন্দ্রকুমার সরকার মহাশয়ের পিতা। তিনি আমার পিতামহ নীলমণি দে মহাশয়ের এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র দে মহাশয়ের নিকটে সরকারের কার্য্য করিতেন। তিনি বড় কাল ছিলেন। তিনি একস্থানে বরযাত্রী হইয়া যাইলে, দুইজন ছেলে দুইখানি তালপত্র ও দুইখানি কলাপাতা আনিয়া তাঁহার গাত্র চাঁচিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল যে তাহাদের 'সেয়াই' কালির জন্য ভূষার অভাব হইয়াছে। পীতাম্বর বাবু বলিলেন যে জনসাধারণের উপকারের জন্য তিনি দেহত্যাগ করিতেও প্রস্তুত, গায়ের একটু ময়লা দান করা ত সামান্য কথা। তখন কাল ভাজা চাউল জলে ভিজাইয়া রাখিয়া সেই জলের সহিত ভূষা ভাল করিয়া মিশাইয়া কালি প্রস্তুত হইত।

এই প্রকার তামাসা (practical joke) জামাতাবাবাজীদিগের প্রতি প্রযুক্ত হইত; পানের ডিবার ভিতর আরসুলা রাখা ইত্যাদি। আমাদিগের বাটীর গৃহচিকিৎসক (Family Doctor) চণ্ডীচরণ দাসগুপ্ত

গল্প করিতেন যে তাঁহার এক বন্ধু একজনের ভাল একটী পাঁঠা তাহার অজ্ঞাতসারে মারিয়া রন্ধনপূর্ব্বক খাইয়াছিলেন এবং রাঁধা মাংস হাঁড়িতে পূরিয়া এবং সরা ঢাকাদিয়া পুষ্করিণীতে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন এবং স্নান করিবার সময় দুইদিন ধরিয়া সেই মাংস ভক্ষণ করিয়াছিলেন।

আমার পিতা হুগলিজেলার দাঁড়পুর-গোবিন্দপুর গ্রামের ৺ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। আমার মাতামহ অতিশয় গৌরাঙ্গভক্ত ছিলেন। তিনি আমার জ্যেষ্ঠ মাতুলের নাম শ্রীকৃষ্ণ এবং কনিষ্ঠ মাতুলের নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রাখিয়াছিলেন। আমার পিতার বিবাহের সময় কাঁচরাপাড়া হইতে অনেক বরযাত্রী গিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভিতর শ্রীমহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামে একজন রহস্যপ্রিয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। কন্যাসম্প্রদান কার্য্য ও খাওয়ান দাওয়ানতে দশটা রাত্রি হইয়াছিল। তাহার পর আমার মাতামহ তাঁহার ভৃত্যকে লইয়া প্রাত্যহিক হরিসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। বরযাত্রীদিগের নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়াতে মহেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় রহস্য করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার দুইজন বন্ধু সহ মস্তকে কাপড় বন্ধন করিয়া 'হরিবোল' বলিয়া উদ্দাম নৃত্য করিতে লাগিলেন। আমার মাতামহ দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের পদধূলি তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন যে ভগবান্ অনেকদিন তাঁহার সহিত এরূপ ভক্তগণের মিলন ঘটান্ নাই এবং উঁহাদিগকে কিছুদিন তাঁহার বাটীতে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। মহেশ বাবু আমাকে বলিয়াছিলেন যে আমার মাতামহের আন্তরিক ভক্তি দেখিয়া তাঁহারা তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আমার মাতামহ তাঁহাদের বাক্য আদর্শ বৈষ্ণবের স্বাভাবিক বিনয় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

তখনকার লোকেরা এইরূপ তামাসায় অভ্যস্ত ছিলেন—আমার পিতামহ (৺নীলমণি দে) যখন কলিকাতা হইতে কাঁচরাপাড়ার বাটীতে আসিতেন, তখন কৃষ্ণদেবের প্রসাদ পাইবার জন্য মন্দিরে যাইতেন। তিনি মন্দিরের মেঝের উপরই প্রসাদান্ন দিতে বলিতেন এবং প্রসাদের কিছু অবশেষ রাখিতেন না। একদিন এক অধিকারী (সেবাইত) মহাশয় তাঁহাকে আমড়াসহিত অন্ন দিয়া বলিয়াছিলেন যে যেন তাঁহার পাতে কৃষ্ণদেবের প্রসাদের কিছু অবশেষ না থাকে। শুনিয়াছি যে আমার পিতামহ আমড়ার আঁটীটি পর্য্যন্ত গলাধঃকরণ করিয়াছিলেন। আমার পিতামহ প্রথম ম্যাল্যারিয়া আক্রমণের সময়ে অর্থাৎ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

অনেক সুশিক্ষিত এবং সংযত অধিবাসী থাকিলেও, দুই চারিজন মদ্যপ সে সময়ে বিদ্যমান ছিল। ইহাদের ভিতর একজন প্রায় প্রত্যহ নয়টা দশটা রাত্রিতে বাজার হইতে আমাদের বৈঠকখানার পার্শ্ব দিয়া, তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রতি এবং যাঁহাদিগের বিরুদ্ধে তাঁহার ক্রোধ থাকিত তাঁহাদিগের প্রতি কটুবাক্য বর্ষণ করিতে করিতে গৃহাভিমুখে যাইতেন। ইনি মদ্যপান করার পরে বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়া এরূপ দূষণীয় বাক্য প্রয়োগ করিতেন কিম্বা এইরূপ কটু বাক্য প্রয়োগকরিবার অভিপ্রায়ে মদ্যপান করিতেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। কাঁচরাপাড়ার একটী সম্ভ্রান্ত পরিবারের জামাতাও মদ্যপায়ী ছিলেন। তিনি চন্দননগরের একজন বিশিষ্ট অধিবাসীর পুত্র। তিনি দেখিতেও সুপুরুষ ছিলেন। তিনি মদ্যপান করিলেও কাহাকেও গালাগালি দিতেন না, কিন্তু প্রায়ই রাস্তায় পড়িয়া থাকিতেন। আমি আমাদের চাকর দিয়া অনেকবার তাঁহাকে তাঁহার শ্বশুরালয়ে পৌঁছাইয়া দিয়াছি। আর একব্যক্তি একবার অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়া রক্ষাকালী পূজার সময়ে হাড়িকাঠের

ভিতরে বলির পাঁঠার নীচে নিজের একটী পা রাখিয়া কামারকে শীঘ্র ছাগলটীকে কাটিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কামারও পাঠাটী কাটিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। দর্শকগণের একজন হাড়িকাঠের ভিতর তাঁহার পা দেখিয়া কর্ম্মকারকে সাবধান না করিলে পাঁঠার সঙ্গে তাঁহার পাও বলি হইয়া যাইত।

মাদকদ্রব্যের প্রতি মাদকদ্রব্যসেবীদিগের আসক্তি এত প্রবল হয়, যে তাহারা মিথ্যা-কথা যে দোষার্হ ইহা জ্ঞান করে না। একবার আমার ডাক্তার জ্যেঠামহাশয় ও আমি আমাদের বৈঠকখানাতে অপরাহ্নে বসিয়া আছি, এমন সময়ে একটী প্রৌঢ়বয়স্ক ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিলেন যে তাঁহার বৃদ্ধা মাতা সিঁড়ি হইতে পড়িয়া যাইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছেন এবং তাঁহার অনেক রক্তস্রাব হইয়াছে এবং সেইজন্য তাঁহার ব্র্যাণ্ডির (Exshaw no. 1) বিশেষ প্রয়োজন আছে এবং আমাদের নিকট এই ব্র্যাণ্ডি ঔষধার্থে থাকে বলিয়া তিনি আমাদের বাটীতে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া আসিয়াছেন। আমি তৎক্ষণাৎ ব্র্যাণ্ডি আনিতে যাইতে উদ্যত হইলে ডাক্তার জ্যেঠামহাশয় চক্ষুদ্বারা ইঙ্গিত করিয়া আমাকে বারণ করিলেন এবং অভ্যাগত ব্রাহ্মণকে বলিলেন যে নীচের আলমারিতে অন্যান্য ঔষধ থাকে এবং উপরের আলমারিতে আমাদের বাটীর বিশেষ প্রয়োজনের নিমিত্ত সামান্য ব্র্যাণ্ডি থাকে এবং তখন অন্য লোককে দিবার মত ব্র্যাণ্ডি নাই। ব্রাহ্মণটী এই কথা শুনিয়া এবং কাকুতি মিনতি নিষ্ফল দেখিয়া চলিয়া গেলেন। আমি ডাক্তার জ্যেঠামহাশয়ের প্রতি একটু বিরক্ত হইলাম এবং তাঁহাকে তাঁহার এরূপ নির্দ্দয় আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে (কারণ আমাদের বাটীতে চিকিৎসার জন্য তখন Exshaw no. 1 ব্র্যাণ্ডি দেড় বোতল মজুত ছিল) তিনি বলিলেন যে ঐ লোকটীর মাতার সিঁড়ি হইতে পড়িয়া যাইবার

কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং মগু ক্রয়করিবার পয়সার অভাব হেতু কিম্বা ধান্যোৎপন্ন (ধেনো) মগ্যের স্বাদ বদলাইবার জন্য তিনি আমাদিগের বাটীতে আসিয়াছিলেন। তখন আমি জ্যেঠামহাশয়ের কথাতে সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারি নাই; কিন্তু পরদিন তাঁহার কথার সত্যতা সম্বন্ধে আমার আর কোন সন্দেহ রহিল না।

আমাদের বাটী হইতে কিয়দ্দূরে একটী গঞ্জিকাসেবীর দল প্রত্যহ একটী বৈঠকখানাতে একত্রিত হইতেন। ইঁহারা নির্ব্বিরোধী ছিলেন; কাহারও কোন প্রকার অনিষ্টের চেষ্টা করিতেন না, নিজের আনন্দে ইঁহারা বিভোর হইয়া থাকিতেন। ইঁহাদের ভিতর দুইজন গুলি খাইতে অভ্যস্ত ছিলেন—একজন প্রৌঢ় বয়স্ক, অপরজন যুবক; উভয়েই ব্রাহ্মণ ছিলেন। যুবকটী অতিরিক্ত মাদকদ্রব্য সেবন করিয়া শীঘ্রই কালগ্রাসে পতিত হইলেন। প্রৌঢ় ব্যক্তি বোধহয় এই দুইটী মাদকদ্রব্য নিয়মিত পরিমাণে সেবন করিতেন, সেই জন্য তাঁহার বিশেষ অনিষ্ট হয় নাই। তাঁহার এক আত্মীয়ার তিন হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ ছিল। এই কাগজের সুদ আনিতে প্রতি বৎসর কলিকাতায় আসিয়া আমাদের যোড়াসাঁকোর বাটীতে দুই তিনদিনের জন্য তিনি অবস্থান করিতেন। একবার (তখন আমি প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ি, বোধহয় ১৮৮৭ কিম্বা ৮৮ খৃষ্টাব্দে) বেঙ্গল ব্যাঙ্ক হইতে যখন তিনি তাঁহার কোম্পানীর কাগজের সুদ একশত কুড়ি টাকা আনিতেছিলেন, তখন চিৎপুর রোডে তিনটী লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। একটী লোক একটী সোনার নূতন কণ্ঠমালা তাঁহার সম্মুখে ফেলিয়া দিল এবং হঠাৎ তার হাত হইতে পড়িয়া গিয়াছে, এইরূপ ভাণ করিল। পশ্চাৎ হইতে অবশিষ্ট দুইজন লোক আসিয়া প্রথম ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিল যে সে কোথা হইতে এরূপ মূল্যবান্ ও সুন্দর অলঙ্কার পাইয়াছে। প্রথম ব্যক্তি বলিল

যে ঐ অলঙ্কারটী তাহার স্ত্রীর জন্য তিন চারিদিন হইল সে গড়াইয়াছে ; কিন্তু আকস্মিক বিপদ ঘটাতে সে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং ঐ গহনা প্রস্তুত করিতে তাহার একশত টাকা খরচ হইয়াছে। এক্ষণে যদি সে পঞ্চাশ টাকা পায় তাহা হইলে এই মূল্যবান্ অলঙ্কারের বিনিময়ে সে তাহাই গ্রহণ করিবে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ব্যক্তি বলিল সে যদি তাহাদিগের সহিত তাহাদিগের একক্রোশদূরস্থ বাটীতে গমন করে তাহা হইলে ঐ মূল্যে ঐ দ্রব্যটী তাহারা কিনিতে পারে। প্রথম ব্যক্তি বলিল যে সে এত দূরে যাইতে অক্ষম। তাহার ২০।২৫ মিনিটের ভিতর টাকা আবশ্যক। সে নিকটস্থ স্বর্ণকারের দোকানে যাহা পায় তাহাতে অলঙ্কারটী বিক্রয় করিবে। আমাদের দেশের ব্রাহ্মণটী অর্দ্ধমূল্যে একটী সুন্দর স্বর্ণালঙ্কার ক্রয় করিবার লোভ সংবরণকরিতে পারিলেন না এবং সানন্দে আমাদের বাটীতে আসিয়া আমাকে সেই অলঙ্কারটী দেখাইয়া বলিলেন যে তিনি সুদ পাইয়াছেন এবং তাহার উপর পঞ্চাশ টাকা লাভও করিয়াছেন। আমার সন্দেহ হইল, কারণ এইরূপ চাতুরীর কথা (confidence-trick) আমি আরও শুনিয়াছিলাম। সেইজন্য তাঁহাকে ঐ অলঙ্কারটী লইয়া আমি আমাদের বাসার নিকটস্থ একটী স্বর্ণকারের দোকানে যাইতে বলিলাম। পরে প্রকাশ পাইল যে সেইটী পিত্তল-নির্ম্মিত। তখন তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

অদ্ভুত উপাধির জন্য কখনও কখনও হাস্যরসের উদ্রেক হয়। মাঝের-পাড়ার একটী ব্রাহ্মণ পরিবারের উপাধি ছিল 'পূততুণ্ড।' ইহা চল্‌তি ভাষায় 'পূঁইদণ্ড' হইয়াছিল। এই পরিবারের একব্যক্তি রেলগাড়ীতে যাইবার সময়ে যখন আর একজন যাত্রীর সহিত কথোপকথন করিতে-ছিলেন, তখন তিনি এই কাঁচরাপাড়ার অধিবাসীর নাম জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন। ইনি বলিয়াছিলেন ইহার নাম 'অমুক পূঁইদণ্ড'। প্রশ্নকর্ত্তা

বিবেচনা করিলেন যে কাঁচরাপাড়া-বাসী তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেছেন, কারণ তিনি এরূপ উপাধি পূর্ব্বে শ্রবণ করেন নাই। ইহার পরে তিনি কথাবার্ত্তা না কহিয়া গম্ভীর হইয়া রহিলেন। কাঁচরাপাড়ার লোকটী পুনরায় তাঁহার সহিত কথা কহিবার অভিপ্রায়ে ঐ বিদেশী লোকটীকে তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি ইহার উত্তরে বলিলেন যে তাঁহার নাম 'অমুক শাক-পাট-লাঠি'। পূততুণ্ড মহাশয় বিরক্ত হইয়া বিদেশী লোকটীকে তাঁহার বিদ্রূপের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন "যদি পুঁই শাকের দণ্ড হয়, তাহা হইলে পাট শাকের লাঠি হইবে না কেন?"

সে সময়ে মোকদ্দামা তদ্বির-নিপুণ চারি পাচজন ব্যক্তি আমাদের গ্রামে ছিলেন। তাঁহারা রাণাঘাটে যাইলে প্রত্যহ এক টাকা এবং কৃষ্ণনগরে যাইলে প্রত্যহ দুই টাকা অর্থী কিম্বা প্রত্যর্থীর নিকট হইতে গ্রহণ করিতেন। ইহা ব্যতীত তাঁহারা তাঁহাদের পাথেয় এবং মিষ্টান্ন আদায় করিতেন। তাঁহারা তাঁহাদের জীবিকা-অর্জ্জনের নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে নূতন মোকদ্দামার সৃষ্টি করিতেন। আমি শুনিয়াছি যে আমার জন্মাবার অন্ততঃ কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে একজন 'নাগ' উপাধিযুক্ত কায়স্থ ছিলেন। তিনি মোকদ্দামা তদ্বিরে দক্ষ ছিলেন এবং দলিল-পত্র জাল করিতে নিপুণ ছিলেন এবং তাঁহার হস্তাক্ষর সুন্দর ছিল। একটী দলিল জাল করার জন্য কৃষ্ণনগরের সাহেব জজের নিকট গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত হইলে, তিনি একটী মাছধরা জাল বুনিতে বুনিতে বিচারকের এজলাসে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি সেই দলিল জাল করিয়াছেন কিনা তিন চারিবার জজ্ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে তিনি হুজুরের কথা কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না, কারণ তিনি একজন পাড়াগেঁয়ে মূর্খব্যক্তি। জজের পেশকার তাঁহাকে

একখানি দলিল প্রদর্শন করিয়া সেখানি তিনি জাল করিয়াছেন কিনা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন যে তিনি জাল বুনিয়া তাঁহার জীবিকা-অর্জ্জন করেন এবং একদিন যদি তিনি এই জালবোনা কার্য্য স্থগিত রাখেন, তাহা হইলে তাঁহার সংসার অচল হয় এবং সেইজন্য তিনি হুজুরের এজলাসে বাধ্য হইয়া জালের দড়ি এবং কাঠি হস্তে উপস্থিত হইয়াছেন। শুনিয়াছি সে যাত্রা তিনি অব্যাহতি পাইয়াছিলেন।

আম্রের সময়ে ঝড় হইলে আম্র কুড়ান একটী বৃহৎ ব্যাপার হইত। অনেকেই তাঁহাদের নিজের বাগানের দিকে কিম্বা অন্যের বাগানের দিকে আম্র-সংগ্রহের নিমিত্ত ছুটিতেন। একটী বড় বাগানের আম্র সমস্তই একলা কুড়াইবার নিমিত্ত গভীর রাত্রিতে একজন স্ত্রীলোক তাহার মাথার উপরে একটা খড়ের বিড়ে রাখিয়া তাহার উপরে একটী জ্বলন্ত কয়লাপূর্ণ সরা রাখিত এবং মাঝে মাঝে তাহাতে ধূনা ছড়াইয়া দিত। ইহাতে দপ্‌ করিয়া আগুণ জলিয়া উঠিয়া আবার নিবিয়া যাইত। সেই বাগান আলেয়া (ignis fatuus) অধিকৃত, এই ভয়ে আর কেহ সেখানে আম্র কুড়াইতে যাইত না।

সে সময়ে পুরুষ বরযাত্রীরা সময়ে সময়ে অতিশয় অত্যাচার করিতেন। স্ত্রী-আচার সময়ে তাঁহারা অন্দরমহলে প্রবেশ করিতেন এবং স্ত্রীলোকদিগকে বিরক্ত করিতেন। আমার ভগ্নীর বিবাহের সময়ে শ্যামবাজারের বরযাত্রী-মহোদয়েরা অন্দরমহলে প্রবেশলাভ না করিতে পারিয়া কলিকার আগুন দিয়া আমাদের নূতন সতরঞ্চগুলির অনেক ক্ষতি করিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে বরপক্ষীয়দিগের কন্যাপক্ষীয়দিগের সহিত মারামারি হইত। কিন্তু কন্যাপক্ষীয়েরা সাধারণতঃ প্রবল হওয়াতে বরকে তাঁহাদের অধিকারের ভিতর আনিয়া নিরাপদে রাখিতেন এবং বিবাহ পণ্ড হইতে দিতেন না। একবার আমাদের স্মরণ

আছে, বরপক্ষীয় লোকেরা ও কন্যাপক্ষীয় লোকেরা একত্রিত হইয়াছেন। বিবাহ আরম্ভ হইবার অধিক বিলম্ব নাই। এমন সময়ে বরপক্ষীয়েরা নির্দ্দিষ্ট পাওনার কিছু অধিক দাবী করিয়া বসিলেন। তর্ক হইতে লাগিল, তর্ক বিবাদে পরিণত হইল। বরপক্ষীয়েরা বর লইয়া প্রস্থান করিলেন। বর-মহাশয়ের সমস্ত রাত্রি জাগরণ হইল বটে, কিন্তু অনাহারে কাঁচরাপাড়া হইতে বিজপুর পর্য্যন্ত পথভ্রমণে ও বাসর-ঘরের পরিবর্ত্তে কাঁচরাপাড়া ষ্টেশানে এবং ট্রেণের তৃতীয় শ্রেণীর কামরাতে। গরম গরম লুচি, তরকারী ও কলিকাতা হইতে আনীত নানাবিধ উচ্চশ্রেণীর মিষ্টান্নের পরিবর্ত্তে বাজারের 'বাসি' খই, মুড়কীতে বরযাত্রীদিগের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইয়াছিল। কন্যাকর্ত্তা মহাশয় সেই রাত্রিতেই একটী স্বজাতীয় শিক্ষিত নিদ্রালু যুবককে ধরিয়া আনিয়া তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। মোটের উপর এ বিবাহটী ভালই হইয়াছিল।

বাঙ্গালীজাতির উন্নতির অন্তরায় 'দলাদলি' তখন প্রত্যেক গ্রামে প্রবলভাবে বর্ত্তমান ছিল। একবার আমাদের ও আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী আর এক ভদ্রলোকের জগদ্ধাত্রী-পূজা হইতেছিল। আমাদিগকে অপদস্থ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহারা আমাদিগের সরকার বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্যের নামে কলিকাতাতে একটী 'খেমটাওয়ালী সম্প্রদায়কে' বায়না দিয়া আসেন। তাহারা আসিলে আমাদের বাটীর সকলে বলিলেন যে খেমটার নাচ গৃহস্থের বাটীতে কিছুতেই দেওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু খেমটাওয়ালী-সম্প্রদায় তাহাদের সমস্ত প্রাপ্য টাকা দাবী করিল। বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে তাহাদিগের নিকট প্রেরণ করা হইলে, তাহারা তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। সেই সময়ে অপর দলের একজন লোক রহস্য দেখিবার জন্য সেই স্থানে উপনীত হইলে, তাহারা বলিল

যে তিনিই তাহাদিগকে বায়না দিয়া আসিয়াছেন। তাহারা আমাদের বিরুদ্ধপক্ষের বাটীতেই তাহাদের নাচগান সমাপ্ত করিল। যদিও তাঁহারা ইহাতে একটু অপদস্থ হইলেন, তাঁহারা 'লেডী ক্যানিং' নামক রসগোল্লা-জাতীয় নূতন-আবিষ্কৃত মিষ্টান্ন খাওয়াইয়া আমাদিগকে পরাজিত করিলেন।

সে সময়ে ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, ব্যাড্‌মিণ্টন্ প্রভৃতি খেলা পল্লীগ্রামে প্রচলিত ছিল না। দাঁড়াগুলি, হাডু-ডুডু, ঘুড়ী-উড়ান, সাঁতার দেওয়া, বাচ খেলা এবং কুস্তী পাড়া-গাঁয়ে প্রচলিত ছিল। বৃদ্ধেরা তাস, দাবা ও পাশাতে তাঁহাদের অবকাশ অতিবাহিত করিতেন। তখন কলিকাতাতে ক্রিকেট প্রচলিত হইয়াছিল।

আমাদের গ্রামের ন্যায়বাগীশ, ন্যায়রত্ন এবং চূড়ামণি-উপাধিধারী পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষাতে যে অধিক ব্যুৎপন্ন ছিলেন তাহা বলিতে পারি না। পুরোহিত-সম্প্রদায়ের একজনের নামে একটী নিমন্ত্রণের পত্রে দেখিয়াছিলাম—"শ্রী—ভট্টাচার্য্য, সুরাচার্য্যকল্পেষু অর্থাৎ বিদ্যাতে যেন তিনি বৃহস্পতি অপেক্ষা কিছু ন্যূন ছিলেন" লিখিত আছে। কিন্তু আমি জানি এই ভট্টাচার্য্যপ্রবর 'পৃথিবী'কে 'প্রিথীবি' বানানকরিতেন। সাধারণতঃ ভট্টাচার্য্যমহাশয়দিগের বিবাহ করিতে হইলে চারি পাঁচ শত টাকা কন্যাপক্ষকে দিতে হইত। এইজন্য আমাদের গ্রামের দুইজন বিবাহ করিতে পারেন নাই এবং একজন স্ত্রীবিয়োগের পরে আর বিবাহ করিতে সমর্থ হন নাই এবং এই তিনজনেরই চরিত্র কলুষিত ছিল।

তখন জীবিকার্জ্জন এখনকার মত কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়ায় নাই। যদিও এখনকার তুলনায় সে সময়ের লোকের আয় অনেক কম ছিল, কিন্তু জিনিষপত্রের মূল্য অল্প বলিয়া স্বল্প আয়েও সাধারণতঃ

সাংসারিক অভাব দূরীভূত হইত। খাদ্যদ্রব্য যে কেবল সস্তা ছিল তাহা নহে, তাহা প্রায়ই ভেজালশূন্য অবস্থায় পাওয়া যাইত। এইজন্যই তাঁহারা ম্যালেরিয়া রোগ বিদ্যমানেও পুষ্টিকর দ্রব্য আহারকরিয়া এবং সাংসারিক চিন্তাশূন্য হইয়া রোগের সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইতেন।

আমাদের বাটীতে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি শ্রীচণ্ডীচরণ দাশগুপ্ত আমাদের গৃহচিকিৎসক ছিলেন। আমি compounder ছিলাম। আমার অবকাশ-সময়ে আমি ডাক্তার দুর্গা-দাস করের **Materia Medica,** ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের চিকিৎসাদর্পণ এবং অন্যান্য দুই একখানি ডাক্তারী পুস্তক অধ্যয়ন করি-তাম। প্রত্যহ তিন চারিটী রোগীকে আমি নিজেই ঔষধ বিতরণ করিতাম। কিন্তু যে শিশির উপর poison অর্থাৎ বিষ লেখা থাকিত, সেই সকল ঔষধ এবং digitalis ইত্যাদি কতিপয় ঔষধ আমি ব্যবহার করিতাম না এবং সাধারণতঃ ডাক্তারের prescription-অনুযায়ী ঔষধ বিতরণ করিতাম। এইরূপ করাতে আমার 'চিকিৎসক' বলিয়া অভিমান জন্মিয়াছিল। একদিন বেলা দুইটা তিনটার সময়ে আমাদের বাটীতে বিধুভূষণ (পতন) ভট্টাচার্য্য, কাকা মহাশয়, আসিলেন। তখন তিনি জ্বরে কাঁপিতেছিলেন। তাঁহার গায়ে হাত দিয়া মনে হইল যে উত্তাপ ১০৪ ডিগ্রীর কম নহে। আমি তাঁহার জন্য fever-mixture প্রস্তুত করিয়া এক দাগ খাইতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম। তিনি বলিলেন দুই ঘণ্টা পরে যদি তাঁহার জ্বর না যায়, তখন আমার ঔষধ তিনি সেবন করিবেন। তিনি নিজেও য়্যালোপ্যাথী চিকিৎসা কথঞ্চিৎ জানিতেন। তিনি এত জ্বর-সত্ত্বেও তৈল মাখিয়া পুষ্করিণীতে স্নান করিলেন এবং ভাতও খাইলেন ও ভাত খাইয়া আমাদের বাটীতে পুনরায় আসিলেন।

তখন তাঁহাকে আমি থারমোমিটার দিয়া দেখিলাম, কিন্তু জ্বরের কোন চিহ্ন পাইলাম না।

সে সময়ে গ্রামের লোকেরা দলাদলিতে যেরূপ উৎসাহ প্রদর্শন করিতেন, সেইরূপ উৎসাহ বারোয়ারী পূজার সময়ে, দুর্গা পূজাতে, দোল এবং রথযাত্রার সময়েও দেখাইতেন। কাঁচরাপাড়াতে বারোয়ারী পূজা উপলক্ষে বউমাষ্টারের, লোকা ধোবার ও মতি রায়ের যাত্রা এবং পাঁচালী-ওয়ালাদিগের কবিতাযুদ্ধ শুনিতে বহু লোকের সমাগম হইত। যদিও যাত্রা ও পাঁচালীগুলি রাত্রি ৩টা অথবা ৪টায় সচরাচর আরম্ভ হইত, তত্রাচ সন্ধ্যা আটটা নয়টা হইতে ভিন্নগ্রাম হইতে লোকেরা আমাদিগের বাটীর সম্মুখ দিয়া বারোয়ারীতলায় গমন করিতেন। এক্ষণে এই স্বল্প-ব্যয়সাধ্য আমোদের পরিবর্ত্তে অধিক ব্যয়সাধ্য থিয়েটার, বায়োস্কোপ, সার্কাস এবং কারনিভ্যালের প্রচলন হইয়াছে বটে, কিন্তু তখনকার নিরাবিল আনন্দ এখনকার দর্শক এবং শ্রোতৃবৃন্দ উপভোগ করিতে পারেন কিনা এ বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ আছে। কিম্বা ইহাও হইতে পারে যে আমাদের বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আনন্দ অনুভব এবং উপভোগ করিবার শক্তিও হ্রাস-প্রাপ্ত হয়।

সে সময়ে সন্ধ্যাকালে কাঁচরাপাড়ায় অনেক ভদ্রলোকের বৈঠক-খানাতে দশ বারজন করিয়া লোক সমবেত হইতেন। আমাদের বাটীতে ডাক্তার চণ্ডীচরণ দাশগুপ্ত, বামাচরণ রায় চোধুরী, উমেশচন্দ্র শিকদার (অধ্যাপক সতীশচন্দ্র রায়ের সম্বন্ধে মাতামহ), হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (পূর্ব্বে রেলওয়ের কর্ম্মচারী, তাহার পরে কৃষক), শ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য (কুমারটুলীর সাহিত্যিক Statutory-Civilian ৺বরদাচরণ মিত্রের পিতৃগুরু), কবিরাজ কৈলাসচন্দ্র রায়, রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (রায় চৌধুরী মহাশয়দিগের জামাতা, পূর্ব্বে বলাগড়-নিবাসী) প্রভৃতি

ভদ্রমহোদয়গণ সন্ধ্যাকালে সমবেত হইতেন। রাজনারায়ণ বাবু রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণসমূহে অভিজ্ঞ ছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ রায় মহাশয় (শ্রীকালিকৃষ্ণ ও ডাক্তার বটকৃষ্ণ রায়ের পিতা) মধ্যে মধ্যে আমাদিগের বৈঠকখানাতে সন্ধ্যাকালে আসিতেন। তাঁহার বাটী আমাদিগের বাটী হইতে প্রায় অর্দ্ধমাইল ছিল। আমার স্মরণ আছে যে একবার তাঁহার আমাদিগের বাটীতে আসিবার সময়ে বৃশ্চিকদংশনের জন্য এবং আর একবার আমাদের বৈঠকখানাতেই শূলবেদনার আক্রমণে তিনি অস্থির হইয়াছিলেন এবং আমাদিগের বাটীতে দুইখানি পাল্কী থাকা সত্বেও রাত্রিতে শিবিকাবাহক সংগ্রহকরিতে আমরা সমর্থ হই নাই। বেহারাদিগের বাসস্থান কাঁচরাপাড়া এবং শুষ্ক যমুনাখাতের উত্তরে গুপ্তিয়া গ্রামে ছিল। আমার পিতাঠাকুর কাঁচরাপাড়া ষ্টেশান হইতে পাল্কী করিয়া বাটী আসিতেন। তিনি কলিকাতাতেও পাল্কী চড়িয়া তাঁহার দৈনিক কার্য্য সমাধান করিতেন। সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহিত যখন আমি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম দেখা করিতে গিয়াছিলাম, তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, “তুমি আমার সহিত দেখা কর না। প্রথমতঃ তোমার চাউলপটীর আত্মীয়দিগের সহিত আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে, দ্বিতীয়তঃ তুমি শিক্ষাবিভাগে কার্য্য করিতেছ ও ইউনিভার্সিটীর পরীক্ষক হইতেছ, তৃতীয়তঃ তুমি সতীশের (সার আশুতোষের ভগ্নীপতি শ্রীসতীশচন্দ্র রায়ের) প্রতিবেশী এবং তোমাদের পাল্কীতে চড়িয়া আমি ষ্টেশান হইতে সতীশের বাটী গিয়াছি এবং পুনরায় ষ্টেশানে আসিয়াছি।”

ডাক্তার জ্যেঠামহাশয়ের (চণ্ডীবাবুর) কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত ছিল। সে সময়ে বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্র ‘বঙ্গবাসীর’ তিনি একজন গ্রাহক ছিলেন। বঙ্গবাসীমুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত পুস্তকের ভিতর

অনেকগুলি আমার অনুরোধে তিনি ক্রয়করিয়াছিলেন। আমার কার্য্য ছিল এই সংবাদপত্র এবং গ্রন্থসমূহ সন্ধ্যাকালে সমবেত ভদ্রলোকদিগের জন্য পাঠকরা। যদিও আমি কখন তাম্রকূট কোন আকৃতিতে সেবন করি নাই, [১] চাকরদিগের অনুপস্থিতিতে আমি আহ্লাদের সহিত অনেক ভদ্রলোকের নিমিত্ত তামাক কলিকায় সাজিয়া দিতাম। সমবেত ভদ্রলোকেরা কলিকাতার 'অম্বুরী' তামাক ব্যতীত আমাদের বাটীতে প্রস্তুত দাকাটা তামাকের ধূমপান করিতেন। অনেকগুলি হুঁকা আমাদের বৈঠকখানায় থাকিত। কোন কোন ভদ্রলোকের জন্য নিজস্ব একটী হুঁকার ব্যবস্থা করিতে হইত।

আমাদের বাটীতে একটী কক্ষে শ্রমজীবীদিগের জন্য নৈশ বিদ্যালয় আমি স্থাপিত করিয়াছিলাম। এই শিক্ষাকার্য্যে আমার বালক-বন্ধুগণ আমাকে অনেক সাহায্য করিতেন। আমার পিতার যোড়া-সাঁকোনিবাসী এক বন্ধু একবার আমাদের কাঁচরাপাড়ার বাটীতে আসিয়া আমাদের 'গুঁফো' অর্থাৎ গোঁফবিশিষ্ট ছাত্রদিগের বিষয় লইয়া আমাদিগকে অনেক উপহাস করিয়াছিলেন। সম্প্রতি আমাদের গ্রামের কতিপয় শ্রমজীবী একটী 'ক্লব' ('club' ; এটি উঁহাদের কথা) স্থাপিত করিবার অভিপ্রায়ে আমার নিকট হইতে আমাদের কাঁচরাপাড়ার বাস-স্থানের একটী ঘর লইয়াছেন।

১ এইজন্য আমি পূর্ব্বে বিশেষ গর্ব্ব অনুভবকরিতাম। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে আমার দুইটী আত্মীয় [Hon'ble B. K. Basu C. I. E., Solicitor এবং the late M. N. Basu B. A. (Cal.) and M.A. (Cantab), Bar-at-Law] এবং সম্প্রতি আমার এক-জন ব্যাঁটরানিবাসী শ্রদ্ধেয় বন্ধু (Mr. G. M. Dutt, Advocate, High Court) আমার তাম্রকূটের প্রতি বিরাগের জন্য আমার কোন credit নাই বলাতে আমার এই গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে কিম্বা তাহার অব্যবহিত পরেই শ্রীহরিদাস রায়ের (দাশগুপ্ত; Commercial Intelligence Departmentএ কার্য্য করেন) প্রযত্নে স্বর্গীয় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদপত্র প্রভাকরের নামে প্রভাকর লাইব্রেরী অর্থাৎ পুস্তকাগার কাঁচরাপাড়াতে স্থাপিত হইয়াছিল। হরিদাস বাবু তাঁহার চাকরীর জন্য কলিকাতায় আসিলে এই গ্রন্থাগারটী উঠিয়া যায়। যতদিন এই পুস্তকাগার ছিল ততদিন আমি ইহার একজন সভ্য ছিলাম।

লেখকের স্মরণ আছে যে এই সময়ে 'কাঁচরাপাড়া হিতৈষিণী সভা' বলিয়া একটী সমিতি গঠিত হইয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল যে এই গ্রামের যাহাতে মঙ্গল হয় তাহার উপায় নির্দ্ধারণকরা। কৃষ্ণদেব রায়ের মন্দিরের একটী কক্ষে মাঝে মাঝে এই সভার অধিবেশন হইত। ইহা অধিককাল স্থায়ী হয় নাই।

সে সময়ে ভূতের ভয়, মনে হয়, কিছু অধিক ছিল। চণ্ডীবাবু বলিতেন যে আমাদের পাড়ায় একজন ভদ্রলোকের যৌবনাবস্থায় স্বভাব কলুষিত থাকায়, গভীর রাত্রিতে সদর রাস্তা দিয়া গমনাগমনের তাঁহার প্রয়োজন হইত। তিনি সে সকল পথ দিয়া অন্য লোকের যাতায়াত নিবারিত করিবার অভিপ্রায়ে অনেক ভূতের গল্প সৃষ্টিকরিয়াছিলেন। মানুষভূত ছাড়া ঘোঁড়াভূত, ঝড়ভূত ইত্যাদি অনেক প্রকারের প্রেত আবিষ্কার করিয়াছিলেন। অনেক সময় প্রেতাত্মাদর্শন বুদ্ধিবিভ্রম হইতে উৎপন্ন হয়। কোন কোন রোগে মস্তকে রক্তাধিক্যপ্রযুক্ত রোগী এই প্রকার প্রেতাত্মা (hallucination) দর্শন করিয়া থাকে। কখন এই বুদ্ধিবিভ্রম দৃষ্টিভ্রম (illusion) হইতে উৎপন্ন হয়। আমার পাঠ্যাবস্থায় আমাদের একজন চাকর তাহার জামার দুই হাতার ভিতর একটী লাঠি প্রবেশ করিয়া লাঠির মধ্যভাগে দড়ি বাঁধিয়া এই জামাটী শুকাইবার জন্য

আমাদের কলিকাতার বাসস্থানের পেয়ারাগাছে ঝুলাইয়া দিয়াছিল। রাত্রিতে আমি বাহিরে আসিলে দেখিলাম যে একটী শাদা-কাপড়-পরা কন্ধকাটা (স্কন্ধ-কর্ত্তিত) ভূত তাহার দুইখানি হাত ছড়াইয়া নাড়িতেছে। কাঁচরাপাড়ার একজন ভদ্রলোককে ডাকিলাম। তিনিও ভয় পাইলেন। পরে আমাদের বামুনঠাকুরকে নিদ্রা হইতে জাগরিত করিলে তিনি একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন যে আমাদিগের একজন ভৃত্যের জামা বায়ুতে ঐরূপে আন্দোলিত হইতেছে।

সে সময়ে 'ভূতে পাওয়ার' কথা মাঝে মাঝে শুনা যাইত। রামায়ণেও ভূতগ্রস্ততার বিষয় বর্ণিত আছে। ইউরোপেও প্রেতের মনুষ্যদেহ অধিকারের (**spirit-possession**) কথা প্রচলিত আছে। অনেক সময়ে 'ভূতে পাওয়া', বায়ুরোগ (**nervous disorder**) ব্যতীত আর কিছুই নয়। 'ভূতে পাওয়ার' অছিলায় অনেক রোজা (ওঝা) অজ্ঞ এবং কুসংস্কারাপন্ন লোকদিগকে প্রতারিত করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিত। কখন কখন দুই একটী সাহসী যুবক হঠাৎ আলোক জ্বালিয়া ওঝার কীর্ত্তি প্রকাশিত করিয়া দিতেন এবং ওঝাও মার খাইতে খাইতে পলায়ন করিতেন। কিন্তু কখন কখন এরূপ ঘটিত—ওঝা দুর্ব্বল ভূতাবিষ্ট ব্যক্তিকে দন্তদ্বারা জলপূর্ণ কলসী স্থানান্তরিত করণের কিম্বা হঠাৎ নিকটস্থ বৃক্ষের একটী বৃহৎ শাখা ভগ্ন করণের দ্বারা ভূতাবিষ্ট রোগীকে সুস্থ করিতেন। এরূপ দুই চারিটী গল্প বিশ্বাসযোগ্য প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট আমরা শুনিয়াছি।

যদিও অধিকাংশ ভূতের গল্প বিকৃতমস্তিষ্কপ্রসূত, তত্রাচ দুই একটী যে সত্য তাহাতে—আমাদের বিদ্যা ও বুদ্ধির বর্ত্তমান অবস্থাতে—কোন সন্দেহ নাই। আমি এ সম্বন্ধে কেবল চারিটী ঘটনার উল্লেখ করিব। ২৪।২৫ বৎসর হইল কাঁচরাপাড়ার মালিপাড়া-নিবাসী শ্রীআশুতোষ চট্টো-

পাধ্যায়ের বাটীতে ঢিল, হাড় ইত্যাদি সন্ধ্যার সময়ে পড়িতে লাগিল। জিনিষপত্র সকলের সম্মুখে বিপর্য্যস্ত ও ভগ্ন হইতে আরম্ভ হইল। আশুবাবু চাগদার পুলিশ-ষ্টেশানে সংবাদ প্রেরণকরিলে কয়েকদিন কন্‌ষ্টেবল এবং চৌকীদার বাটী বেষ্টন করিয়া রহিল, কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না। তাহার পর কি ঘটিয়াছিল আমার স্মরণ নাই। আমি এই বৃত্তান্ত আশুবাবুর নিকট এবং ঐ পাড়ার অন্যান্য অধিবাসীর নিকট শ্রবণ করিয়াছিলাম। আশুবাবু Locomotive Officeএর একজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী এবং কাঁচরাপাড়া স্কুলের Secretary ছিলেন। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মণ্ডল (শিক্ষক) বলেন যে একদিন একটী ঢিল তাঁহার ও দারোগার কর্ণের পার্শ্ব দিয়া বেগে চলিয়া গিয়াছিল।

দ্বিতীয় ঘটনার বিষয় আমরা কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ ৺দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম। ইনি কটকের প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব রায় জানকীনাথ বসু বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। পরোপকার এবং দেশের সর্ব্ববিধ হিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগের জন্য এখনও পর্য্যন্ত কৃষ্ণনগর এবং বৈদ্যনাথে বসু-মহাশয়ের নামের সমধিক খ্যাতি আছে। কৃষ্ণনগরের ছাত্রেরা তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীর অতিশয় প্রশংসা করিতেন। তাঁহাকে যদি সত্যের এবং আন্তরিকতার প্রতিমূর্ত্তি বলা যায় তাহা একেবারেই অত্যুক্তি হয় না। তিনি যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক তখন তাঁহার একটী কন্যা জন্মে। তখন তিনি সপরিবারে কলিকাতা ইটিলীর একটী বাটীতে বাস করিতেন। এই বাটীর কর্ত্তা ও তাঁহার দুই পুত্র ওলাউঠা রোগে সেই বাটীতে মারা যান। গৃহিণী ও অপর দুই পুত্র ভূতের উৎপাতে বাটী ছাড়িয়া পলায়ন করেন। তাহার পরে দেবেন্দ্র বাবু এই বাটী ভাড়া লন। এই বাটীর ছাদের উপরে দাইল-ভাঙ্গা শব্দ প্রায় শ্রুত হইত।

মধ্য রাত্রিতে দ্বারে ভীষণ আঘাতের শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইত। এক-জন ঝি লাল-কাপড়-পরা একটী স্ত্রীলোককে ঘরের বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়াছিল। দেবেন্দ্র বাবুর একজন উচ্চশিক্ষিত আত্মীয় একদিন ভূতের কথা শুনিয়া পরিহাস করিতেছিলেন। তখন অপরাহ্ন তিনটা কিম্বা চারিটা। তৎক্ষণাৎ কড়িকাষ্ঠ হইতে খানিকটা গোবর-গোলা দুর্গন্ধ-পূর্ণ জল সেই স্থানে পড়িল। দেবেন্দ্র বাবুর আত্মীয় কড়িকাষ্ঠটী বিশেষরূপে পরীক্ষাকরিলেন; কিন্তু দেখিলেন কড়িকাঠ সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক। এই বাটীতে দেবেন্দ্র বাবুর শিশুকন্যার অসুখ হইল। অসুখ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিহইতেছে দেখিয়া তিনি তাঁহার মামার বাটীতে সপরিবারে পরিবর্ত্তনের জন্য যাইলেন। রাত্রি দুইটার সময়ে নূতন বাটীর ছাদে ভয়ানক শব্দ হইল। তাহার পরেই দেবেন্দ্র বাবুর কন্যা অজ্ঞান হইল। পরদিন প্রাতে ৮টার সময় তাহার মৃত্যু হয়।

তৃতীয় ঘটনা—দেওঘরের একটী বাটীর সম্বন্ধে অতিশয় বিশ্বস্ত লোকের নিকট শুনিয়াছি যে বাড়ীটিতে ভূতের উপদ্রব ছিল। পরে কতকগুলি দৈবকার্য্য করায় ঐ সকল উপসর্গ দূরীভূত হইয়াছিল। (১) একটী দীর্ঘকায়া প্রেতযোনি স্ত্রীলোকের দুইজন পুরুষের মাথায় সুড়সুড়ি দেওয়া; (২) খাট ও খাটিয়া সবেগে আন্দোলনকরা; (৩) রেলওয়ে গার্ডের ন্যায় ক্যাপ, প্যাণ্ট্-পরা একটী বিষণ্ণ অবনতমস্তক যুবকের ছায়া সার্সীর উপরে অন্ততঃ পাঁচ মিনিট ধরিয়া পড়া; (৪) ঐ দীর্ঘাকৃতি স্ত্রীলোকের ছায়া মাঝে মাঝে দেওয়ালের উপরে পড়া; (৫) ছাতের উপরে ভয়ানক শব্দ; (৬) দোতলার ছাত হইতে দুম্ দুম্ শব্দ করিয়া কাহারও নামিয়া আসা এবং দোতলায় পৌঁছিলে শব্দ থামিয়া যাওয়া; কিন্তু কোন আকৃতি না দেখা; (৭)

সার্সী বন্ধ থাকিলেও কে যেন সার্সী খুলিয়া জোরে বন্ধ করিতেছে এইরূপ শব্দ ; (৮) নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ।

যাঁহারা দেওঘরের কথা বলিয়াছেন তাঁহারা সেই বাটীতে চারিবৎসর ছিলেন। তাঁহারা স্বামী ও স্ত্রী সাধারণতঃ সে বাটীতে থাকিতেন। অবশ্য চাকর, চাকরাণী ও রাঁধুনীও থাকিতেন। তাঁহারা এই সকল উৎপাতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। গ্রীষ্মাবকাশের সময়ে উঁহাদের কন্যা, জামাতা ও দৌহিত্রও যাইতেন ; তাঁহারাও এ সকল ভৌতিক ব্যাপার দর্শন করিয়াছিলেন। পাছে সেই বাড়ীর কোন ক্ষতি হয়, সেইজন্য ইঁহাদিগের নাম প্রকাশ করিলাম না। তাঁহারা উপরতলায় শয়ন ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের কোন ক্ষতি করিত না বলিয়া তাঁহারা এই বাটীটি ত্যাগ করেন নাই। এক্ষণে ইঁহারা কলিকাতায় নিজের বাটীতে বাস করিতেছেন।

চতুর্থ ঘটনা—আমি আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু হাওড়ার প্রসিদ্ধ বহুদর্শী চিকিৎসক শরৎচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের নিকট সম্প্রতি শুনিয়াছি। দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাওড়া আদালতের বিখ্যাত ব্যবহারাজীব ছিলেন। তাঁহার বাটীতে তাঁহার জামাতার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেই রোগী তাঁহার শিশুকন্যাকে দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশকরেন, কিন্তু কোন কারণবশতঃ কন্যাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাওয়া হয় নাই। রোগীর মৃত্যু হইলে তাঁহার মৃতদেহ হাওড়ার শ্মশানঘাটে নীত হইল। একটী উত্তমরূপে আলোকিত ঘরে ডাক্তারবাবু, তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা, তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতার জ্যেষ্ঠপুত্র (যিনি ব্যবসাতে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পিতার স্মৃতি স্থায়ী করিবার নিমিত্ত নরসিংহ দত্ত কলেজ স্থাপিত করিয়াছিলেন), মৃতজামাতার শিশুকন্যা এবং একজন ভৃত্য শয়ন করিয়াছিলেন। শয়ন করিলেও তাঁহাদিগের ভিতর কেহ নিদ্রিত

হন নাই। শরৎবাবু প্রথমে দেখিলেন যে মৃত জামাতা তাঁহাদিগের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তখন তিনি চীৎকার করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার, ভ্রাতুষ্পুত্রের এবং ভৃত্যের মনোযোগ আকর্ষণকরিলেন। সকলেই স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। মৃত জামাতা অগ্রসর হইয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহার কন্যার নিকট আসিলেন এবং মস্তক অবনত করিয়া কন্যাকে দর্শন করিয়া অদৃশ্য হইলেন।

প্রায় ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে কাঁচরাপাড়ার বাজারপাড়াতে একটী সখের থিয়েটার গঠিত হইয়াছিল। আমার স্মরণ আছে যে একবার মহা-কালীর তলায় মাইকেল মধুস্দন দত্তের মেঘনাদবধের অভিনয় ইঁহারা করিয়াছিলেন। অভিনয়টী মোটের উপর ভালই হইয়াছিল। অভি-নেতৃবর্গের মধ্যে সত্যচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের রাবণের ভূমিকা উৎকৃষ্ট হইয়াছিল।

আমাদের পাড়ায় শ্রমজীবিসম্প্রদায় একটী যাত্রার দল গঠিত করিয়া ছিলেন। তাহার ভিতরে কেবল একজন উচ্চজাতির লোক ছিলেন তাঁহার নাম নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (ন্যানা)। একবার ইঁহারা মহাভারতের অর্জ্জুন ও বভ্রুবাহন-সম্বন্ধীয় নাটকের অভিনয় করিয়া-ছিলেন। ইহাতে মতিসূত্রধর (ডোম) অর্জ্জুন এবং নবকুমার বন্দ্যো-পাধ্যায় বভ্রুবাহন সাজিয়াছিলেন। উমেশচন্দ্র শিকদার মহাশয় নব-কুমারবাবুকে এ সম্বন্ধে অনেক উপহাস করিতেন, আমাদের মনে আছে।

চৌধুরীপাড়াতে বাগ্দীপাড়ার অধিবাসিগণ মনসার গানের দল গঠন করিয়াছিলেন। আমাদের বাটীতে একবার এই মনসার গান হইয়া-ছিল। অভিনেতৃগণ অশিক্ষিত হইলেও তাঁহাদের অভিনয় সুন্দর হইয়াছিল।

আমার পিতামহদিগের সময় হইতে আমাদের বাটীতে যাত্রা ইত্যাদির জন্য এবং লোক খাওয়ানর জন্য সামিয়ানা, সতরঞ্চ, গালিচা, ঝাড়, লণ্ঠন, এবং পিত্তলনির্ম্মিত বড় থালা, খুলি, কড়া ইত্যাদি মজুত থাকিত। আমার পিতাও এইসকল দ্রব্য অনেক বাড়াইয়াছিলেন। কাঁচরাপাড়ার এবং অন্যান্য স্থানের বারোয়ারীতে লইয়া যাওয়ায় এইসকল দ্রব্যের বিশেষরূপ ক্ষতি হওয়াতে তিনি তিনটী বৃহৎ সেগুণকাষ্ঠের সিন্ধুক প্রস্তুত করাইয়া তাহার ভিতরে এই সকল দ্রব্য চাবি দিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি বাটী না আসিলে অন্য লোক এই জিনিষগুলি পাইতেন না। সেই জন্য কেহ কেহ আমার পিতার উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন।

আমার পিতামহদিগের আমলে প্রতিবৎসর আমাদিগের বাটীতে দুর্গাপূজা ও দোল হইত। বাটীতে পাল, সতরঞ্চ প্রভৃতি সিন্ধুকের ভিতরে থাকিত। একবার চাকরদিগের অনবধানতাবশতঃ বর্ষাকালে সিন্ধুকের ভিতর উই প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত নষ্ট করিয়াছিল। পীতাম্বর সরকার মহাশয় আমার খুল্লপিতামহ [ঈশ্বরচন্দ্র দেব (দে) ; তাঁহার মৃত্যু ১৮৬৭ খৃঃ] মহাশয়কে কলিকাতায় পত্র লিখিলেন যে মহামায়া (দুর্গা) তাঁহাকে স্বপ্নে আদেশ করিয়াছেন যে তাঁহার (দেবীর) এবার নূতন আসবাবপত্র আবশ্যক এবং তিনি পুরাতন জিনিষ ব্যবহার করিবেন না। আমার খুল্লপিতামহ সমস্ত বুঝিলেন এবং আবশ্যকীয় আসবাব নূতন প্রস্তুত করিতে অনুমতি দিলেন।

আমার খুল্লপিতামহের পুত্রকন্যা ছিল না। আমার পিতা তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্র এবং বাটীর ভিতর একমাত্র পুত্র-সন্তান ছিলেন। আমার খুল্লপিতামহ প্রথমে Union Bankএ চাকরী করিতেন এবং এই ব্যাঙ্ক উঠিয়া যাইলে কোম্পানীর কাগজ এবং সেয়ারের দালালি করিয়া অনেক

টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে বার্ষিক টাকা ও পঞ্জিকা দানে, গ্রামের বারোয়ারীপূজার চাঁদা বাবদে. গ্রামের দরিদ্রদিগকে পূজার সময় বস্ত্রবিতরণে এবং পূজায় ও দোলে অনেক টাকা ব্যয় করিতেন। অর্থসঞ্চয়ের দিকে তাঁহার একেবারেই দৃষ্টি ছিল না। আমার পিতাঠাকুর উপার্জ্জন ও ব্যয়-বিষয়ে তাঁহার খুল্লতাতকে অনুকরণ করিয়াছিলেন ; উপরন্তু তিনি বাটীতে একটী Charitable Dispensary করিয়া বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ এবং কাঁচরাপাড়ার এণ্ট্রান্স্ স্কুলে অন্ততঃ দুই বৎসর মাসিক দেড়শত টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি চারি পাঁচজন ছাত্রের স্কুলের মাসিক বেতন দিতেন। আমাদের কলিকাতার বাসায় দুই তিনজন কাঁচরাপাড়ার লোক সর্ব্বদাই বাস করিতেন। পাঠক মনে করিবেন না যে আমাদের গ্রামে কেবল আমার পিতা ও আমার পিতামহ এরূপ দানশীল ছিলেন। আরও এরূপ বদান্য লোক কাঁচরাপাড়াতে সে সময়ে দৃষ্ট হইত।

সে সময়ে হিন্দু ও মুসলমানের ভিতর কোন বিবাদ ছিল না। আমার খুল্লপিতামহ দুইবার মুসলমানপাড়ার সমস্ত মুসলমানকে দোল এবং পূজার সময়ে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়া ছিলেন। তিনি ঘৃত, ময়দা ইত্যাদি আমাদের গৃহের সন্নিহিত বাগানে আনাইয়া দিয়াছিলেন। মুসলমানেরা নিজে রন্ধনের ও পরিবেশনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমাদের বাটীতে ফকির সেখ, সাগর, প্রহ্লাদ ও মুলুকচাঁদ সেখ নামে চারিজন বিশ্বস্ত মুসলমান ভৃত্য বিভিন্ন সময়ে ছিলেন। তখন অনেক মুসলমানের হিন্দু নাম ছিল। পূজা ও দোলের সময় ইঁহাদের পুত্রকন্যা নূতন বস্ত্র পরিধানকরিয়া আমাদিগের বাটীতে ঠাকুর দেখিতে আসিতেন।

বিবাহসভাতে ইংরাজীশিক্ষিত বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রী যুবকদিগের

মধ্যে বাগ্‌যুদ্ধ প্রায়ই হইত। আমরা বৃদ্ধ লোকদিগের নিকট শুনিয়াছি যে, তাঁহাদের যৌবনকালে বাইবেল হইতে Nebuchadrezzar (King of Babylon—Jeremiah-39), Jerusalem, peradventure সদৃশ কঠিন বানান বিবাহআসরে জিজ্ঞাসা করা হইত। সে সময়ে কাঁচরাপাড়ায় কোন ইংরাজী স্কুল ছিল না এবং ভাগীরথীর পরপারে বাঁশবেড়িয়ার সন্নিকট শিবপুরে ডাফ্ (Duff) সাহেবের একটী স্কুল ছিল। এই বিদ্যালয়ে অন্য পুস্তকের সহিত Bibleও পড়া হইত। সেইজন্য তদানীন্তন শিক্ষিত ব্যক্তি বাইবেলে অভিজ্ঞ ছিলেন।

আমাদের সময়ে কাঁচরাপাড়ার গঙ্গারধারে একটী H. E. School স্থাপিত হইয়াছিল। আমি যখন পাঠশালায় পাঠ শেষ করিয়া সাত বৎসর বয়সে অর্থাৎ ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে আমার ইংরাজী শিক্ষা এই স্কুলে আরম্ভ করি, তখন শ্রীহরিচরণ মুখোপাধ্যায় (B. A.-plucked) হেডমাষ্টার ছিলেন। আমার পিতা শ্যামাচরণ দে ইহার সেক্রেটারী ছিলেন। হরিচরণ বাবু আমাদের বাগানবাটীতে বাস করিতেন। গ্রামের লোক তাঁহার চরিত্র-সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া আমার পিতাকে তাঁহাকে ছাড়াইয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। আমার পিতা অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন এবং তাঁহার স্থলে হালিসহর বল্‌দেঘাটার শ্রীতারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, মহাশয়কে নিযুক্ত করিলেন। কাঁচরাপাড়া-ত্যাগ করিবার পরে হরিচরণ বাবুর অপর কোন স্থানে চাকরীর যাহাতে সুবিধা হয়, এই জন্য আমার পিতা একটী ভাল certificate তাঁহাকে দিলেন। হরিবাবু সেই certificate লইয়া গ্যারেট সাহেব Inspector মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বলিলেন যে তাঁহার কোন দোষ ছিল না, তত্রাচ Secretary তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছেন, এবং তাঁহার দোষশূন্যতা প্রমাণ করিবার জন্য এই certificate প্রদর্শন করিলেন। গ্যারেট

সাহেব আমার পিতাকে অফিসে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তিনি যাইতে অস্বীকৃত হইলেন। সাহেব রাগ করিয়া **grant-in-aid** বন্ধ করিলেন। আমার পিতা প্রায় মাসিক একশত টাকা করিয়া সাহায্য করিতেন। ইহার পর হইতে তিনি প্রায় দেড়শত টাকা করিয়া মাসে স্কুলকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। তাহার পর স্কুলের **grant-in-aid** পুনরায় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইলে, তিনি সেক্রেটারীর কার্য্য ছাড়িয়া দিলেন। হরিচরণ বাবু আমার স্কুলে প্রবেশের পর একবৎসর বোধহয় ছিলেন। কিন্তু তারাপ্রসন্ন বাবুর নিকট আমি অনেকদিন শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম। যখন আমি ঢাকা কলেজ হইতে কৃষ্ণনগর কলেজে বদলি হইয়া আসিয়াছিলাম, হরিচরণ বাবুর সহিত আমার কৃষ্ণনগরে মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ হইত। তিনি তখন স্কুলসমূহের **Subinspector** ছিলেন। দেখা হইলেই তিনি আমাদের বাটীর কুশল জিজ্ঞাসাকরিতেন। তারাপ্রসন্ন বাবু B. L. পাশ করিয়া তমলুকের উকিল হইয়াছিলেন।

আমার সহপাঠী ছিলেন হালিসহর-নিবাসী শ্রীবেণীমাধব ভট্টাচার্য্য (ব্যারাকপুর সরকারী স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার), শ্রীনীলমণি দে (ষ্টেট্‌স্‌ম্যান সংবাদপত্রের ভূতপূর্ব্ব কেরাণী, এক্ষণে আমার প্রতিবেশী) এবং গোলাবাড়ীর উমাকান্ত মিত্র (নৈহাটীর চিকিৎসক)। আমাদের নীচের শ্রেণীতে হালিসহর স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীআশুতোষ মিত্র (বি-এ) পড়িতেন। আমাদের পাঁচ-ছয় শ্রেণী উপরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়, তাঁহার মাতুল যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় (পরে বাঙ্গালার ছোটলাটের দপ্তরের বিশিষ্ট কর্ম্মচারী), আমার মাতুল স্বর্গীয় কৃষ্ণচৈতন্য মিত্র, কবিরাজ জনরঞ্জন মল্লিক প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতেন।

তখন Entrance Class ছিল First Class, Infant Class ছিল Ninth Class। এক্ষণে Matriculation Class হইয়াছে Tenth Class এবং Infant Class হইয়াছে First Class। এরূপ নাম বিপর্য্যয়ের সহিত শিক্ষাবিপর্য্যয়ের কিছু সম্বন্ধ আছে কিনা সুধীগণের বিবেচ্য। এক্ষণে বৎসর বৎসর পাঠ্যপুস্তক পরিবর্ত্তিত হয়, তাহাতে পুস্তকপ্রণেতাদিগের এবং পুস্তক বিক্রেতাদিগের অনেক সুবিধা হয় বটে এবং হেডমাষ্টার মহাশয়-দিগেয় এবং Text-book Committeeর সভ্যদিগের সম্মান (prestige) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু শিক্ষার্থীদিগের এবং তাঁহাদের অভিভাবক-দিগের প্রায় প্রাণান্ত হইতে হয়। কোন কোন পুস্তকের চতুর্থাংশ পাঠ সমাপ্ত না হইতে হইতে তাহাকে ত্যাগকরা হয় এবং নূতন পুস্তক কিনিতে অভিভাবকগণকে বাধ্য করা হয়। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে অন্যান্য বিষয়ে (subject) কি হইয়াছে বলিতে পারি না, কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার যে অবনতি হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। পূর্ব্বে Entrance পাশ করিয়া যাঁহারা কলেজে আসিতেন, তাঁহারা সাধারণতঃ এক্ষণকার Matriculation পাশ ছাত্র অপেক্ষা ইংরাজী অনেক ভাল শিখিতেন।

সে সময়ে বৃদ্ধ ভদ্রলোকগুলির একটী অভ্যাস ছিল, 'বংশ-পরিচয়' জিজ্ঞাসা করা; অন্ততঃ প্রপিতামহের নাম না বলিতে পারিলে তাঁহা-দিগের নিকট উপহাসাস্পদ হইতে হইত। এখনকার 'সনাতনধর্ম্মের' পৃষ্ঠ-পোষকদিগের ন্যায় তাঁহারা কোন বিষয়ে সনাতনী প্রথা পরিবর্ত্তন করিতে চাহিতেন না। লেখকের স্মরণ আছে যে তিনি 'Acid'কে এসিড না লিখিয়া 'য়্যাসিড' লিখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার গ্রামের এক ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহাকে সাতিশয় তিরস্কার করিয়াছিলেন; তিরস্কারের কারণ এই যে ব্রহ্মমুখনিঃসৃত বর্ণাবলী আমি বিকৃত করিবার সাহস করিয়াছিলাম।

কৃষ্ণদেব রায়ের মন্দিরের সন্নিহিত বাজারটীতে তখন অনেক স্থায়ী দোকান ছিল। চাল, ডাল, ময়দা, ঘৃত, তৈল প্রভৃতির দোকানের মধ্যে শ্রীসাতকড়ি পাল এবং রাখালচন্দ্র পালের দোকানই শ্রেষ্ঠ ছিল। উভয় পাল মহাশয়ের বাসস্থান মল্লিকের বাগে ছিল। রাখাল পাল মহাশয় পরে জমিদারী ক্রয়করিয়াছিলেন এবং কাঁচরাপাড়া ষ্টেশানের নিকট ভাড়া দিবার জন্য একখানি বড় বাড়ী নির্ম্মাণকরিয়াছিলেন। মিষ্টান্ন-বিক্রেতাদিগের মধ্যে চিন্তামণি মজুমদার মহাশয়, মশলাবিক্রেতাদিগের মধ্যে নবীনচন্দ্র দত্ত মহাশয় এবং বস্ত্রবিক্রেতাদিগের মধ্যে রাজেন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয় বিখ্যাত ছিলেন। কাঁচরাপাড়ার সহিত একটী নূতন প্রকারের মিষ্টান্নের নাম বিজড়িত। এই মিষ্টান্নকে 'চাঁপা' বলে। ইহা ধনেখালির খইচূরের এবং জয়নগরের মোয়ার সদৃশ। ইহা খই বাটিয়া চিনি, মশলা ও গব্যঘৃতের মিশ্রণে এখনও প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বে ইহার প্রণালী আরও ভাল ছিল। প্রত্যহ প্রাতে কাঁচরাপাড়ার বাজারে তরকারি, মাছ এবং অন্যান্য দ্রব্যের অনেক অস্থায়ী দোকান বসিত। অন্যগ্রাম হইতে বহুলোক কাঁচরাপাড়ার বাজারে জিনিষ কিনিবার জন্য আসিতেন।

আমার পিতাঠাকুর কলিকাতা হইতে বাটী আসিলে যাঁহারা প্রত্যহ আমাদিগের বৈঠকখানাতে আসিতেন তাঁহারা ব্যতীত অনেক ভদ্র-লোকের সমাগম হইত। সন্ধ্যাকালে গানবাজনা হইত। আমাদের বাটীতে ঢোল, খোল, বাঁয়া, তবলা, তানপুরা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র মজুত থাকিত। গান-বাজনা তখন অনেক ভদ্রলোকের বৈঠকখানাতে প্রত্যহ হইত। যোগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার রায় চৌধুরী প্রভৃতি ভদ্রলোকেরা সঙ্গীত-অভিজ্ঞ ছিলেন।

সে সময়ে বিজয়া-দশমীর দিনে অনেকে নৌকাভাড়া করিয়া ভাগী-

রথীতে প্রতিমাবিসর্জ্জন দেখিতে যাইতেন। ত্রিবেণী এবং বংশবাটী (বাঁশবেড়ে) হইতে কাঁচরাপাড়া এবং হালিসহর পর্য্যন্ত ভাগীরথীবক্ষ সুসজ্জিত তরণীর দ্বারা শোভিত হইত। দুইখানা নৌকার উপরে একখানা দুর্গাপ্রতিমা স্থাপিত হইত। প্রতিমাবিসর্জ্জনের পর প্রতি-বেশিগণ আমাদের বৈঠকখানাতে একত্রিত হইতেন। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গান, বাজনা হইত। নানাপ্রকার মিষ্টান্ন, সিদ্ধি, বেলপাতা, আলতাগোলা রং এবং লেখনী প্রস্তুত থাকিত। কেহ কেহ অতিরিক্ত সিদ্ধিপান করিয়া মত্ততা প্রকাশ করিতেন।

আমাদের গ্রামে তখন দুর্গাপূজা, দোল এবং রথের সময়ে অনেক লোকের আগমন হইত। প্রবাসী অধিবাসী ব্যতীত অনেক বিদেশী লোক আসিয়া এই গ্রামকে জনবহুল করিতেন। আমাদের বাল্য-কালেও গ্রামের অনেক অবনতি হইয়াছিল। চল্লিশ, পঞ্চাশখানা দুর্গা-প্রতিমা আমাদের সময়ে সাত আটখানায় পরিণত হইয়াছিল। আমাদের বাটীতে কেবল একবার দুর্গাপূজার কথা আমার মনে আছে। কিন্তু প্রতিবৎসর আমাদের বাটীতে, কার্ত্তিক পূজা ও আমার পিতামহ-স্থাপিত শ্রীধরঠাকুরের দোল হইত। দোল বিশেষ জাঁকজমকের সহিত হইত। কৃষ্ণদেব রায়ের, আমাদের বাটীর, রাজেন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয়ের এবং বিশেষতঃ ঘোষপাড়ার দোলের জন্য কাঁচরাপাড়ায় অনেক লোকের সমাগম হইত। ঘোষপাড়ায় যাইতে হইলে কাঁচরাপাড়ার মধ্য দিয়া গমন করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ ঘোষপাড়ার অনেক যাত্রী ফিরিবার সময়ে রাজেন্দ্র বাবুর বাটী হইয়া কৃষ্ণদেব রায় সন্দর্শনকরিয়া তাঁহাদের নিজ নিজ গৃহে প্রত্যা-বর্ত্তন করিতেন। রথের সময়ে ঘোষপাড়ায় কিম্বা রাজেন্দ্র বাবুর বাটীতে তেমন লোক আসিতেন না। কিন্তু কৃষ্ণদেব রায়ের প্রথম রথে কাঁচরা-পাড়ার নিকটস্থ বিভিন্নগ্রাম হইতে অনেক যাত্রীর সমাবেশ হইত এবং

নানাপ্রকার দোকানে যাত্রীদিগের সাম্বৎসরিক আবশ্যকীয় দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় হইত। কাঁচরাপাড়ার কৃষ্ণদেব রায়ের বর্ত্তমান সুদৃঢ় এবং সুদৃশ্য মন্দিরের জন্য এই গ্রাম কলিকাতার মল্লিক মহাশয়দিগের নিকট ঋণী। হুগলীর নিকটস্থ সাগঞ্জের নন্দীমহাশয়েরা (যাঁহারা পূর্ব্বে কাঁচরাপাড়ার সন্নিহিত কেউটে গ্রামে বাস করিতেন) কৃষ্ণদেব রায়কে একটী সুন্দর রথ প্রদানকরিয়াছিলেন এবং এই কাষ্ঠের রথ ভস্মীভূত হইলে তাঁহারা লৌহের একটী ক্ষুদ্রতর রথ প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন। নন্দীমহাশয়েরা ভাগীরথীর অপর পারে সাগঞ্জে বাস করিলেও তাঁহাদের পূর্ব্ব বাসস্থানে অর্থাৎ কেউটে গ্রামে দুর্গাপূজা করিতেন। এই দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জ্জনের সময় অন্য পথ দিয়া লইয়া যাইলেও বিসর্জ্জন করিয়া কেউটে ফিরিবার সময়ে বাদকেরা যখন বিসর্জ্জনের বাদ্য আমাদের বাটীর নিকট দিয়া বাজাইয়া যাইতেন, তখন বিজয়া-সম্মিলনের নিমিত্ত প্রতিবেশি-সমাগমে, গীত, বাদ্য, পান-ভোজন, অভিনন্দন, প্রত্যভিনন্দনের আনন্দ-কোলাহলে আমাদিগের গৃহ মুখরিত হইলেও, এই বিসর্জ্জনের বাদ্য অতীতবর্ষে পরলোকগত আত্মীয় ও বন্ধুর স্মৃতি জাগরূক করাইয়া এবং জীবনের বর্ষব্যাপী অপব্যবহার কথা স্মরণকরাইয়া আমাদিগের নিরাবিল আনন্দকে বিষাদের ছায়ায় আবৃত করিত।

পয়তাল্লিশ বৎসরের ভিতরে কাঁচরাপাড়া-গ্রামের লোকসংখ্যা কিরূপ হ্রাস পাইয়াছে, তাহার একটী তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

পয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে—

(১) চৌধুরীপাড়া—

শ্রীবামাচরণ রায় চৌধুরী ; শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী (শিক্ষক); শ্রীদাশরথি রায় চৌধুরী। শ্রীখগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (চৌধুরীদিগের দৌহিত্র এবং ই, বি, রেলের কেরাণী)। দাশরথি রায় চৌধুরীর

ভগ্নীপতি শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার দুই পুত্র। শ্রীরাম-কৃষ্ণ রায় চৌধুরী এবং তাঁহার দুই পুত্র—আশুতোষ, (ই, বি, রেলের Goods-clerk) এবং পরেশনাথ (Post-master)। শ্রীঅক্ষয়কুমার রায় চৌধুরী ; শ্রীনবীনচন্দ্র রায় চৌধুরী এবং তাঁহার দুই পুত্র পাচকড়ি ও তিনকড়ি (উভয়েই ই, আই, রেলের কেরাণী) এবং পাচকড়ি বাবুর তিন পুত্র, নগেন্দ্র, যতীন্দ্র ও ধীরেন্দ্র। শ্রীপ্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী (গড্ডার সেরেস্তাদার) এবং তাঁহার পাচ পুত্র। শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার পুত্র প্রফুল্লকুমার (উভয়েই মধ্য-প্রদেশের কেরাণী)। শ্রীনসীরাম বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার ভাগিনেয়—হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (কাঁচরাপাড়ার লোকো আফিসের কেরাণী), এবং হরিশ বাবুর ভাগিনেয়—নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহাব পুত্র পশুপতি। শ্রীনন্দলাল মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার দুই পুত্র প্রিয়নাথ এবং ভূতনাথ। শ্রীচূণীলাল সরকার (কায়স্থ, জাহাজের সরকার)। শ্রীমথুর রায় চৌধুরীর জামাতা, রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (আদি নিবাস বলাগড়) এবং রাজনারায়ণ বাবুর তিন পুত্র দাশরথি, বটকৃষ্ণ ও সত্যচরণ।

শ্রীরাজচন্দ্র ঘোষ (গোয়ালা), বনমালী ঘোষ, শ্রীমন্ত ঘোষ, দ্বারকানাথ ঘোষ, হরিচরণ ঘোষ, ছিরু বিশ্বাস, নবীন বিশ্বাস, নন্দ ঘোষ (গোয়ালা) রসময় ঘোষ, করুণা ঘোষ, রসিক ঘোষ, দীননাথ ঘোষ ; রামকুমার ঘোষ এবং তাঁহার চারিপুত্র—জ্যেষ্ঠ সিদ্ধেশ্বর (রায়গড়ের রাজার ওভারশিয়ার) মধ্যম যজ্ঞেশ্বর (উজ্জয়িনীর বড় মিস্ত্রী) ; ভোলানাথ পাইক এবং তাঁহার পুত্র—সত্যচরণ ; ভুবন কুম্ভকার এবং তাঁহার পুত্র ; গোবিন্দ কাপালি ও তাঁহার ভ্রাতা রঘুনাথ কাপালি (উভয়েই বিখ্যাত রাজমিস্ত্রী) ; কেদার কাপালি, গোপাল সেখ ও আব্বাস সেখ।

উপরিলিখিত ব্যক্তি ব্যতীত চৌধুরীপাড়ার অন্তর্গত বাগ্দীপাড়াতে অন্ততঃ ১৬ ঘর বাগ্দীর বাস ছিল।

(২) মাঝের পাড়া—

শ্রীচন্দ্রকুমার সরকার (কায়স্থ) এবং তাঁহার পুত্র এককড়ি (ভারত-গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী)। শ্রীমতী নৃত্যকালী দেবী। শ্রীভোলানাথ স্বর্ণকার। কবিরাজ বিপিনবিহারী মল্লিক এবং তাঁহার ভ্রাতা হরিচরণ (আবগারীর সাব্-ইনস্পেক্টর)। বিপিন বাবুর দুই পুত্র—জন্নরঞ্জন (কবিরাজ) এবং মনোরঞ্জন (কবিরাজ)। শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় এবং তাঁহার তিন ভ্রাতা—মধ্যম যোগেশ, কনিষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্র (ডাক্তার)। ৺চন্দ্র সরকার মহাশয়ের বিধবা (সরকার বৌ)। শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় (বৈদ্য Post-master)। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বাটীতে—ষষ্ঠী কুম্ভকার এবং তাঁহার দুই ভ্রাতা। ননী নাপিত এবং তাঁহার ভ্রাতা বিষ্ণু এবং বিষ্ণুর পুত্র। শ্রীশ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য এবং তাঁহার ভ্রাতা শ্রীরাম। শ্রীবিষ্ণুচরণ রায়। শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং তাঁহার পুত্র। হাজারিবাগ প্রবাসী পুলিশ ইনস্পেক্টর নবকৃষ্ণ রায়ের বাটীতে শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার দুই পুত্র। আমার স্মরণ আছে একবার নবকৃষ্ণ বাবু ও তাঁহার দুই পুত্র, একজন উকীল এবং একজন মুন্সেফ কাঁচড়াপাড়ায় আসিয়াছিলেন। আজমীর-প্রবাসী শ্রীহরিমোহন রায় (সরকারী কর্ম্মচারী) এবং তাঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ মনোমোহন রায় বি, এ, (সরকারী কর্ম্মচারী) এবং মনোমোহন বাবুর কনিষ্ঠ, মাঝে মাঝে আসিয়া কাঁচরাপাড়ায় বাস করিতেন। শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন; যজ্ঞেশ্বর ন্যায়রত্ন এবং তাঁহার পুত্র পণ্ডিত নিরহরি ভট্টাচার্য্য; হরিচরণ সরকার এবং তাঁহার পুত্র (কায়স্থ); গুইরাম যোগী; হরিচরণ সেন, যাঁহার বাটী পরে প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য ক্রয়করিয়াছিলেন।

শ্রীগোপালচন্দ্র বৈষ্ণব এবং তাঁহার পুত্র। শ্রীহীরালাল মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার তিন পুত্র, (তিনজনই কেরাণী)। হীরালাল বাবুর তিন ভ্রাতা—শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (উচ্চ শ্রেণীর পোষ্ট-মাষ্টার এবং কাঁচরাপাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট), এবং তাঁহার চারি পুত্র—জ্যেষ্ঠ নৃত্যলাল (ডাক্তার)। তুলসীর মাতা (বিধবা ব্রাহ্মণী)। শ্রীমতী স্বর্ণ দাসী ॥ শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য এবং তাঁহার দুই পুত্র; তাঁহার ভ্রাতা বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য (পতন); সারদা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার তিন পুত্র যোগেন্দ্র, লালবিহারী ও নবকুমার (ন্যানা); শিবচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার পুত্র। বিখ্যাত সরকারী ডাক্তার—শ্রীসূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া-প্রবাসী); কালাচাঁদ ঘোষ। শ্রীশ্যামাচরণ দে (কায়স্থ—শেয়ার এবং কোম্পানীর কাগজের দালাল এবং কাঁচরাপাড়া স্কুলের সেক্রেটারী) এবং তাঁহার পুত্র - সতীশচন্দ্র,[১] ব্রজ কর্ম্মকার, শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধবা (বড় গিন্নী, ইনি ঈশান অধিকারী মহাশয়ের ভগ্নী ছিলেন)। শ্রীনাথ বাবুর ভাগিনেয়—গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার পুত্র। শ্রীউমেশচন্দ্র শিকদার এবং তাঁহার সম্বন্ধে দৌহিত্র—শ্রীসতীশচন্দ্র রায় (এম-এ, পরে কলিকাতা

১। এম্-এ- বি-এল, ঢাকা কলেজের ১৮৯২ হইতে ৯৮, কৃষ্ণনগর কলেজের ১৮৯৮ হইতে ১৯০১, হুগলি কলেজের ১৯০১ হইতে ১৯০২ এবং কৃষ্ণনগর কলেজের (১৯০২-৯) ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন, এই কলেজের অধ্যক্ষ ১৯০৯ হইতে ১৯১৬, প্রেসিডেন্সী কলেজের (১৯১৬) ঢাকা কলেজের (১৯১৬ হইতে ১৯) এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের (১৯১৯-২১) ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন, আই-ই-এস্-এ ১৯২১ খৃঃ কায়েমী হইয়া হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ ও সহকারী অধ্যক্ষ ১৯২৬ পর্য্যন্ত থাকিয়া সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানে হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজের অধ্যক্ষতা (১৯২৮ হইতে করিতেছেন। ১৮৯৫ হইতে ১৯৩১ পর্য্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক ছিলেন। ইনি ইংরাজীতে Kalidasa and Vikramaditya এবং Stray thoughts

বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক)।[১] সতীশ বাবুর ভগ্নীপতি শ্রীহীরালাল মুখোপাধ্যায়ের তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ হরিচরণ (এম-এ, পরে কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কলেক্টর), মধ্যম পান্নালাল (এম-এ, উত্তরপাড়া কলেজের অধ্যাপক) এবং কনিষ্ঠ নন্দলাল। শ্রীমতী প্রসন্ন গোয়ালিনী। শ্রীহরিচরণ ঘোষ (গোয়ালা) এবং তাঁহার মাতা। শ্রীমতী কুসুমকুমারী দেবী এবং তাঁহার মাতা। শ্রীকালিপ্রসন্ন ঘটক (ব্রাহ্মণ) এবং তাঁহার এক পুত্র; কালি বাবুর ভ্রাতা তারাপ্রসন্ন; কালি বাবুর জ্ঞাতিভ্রাতা আশুতোষ (জামালপুরের রেল কর্ম্মচারী) আশু বাবুর দুই পুত্র (বর্ত্তমানে জামালপুর-প্রবাসী) যোগেশচন্দ্র এবং হরিধন। কালী বাবুর আত্মীয় শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (মতিহারীর সেরেস্তাদার); গোপাল বাবুর পুত্র নগেন্দ্রনাথ (ছাপরার আদালতের কর্ম্মচারী), গোপাল বাবুর ভ্রাতা যাদবচন্দ্র (কালেক্টরীর একাউন্টেণ্ট), যাদব বাবুর দুই পুত্র—সতীশ (Insurance Agent) এবং যতীশ (বর্ত্তমানে শালিখা-প্রবাসী, ম্যাডান কোম্পানীর বায়স্কোপ-পরিচালক)। কালিপ্রসন্ন ঘটকের ভগ্নীপতি শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ই, বি, রেলের কেরাণী) এবং তাঁহার দুই পুত্র নগেন্দ্রনাথ এবং নরেন্দ্রনাথ। শ্রীসিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য্য (ই, বি, রেলের মিস্ত্রী) এবং তাঁহার চারি পুত্র। শ্রীপ্যারীলাল ঘোষ (গোয়ালা) এবং তাঁহার দুই পুত্র—গোবর্দ্ধন এবং

এবং বাঙ্গালাতে রামায়ণের প্রকৃত কথা এবং গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী রচনা করিয়াছেন।

১। ইনি এম্-এ পাশ করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের আয়-ব্যয় বিভাগে 'Finance), এবং কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ডেপুটী একাউণ্টেণ্ট, ডেপুটী লাইসেন্স অফিসার ও ডেপুটী এক্সিকিউটিভ অফিসারের কার্য্য করিয়াছেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা এবং পরীক্ষা কার্য্য করিতেছেন এবং Permanent Settlement (চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত) ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইনি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইনি এক্ষণে (১৯৩৩) নৈহাটীতে বাস করিতেছেন।

অমূল্যধন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, তাঁহার পুত্র রাজেন্দ্রকুমার; তাঁহার তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ যোগেন্দ্র এবং মধ্যম খগেন্দ্র; ইঁহারা বস্ত্র-বিক্রেতা এবং কাঁচরাপাড়া কর্ত্তাভজা-সম্প্রদায়ের গুরু।

কবিরাজ দুর্গানন্দ দাশগুপ্তের বাটীতে শ্রীহারাণচন্দ্র কর্ম্মকার ও তাঁহার তিন ভ্রাতুষ্পুত্র। শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ (গোয়ালা); কৈলাসচন্দ্র ঘোষ (বেড়েল); শয়নারায়ণ ঘোষ, গোপালচন্দ্র ঘোষ, পরাণচন্দ্র ঘোষ, রামচন্দ্র ঘোষ, ননী ঘোষ, মাখন ঘোষ ও কালী ঘোষ (মাঝি)। শ্রীমতী কামিনী দাসী (গোয়ালিনী)। শ্রীকেদারনাথ প্রামাণিক এবং তাঁহার তিন পুত্র। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায় (দাশগুপ্ত ষ্টেশান-মাষ্টার) এবং তাঁহার চারি ভ্রাতুষ্পুত্র—শিবচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ, বিপিন-বিহারী (Ralli Brothers) এবং হরিদাস; (বিপিন বাবু ব্যতীত আর সকলেই সরকারী কর্ম্মচারী); যোগেন্দ্র বাবুর ভ্রাতা হীরালাল (ষ্টেশান-মাষ্টার), মহানন্দ (রেলওয়ে কর্ম্মচারী) এবং রাজকৃষ্ণ (ষ্টেশান মাষ্টার); মহানন্দ বাবুর পুত্র গোপালচন্দ্র; রাজকৃষ্ণ রায়ের চারি পুত্র—মধ্যম শরদিন্দু (District Engineer, Birbhum)। শ্রীনারায়ণ সর্দ্দার (হাড়ি) ও তাঁহার দুই পুত্র। শ্রীমতী শ্যামাদাসী (হাড়ি)। শ্রীনবীনচন্দ্র রায় (উপাধি মুন্সী, বৈদ্য, কাঁচরাপাড়া রেলের কারখানার প্রথম বড় বাবু); তাঁহার দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ হারাণচন্দ্র এম-এ; ইঁহারা কলিকাতায় থাকিতেন এবং কদাচিৎ বাটী আসিতেন। নবীন বাবুর ভ্রাতা কবিরাজ কৈলাসচন্দ্র এবং তাঁহার চারি পুত্র—বামাচরণ, ভগবতী-চরণ, রাধাজীবন এবং কনিষ্ঠ শ্রী ব্রজবল্লভ (কবিরাজ এবং কবি)। শ্রীদ্বারকা-নাথ সূত্রধর (ডোম) এবং তাঁহার তিন ভ্রাতা—হিরু, বেণী এবং মতি। শ্রীমতী চণ্ডী এবং কামিনী দাসী (গোয়ালিনী)। শ্রীমতী সারদা দাসী এবং তাঁহার মাতা (কায়স্থ)। নীলমণি কায়স্থ; হরি কায়স্থের মাতা।

শ্রীমধুস্থদন সেনগুপ্ত এবং তাঁহার দুই পুত্র। মধু বাবুর কনিষ্ঠ শশিভূষণ মাঝে মাঝে কাঁচরাপাড়ায় আসিতেন কিন্তু তাঁহার পরিবার-বর্গ এখানে থাকিতেন না। শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (রেলের কেরাণী) এবং তাঁহার তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ চারু (কন্‌ট্র্যাক্‌টর), এবং মধ্যম—কেশব। শ্রীগোপালচন্দ্র মজুমদার (বৈদ্য ; ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী) এবং তাঁহার দুই পুত্র। শ্রীরাখালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। শ্রীমতিলাল মজুম-দার (বৈদ্য) এবং তাঁহার দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ যতীন্দ্র (উকিল)। শ্রীগোপালচন্দ্র দাশগুপ্ত (বৈদ্য, কাঁচরাপাড়া কারখানার কর্ম্মচারী এবং স্কুলের সেক্রেটারী); ইঁহার পুত্র জয়কৃষ্ণ (সরকারী ডাক্তার)। গোপাল বাবুর ভ্রাতা—গিরীশচন্দ্র (সরকারী কর্ম্মচারী) এবং ইঁহার দুই পুত্র। কবিরাজ ব্রজেন্দ্রকুমার রায় (বৈদ্য) এবং তাঁহার চারি পুত্র—রাজেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ এবং নৃপেন্দ্রনাথ—সকলেই কবিরাজ। শ্রীশশিভূষণ রায় (বৈদ্য কবিরাজ এবং লেখক) তাঁহার পুত্রগণ কবিরাজ গিরিজাভূষণ, মণীন্দ্র (কবিরাজ), ফণীন্দ্র (Post master) ও হেমচন্দ্র (পোলিশ কর্ম্মচারী)। শ্রীবিধুভূষণ রায় (বৈদ্য) এবং তাঁহার দুই ভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র (কবিরাজ) ডাক্তার নবীনচন্দ্র গুপ্তের চারি পুত্র—নন্দলাল, অমৃতলাল (চিত্রকর) রঙ্গলাল (ডাক্তার) ও ভোলানাথ (ডাক্তার) মাঝে মাঝে কাঁচরা-পাড়ায় থাকিতেন। ডাক্তার চণ্ডীচরণ দাশগুপ্ত। শ্রীনবীনচন্দ্র রায় (বৈদ্য) এবং তাঁহার পুত্র—তারকনাথ (ডাক্তার)। শ্রীগোপালচন্দ্র মজুমদার (বৈদ্য, শিক্ষক) এবং তাঁহার পুত্র প্রবোধ। শ্রীদীননাথ ও দ্বারকানাথ রায় (বৈদ্য)। শ্রীমাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁহার ভ্রাতা নবকুমার।

শ্রীসাধন ঘোষ (গোয়ালা)। শ্রীভৈরব ঘোষ। শ্রীমতী ব্রহ্মদাসী।

শ্রীমতী শিবু বাঙ্গালিনী। শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, তাঁহার ভ্রাতা মহেশচন্দ্র এবং মহেশ বাবুর পুত্র আশুতোষ। শ্রীশ্যামাচরণ হালদার। শ্রীনগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার তিন পুত্র, —যতীশ, কালী ও খগেন্দ্র। শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন (বৈদ্য, উপাধি ডাক্তার—কাঁচরাপাড়া কারখানার বড় বাবু) এবং তাঁহার তিন পুত্র—স্বরেন্দ্র, নলিনবিহারী এবং উপেন্দ্র। শ্রীসূর্য্যকুমার সেন, (ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট) এবং তাঁহার দুই ভ্রাতা—অক্ষয়কুমায় (জ্যেষ্ঠ, কবিরাজ) এবং কনিষ্ঠ চন্দ্রকুমার (ডাক্তার)। সূর্য্য বাবুর তিন পুত্র পাঁচু, বিজয় ও সরোজ। সূর্য্য বাবুর ভগ্নীপতি—বক্কেশ্বর গুপ্ত, বক্কেশ্বর বাবুর চারি পুত্র—সতীশ (সাব-রেজিষ্ট্রার), ক্ষিতীশ (ইঞ্জিনিয়ার), হরিদাস এবং নরেশ। শ্রীউমেশচন্দ্র প্রামাণিক (বিখ্যাত গুরু মহাশয়) এবং তাঁহার দুই পুত্র। শ্রীবেণীমাধব শূর। শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য্য, তাঁহার ভ্রাতা প্রসন্নকুমার, প্রসন্ন বাবুর তিন পুত্র—পঞ্চানন, বঙ্কু-বিহারী এবং হরলাল (লালু)।

ইহা ব্যতীত এই পাড়ায় প্রায় কুড়ি ঘর বাগ্দী, ষোল ঘর কৈবর্ত্ত এবং এক ঘর মুসলমান বাস করিতেন।

(৩) মুসলমানপাড়া—

এই পাড়াতে প্রায় ত্রিশ ঘর মুসলমান বাস করিতেন।

(৪) মালিপাড়া—

শ্রীঅম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য এবং তাঁহার চারি পুত্র—শিতিকণ্ঠ, ললিত-কণ্ঠ, বাণীকণ্ঠ এবং মণিকণ্ঠ। শ্রীমাতঙ্গিনী ভট্টাচার্য্য। শ্রীসাতকড়ি ভট্টাচার্য্য এবং তাঁহার দুই ভ্রাতা—গিরীশচন্দ্র এবং ভগবতীচরণ, ভগবতী বাবুর দুই পুত্র—পঞ্চানন এবং শরৎ। শ্রীভোলানাথ স্বর্ণ-কার এবং তাঁহার দুই পুত্র। শ্রীপঞ্চানন গাঙ্গুলী। কবিরাজ উপেন্দ্র-

নাথ বরাট এবং তাঁহার পুত্র সনৎকুমার (সরকারী ডাক্তার)। শ্রীজগদীশনাথ রায়, (ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশ স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট), ইঁহার চারি পুত্র—জ্যেষ্ঠ—রাধানাথ রায়, এম-এ, (কলিকাতার রেজিষ্ট্রার), মধ্যম—খগেন্দ্রনাথ, কনিষ্ঠ—হরিনাথ (লেখকের সহপাঠী এবং পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর); ইঁহারা কলিকাতার জগদীশনাথ রায় লেনেই থাকিতেন, কদাচিৎ কাঁচরাপাড়ায় যাইতেন)। জগদীশ বাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—শ্রীউমানাথ[১] লেখকের পিতার নিকট প্রায়ই আসিতেন। শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ রায় এবং তাঁহার তিন ভ্রাতা—দ্বারকানাথ, নন্দলাল এবং প্রতাপচন্দ্র। কেবল লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু কাঁচরাপাড়ায় থাকিতেন। ইঁহার তিন পুত্র—কালিকৃষ্ণ (শিক্ষক), বটকৃষ্ণ (ডাক্তার); এবং ভূজেন্দ্র (Steno-typist)। দ্বারকা বাবুর চারি পুত্র—তৃতীয় নগেন্দ্র-নাথ (Electric Engineer, Calcutta, বিলাত-প্রত্যাগত); নন্দ বাবুর এক পুত্র—আশুতোষ (P. W. D. কর্ম্মচারী); প্রতাপ বাবুর দুই পুত্র—জয়কৃষ্ণ (ময়ূরভঞ্জ রাজের কর্ম্মচারী); নীলমণি (ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী)। শ্রীঈশ্বর ন্যায়বাগীশ এবং তাঁহার ভ্রাতৃ-কন্যার পুত্র—ভূষণ ভট্টাচার্য্য। শ্রীহরিচরণ চক্রবর্ত্তী (টিকার ইন্‌স্‌পেক্টর) এবং তাঁহার পুত্র। শ্রীদাশরথি মজুমদার। শ্রীতিনকড়ি চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁহার পুত্র অবিনাশ। শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় (কাঁচরাপাড়ার রেলের কেরাণী এবং স্কুলের সেক্রেটারী)। শ্রীকালিপ্রসন্ন গাঙ্গুলী (ই, আই, রেলের কেরাণী)। শ্রীভরতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শ্রীসাতকড়ি মণ্ডল (মালাকর) এবং তাঁহার দুই পুত্র—তিনকড়ি (কাঁচরাপাড়া

১। জগদীশ বাবু, উমানাথ বাবু, জগদীশ বাবুর পুত্রেরা এক্ষণে (১৯৩৩ খৃঃ) কেহ জীবিত নাই। রাধানাথ ও খগেন্দ্র বাবুর পুত্রেরা এবং হরিনাথ বাবুর দৌহিত্রেরা কলিকাতার বাটীতে বাস করিতেছেন।

কারখানার কেরাণী) এবং রাজেন্দ্র (শিক্ষক)। শ্রীবেণীমাধব রায়, নারায়ণচন্দ্র রায়, নবীনচন্দ্র প্রামাণিক, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রামাণিক এবং তাঁহার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র। শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত (মালাকর), হেমচন্দ্র দত্ত, রাধানাথ দত্ত, গোলক দত্ত, গিরীশ দত্ত; অক্ষয়কুমার দত্ত, (পেনস্থানার এবং পোষ্ট-মাষ্টার) এবং তাঁহার পুত্র—তুলসীচরণ। শ্রীরাখালচন্দ্র পাল এবং তাঁহার ভ্রাতা—কান্তিচন্দ্র (শিক্ষক)। শ্রীপাচকড়ি প্রামাণিক, উমেশচন্দ্র প্রামাণিক।

বাজার পাড়া

শ্রীশ্রীগোপাল মুখোপাধ্যায় (অধিকারী)। শ্রীরাধাগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় (অধিকারী) এবং তাঁহার দুই পুত্র—অতুল এবং শ্রীকৃষ্ণ। রাধাগোবিন্দ বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র বিজয় ও জীবন। শ্রীঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (অধিকারী), ইঁহার নিকট হইতে বিশ্বকোষ অভিধানে কাঁচরাপাড়ার বৃত্তান্ত সংগৃহীত হইয়াছিল।

ঈশান বাবুর আত্মীয়—হরিচরণ মুখোপাধ্যায় ও পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়; মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায়; সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়; বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় (অধিকারী)। শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায় (অধিকারী বিখ্যাত লৌহের দালাল) এবং তাঁহার চারিপুত্র—হরিদাস, নরেন্দ্র, বীরেন্দ্র ও জিতেন্দ্র। শ্রীশ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার পাঁচপুত্র—সুরেন্দ্রনাথ (শিক্ষক), গোপালচন্দ্র (কন্ট্র্যাক্টর), দেবেন্দ্রনাথ (ই, বি, রেলের ওভারশিয়ার), চারুচন্দ্র (ই, বি, রেলের কেশিয়ার); শ্রীনাথ বাবুর আর এক পুত্রও ছিলেন। শ্রীনাথ বাবুর এক কন্যার সহিত লাহোর হাইকোর্টের জজ্ সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হইয়াছিল; ইনি জলকষ্ট নিবারণের জন্য বাজারপাড়াতে একটী পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শ্রীনীলমণি মুখো-

পাধ্যায় এবং তাঁহার পুত্র ক্ষেত্রনাথ। শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁহার পুত্র—সিদ্ধেশ্বর (কটকের ওভারশিয়ার); সিদ্ধেশ্বর বাবুর পুত্রেরা এক্ষণে কাঁচরাপাড়ায় বাস করেন না। শ্রীমহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (জমিদার) এবং তাঁহার তিন পুত্র। শ্রীহেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (কৃষ্ণদেব রায়ের পূজক ; নিমন্ত্রণোপলক্ষে অতিরিক্ত ভোজনের নিমিত্ত তাঁহাকে 'রাক্ষস ব্রাহ্মণ' বলিত)। শ্রীবিপিনবিহারী রায় (ব্রাহ্মণ) এবং তাঁহার দুই ভ্রাতা—বিনোদবিহারী এবং গোষ্ঠবিহারী। শ্রীসত্যচরণ পাত্র (কাঁচরাপাড়া কারখানার কেরাণী)। শ্রীসত্যচরণ ভট্টাচার্য্য ; অচ্যুত ভট্টাচার্য্য। শ্রীনীলাম্বর বাগীশ, রামেশ্বর বাগীশ এবং তাঁহার পুত্র কালিপদ। শ্রীদীননাথ রজক এবং তাঁহার ভ্রাতা—দ্বারকানাথ। শ্রীচিন্তামণি মজুমদার (মোদক ; বিখ্যাত সন্দেশ এবং চাঁপা প্রস্তুত-কারক) এবং তাঁহার দুই পুত্র নবীনচন্দ্র ও পাঁচকড়ি। শ্রীদীননাথ মোদক এবং তাঁহার পুত্র হরিচরণ। শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র মোদক। শ্রীসূর্য্য-কুমার রায় এবং তাঁহার ভ্রাতা প্রসন্নকুমার। শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত (মশলা বিক্রেতা) ; কালিচরণ শূর, হরিপদ বিশ্বাস, গাডু ময়রা।

বাজারপাড়ার ঘোষ (কায়স্থ) পরিবারের অনেকেই উচ্চশিক্ষিত এবং পদস্থ—শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ (শিক্ষক এবং দেশ-হিতৈষী।

কৈলাস বাবুর তিনপুত্র—রজনীনাথ (উকিল), নলিনীনাথ (পুলিশের হেডক্লার্ক) এবং ঊষানাথ।

কৈলাস বাবুর খুল্লতাত—নারায়ণচন্দ্র এবং তাঁহার দুইপুত্র—গোপালচন্দ্র (ডাক্তার) এবং রাধারমণ (ডাক্তার)। কৈলাস বাবুর ভ্রাতা—অক্ষয়কুমার এবং তাঁহার পুত্র—মাখনলাল (রেলের কেরাণী)। কৈলাস বাবুর জ্ঞাতি ভ্রাতা—মধুসূদন এবং তাঁহার পুত্র—নরসিংহ (কুচবিহারের নায়েব আহিলকর), এবং আশুতোষ (উকিল)

কৈলাস বাবুর কনিষ্ঠভ্রাতা—প্যারিচরণ এবং তাঁহার পুত্র—সিদ্ধেশ্বর (পরে সহকারী জজ্)।

বাজারপাড়ার রথতলা

শ্রীমেঘনাদ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁহার পুত্র—প্রবোধ। শ্রীহরিচরণ মুখোপাধ্যায় (ষ্টেশানমাষ্টার) এবং তাঁহার দুই পুত্র।

রথতলাতে অন্ততঃ ষোলঘর বৈষ্ণব বাস করিতেন। বাজারপাড়ার গঙ্গার ধারের দিকে শ্রীগোপেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, শিলু মাঝি এবং তাঁহার পুত্র। ঈশান পাটনী। শ্রীমতী ক্ষিতি পাটনী। গঙ্গাধারের পুরাতন স্কুলবাটীর নিকট অন্ততঃ ছয়ঘর বাগ্দী বাস করিতেন।

উপরে যাঁহাদিগের নাম লিখিত হইয়াছে তাঁহাদিগের ভিতরে এই কয়টী ভদ্রলোকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা কাঁচরাপাড়া গ্রামের উন্নতি-সাধনের জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ৺সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, ইনি কটকে সরকারী ওভারশিয়ার ছিলেন। পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণকরিয়া কাঁচরাপাড়ার উন্নতিসাধনে সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। ইঁহার বন্ধু ৺কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ বরাট (বৈদ্য) যতদিন জীবিত ছিলেন এই পল্লীগ্রামের উন্নতি বিধানে সর্ব্বদাই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ৺কৈলাসচন্দ্র ঘোষ পূর্ব্বে হুগলী কলেজিয়েট স্কুলের অঙ্কশাস্ত্রের শিক্ষক ছিলেন। তিনি সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণকরিয়া কাঁচরাপাড়া-গ্রামের এবং বিশেষতঃ এই স্থানের বিদ্যালয়ের উন্নতিবিধানে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পূর্ব্বতন ছাত্রদিগের নিকট হইতে স্কুলের জন্য মাসে মাসে অনেক টাকা সংগ্রহকরিতেন। আমি তখন সরকারী শিক্ষা-বিভাগে প্রবেশ করিয়াছিলাম। কৈলাস বাবুর প্রতি তাঁহার পূর্ব্বতন ছাত্রদিগের এরূপ ভক্তি-দর্শনে আমি মুগ্ধ এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। বর্ত্তমান

সময়ে শিক্ষক এবং ছাত্রদিগের মধ্যে সেরূপ প্রীতি নাই বলিয়া আমাদিগের মনে হয়। এজন্য শিক্ষক এবং ছাত্রগণ উভয় পক্ষই দায়ী। শিক্ষকগণের ছাত্রদিগের প্রতি সমধিক সহানুভূতির অভাব এবং ছাত্রদিগের শিক্ষকদিকের সহিত ব্যবহারে শ্রদ্ধা এবং ভক্তির অভাব এবং স্বতন্ত্রতার আধিক্য, শিক্ষক এবং ছাত্রমণ্ডলীর মনোমালিন্যের কারণ বলিয়া আমরা বিবেচনা করি। আমরা ছাত্রদিগের উপর সমস্ত দোষ ন্যস্ত করিতে সম্মত হইতে পারি না; কারণ এখনও পর্য্যন্ত "ঢাকা পোগোজ্ স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং পপুলার লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী হরিরাম ধর (B A.), ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যাপক রাখালচন্দ্র ঘোষ (M. A.), চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যাপক দেবেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (M. A.), স্বর্গীয় খাঁ বাহাদুর আবদুল লতিফ (B. A. ; যিনি বাঙ্গালা সরকারের Under-secretary হইয়াছিলেন) প্রভৃতি আমার ঢাকা কলেজের ছাত্রেরা, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইস্‌চেয়ারম্যান এবং উকিল), শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (B. A., B. T., কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের সহকারী হেডমাষ্টার), শ্রীনগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (B. A. কৃষ্ণনগর কলেজের লাইব্রেরীয়ান), শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু (M. Sc, I. C. S. ; জজ্) শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী (M. A.. Phd.. Archaeologist), শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু (M. A., Asst. Forest Officer), শ্রীসেরাজুল ইস্‌লাম (B L., খুলনার উকিল), শ্রীশৌরেশচন্দ্র ঘটক (B. A. শিক্ষক), শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার (M. A. বিলাতের শিক্ষাপ্রণালীর বিষয়ে ডিগ্রীপ্রাপ্ত, নর্ম্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক) প্রভৃতি কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্রেরা, শ্রীসরোজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (M. A., Office of the Accountant General, Bengal) শ্রীসরোজনাথ ঘটক (B. Sc. Assistant Accountant-general),

শ্রীসুশীলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (M. A. Research-scholar), শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু (B. A.), প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক সুবোধকুমার সেনগুপ্ত (M. A.), হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজের অধ্যাপক রণদারঞ্জন চক্রবর্ত্তী (M. A.), রিপন কলেজের অধ্যাপক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য (M. A.), হাওড়ার ডাক্তার রাখালচন্দ্র দত্ত (M. B) প্রভৃতি প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রেরা, অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (M. A.), প্রভৃতি হুগলী কলেজের ছাত্রগণ এখনও পর্য্যন্ত আমাকে সমধিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

কাঁচরাপাড়ার মাঝেরপাড়ার অধিবাসী ৺অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় উচ্চশ্রেণীর পোষ্ট-মাষ্টার ছিলেন। সরকারী কার্য্য হইতে অবসর লইয়া কাঁচরাপাড়ায় অবস্থান করিয়া এবং ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হইয়া গ্রামের উন্নতির অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার পরে গ্রামের কতিপয় লোকের অন্যায় আচরণে বিরক্ত হইয়া এবং ম্যালেরিয়া রোগে সপরিবারে আক্রান্ত হইয়া তিনি গ্রাম ত্যাগকরিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

কাঁচরাপাড়ার বর্ত্তমান অধিবাসী।

চৌধুরীপাড়া—

শ্রীসুবোধ ঘোষ, ভদু ঘোষ ; সতীশ ঘোষ ; এবং তাঁহার তিন পুত্র। শ্রীদুলাল ঘোষ এবং তাঁহার ভাগিনেয়। শ্রীসতীশ ঘোষ (বনমালীর পুত্র) ও তাঁহার এক পুত্র। আশু বাবুর পুত্র কালিচরণ রায় চৌধুরী (ব্রাহ্মণ) এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী (পাচকড়ি বাবুর পুত্র) ও তাঁহার এক পুত্র। ধীরেন্দ্র বাবুর ভ্রাতা নগেন্দ্র বাবু এবং তাঁহার দুই পুত্র জামশেদ্‌পুরে থাকেন। ধীরেন্দ্র বাবুর আর এক ভ্রাতা—যতীন্দ্র বাবু ও তাঁহার তিন পুত্র কলিকাতাতে

থাকেন। ৺সিদ্ধেশ্বর ঘোষের (গোয়ালা) তুই পুত্র—ললিতমোহন ও শৈলেন্দ্র, ললিতমোহনের এক পুত্র—ইঁহারা কখনও কখনও কাঁচরাপাড়ায় আসেন।

৺যজ্ঞেশ্বর ঘোষের পুত্র—অমরেন্দ্র, মাঝে মাঝে কাঁচরাপাড়ায় আসেন।

৺রাধিকা ঘোষের পুত্র—মন্মথ ও প্রমথ, ইছাপুর হইতে মাঝে মাঝে কাঁচরাপাড়ায় আসেন।

শ্রীহরি বাগ্দী এবং তাঁহার তিন পুত্র; কাল বাগ্দী; অতুল বাগ্দী এবং তাঁহার তুই পুত্র; ভূষণ বাগ্দী এবং তাঁহার এক পুত্র; সতীশ বাগ্দী এবং তাঁহার তিন পুত্র; পাগল বাগ্দী, গোপাল বাগ্দী, ভুলু বাগ্দী, বাঁশি শেখ, খতু শেখ, গোবিন্দ উড়ে এবং তাঁহার এক পুত্র।

মাঝের পাড়া

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় (বৈদ্য) এবং তাঁহার পুত্র দ্বারকানাথ (ডাকঘরের কর্ম্মচারী); গোপাল বাবুর জ্ঞাতি—হরিদাস (Commercial Intelligence Dept.), উপেন্দ্রনাথ (Customs Retd.) এবং বিপিনবিহারী (Ralli Brothers), মাঝে মাঝে কাঁচরাপাড়ায় আসেন। রাজকৃষ্ণ বাবুর তৃতীয় পুত্র—শ্রীশরদিন্দু রায় (District Engineer, Birbhum) এবং পূর্ণচন্দ্র (P. W. D.)। হীরালাল বাবুর কনিষ্ঠা কন্যা—শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীর এক পুত্র—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার (ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের বাঙ্গালার অধ্যাপক)। শিব বাবুর তিন পুত্র; বিপিন বাবুর তুই পুত্র; উপেন্দ্র বাবুর পাঁচ পুত্র এবং হরিদাস বাবুর এক পুত্র মাঝে মাঝে কাঁচরাপাড়ায় আসেন।

শ্রীভীমচন্দ্র কর্ম্মকার ও তাঁহার ভ্রাতা—অর্জ্জুন। শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ

(গোয়ালা) ও তাঁহার এক পুত্র। শ্রীখগেন্দ্রনাথ ঘোষ (গোপ ; বস্ত্র বিক্রেতা এবং শাখা কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের গুরু) এবং তাঁহার দুই পুত্র। শ্রীপঞ্চু প্রামাণিক, পান্নালাল প্রামাণিক, ফেলারাম প্রামাণিক। শ্রীসত্য-চরণ ঘোষ (গোয়ালা)। ৺শিবচরণ ঘোষের পুত্র (ডাকনাম হাগু); শ্রীনন্দ ঘোষ, ভোলানাথ ঘোষ। ৺গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী। ৺হীরালাল মুখোপাধ্যায়ের তিন পুত্র—৺যতীশ, সতীশ (post-office) এবং ৺ক্ষিতীশ। ৺অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়ের চারি পুত্র—জ্যেষ্ঠ অবসর-প্রাপ্ত সরকারী ডাক্তার রায় সাহেব নৃত্যলাল মুখোপাধ্যায় ব্যতীত ইঁহারা সকলেই ডাকঘরে কিম্বা রেলওয়েতে চাকরী করেন।

সতীশচন্দ্র দে (বর্ত্তমানে হাওড়া, নরসিংহ দত্ত কলেজের অধ্যক্ষ) এবং ইঁহার তিন পুত্র—যতীশ,[১] ক্ষিতীশ এবং কনিষ্ঠ সুধীর; সুধীরের এক পুত্র অবন্তীভূষণ, ইঁহারা মাঝে মাঝে কাঁচরাপাড়ায় আসেন। ইঁহাদের বাটীতে শ্রীমতী গিরিবালা ঘোষ (৺রাজেন্দ্রকুমার ঘোষের বিধবা স্ত্রী) এবং শ্রীমতী মোহিনী দাসী (৺কালি মাঝির বিধবা স্ত্রী) বাস করেন।

শ্রীমতী স্বর্ণ দেবী ; ৺হরিচরণ সরকারের দুই পৌত্র। ডাক্তার

১। ইনি এগার বৎসর বয়সে (১৯০৯) এনট্রেন্স, তের বৎসরে ইণ্টার মিডিয়েট, পোনের বৎসরে (১৯১৩) বি-এ, সতের বৎসরে (১৯১৫) এম্-এ, কুড়ি বৎসরে বি-এল্ পরীক্ষা দিয়া টাটা ব্যাঙ্কে দুই বৎসর কার্য্য করিয়া এবং ১৯২০ হইতে ১৯২৩ পর্য্যন্ত বিলাতে থাকিয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-এ হইয়া লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউরোপীয় ইতি-হাসের অধ্যাপক (Lecturer) ১৯২৩ হইতে ১৯২৭ পর্য্যন্ত ছিলেন এবং ১৯২৭ সেপটেম্বর হইতে সিংহলে (Ceylon) ইউনিভার্সিটী কলেজের ইউরোপের ও ভারতবর্ষের ইতিহাসের সহকারী অধ্যাপকের (appointment by the Secretary of State for Colonies) কার্য্য করিতেছেন।

শরচ্চন্দ্র রায় ও তাঁহার পুত্র—কানাই মাঝে মাঝে কাঁচরাপাড়ায় আসেন। কবিরাজ ৺মনোরঞ্জন মল্লিকের পুত্র—মোহিতচন্দ্র (মাঝে মাঝে কাঁচরাপাড়ায় আসেন।

শ্রীপাগল বাগ্দী, কুড়ন বাগ্দী, শশী বাগ্দী, সুশীল বাগ্দী। শ্রীবসন্তনাথ (যোগী) এবং তাঁহার দুই পুত্র। ৺নিরহরি ভট্টাচার্য্যের স্ত্রী। শ্রীজয়কৃষ্ণ দাশগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জন) এবং তাঁহার এক পুত্র, তাঁহারা কখনও কখনও কাঁচরাপাড়ায় যান, সাধারণতঃ কলিকাতায় (ভবানীপুরে) বাস করেন।

জয়কৃষ্ণ বাবুর খুল্লতাত—শ্রীগিরীশচন্দ্র দাশগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারী) এবং তাঁহার দুই পুত্র, ইঁহারা কখনও কখনও কাঁচরাপাড়ায় যান; সাধারণতঃ কলিকাতায় বাস করেন।

শ্রীবিধুভূষণ রায় এবং তাঁহার চার পুত্র, এবং তাঁহার ভ্রাতা—শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় (কবিরাজ, চুঁচুড়া) ও তাঁহার দুই পুত্র; ইঁহারা কখনও কখনও কাঁচরাপাড়ায় যান। শ্রীহেমনাথ রায় (অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্ম্মচারী)। চুঁচুড়ার কবিরাজ ব্রজবল্লভ রায় কাব্যকণ্ঠবিশারদ।

শ্রীতারাপদ বরাট। শ্রীপঞ্চানন গুপ্ত, তিনি কখন কখনও কাঁচরাপাড়ায় যান।

৺সূর্য্যকুমার সেনের (বৈদ্য) পৌত্র—কালিপদ, সূর্য্যবাবুর মধ্যম পুত্র বিজয়গোপাল (হেডক্লার্ক) এবং তাঁহার এক পুত্র—কানাই; এবং সূর্য্যবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র সরোজ এবং তাঁহার দুই পুত্র।

৺সূর্য্যকুমার সেনের ভাগিনেয়—শ্রীসতীশচন্দ্র গুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত সাবরেজীষ্ট্রার) এবং তাঁহার দুই পুত্র। সতীশ বাবুর ভ্রাতা ক্ষিতীশ এবং তাঁহার চারি পুত্র। সতীশ বাবুর তৃতীয় ভ্রাতার এক পুত্র। সতীশ বাবু এক্ষণে কৃষ্ণনগরে থাকেন।

৺উমেশচন্দ্র প্রামাণিক গুরু মহাশয়ের দুই পুত্র—সনৎকুমার এবং কৃষ্ণলাল ; সনতের চার পুত্র এবং কৃষ্ণলালের চার পুত্র।

শ্রীবেণীমাধব শূর, (মিষ্টান্ন প্রস্তুত-কারক) এবং তাঁহার পাচ পুত্র, জ্যেষ্ঠ কালি শূর এবং তাঁহার তিন পুত্র। বেণী বাবু উৎকৃষ্ট 'চাঁপা' নামক মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে দক্ষ।

শ্রীশরৎ কর্ম্মকার।

মুসলমান পাড়া

শ্রীপদ্ম ও রাজু শেখ ; রাজু শেখের এক পুত্র ; মনিরুদ্দি শেখ, পটল শেখ, নূরবক্ত শেখ, বিজু শেখ, ইন্তাজ শেখ, নগেন শেখ, জনাবালি শেখ, আতরালি শেখ, রোসনালি শেখ, সামেদ শেখ, হাইদর শেখ, ফকিরচাঁদ শেখ, জবান শেখ, বুধুই শেখ, ইমান আলি শেখ, মেতর ধাওয়া, হরি ধাওয়া, ফকির ধাওয়া, ইছো শেখ, নন্দ শেখ, বরদা শেখ, গোপাল শেখ।

মালিপাড়া

৺কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ বরাট মহাশয়ের একমাত্র পুত্র রায় সনৎকুমার বরাট বাহাদুর (এম, এ ; এল, এম, এস, বাঁকীপুরের বিখ্যাত সরকারী চিকিৎসক)। ইঁহার চার পুত্র ; জ্যেষ্ঠ অজিতকুমার (এম, বি, ডাক্তার এবং **research-scholar**)। সনৎবাবুর মাতা মধ্যে মধ্যে কাশী, বাঁকীপুর এবং কাঁচরাপাড়াতে অবস্থান করেন। সনৎবাবুর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী দুর্গার এবং জামাতা শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায়ের (পাটনা জেলার রাজগৃহ-সন্নিহিত নালন্দার প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষের তত্ত্বাবধায়ক) এবং সনৎবাবুর মাতার আতিথেয়তা এবং যত্ন আমরা কখনই ভুলিতে পারিব না।

৺ভগবতী ভট্টাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র পঞ্চানন (রেলওয়ে কর্ম্মচারী) ;

ইঁহার চারপুত্র, ইঁহারা কখনও কখনও কাঁচরাপাড়ায় আসেন। পঞ্চাননবাবুর ভ্রাতা—শরৎচন্দ্র, (কাঁচরাপাড়া কারখানার কর্ম্মচারী ; ইঁহার পুত্র নির্ম্মলকুমার। ৺ললিতকণ্ঠ ভট্টাচার্য্যের তিন পুত্র। ৺বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্যের এক পুত্র। শ্রীহরি প্রামাণিক এবং তাঁহার এক পুত্র। শ্রীনগেন্দ্র প্রামাণিক (কাঁচরাপাড়া কারখানার মিস্ত্রী) এবং তাঁহার এক পুত্র। শ্রীপাঁচু প্রামাণিক। শ্রীতারাপদ প্রামাণিক এবং তাঁহার ছয় ভ্রাতা। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ পাল (৺কান্তিচন্দ্র পালের পুত্র)। ৺পঞ্চু-ভট্টের বিধবা।

শ্রীবঙ্কুবিহারী ভট্টাচার্য্য এবং তাঁহার তিন পুত্র। শ্রীহরলাল (লালু) ভট্টাচার্য্য এবং তাঁহার এক পুত্র। ৺দাশরথি মজুমদারের এক পুত্র। শ্রীকালিকৃষ্ণ রায় এবং তাঁহার এক পুত্র, হিরণ (ডাক্তার)। কালিকৃষ্ণবাবুর ভ্রাতা—ডাক্তার বটকৃষ্ট রায় (কলিকাতা, সিমলা), ইঁহার দুই পুত্র—প্রভাত ও বিমল। কালিকৃষ্ণ বাবুর অপর ভ্রাতা—ভূজেন্দ্র কৃষ্ণ (Steno-typist), ইঁহার এক পুত্র। ইঁহারা কখনও কখনও কাঁচরাপাড়ায় যান। শ্রীদুর্গাদাস কবিরাজ (কলিকাতা ৺মনো-রঞ্জন মল্লিকের ভগ্নীপতি) ; ইনি কখনও কখনও কাঁচরাপাড়ায় যান. ৺বেণীরায়ের বাটী ক্রয় করিয়াছেন। ৺কালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র, বিভূতিভূষণ (বরিশালের উকীল); ইনি কখনও কখনও কাঁচরাপাড়ায় যান। শ্রীতুলশী চরণ দত্ত (কাঁচরাপাড়া কারখানার কর্ম্মচারী) ; ইঁহার তিন পুত্র। শ্রীগিরীশ মালাকর। শ্রীঅমূল্য মালাকর। ৺নারায়ণ চন্দ্র রায়ের পুত্র—তারক নাথ (ডাক্তার, কলিকাতা)। শ্রীরাজেন্দ্র নাথ মণ্ডল (মালাকর, শিক্ষক) এবং তাঁহার দুই পুত্র—শক্তিপদ এবং জ্যোতিপ্রসাদ। রাজেন্দ্রবাবুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺তিনকড়ি মণ্ডলের চার পুত্র—রামকৃষ্ণ, অতুল, কমল এবং পাচু।

রামকৃষ্ণ বাবুর দুই পুত্র। ৺অবিনাশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিধবা।

বাজারপাড়া

শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় (অধিকারী) এবং তাঁহায় তিন ভ্রাতা—নরেন্দ্র, বীরেন্দ্র এবং জিতেন্দ্র ; নরেন্দ্র বাবুর চারি, বীরেন্দ্র বাবুর তিন এবং জিতেন্দ্র বাবুর দুই পুত্র ; ইঁহারা জমিদার। ৺সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের বিধবা। ৺সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের এক পুত্র, ইঁহারা কলিকাতায় থাকেন এবং কখনও কখনও কাঁচরাপাড়ায় আসেন। শ্রীঅতুল কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার পুত্র ননীলাল (কারখানার কর্ম্মচারী)। অতুলবাবুর ভ্রাতা—শ্রীকৃষ্ণ কলিকাতায় থাকেন এবং মধ্যে মধ্যে কাঁচরাপাড়ায় আসেন। ৺বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের দুই পুত্র—রাসবিহারী এবং জগন্নাথ। ৺জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের এক পুত্র—হরিপদ। উপরিউক্ত মুখোপাধ্যায় (অধিকারী) মহাশয়েরা কৃষ্ণদেব রায়ের সেবায়েৎ।

শ্রীহরিচরণ মুখোপাধ্যায় (কাঁচরাপাড়া কারখানার কর্ম্মচারী) এবং তাঁহার তিন পুত্র—পুলিন, বঙ্কিম এবং বিশ্বেশ্বর ; পুলিনবাবুর তিন পুত্র এবং বঙ্কিমবাবুর দুই পুত্র। ৺পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের চার পুত্র—কানাইলাল, নন্দলাল, মণিলাল ও ফণীন্দ্র ; নন্দলাল বাবুর এক পুত্র। শ্রী শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। শ্রীচারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শ্রীবিনোদ বিহারী পাত্র এবং তাঁহার দুই পুত্র। শ্রীসত্যচরণ পাত্র এবং তাঁহার ছয় পুত্র—(বিজপুরে বাস করিতেছেন)। শ্রীকালিচরণ শূর এবং তাঁহার দুই পুত্র—হরপ্রসাদ এবং গঙ্গাপ্রসাদ। শ্রীহরিপদ বিশ্বাসের ছয় পুত্র—তারাপদ, সুধাকর, দিবাকর, ভাস্কর, শশিশেখর এবং মধুসূদন। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মজুমদার (রেঙ্গুন), ইনি কখনও কখনও কাঁচরাপাড়ায়

আসেন। শ্রীপ্রফুল্ল কুমার বন্দোপাধ্যায় এবং তাঁহার দুই পুত্র। ৺দীন নাথ রজকের স্ত্রী ও কন্যা। ৺দ্বারকা নাথ রজকের স্ত্রী ও কন্যা। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র নিয়োগী; তাঁহার পুত্র—গৌরচন্দ্র (কাঁচরাপাড়া কারখানার মিস্ত্রী। শ্রীভূপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ই, বি, রেলের কর্ম্মচারী—৺নীলমণি মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র)। শ্রীবনমালী বিশ্বাস, (সদ্গোপ; ই, বি, রেলের কর্ম্মচারী)। শ্রীভূষণ চন্দ্র ঘোষ, (ই, বি, রেলের কর্ম্মচারী। এবং তাঁহার দুই পুত্র—কমল ও মণিলাল। শ্রীমণিমোহন চট্টোপাধ্যায় (৺মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পৌত্র)। শ্রীউপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস এবং তাঁহার পুত্র—কালিপদ। শ্রীকালিচরণ বিশ্বাস এবং তাঁহার দুই পুত্র—মাধব এবং সাধু। শ্রীসতীশ মণ্ডল। শ্রীঅতুল মণ্ডল এবং তাঁহার এক পুত্র। শ্রীভাগবত রাজবংশী। শ্রীভগীরথ রাজবংশী। শ্রী শ্রীনিবাস বিশ্বাস এবং তাঁহার এক পুত্র—সত্যচরণ। শ্রীনিবারণ মণ্ডল এবং তাহার এক পুত্র—গুরুপদ। শ্রীকালিপদ বিশ্বাস এবং তাঁহার এক পুত্র—দীননাথ। শ্রীসতীশ বিশ্বাস। ৺মেঘনাদ মণ্ডলের চারিপুত্র—তারাপদ, রামপদ, শ্রীনিবাস ওবং গৌর। শ্রীপাঁচু বিশ্বাস। শ্রীনীলকণ্ঠ বিশ্বাস এবং তাহার এক পুত্র। শ্রীবাবুরাম বাগ্দী এবং তাঁহার দুই পুত্র; ঈশান বাগ্দী এবং তাঁহার এক পুত্র; হৃষিকেষ বাগ্দী; নীরো বাগ্দী; জন্তিরাম বাগ্দী। শ্রীবলাই মালো। শ্রীমাণিক বিশ্বাস এবং তাঁহার এক পুত্র। শ্রীকার্ত্তিক রজক এবং তাঁহার এক পুত্র। ৺গোপেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র—দুলাল (হালিসহর পাটকলের কর্ম্মচারী)। ৺নন্দলাল মজুমদার।

ঘোষ মহাশয়দিগের বাটী

ইঁহারা কায়স্থ এবং ইঁহাদের বাটীর অনেকেই উচ্চ শিক্ষিত এবং উচ্চ পদস্থ। ৺নরসিংহ ঘোষের পুত্র—প্রভাতচন্দ্র (Attorney,

কলিকাতা); প্রভাতবাবুর দুই পুত্র; প্রভাতবাবুর মধ্যম ভ্রাতা—প্রকাশচন্দ্র (সাবডেপুটী কলেক্টর); প্রকাশবাবুর দুই পুত্র; প্রভাতবাবুর তৃতীয় ভ্রাতা—বিভাসচন্দ্র (বগুড়ার মুন্সেফ); প্রভাতবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা—বিকাশচন্দ্র। ৺নরসিংহ ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা—আশুতোষ (শিয়ালদহ আদালতের উকীল)। ৺কৈলাসচন্দ্র ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺রজনীনাথের তিন পুত্র—পঞ্চানন, বিনয়কৃষ্ণ এবং নির্ম্মল চন্দ্র; কৈলাস বাবুর মধ্যম পুত্র ৺নলিনী নাথের এক পুত্র—হেমকুমার; কৈলাস বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র—উষানাথের তিন পুত্র—শশধর, নন্দ এবং শ্রীকুমার। কৈলাসবাবুর মধ্যম ভ্রাতা অক্ষয়কুমারের পৌত্র—বিভূতিভূষণ; বিভূতিবাবুর এক পুত্র। কৈলাসবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺প্যারীমোহনের চারি পুত্র—জ্যেষ্ঠ সিদ্ধেশ্বর (জজ্ মধ্যপ্রদেশ), মধ্যম সতীশ (বিলাসপুরের উকীল), তৃতীয় জোতিশ্চন্দ্র (M.A. Cal. and B. Litt. Oxford; ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন; বর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজীর অধ্যাপক এবং পরীক্ষক)· এবং কনিষ্ঠ প্রভাসচন্দ্র; সিদ্ধেশ্বর বাবুর তিন পুত্র। কৈলাস বাবুর খুল্লতাত ৺রামনারায়ণ ঘোষের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ গোপালচন্দ্র (অবসরপ্রাপ্ত মধ্যপ্রদেশের সরকারী ডাক্তার) এবং কনিষ্ঠ রাধারমণ (যশোহরের সিভিলসার্জ্জন)। গোপালবাবুর ছয় পুত্র—জিতেন্দ্র, ৺ধীরেন্দ্র, মণীন্দ্র, শচীন্দ্র, শৈলেন্দ্র এবং বীরেন্দ্র: জিতেনবাবুর দুই পুত্র; ৺ধীরেনবাবুর এক পুত্র; শচীনবাবুর এক পুত্র। রাধারমণবাবুর এক পুত্র—দেবপ্রসাদ। গোপালবাবু এবং তাঁহার পুত্রেরা কাঁচরাপাড়ায় বাস করিতেছেন। গোপাল বাবুর আত্মীয়গণ কদাচিৎ কাঁচরাপাড়ায় আসেন।

আমরা উপরিলিখিত লোক-সংখ্যাতে বাটীর স্ত্রীলোকদিগের এবং অন্যান্য পরিজনের নাম উল্লেখ করি নাই। এই তালিকা হইতে ৪৫ বৎসর পূর্ব্বের লোক সংখ্যা নির্দ্ধারিত করা সুকঠিন। কিন্তু আমরা একটা average এই প্রকারে নির্দ্ধারণ করিতে পারি। সাতটী পরিবার লওয়া যাক্—

(ক) শ্রীশ্যামাচরণ দে (কায়স্থ ; গ্রন্থকারের পিতা ; ১৮৪২ খৃঃ হইতে ১৯০১ খৃঃ)। তাঁহার পুত্র সতীশচন্দ্র (জন্ম ১৮৭১ খৃঃ)।

লেখকের মাতুল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মিত্র (মৃত্যু—১৯০৭ খৃঃ)।

„ মাতাঠাকুরাণী শ্রীমতী কামাখ্যাকুমারী (মৃত্যু—১৯৩১ খৃঃ)।

„ ভগ্নী শ্রীমতী সুশীলাবালা মিত্র (জন্ম—১৮৭৫ খৃঃ ; ৪নং গোপাল বিশ্বাসের লেন, হরিদাস মিত্রের সহিত বিবাহ)।

„ পিসিমাতা শ্রীমতী পার্ব্বতী (মৃত্যু—১৯০৪ খৃঃ)।

„ পিস্তুত ভগ্নী শ্রীমতী মঙ্গলা।

„ পিসিমাতার আত্মীয়া শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি, (মৃত্যু—১৯১০ খৃঃ)।

শ্রীমতী যোগমায়া দাসী (দরিদ্রা প্রতিবেশিনী)।

(দুইজন সরকার—শ্রীযুক্ত বামাচরণ রায় চৌধুরী ও বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য ; পূর্ব্বে তাঁহাদের নাম লেখা হইয়াছে ; দুইজন ভৃত্য—ভৈরব ঘোষ ও মুরারি সর্দ্দার, পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে ধরা হইয়াছে।)

দুইজন দাসী—শ্রীমতী হরিমতি ও কুমদা। মোট "এগার জন"।

(খ) শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁহার স্ত্রী, তাঁহার এক পুত্র নগেন্দ্রনাথ (এক্ষণে ছাপরা-প্রবাসী), তাঁহার ভগ্নী শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী, তাঁহার ভাগিনেয়ী শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবী, একজন দাসী। মোট "ছয় জন"।

(গ) শ্রীকালিপ্রসন্ন ঘটক (ব্রাহ্মণ), তাঁহার স্ত্রী, তাঁহার একপুত্র। মোট "তিন জন"।

(ঘ) শ্রীকালাচাঁদ ঘোষ, (গোপ), তাঁহার স্ত্রী, তাঁহার ভগ্নী, তাঁহার কন্যা। মোট "চার জন"।

(ঙ) শ্রীতী প্রসন্ন গোয়ালিনী, মোট "এক জন"।

(চ) শ্রীমতী চণ্ডীদাসী ও কামিনী দাসী, মোট "দুই জন"।

(ছ) শ্রীশ্রীনাথ ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার কন্যা—শ্রীমতী গিরিবালা দেবী; মোট "দুই জন "।

এই সাতটী পরিবারের লোক মোট "২৯ জন"। অতএব প্রত্যেক পরিবারের **average** ২৯ বিভক্ত ৭ অর্থাৎ ৪। সেই জন্য মোট লোক সংখ্যা স্থির করিতে হইলে তালিকার লোক-সমষ্টিকে ৪ দিয়া গুণন করিলে পাওয়া যাইবে। ইহাও যে নির্ভুল হইবে তাহা বলা যায় না। বর্ত্তমানে কাঁচরাপাড়ার অধিবাসীদিগের যে নাম দিয়াছি, তাঁহারা সকলেই কাঁচরাপাড়ার স্থায়ী অধিবাসী নয়, তাঁহাদিগের ভিতর অনেকেই বৎসরে দুই এক দিন এই গ্রামে আসেন। আমরা লোক সংখ্যা সম্বন্ধে মোটামুটি এই প্রকার বলিতে পারি—

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ম্যালেরিয়া-আক্রমণের পূর্ব্বে কাঁচরাপাড়ার লোক-সংখ্যা ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে (১৮৮৮ খৃঃ) যে লোক-সংখ্যা ছিল তাহার অন্ততঃ তিন গুণ ছিল। আবার বর্ত্তমান (১৯৩৩ খৃঃ) লোক-সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যে লোক-সংখ্যা ছিল তাহার প্রায় এক তৃতীয়াংশ হইয়াছে। লোক-সংখ্যা অনুপাতে অন্যান্য বিষয়েও এই পল্লীগ্রামের অবনতি ঘটিয়াছে। গ্রামের অধিকাংশ ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং বনে পরিণত হইয়াছে। পুষ্করিণী সকল জলশূন্য হইয়াছে, ম্যালেরিয়া ভীষণতর আকার ধারণ করিয়াছে এবং কখনও

কখনও কালাজ্বরে রূপান্তরিত হইতেছে। বর্ত্তমান অধিবাসিগণ উৎসাহশূন্য হইয়াছেন। এণ্ট্রান্স বিদ্যালয়টী একটী ক্ষুদ্র পাঠশালায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যে বাজারটীতে প্রত্যহ নিকটবর্ত্তী গ্রামসকল হইতে জনসমাগম হইত, যাহা প্রত্যূষ হইতে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত ক্রেতা বিক্রেতার কোলাহলে মুখরিত হইত, যাহা বহু স্থায়ী এবং অস্থায়ী বিপণিতে শোভিত থাকিত, সেস্থান এক্ষণে সাত আটটী ম্রিয়মাণ দোকান অধিকার করিয়াছে।

আমরা এই অবনতির নিম্নলিখিত কারণ অনুমান করিতে পারি—

(১) ম্যাল্যারিয়া-আক্রমণ। অনেকে মনে করেন পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ে স্থাপনের পর হইতেই জলনিকাশের পথগুলি রুদ্ধ হওয়াতে এ প্রদেশে ম্যাল্যারিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে ম্যাল্যারিয়া ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে উলা অর্থাৎ বীরনগরকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়াছিল এবং তাহার পরে কাঁচরাপাড়া ইত্যাদি গ্রামাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল। ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে শিয়ালদহ হইতে কুষ্ঠিয়া পর্য্যন্ত ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে উলা এবং কাঁচরাপাড়া ইষ্টার্ণ-বেঙ্গল-রেলওয়ে-নির্ম্মাণের অন্ততঃ আট বৎসর পূর্ব্বে ম্যাল্যারিয়াদ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল।

নদীয়া জিলান্তর্গত উলা-গ্রামের ম্যাল্যারিয়াতে আক্রান্ত হইবার পরে কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল, বিশ্বকোষ হইতে তাহার বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল। "১২৬১ কি ৬২ সালে (১৮৫৪—৫৫খৃঃ অব্দে) ঐ জর প্রথমতঃ উলাতে প্রকাশ পায় এবং ক্রমাগত পাঁচ সাত বৎসর উপর্য্যুপরি সতেজে বিচরণকরিয়া নগর বিশেষে উলাকে, শ্মশান সমান ও অরণ্যতুল্য করিয়া ফেলে। এরূপ মড়ক হইতে কেহ কখন দেখেন নাই বলিয়া সকলেই

ঘোষণা করিয়া থাকেন। কোন কোন বাড়ীতে একটী দিবারাত্রির মধ্যে আবালবৃদ্ধ সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া সবংশে নির্ব্বংশ হইয়াছেন, কোন কোন পল্লীতে মৃত্যুর ভয়ঙ্কর প্রকোপ দর্শন করিয়া, ডাক্তার বৈদ্য প্রবেশ করিতে শঙ্কিত ও ভীত হইয়াছেন। এই যাহাকে দেখা গেল আর সে নাই, এই যে ব্যক্তি একজনের ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া যাইল, তখনি আর একজন সেই ব্যক্তির অন্তিমদশা দেখিতে চলিলেন, এই যে একজনকে দাহ করিয়া আসিলেন, তখনই আর একজন তাঁহাকে দাহ করিতে চলিলেন। ক্রমাগত করাল কাল যখন এইরূপে বাহু প্রসারিত করিয়া বিস্তৃত বদনে নরাস্থি চর্ব্বণ করিতে আরম্ভ করিল, তখন লোকের যথাবিধি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা হওয়া দূরে থাকুক কোন কোন লোকের মৃতদেহ জীবনাবসান স্থান হইতে স্থানান্তরিত হইবারও আর উপায় রহিল না, যেখানকার দেহ সেইখানে থাকিয়াই ক্রমে শৃগাল শকুনির ভক্ষ্য হইতে লাগিল। দেশের এইরূপ ভীষণ মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া অবশিষ্ট অধিবাসীরা কে কোথায় প্রস্থান করিলেন তাহার স্থিরতা রহিল না। ক্রমে জনাকীর্ণ 'বীরনগর' শ্মশানবৎ হইয়া পড়িল। যদিচ এক্ষণে উলাতে আর মারীভয়ের তাদৃশ প্রাদুর্ভাব নাই, তত্রাচ নগরটী একেবারে উচ্ছিন্নপ্রায় হইয়া গিয়াছে। যেমন কোন অরণ্যের ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত বৃক্ষ ভস্মীভূত হইলে দাবানল আপনা হইতে নির্ব্বাপিত হয়, উলারও ঠিক সেই দশা হইয়াছে"। ম্যাল্যারিয়ার প্রথম আক্রমণের পরে কাঁচরাপাড়া প্রভৃতি গ্রামগুলিরও ঐরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল। আমরা বাল্যকালে শুনিয়াছি যে লোকের অভাবে মৃতদেহ দাহ করা কঠিন হইয়াছিল। আমার পিতামহ নীলমণি দে মহাশয় এই ভীষণ ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হইয়া এই সময়ে দেহত্যাগ করেন।

রোণ্যাল্ড রস সাহেব ১৮৯৭—৯৯ খৃঃ অব্দে স্থির করিয়াছেন যে

এনোফেলিস্ নামক মশকের সহিত ম্যাল্যারিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। তিনি বলেন যে ম্যাল্যারিয়ার জীবাণু ম্যাল্যারিয়া রোগগ্রস্ত মনুষ্য হইতে এনোফেলিস্ জাতীয় মশক-দ্বারা সুস্থ মনুষ্যদেহে সঞ্চারিত হয়। তিন প্রকার ম্যাল্যারিয়ার জীবাণু আছে। ইহারা তিন প্রকার জ্বর উৎপাদন করে। যে স্থানে কিছুকালের জন্য জল সঞ্চিত থাকে, সেইস্থানে মশক-কুল পরিবর্দ্ধিত হয়।

প্রথমে এই নদীমাতৃক দেশে নদীসকল ক্ষীণা হইতে ক্ষীণতরা হইতে লাগিল, নদীগর্ভে অনেক চর দেখা দিল এবং অনেক ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী বিলুপ্তা হইল। এই সকল নদী মজিয়া যাওয়াতে নিকটস্থ পল্লীগ্রামের জল-বহির্গমনের পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। ইহার উপর রেলওয়ের বাঁধ-গুলির জন্য জলের প্রবেশ ও নির্গমনের আরও অসুবিধা হইল। সন্নিহিত গ্রামগুলিতে বৃষ্টির জল সঞ্চিত হইতে লাগিল। এই সকল অবরুদ্ধ ক্ষুদ্র জলাশয়ে গাছের পাতা এবং অন্যান্য আবর্জ্জনা পচিয়া ম্যাল্যারিয়া-মশক-বৃদ্ধির সহায়তা করিতে লাগিল।

পূর্ব্ববঙ্গে বর্ষাকালে মেঘনা, ব্রহ্মপুত্রনদ, ধলেশ্বরী, পদ্মা ও বুড়িগঙ্গা প্রভৃতি নদীর জল উচ্ছলিত হইয়া নিকটস্থ গ্রামগুলিকে প্লাবিত করে এবং পরে এই জল-অপসারণের সহিত আবর্জ্জনারাশি অপসারিত হয় এবং এই জন্য এই গ্রামগুলিতে ম্যাল্যারিয়া আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না। আমাদের মনে হয় যে রেলওয়ে থাকিলেও যদি জল-নিকাশের বন্দোবস্ত হয়, জঙ্গলগুলি কাটা হয়, পুষ্করিণীগুলি পরিষ্কৃত হয় এবং ভেজালবিহীন খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিবার সুবিধা থাকে, মশারি, কুইনিন এবং অগ্নিতাপে বিশুদ্ধ জলের পানীয়রূপে ব্যবহারে জন-সাধারণ অভ্যস্ত হয়েন, তাহা হইলে ম্যাল্যারিয়া এবং অন্যান্য রোগের আক্রমণ হইতে গ্রামগুলি সহজেই অব্যাহতি পায়। ডাক্তার Oslerএর

Principles and Practice of Medicine হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটী ছত্র উদ্ধৃত করিলাম—

"As a practical conclusion of the whole matter, the anti-malarial campaigns so energetically advocated and carried out by Ross have shown that by protecting the individual from the bites of mosquitoes, by exterminating the insects or by carefully treating all patients so that no opportunity may be offered for the parasite to enter the mosquito, malaria may be eradicated from any locality........................ ....This most successful campaign against malaria has been carried out on the following lines—

(1) The eradication of mosquito propagation areas by drainage and the filling of places where the larvae exist. This has been done in large districts.

(2) The control of propagation areas that are allowed to exist or that cannot be economically and permanently treated. On small areas the larvae are prevented from arriving at the adult stage by the use of crude oil or kerosene and in large bodies of water by treating the edges where alone the mosquito larvae exist. A concentrated larvacide of carbolic acid, resin and caustic soda has been found effective, when

applied to the edges of large pools, ditches, wet areas and streams. A barrel of oil with an automatic drip at the head of a stream has been found to work satisfactorily.

(3) Protection by screening of houses. Copper-bronze screens of 18 meshes to the inch are effective. Screened vestibules decrease the chance of access of mosquitoes. Mosquito-nets over the beds are found as a rule, to be a failure, chiefly because few persons sleep through a whole night without an arm or leg coming in contact with the netting on which the anopheles mosquito settles.

(4) The destruction of adult anopheles in rooms, the mosquitoes in which are usually in corners and very often within a foot of the floor.

The patient suffering from malaria should be in bed and given a liquid or soft diet. The bowels should be moved freely, for which a calomel and saline purge is best. In quinine we possess a specific remedy and the parasites are most easily destroyed at the stage when they are free in the circulation—that is during and just after segmentation............ The quinine should be given in solution or capsules. Pills and compressed tablets are uncertain, as they may not

be dissolved. The use of dilute hydrobromic acid to dissolve the quinine often prevents ringing in the ears. Euquinine in the same dosage or quinine tannate, double the amount, may be given to patients with whom quinine disagrees."

নিম্নলিখিত অংশ Encyclopaedia Britannica (14th edition) হইতে সংগৃহীত হইল—"Stevens found arsenic, after initial doses of quinine, of great value in helping to eradicate the parasite. Together with quinine or other drug-therapy, the important factor of building up and maintaining the general health so as to assist the natural forces of the body to eliminate the malarial parasite must not be forgotten..............other salts of quinine, hydrochloride and bihydrochloride, affect the digestion less and seem to be as satisfactory. The tannate has been much used in Italy, specially for prophylaxis among children. The daily small dose is more easily and therefore more certainly taken by patients (out of hospital) than larger occasional doses which cause some dyspepsia and headache and are therefore frequently postponed... ....Not all people bear quinine continued over a long period well and they may show symptoms of quininism. Occasionally an individual is hypersensi-

tive to quinine and may show symptoms even following an initial dose. On the first appearance of quininism the drug should be stopped for a time or arsenical treatment substituted ....Quinine prophylaxis should be supported by measures to prevent mosquito-bites as far as practicable.. In subtropical regions or where mosquitoes hibernate in dark places in rooms of homes, cellars, stables, out-houses and such places, often attaching themselves to cob-webs, they should systematically be killed directly or by fumigation. The breeding-place of the mosquitoes is any still water on which they lay their eggs .... A female mosquito lays about 250 eggs at one time and in seven to ten days brings them to maturity. The young aquatic forms may be destroyed by larvicides such as kerosene, waste oil, cresol or 'parisgreen' .... Anopheline mosquitoes do not attack until sunset, when one may remain as far as possible indoors in houses, bungalows and huts protected by a close-mesh wire or netted windows and double doors; a bed or head net should cover any exposed part of the body during sleep. In the early evening the wearing of puttees by men and a paper-lining

under the stockings by women prevents bites on the legs."

উপরিলিখিত ইংরাজী অংশের সার মর্ম্ম এই যে—

(১) জলনিকাশের বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। কোন স্থানে জল জমিলেই তাহা মশকের বাসস্থান হইবে। (২) জলাশয়গুলির ধারে ধারে কেরোসিন ছড়াইয়া দিতে হইবে, কারণ মশকের ডিম জলাশয়ের ধারেই থাকে। স্রোতস্বতী অর্থাৎ যাহাতে স্রোত বহিতেছে তাহাতে মশক ডিম পাড়িতে পারে না। (৩) জঙ্গল পরিষ্কার করিতে হইবে। (৪) ঘরের জানালাগুলির ভিতর দিয়া যাহাতে মশক না প্রবেশ করিতে পারে, এই নিমিত্ত ধাতব জাল লাগাইতে হইবে। (৫) বিছানায় মশারি ব্যবহার করিতে হইবে। (৬) কুইনিন দশগ্রেণ কিম্বা পাঁচগ্রেণ করিয়া ম্যাল্যারিয়ার সময় প্রত্যহ খাইতে হইবে। প্রাতে খালি পেটে খাওয়াই ভাল। কুইনিন সেবনের পূর্ব্বে ক্যাষ্টর অইল (**Castor oil**) কিম্বা অন্য কোন মৃদু বিরেচক দ্বারা অন্ত্র পরিষ্কারকরা আবশ্যক। (৭) ম্যাল্যারিয়া আক্রমণ করিলে ঐরূপ মৃদু বিরেচক দ্বারা পেট পরিষ্কার করিয়া দৈনিক কুড়িগ্রেণ পর্য্যন্ত কুইনিন ব্যবহার করিতে হইবে; যে সময়ে জ্বর কমিয়া যাইতেছে এবং ঘর্ম্ম হইতেছে, সেই সময়ে কুইনিন প্রযোজ্য। জ্বরের বৃদ্ধির সময়ে কুইনিন প্রয়োগ করিলে প্রায়ই উপকার হয় না, অধিকন্তু মস্তকের যন্ত্রণা হয়। জ্বর ত্যাগ হইবার পরেও অন্ততঃ পোনের দিন দশগ্রেণ কিম্বা পাঁচগ্রেণ করিয়া প্রত্যহ প্রাতে খালিপেটে কুইনিন খাওয়া উচিত। কুইনিনে উপকার না হইলে কখনও **Arsenic**এ উপকার হয়। **Arsenic** সেবন চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে করা আবশ্যক; কারণ **Arsenic** (সেঁকো) একটি প্রবল বিষ। কুইনিন মুখ দিয়া সেবন করিয়া কোন উপকার না হইলে

কুইনিন injectionএ অনেক উপকার হয়। কিন্তু এ বিষয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক। ম্যালারিয়া জ্বর কালাজ্বরে পরিণত হইলেও Urea Stibamine এবং তৎসদৃশ ঔষধের injection বিজ্ঞ চিকিৎসকের সাহায্যে গ্রহণ করিয়া অনেকে এই ভীষণ ব্যাধি হইতে মুক্ত হইতেছেন। কুইনিনের সহিত প্ল্যাস্‌মকিন (Plasmochin) দ্বারা বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ে রোগীর চিকিৎসা আরম্ভ করিলে ম্যাল্যারিয়া রোগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করা যায়, ইহা আধুনিক মত। কুইনিন সেবন করিতে যদি মস্তক-ঘূর্ণন, কাণে তালা লাগা, শিরঃপীড়া, আমাশয় প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়, কুইনিন বন্ধ করিতে হইবে। (৮) একমাস কুইনিন ইত্যাদি খাইয়া উপকার না হইলে ম্যাল্যারিয়াগ্রস্ত দেশ পরিত্যাগকরিয়া কিছুদিনের জন্য কোন স্বাস্থ্যনিবাসে থাকা বিধেয়। (৯) পানীয় জল নদী কিম্বা নলকূপ হইতে লওয়াই উচিত এবং পান করিবার পূর্ব্বে সিদ্ধ করিয়া শীতল করিয়া লওয়া বিধেয়। কলিকাতার অধিবাসীরা অনেক সময় ম্যাল্যারিয়ার নামে অতিশয় ভয় পান। আমার একজন মাননীয় আত্মীয় আমাদের কাঁচরাপাড়ার বাটীতে আসিলে জলের পরিবর্ত্তে ডাবের জল খাইতেন। তখন আমি এ ভীতির কারণ বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না, কারণ আমরা তখন বৎসরের অধিকাংশ সময় কাঁচরাপাড়াতে অতিবাহিত করিতাম এবং যদিও আমাদের ভাদ্র এবং আশ্বিন মাসে দুই একবার জ্বর হইত, সে জ্বর ৪।৫ দিনের অধিক স্থায়ী হইত না এবং শরীরের বিশেষ কোন ক্ষতি হইত না। যদিও কাঁচরাপাড়াতে ম্যাল্যারিয়ার প্রাদুর্ভাব কথঞ্চিৎ পরিমাণে ছিল, ওলাউঠা, বসন্ত প্রভৃতি সহরের সংক্রামক ব্যাধি এ স্থানে প্রায়ই দৃষ্ট হইত না। কিন্তু আমরা পরে দেখিয়াছিলাম যে যাঁহারা ম্যাল্যারিয়াশূন্য স্থান হইতে ম্যাল্যারিয়াপূর্ণ স্থানে দুই একদিনও

অবস্থান করিতেন, তাঁহাদিগকে এই ব্যাধি ভীষণভাবে আক্রমণ করিত এবং তাঁহাদের জীবনান্ত না হইলেও এই রোগের হস্ত হইতে মুক্তি পাইতে তাঁহাদের বিষম বেগ পাইতে হইত। ইহার কারণ বোধহয় ম্যালা্যরিয়া বিষ যদি ক্রমে ক্রমে কিয়ৎপরিমাণে মনুষ্যদেহে প্রবেশ করে, তাঁহা হইলে ইহা কখন কখন রোগ প্রতিষেধকরিবার শক্তি (**immunity**) প্রদান করে। এই বিষয়ে একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে আমাদের ম্যাল্যারিয়া-ক্লিষ্ট গ্রামেও দীর্ঘজীবী (সত্তর, আশী বৎসর বয়স্ক) লোকের অভাব ছিল না। শুনিয়াছি পক্ষাঘাতগ্রস্থ রোগীর শরীরে ম্যাল্যারিয়া বিষ সঞ্চারিত করিতে পারিলে পক্ষাঘাতের উপকার হয়।

বর্ত্তমান বিজপুরের এবং কাঁচরাপাড়া গ্রামের অবস্থা তুলনাকরিলে আমি যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি তাহার সত্যতা সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ থাকিবে না। বিজপুর কাঁচরাপাড়া গ্রাম হইতে তিন মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে। বিজপুরকেও কাঁচরাপাড়া বলে। যে সময়ে কাঁচরাপাড়া সমৃদ্ধি-শালী গ্রাম ছিল, সে সময় বিজপুর কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গলপূর্ণ দস্যুগণের বাস-স্থান ছিল। এক্ষণে সেই বিজপুরে কাঁচরাপাড়া-ডাকঘর, পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের কাঁচরাপাড়া ষ্টেশান এবং বৃহৎ কারখানা স্থাপিত হওয়ায়, ইহা অনেক বিষয়ে কলিকাতার সমকক্ষ হইয়াছে। ভাল ড্রেন, পরিস্রুত জল, বৈদ্যুতিক আলো, শিল্প এবং সাধারণ বিদ্যালয়, চিকিৎসাগার, সভাগৃহ এই স্থানের অধিবাসীদিগের দৈহিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উৎকর্ষ সাধন করিতেছে এবং ম্যাল্যারিয়াপূর্ণ গ্রামসমূহের মধ্যে বিজপুর স্বাস্থ্য-নিবাস বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

এই গ্রামের অবনতির দ্বিতীয় কারণ—ভাগীরথীর অবনতি এবং কাঁচরাপাড়া গ্রাম হইতে পশ্চিম দিকে অপসারিত হওয়া। পূর্ব্বে এই নদী

কাঁচরাপাড়ার নিকট দিয়া প্রবাহিত হইত। কিন্তু এক্ষণে ভাগীরথী-গর্ভ এবং কাঁচরাপাড়া গ্রামের মাঝে প্রায় এক মাইলের ব্যবধান হইয়াছে। ভাগীরথী দূরে যাওয়ার জন্য ব্যবসায় এবং স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইয়াছে। গঙ্গার স্বাস্থ্যকর জলের পরিবর্ত্তে গ্রামবাসীদিগকে পঙ্কিল, পানা ও দাম-পূর্ণ পুষ্করিণীর জল ব্যবহারকরিতে হইতেছে। পূর্ব্বে অনেকে প্রত্যহ ভাগীরথীতে প্রাতঃস্নান করিতেন এবং ম্যাল্যারিয়া সত্বেও স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সে সুবিধা আর নাই।

এই গ্রামের অবনতির তৃতীয় কারণ—বিশিষ্ট অধিবাসীদিগের জীবিকা-অর্জ্জন-ব্যপদেশে জন্মভূমি-ত্যাগ। কাঁচরাপাড়ার অনেক শিক্ষিত অধিবাসী এবং তাঁহাদের বংশধর কলিকাতায় এখনও অবস্থান করিতেছেন। কেহ কেহ পাটনার, এলাহাবাদের, আজমীরের এবং অন্যান্য নগরের স্থায়ী অধিবাসী হইয়াছেন। ইঁহাদিগের ভিতর অনেকেই তাঁহাদের গ্রামের সহিত সংস্রব একেবারেই ত্যাগ করিয়াছেন। কেহ কেহ বৎসরে একবার কিম্বা দুইবার দুই এক ঘণ্টার জন্য তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের বাসস্থানে গিয়া ঘরবাড়ী দেখিয়া আসেন। যাঁহারা কলিকাতাতে বাস করেন তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই দুইটী সংসারের ভার বহনকরিতে অক্ষম। যাঁহারা সক্ষম এবং সহরের সুবিধা ভোগ করিতেছেন, তাঁহারা নানাপ্রকার অসুবিধা-পূর্ণ গ্রামে যাইয়া বাস করিতে একেবারেই অভিলাষী নহেন। এমন কি যাঁহারা জীবিকার্জ্জনের জন্য বিজপুরে বাস করিতেছেন, তাঁহারাও ঐ স্বাস্থ্যকর এবং নানা-প্রকার সুবিধাযুক্ত স্থানেব স্থায়ী অধিবাসী হইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

এই গ্রামের উন্নতি করিতে হইলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি আবশ্যক। জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে জঙ্গল আপনা হইতেই অপসারিত হইবে এবং

পুষ্করিণীগুলি সংস্কৃত হইবে, ভাল বিদ্যালয়, পাঠাগার ইত্যাদি স্থাপিত হইবে এবং অন্যান্য অসুবিধাও ক্রমশঃ দূরীভূত হইবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইলে রেলওয়ে মাসিক টিকিটের মূল্য হ্রাসকরিতে হইবে। কাঁচরাপাড়া-গ্রামের চরে যে রেল গিয়াছে তাহাতে অন্ততঃ প্রাতে ষ্টেশান অভিমুখে একখানি এবং অপরাহ্নে গ্রাম অভিমুখে আর একখানি যাত্রী-ট্রেনের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ইহা গবর্ণমেণ্ট না করিলে আর কেহ করিতে পারিবেন না। ছোটলাট লর্ড রোনাল্‌ড্‌সের সময়ে বাগেরখাল সংস্কারের কথা উঠিয়াছিল। এই জল-প্রণালী সংস্কৃত হইলে কেবল যে বাণিজ্যের সুবিধা হইত তাহা নহে, অনেকগুলি গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির প্রধান সহায়কও হইত। গ্রামে যাঁহারা আছেন তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ চারি পাঁচজন উৎসাহী যুবকের অভাব নাই। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য এই সকল যুবকের একটী সভা গঠন করা উচিত। তাহাতে বিদেশে বিশেষতঃ কলিকাতায় কাঁচরাপাড়া-নিবাসী ভদ্রলোকদিগকে নিমন্ত্রণকরা কর্ত্তব্য এবং সুবিধা হইলে ইঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গ্রামের অভাবগুলিতে তাঁহাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণকরা উচিত। প্রত্যেক রবিবারে কিম্বা মাসের ভিতর দুইটী রবিবারে এইরূপ সভার অধিবেশন বাঞ্ছনীয়।

গ্রামের লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইলে যাহাতে এখানে কোন উন্নতিশীল ব্যবসায় স্থাপিত হয়, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। কেহ যদি কাপড়ের, পাটের, কাগজের কিম্বা অন্য কোন অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যপ্রস্তুতের জন্য কারখানা স্থাপিত করিতে চান, তাঁহাকে এই বিষয়ে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিতে হইবে। কারখানা স্থাপিত হইলে কিছু অসুবিধা আছে, যেমন মদের দোকানের, মদ্যপের এবং চোরের সংখ্যা এই সকল জনবহুল স্থানে স্বতঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু ইহা নিশ্চিত

যে ইহাতে সুবিধা অসুবিধা অপেক্ষা অনেক অধিক আছে। আমরা কাঁচরাপাড়া গ্রামের সহিত বিজপুর, হালিসহর, নৈহাটী, কাকনাড়া, শ্যামনগর, ইছাপুর ইত্যাদি গ্রামের তুলনা করিলেই ইহা বেশ বুঝিতে পারিব। কারখানার জন্য এই সকল স্থান হইতে জঙ্গল অপসারিত হইয়াছে, ভাল পথ প্রস্তুত হইয়াছে; রেলওয়ের বাঁধ থাকা সত্ত্বেও জল-নিকাশের বন্দোবস্ত হইয়াছে, বৈদ্যুতিক আলোক এবং পরিস্রুত জলের ব্যবস্থা হইয়াছে, এবং উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়, পাঠাগার ও চিকিৎসাগার স্থাপিত হইয়াছে।

আমাদিগের উক্ত মন্তব্য বঙ্গদেশের অধিকাংশ পল্লীগ্রামের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। বাঙ্গালী জাতির উন্নতিসাধন করিতে হইলে এই সকল গ্রামকে উন্নত করিতেই হইবে এবং এই কার্য্যে গ্রামের সমস্ত শিক্ষিত যুবকের অগ্রণী হইতে হইবে। তাঁহাদিগের কেহ কেহ জীবিকা-অর্জ্জন কিম্বা উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে থাকেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদিগের অফীস, স্কুল ও কলেজের ছুটীর সময়ে তাঁহারা দেশে সহজেই আসিতে পারেন। এইরূপ অধিকাংশ সময়ে তাঁহারা তাঁহাদিগের কিম্বা তাঁহাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের জন্মস্থানের উন্নতির জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে পারেন। তাঁহাদিগের অনেকের অর্থাভাব সত্য, কিন্তু তাঁহাদিগের উৎসাহের অভাব নাই। এই উৎসাহশীল শিক্ষিত যুবকবৃন্দ মিলিত হইয়া দেশের ধনশালী লোকদিগের নিকট যাইয়া গ্রামের অভাবের বিষয় জ্ঞাত করাইতে পারেন এবং তাঁহাদিগের সহানুভূতি ও অর্থসাহায্য প্রার্থনা করিতে পারেন। যদি যুবকদিগের অকপট আগ্রহ থাকে, ঈশ্বর তাঁহাদিগের ইচ্ছা অচিরে ফলবতী করিবেন। ইঁহাদিগের চেষ্টাতে এই সকল গ্রাম স্বাস্থ্যকর স্থানে পরিণত হইলে, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভূমি ও গৃহের মূল্য বর্দ্ধিত হইবে এবং কৃষির উন্নতি হওয়াতে ফল ও

শস্য অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইবে এবং অর্থাভাবও অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইবে। কিন্তু কৃষিকার্য্যে কেবল মজুরদিগকে নিযুক্ত করিলে চলিবে না, তাঁহাদিগের নিজেদের 'হাতেকলমে' পরিশ্রম করিতে হইবে।

এই সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য যে আমাদিগের গ্রামসকলের উন্নতি "হরিজন"দিগের উন্নতির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। সেইজন্য প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া নৈশ বিদ্যালয় আবশ্যক এবং প্রত্যেক বিদ্যালয়ের সহিত একটী করিয়া ক্ষুদ্র আদর্শ কৃষিক্ষেত্র সংযুক্ত করা উচিত। এই ভূমিতে স্বল্পব্যয়ে কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত প্রথায় কৃষিজাত দ্রব্য যে উৎপন্ন হইতে পারে তাহা প্রদর্শনকরা আবশ্যক। হাওড়া জেলার ডেপুটী ইন্‌স্‌পেক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে বলিয়াছেন যে এই জেলার তুইটী বিদ্যালয়ে এইরূপ কৃষি-শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে এবং সেই বিদ্যালয়ের চতুর্থ হইতে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রদিগকে 'হাতেকলমে' কৃষিকার্য্য শিখিতে বাধ্য করা হইতেছে। এই প্রসঙ্গে তিনি পাঞ্জাবের হস্তচালিত লাঙ্গলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই লাঙ্গলদ্বারা ভূমি সহজেই গভীরতর করিয়া খনন করা যায়। এই আদর্শ কৃষি-ক্ষেত্রে অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য উৎপাদনের সহিত ভাল তূলা উৎপাদন এবং এই বিদ্যালয়ে উন্নত চরকা ও হস্তচালিত তাঁতের দ্বারা সূত্র ও বস্ত্র বয়ন ও শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজনীয়। এইরূপ বিদ্যালয়ের জন্য গ্রামবাসী, গ্রামের অধিবাসী কিন্তু আপাততঃ প্রবাসী এবং অন্যান্য দানশীল ব্যক্তির এবং গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা আবশ্যক। এ সকল বিদ্যালয়ের সহিত রাজনীতির (**Politics**) কোন সম্পর্ক থাকিবে না, ইহা বলা বাহুল্য-মাত্র।

নিম্নবঙ্গে বাঁশ ও হলুদের চাষ অল্পব্যয়ে এবং অল্প পরিশ্রমে হইতে

পারে। হলুদ 'আওতাতে'ও জন্মায়। বৎসরে একবার করিয়া পরিশ্রম করিতে পরিলেই সম্বৎসরের সংসারের জন্য হলুদ রাখিলেও বিক্রয় করিবার নিমিত্ত অনেক হলুদ অবশিষ্ট থাকে। কলিকাতায় বাঁশ টাকায় তিন-খানার অধিক পাওয়া যায় না। এক ঝাড় বাঁশ হইতে বাৎসরিক তিন চারি টাকা আয় হইতে পারে। কেবল দেখিতে হইবে বাঁশের 'কোঁড়' গুলি গরু ও ছাগলে না নষ্ট করে ; সেই জন্য কাঁটা দিয়া ঝাড় ঘিরিয়া রাখা আবশ্যক। ভাল বেল, কলা ও পেঁপে হইতেও বেশ আয় হয়। কলিকাতায় একটী পাকা পেঁপে চারি আনা পাচ আনাতেও বিক্রীত হয়। বাগানের বেড়ার ভিতরে সেগুন গাছ পুঁতিলে ইহা বেড়ার কার্য্য করে এবং ভবিষ্যতে মূল্যবান্ কাষ্ঠ উৎপাদন করে।

বিজ্ঞানসম্মত কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিলে যে কেবল কৃষকদিগের উন্নতি হইবে তাহা নহে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকেরা যাঁহারা বর্ত্তমানে বিশেষ-ভাবে অর্থকষ্ট অনুভব করিতেছেন, তাঁহাদিগের শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যোন্নতির সহিত তাঁহাদিগের সাংসারিক অবস্থারও উন্নতি নিশ্চিত হইবে।

এই যুবকসঙ্ঘের ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড হইতে প্রত্যেক বৎসর অর্থ-সংগ্রহ করা উচিত এবং গ্রামের সমস্ত পল্লীর রাস্তার উন্নতিবিধানে এই টাকা ব্যয় করা উচিত। যাহাতে প্রত্যেক পাড়ায় একটী নলকূপ খনিত হয় তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড হইতে টাকা-সংগ্রহের জন্য এবং গ্রামের বিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্য দেশের ধনশালী অধিবাসী এবং প্রবাসী ভদ্রলোকদিগের সহিত এবং জেলার ও মহকুমার রাজপুরুষদিগের সহিত সদ্ভাব রাখিতে হইবে, তাঁহাদিগের সহিত মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ করিতে হইবে ও তাঁহাদিগের পরামর্শ লইতে হইবে এবং নিম্নলিখিত দুইটী স্মৃতি-সভাতে তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে।

প্রতিবৎসর একটী স্মৃতিসভা কবিবর ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জন্মের কিম্বা মৃত্যুর দিনে আহুত করা আবশ্যক। গুপ্তকবি বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ২৫শে ফাল্গুন, ১২১৮ সাল অথবা ১৮১২ খৃষ্টাব্দে কাঁচরাপাড়াতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ১০ই মাঘ, ১২৬৫ সালে অর্থাৎ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। অতএব ১০ই মাঘ কিম্বা ২৫শে ফাল্গুন তাঁহার স্মৃতি-তর্পণের জন্য সভা আহুত করা আবশ্যক। এ সভা এই গ্রামের জগদ্ধাত্রীতলায় গুপ্ত মহাশয়ের বাটীর নিকটে হইলে ভাল হয়। কিন্তু সুবিধার জন্য কৃষ্ণদেব রায়ের মন্দির প্রাঙ্গণে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে কাঁচরাপাড়া-অধিবাসীদিগের উদ্যোগে এবং রাণাঘাট মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের সভাপতিত্বে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের একটী স্মৃতিফলক তাঁহার কাঁচরাপাড়ার বাসস্থানে স্থাপিত হইয়াছে।

ঈশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। বিশ্বকোষ-প্রণেতা বলিয়াছেন "হাস্যরসে কবিতা লিখিয়া তাঁহার সমকক্ষ কেহ হইতে পারেন নাই।" তাঁহার সংবাদপ্রভাকর সেই সময়ের দেশীয় সংবাদপত্র সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। তিনি কবি হইলেও প্রত্নতত্ত্ব অবহেলা করেন নাই। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া প্রাচীন গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ ও রাজবল্লভের নষ্টকীর্ত্তি প্রভৃতি দর্শন-পূর্ব্বক তাঁহার কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। এ ছাড়া আদিশূরের যজ্ঞস্থলের ইতিবৃত্তও প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় দশ বর্ষকাল নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া রামপ্রসাদ সেন, রামনিধি সেন (নিধুবাবু), হরুঠাকুর, রামবসু, নিতাই দাস বৈরাগী, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, রাসু ও নৃসিংহ প্রভৃতি অনেকগুলি প্রাচীন খ্যাতনামা বাঙ্গালী কবির জীবন-চরিত, গীত ও পদাবলী প্রকাশ করিয়াছিলেন। তৎপরে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের জীবনী ও লুপ্তপ্রায় কবিতা বহু পরিশ্রমে সংগ্রহকরিয়া

১২৬২ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাস্তবিক প্রাচীন বাঙ্গালা কবির জীবনবৃত্তাদি উদ্ধারপক্ষে ঈশ্বরচন্দ্রই প্রথম ও প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

ঈশ্বরগুপ্ত কতবড় কবি ছিলেন জানিতে হইলে তাঁহার কবিতাবলী এবং প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত তাঁহার জীবনচরিত পাঠকরা নিতান্ত আবশ্যক।

পল্লীগ্রামে তাঁহার জন্ম হইলেও কলিকাতা সহরে তিনি অনেক সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন; সেইজন্য তিনি সহরের এবং পল্লী-গ্রামের সমাজকে যথাযথভাবে বর্ণনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সমাজের দোষগুণ সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা ছিল এবং দোষগুলি তাঁহার ব্যঙ্গের বিষয়ীভূত হইয়াছিল। তিনি মেকি অর্থাৎ অসত্য একেবারেই ভালবাসিতেন না এবং ইহাকে কশাঘাত করিতে বিরত হন নাই, কিন্তু তাঁহার ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ ছিল না। কাহারও অনিষ্ট কামনাকরিয়া তিনি কাহাকেও গালি দেন নাই। খাঁটি বাঙ্গা-লীর আচার ব্যবহার এবং সে সময়ের বাঙ্গালার প্রকৃত অবস্থা, এরূপ হৃদয়গ্রাহী করিয়া আর কেহ বর্ণনা করিতে সক্ষম হন নাই। আমরা স্বীকার করি তাঁহার কবিতাতে শ্লেষ ও অনুপ্রাসের বাহুল্য আছে, কিন্তু ব্যঙ্গাত্মক কবিতা হইতে শ্লেষ ও অনুপ্রাস একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। এখনকার মত সে সময়ে (১২৬৪ সালে অর্থাৎ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে, সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে) জনসাধারণের অর্থাভাব হইয়াছিল। শারদা-গমে লোকের অবস্থাশীর্ষক পদ্যে কবি দুর্গাপূজার পূর্ব্বে লোকের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল বর্ণনা করিতেছেন—

"এইরূপ ঘরে ঘরে প্রতি জনে জনে।
কোনরূপ সুখ নাই মানুষের মনে ॥

গড়েছে তোমারে বটে খড় মাটী দিয়া।
কিন্তু সব মাটী হয় ভাবিয়া ভাবিয়া॥
কি হইবে কি করিবে ভেবে লোক মরে।
দেনা ঝাঁক্তি হাত খাঁক্তি চাক্তি নাই ঘরে॥
রূপা সোণা সব গেল জাহাজেতে ভেসে।
কার কাছে ধার পাব টাকা নাই দেশে॥
দোকানী পসারি যত আছে মাত্র ঠাটে।
ডাকের সে ডাক নাই জাঁক নাই হাটে॥
কাপুড়ে সাপুড়ে প্রায় স্বধু ঘর খোঁজে।
সস্তাদরে ছাড়ে তবু বস্তা যায় পচে॥"

কুলীনদিগের বহুবিবাহ ইত্যাদি কিরূপ দূষণীয় নিম্নলিখিত কৌলীন্য নামক পদ্য হইতে অনুমিত হইবে—

"মিছা কেন কুল নিয়া কর আঁটা-আঁটি।
এযে কুল কুল নয় সার মাত্র আঁটি॥
কুলের গৌরব কর কোন্ অভিমানে।
মূলের হইলে দোষ কেবা তারে মানে॥
ঘটকের মুখে শুধু কুলীনের চোপা।
রস নাই যশ কিসে কুল হ'ল টোপা॥

* * * *

কুলের সম্ভ্রম বল করিব কেমনে।
শতেক বিধবা হয় একের মরণে॥
বগলেতে বৃষকাষ্ঠ শক্তিহীন যেই।
কোলের কুমারী লয়ে বিয়ে করে সেই॥

* * * *

হে বিভু করুণাময় বিনয় আমার।
এ দেশের কুলধর্ম্ম করহ সংহার॥"

তখনকার বধূদিগের প্রতি শ্বাশুড়ী ও ননদ কিরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহার দৃষ্টান্ত কবির "পৌষ-পার্ব্বণে" আছে—

"বধূর রন্ধনে যদি যায় তাহা এঁকে।
শ্বাশুড়ী ননদ কত কথা কয় বেঁকে॥
হ্যাঁলো বউ কি করলি দে'খে মন চটে।
এই রান্না শিখেছিস্ মায়ের নিকটে?
সাত জন্ম ভাত বিনা মরি যদি দুঃখে।
তথাচ এমন রান্না নাহি দিই মুখে॥"
বধূর মধুর খনি মুখ-শতদল।
সলিলে ভাসিয়া যায় চক্ষু ছল ছল॥
আহা তার হাহাকার বুঝিবার নয়।
ফুটিতে না পারে কিছু মনে মনে রয়॥
ভাগ্যফলে রান্না সব ভাল হয় যাঁর।
ঠ্যাকারেতে মাটীতে পা নাহি পড়ে তাঁর॥
হাসি হাসি মুখখানি অপরূপ আড়া।
বেঁকে বেঁকে যান্ গিন্নী দিয়ে নথ নাড়া॥
"হ্যাঁগা দিদি এই শাক রাঁধিয়াছি রেতে।
মাথা খাও সত্তি বল ভাল লাগে খেতে?"
"দিব্বি দিস কেন বোন্ হেন কথা কয়ে?
ষাট্ ষাট্ বেঁচে থাক জন্ম এয়ো হয়ে॥

পুরুষেরা ভাল সব বলিয়াছে খেয়ে।
ভাল রান্না রেঁধেছিস ধন্য তুই মেয়ে ॥”

সে সময়ে বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে কিরূপ বাগ্-বিতণ্ডা হইয়াছিল, তাহার চিত্র তাঁহার “বিধবা-বিবাহ” কবিতাতে বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।—

বাধিয়াছে দলাদলি লাগিয়াছে গোল।
বিধবার বিয়ে হবে বাজিয়াছে ঢোল ॥
কত বাদী প্রতিবাদী করে কত রব।
ছেলে বুড়ো আদি করি মাতিয়াছে সব।

*　　*　　*　　*

পোড়ামুখ পোড়াইয়া কোন পোড়ামুখী।
‘দুখী’ ‘সুখী’ মেয়ে ফেলে কেঁচে হবে খুকী ॥
ব্যাটা আছে যার তার বেলগাছ এঁচে।
তুড়ী মেরে থুড়ী ব’লে সে বসিবে কেঁচে ॥
গমনের আয়োজন শমনের ঘরে।
বিবাহের সাধ সে কি মনে আর করে ॥

সকলেই এইরূপ বলাবলি করে।
ছুঁড়ীর কল্যাণে যেন বুড়ী নাহি তরে ॥
শরীর পড়েছে ঝুলি চুলগুলি পাকা।
কে ধরাবে মাছ তারে কে পরাবে শাঁখা।
জ্ঞানহারা হয়ে যাই নাহি পাই ধ্যানে।
কে পাইবে “সৎবাপ” মায়ের কল্যাণে ॥” [১]

১। আমরা ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা ও বঙ্কিমবাবুর মত বসুমতী-সংস্করণ হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

ছানাবিহীন, চিনি-বহুল সন্দেশ দুই ছত্রে কবি কিরূপ বর্ণনা করিয়াছেন দেখুন—

"শাদা শাদা মণ্ডাগুলি দানা সরু সরু,
চারকোশ পথে তার চরে নাই গরু !"

কৃপণতা-বিষয়ের কবিতায় কবি কিরূপ সামান্য কথায় হাস্যের উদ্রেক করিয়াছেন—

"লক্ষ্মীছাড়া হও যদি খেয়ে আর দিয়ে ।
কিছুমাত্র লাভ নাই, হেন লক্ষ্মী নিয়ে ॥
যতক্ষণ থাকে ধন তোমার আগারে ।
খাও আর খেতে দাও সাধ্য অনুসারে ॥
ইতে যদি কমলার মন নাহি সরে ।
প্যাঁচা নিয়ে যান মাতা কৃপণের ঘরে ॥"

তাঁহার দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে (১৮৫৯ খৃঃ) রচিত বাঙ্গালীর মেয়ে-শীর্ষক কবিতা ভবিষ্যদ্‌বাণীস্বরূপ হইলেও, ইহাতে সামান্য অতিরঞ্জন আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। অতিরঞ্জন (hyperbole অতিশয়োক্তি) হাস্যরসের অন্যতম প্রধান উপাদান—

"লক্ষ্মী মেয়ে যারা ছিল,
তারাই এখন চড়বে ঘোড়া, চড়বে ঘোড়া !
ঠাঠ ঠমকে চালাক চতুর
সভ্য হবে থোড়া থোড়া !!
আর কি এরা এমন কোরে,
সাঁজ সেঁজুতির ব্রত নেবে ?
আর কি এরা আদর কোরে,
পিঁড়ি পেতে অন্ন দেবে ?

কপালে যা লেখা আছে,
তার ফল তো হবেই হবে!
(এরা) এ, বি পোড়ে বিবি সেজে
বিলিতী বোল কবেই কবে!
(এরা) পর্দ্দা তুলে ঘোমটা খুলে,
সেজে গুজে সভায় যাবে!
ড্যাম্ হিন্দুয়ানী বোলে,—
বিন্দু বিন্দু ব্র্যাণ্ডি খাবে!
আর কিছুদিন থাকলে বেঁচে,
সবাই দেখতে পাবেই পাবে!
(এরা) আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী,
গড়ের মাঠের হাওয়া খাবে!"

দুর্ভিক্ষের করালমূর্ত্তির বর্ণনায় কবি করুণরসের সহিত হাস্যরসের কিরূপ বিমিশ্রণ করিয়াছেন, তাহার একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে দিলাম—

পৌষড়ার গীত।

"এবারে বছরকার দিন কপালে ভাই,
জুট্‌লো নাক পুলিপিটে।
যে মাগ্‌গির বাজার, হাজার, হাজার,
মোর্চ্চেছে লোক কপাল পিটে॥
ভাত না পেয়ে উদর ভোরে,
কত দুঃখী গেল মোরে,
চেলের বাজার সস্তা ক'রে,
দেয় না রাজা ঢেঁড়া পিঠে॥

ঘরে হাঁড়ি ঠঙ্ঠনাস্তি,
মশা মাছি ভন্‌ভনাস্তি,
শীতে শরীর কন্‌কনাস্তি,
একটু কাপড় নাইক পিঠে ॥

দারা পুত্র হন্‌হনাস্তি,
অস্তি নাস্তি ন জানাস্তি,
দিবে রাত্রি খেতে চাস্তি,
আমি ব্যাটা মরি খেটে ॥

আদ্‌পেটা ভাত কদিন খাবো,
দুদিনেই ত ম'রে যাবো,
পেটের জ্বালায় জ্বলে বুঝি,
বেচতে হলো কোটা-ভিটে ॥

ভিটে গেলে যথা তথা,
'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা',
রামপ্রসাদী গীত গেয়ে শেষ,
কাঁদতে হবে ব'সে ঘাটে ॥

ফস্কে গেলো 'আস্কে' খাওয়া,
ছেলের পানে যায় না চাওয়া,
তিল নারকেল তেলের দাওয়া,
টাকায় দুখান নাগরী চিটে ॥

গিন্নী মাগীর বদন বাঁকা,
হাতে মাত্র দুগাছ শাঁকা,
সময়ে না পেলে টাকা,
কপাল ভাঙে আস্ত ইটে ॥

রুক্ষ হাত নিয়ে ঘরে,
কাছেতে দাঁড়ালে পরে,
'ড্যাকৃরা বুড়ো ন্যাকৃরা করিস্'
ব'লে দেবে থ্যাংরা পিঠে ॥"

'বর্ষার অধিকারে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব' শীর্ষক কবিতায় হাস্যরসিক কবি বঙ্গের বিবিধশ্রেণীর অধিবাসীদিগের অবস্থা কিরূপ যথাযথ বর্ণনা করিয়াছেন দেখুন—

"পাতে মাত্র দিই হাত কে খায় গরম ভাত,
পোড়ে থাকে ব্যঞ্জন সকল।
কেবল অম্বল খাই, পেটের সম্বল তাই,
টম্বল, টম্বল ঢালি জল ॥
উহু উহু রাম রাম, পচিয়া গায়ের চাম,
ঘাম ফুঁড়ে ঘামাচি নির্গত।
দাদ কণ্ডূ সব গায়, নাটুরে মাঝির প্রায়,
সাজিলেন বাবু ভেয়ে যত ॥
শুদ্ধাচার যাঁরা শুচি, কালভেদে হাড়ি মুচি,
আচার হইল রাখা দায়।
খেতে ব'সে চুলকুনি, মেলিয়া নখের কুণি,
এঁটো হাত দিতে হয় গায় ॥
পূজা সন্ধ্যা নাহি ঘটে, পিপাসায় ছাতি ফাটে,
ফেলে দিয়ে ফুল বিল্বদল।
ঠাকুরে ঠেকায়ে কলা, বিস্তার করিয়া গলা,
কোশা ধ'রে গালে ঢালে জল ॥

যাহারা সকাল খায়, তারা সব বেঁচে যায়,
পরে আর কে করে আহার।
কিঞ্চিৎ হইলে বেলা, আকাশে অগ্নির খেলা,
সে ঠেলায় প্রাণ বাঁচা ভার॥
পশ্চিমের যত খোট্টা, নাহি খায় চানা ভোট্টা,
পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত।
লোটা লোটা সিদ্ধি খেয়ে খাটিয়ায় গীত গেয়ে,
প'ড়ে প'ড়ে খ্যা'ল দেখে কত॥
উড়ে বলে হোরে ভাই, সেটি গেলা কাঁই পাই,
... ...
লুগা পাট্টা নেরে নেরে, ঠাণ্ডা জড় আনি দেরে,
খরারে মো হঁসা উড়ি গলা॥

* * * *

(গ্রাম্য মুসলমানেরা বলিতেছেন—)
হাঁ্যাতুবারি খেনু ব্যাল, প্যাটেতে মাখিনু ত্যাল,
নাতি তবু নিদ্ নাহি হয়॥
এঁদে দেয় ফুফ্ নানী, কুলুই ডেলের পাণি,
কাঁ্যাচাক্যালা কেচুর ছালন।
বাগুণ ফলেনি গাছে, বালবাচ্ছা কিসে বাঁচে,
কিনে খেতে তেকার মরণ॥
আসমানে পানি নাই, পৌঁজিতে কি ন্যাখে ভাই,
বরাহ্মণে পুচ কর গিয়া।
খোদা তালা নাজা করে, চেনি খাই প্যাট ভরে,
মোট বই ন্যাপ বিছাইয়া॥

আনি দে ... ... বাই, হীতল হলিল খাই,
বাঙ্গাল বলিছে মরি প্রাণে।
ঢাহা যামু টাহা পামু, গাটে নামু আটে খামু,
বগবতী বৈরব কোহানে॥
হিব হিব, অরি অরি, হুজ্জির হুত্তাপে মরি,
গরে যামু কেম্বাই করিয়া।
বীমাবত্তা বগমান্, আমগান্ রাখ জান্,
পূজা দিমু ড্যাড় আনা দিয়া॥

* * * *

শাখীপরে পাখী সব, অবিরত হতরব,
আহার-বিহার নাহি করে।
নীড়মাঝে ভিড় নাই, যে কিছু শুনিতে পাই,
বিলাপের ব্যাখ্যা সেই স্বরে॥
গেল বছরের আশা, গালে হাত দিয়ে চাষা,
ব'সে আছে কাছে রেখে হল।
বরষায় নাহি ধারা, ধান্যচারা গেল মারা,
দুই চক্ষে শতধারা জল॥
মিছেমিছি জেঁকেজুঁকে, মাঝে মাঝে ডেকে ডুকে,
ফোঁটা কত হয় বরিষণ।
বসুধার ঘোর তৃষা, সে জলে কি হয় কৃষা,
আঁরো তিনি হন্ জ্বালাতন॥

... ...

বরষায় নাহি বারি, দৈব-বিড়ম্বনা ভারি,
না জানি পাপের কত ভার।

কিসে এত কোপদৃষ্টি, আপনার এই সৃষ্টি,
কেন কর আপনি সংহার ?

*   *   *   *

আর এক ভিক্ষা চাই, দয়া ক'রে দিলে তাই,
কিছুই তো চাহিব না আর।
অহঙ্কার ঘোর ভীষ্ম, মানবের মনে গ্রীষ্ম,
শান্তি জলে করহ সংহার ॥"

আমরা স্বীকার করি যে ঈশ্বরগুপ্তের কতকগুলি কবিতা অশ্লীলতা-দোষে দুষ্ট। বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন এবং আমরাও বিশ্বাস করি যে তাঁহার অশ্লীলতা ইন্দ্রিয়াদির উদ্দীপনের কিম্বা হৃদয়স্থিত কদর্য্য ভাবের অভিব্যক্তির জন্য নহে। তিনি জনসাধারণের সম্মুখে মেকিকে মেকি প্রমাণ করিতে গিয়া রাগান্বিত হইতেন এবং এই অশ্লীলতা তাঁহার ক্রোধ হইতে সমুৎপন্ন হইত।

গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ এবং শীতঋতু বর্ণনায় তাঁহার কবিত্বশক্তি পরি-স্ফুট হইয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ পুনরায় তাঁহার গ্রীষ্ম-বর্ণনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—

"ছারখার হইতেছে অখিল সংসার।
ঘোর রিষ্টি, যায় সৃষ্টি, বৃষ্টি নাই আর ॥
কিবা ধনী কিবা দীন কেহ নাই সুখে।
সবাকার শবাকার হাহাকার মুখে ॥
ক্ষণমাত্র কেহ আর নাহি হয় স্থির।
কার সাধ্য দিনে হয় ঘরের বাহির ॥
শমন তাতের তাতে বালি তাতে ভাই।
তাতে যদি পড়ে পদ রক্ষা আর নাই ॥

তখন অচল হয়ে পড়ে ভূমিতল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥"

শীত

"জলের উঠেছে দাঁত, কার সাধ্য দেয় হাত,
আঁক্ করে কেটে লয় বাপ্।
কালের স্বভাব দোষ, ডাক ছাড়ে ফোঁস ফোঁস্
জল নয় এযে কাল সাপ ॥

অপুত্রের পুত্রলাভে কত সুখ মনে ভাবে,
যত সুখ রবির কিরণে।
কুটুম্বের কটুবাণী, তাহে ক্লেশ নাহি মানি,
যত ক্লেশ শীত সমীরণে ॥"

গুপ্ত কবির ঋতু-বর্ণনা পুঁথিগত নিয়মানুগ (conventional) ঋতু-বর্ণনা নয়। ইহাতে তাঁহার ঔদরিকতার সামান্য অভিব্যক্তি থাকিলেও তাঁহার অভিজ্ঞতা, বংশপরম্পরাগত চিকিৎসাজ্ঞান এবং ঈশ্বরভক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে। এই বিষয়ে তাঁহার 'হেমন্তে বিবিধ খাদ্য' শীর্ষক পদ্যের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—

"মাঠে এসে শোভায় সকল যাই ভুলে।
কনকের বিভা হরে চণকের ফুলে ॥
ফুলেতে ধরেছে ফল গুটি গুটি সুঁটি।
ইচ্ছা করে দিবানিশি নখ দিয়া খুঁটি ॥
ছাল খুলে মুখে তুলে কচি কচি খাই।
এমন সুখের স্বাদ আর নাহি পাই ॥

কাঁচার খিচুড়ি তার সুধার অধিক।
প্রতি গ্রাসে গ্রাসে হয় রসনা রসিক ॥
পাকাছোলা গুণ ধরে অশেষ প্রকার।
বিশেষ করিয়া সব লিখে উঠা ভার ॥
অগ্নির দীপন করে ভিজে হ'লে পর।
বল-বর্ণ-রুচিকর বাত-পিত্ত-হর ॥
সে ছোলার জল হয় অতি উপকারী।
চন্দ্রকরবৎ শীত-পিত্তরোগহারী ॥
ভিজে ছোলা ভেজে খেলে কত উপকার।
পিত্ত কফ হরে করে বলের সঞ্চার ॥
শুষ্কছোলা ভাজা অতি সুখের আহার।
সেই জানে তার মজা দাঁত আছে যার ॥
খোট্টারা এ ছোলা লয় পরম আদরে।
ভাজা খেয়ে, ছাতু খেয়ে দিনপাত করে ॥
স্বভাবে গরম বীর্য্য বহুগুণ ধরে।
অগ্নিজোর না থাকিলে বিপরীত করে ॥
অগ্নিবল না বুঝিয়া যে করে আহার।
সে ছোলা আছোলা হয় পেটে ঢুকে তার ॥

* * * *

ছোলার ডেলের রস অতি গুণকর।
পাকে মধু বাত-কফ-শ্বাসকাস-হর ॥
বল-বৃদ্ধি করে করি উদরে প্রবেশ।
মহারোগে পথ্যবিধি পীনসে বিশেষ ॥
শাক অতি মুখপ্রিয় দন্তশোথ হরে।

ফলের আদর ভারি ঠাকুরের ঘরে ॥
চণকের খোসা খুলে দেখ দেখ নর।
কিরূপ পদার্থ আছে তাহার ভিতর ॥
আত্মা আর জ্যোতি দেহে চণকের প্রায়।
নিয়ত রয়েছে ঢাকা মায়ার খোসায় ॥
আর কেন? সার লও ছাড় নিদ্রাযোগ।
খোসা খুলে কর কর বস্তু কর ভোগ ॥"

এই হাস্যরসকুশল কবি আদি-রসাত্মক পদ্য রচনা করিতে পারিতেন না। এরূপ যদি আমরা মনে করি, তাঁহার প্রতি আমাদিগের অবিচার করা হইবে—তুইটী দৃষ্টান্ত নিম্নে দিলাম—

প্রণয়ের প্রথম চুম্বন।

"প্রণয়-সুখের সার প্রথম চুম্বন।
অপার আনন্দ-প্রদ প্রেমিকের ধন।
আছে বটে অমৃত অমরাবতী-পুরে।
প্রমোদিত করে যাহে যত সব সুরে ॥
উথলয় সুখসিন্ধু পানে এক বিন্দু।
যার আশে গ্রাসে রাহু পূর্ণিমার ইন্দু ॥
সে সুধার ক্ষুধামাত্র নাহি একক্ষণ।
যদি পাই প্রণয়ের প্রথম চুম্বন ॥"

প্রেম

যথার্থ প্রেমের পথে পথিক যে জন।
নির্ম্মল জলের প্রায় স্নিগ্ধ তার মন ॥
শুদ্ধ ভাবে থাকে শুদ্ধ আপনার ভাবে।
প্রিয়জনে প্রিয়-ভাবে আপনার ভাবে ॥

সরল স্বভাবে পায় সন্তোষের সুখ।
ভ্রমে কভু নাহি দেখে ছলনার মুখ॥
রসের বৃক্ষের সেই পরিপূর্ণ রসে।
ভুবন ভুলায় নিজ প্রণয়ের বশে॥
ভাব-তুলি স্নেহে তুলি রঙ্গে রঙ্গ ঘটে।
চিত্ররূপ চিত্র করে হৃদয়ের পটে॥
সুখময় শুকপক্ষী ভাল ভালবাসা।
মানস-বৃক্ষেতে তার মনোহর বাসা॥
প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষণ অনুরাগ ফলে।
পড়া-পাখী না পড়াতে কত বুলি বলে॥
আঁখির উপরে পাখী পালক নাচায়।
প্রতিপক্ষ প্রতি পক্ষ বিপক্ষ নাচায়॥
প্রেমের বিহঙ্গ সেই ভালবাসি মনে।
আদরে পুষেছি তারে হৃদয়-সদনে॥
পোষ-মানা পড়া-পাখী দরিদ্রের ধন।
সাবধানে রাখি কত করিয়া যতন॥
পোড়ালোক পাপচক্ষে দৃষ্টি করে তারে।
আর আমি কোন মতে দেখাব না কারে॥"

বিরহ।

পদ্মবন যৌবন জীবন-সরোবরে।
বিরহ-শিশির তায় শোভাশূন্য করে॥
পাণ্ডুর অধর-রাগ দিন দিন হয়।
নয়ন-পলকে নীল রেখার উদয়॥

বিনোদ বদনচারু বিমল কমলে।
কে দিল কালির দাগ প্রতি দলে দলে ?
লোকে বলে সর্ব্বসুখদাতা ঋতুপতি।
তা হ'লে বিরহী কেন সদা দুঃখমতি ?
সেই চিন্তা, সেই বুদ্ধি, সেই মাত্র ধ্যান।
কিবা দিবা, বিভাবরী একরূপ জ্ঞান॥
অন্ধকার-ময় বিশ্ব দৃশ্য কিছু নয়।
কেবল তাহার রূপ দৃষ্টিমাত্র হয়॥
অন্তরে বাহিরে যারে নিয়ত নিরখে।
তার তরে মোহ যায় আঁখির পলকে॥
এ বড় বিচিত্র ভাব অভাব ঘটায়।
করেতে রতন ধরি রতন হারায়॥
হায়রে বিরহ-দশা কি ভাব তোমার।
স্বপন সহিত তব প্রভেদ কি আর॥
বিচ্ছেদে বিচ্ছেদ হয় নিদ্রার সহিত।
নয়ন-যুগলে করে আলস্য রহিত॥
নিরবধি নীরধারা বৃষ্টি যাহে হয়।
তা হ'তে কেমনে হবে নিদ্রার উদয় ?
প্রণত হয়েছে চক্ষু প্রণয়ের ভরে।
বিরহ বাতাসে তায় শতধারা ঝরে॥

* * * *

সম্প্রতি আমরা আমাদিগের মাতৃভাষাকে আদর করিতে শিখিয়াছি। কিন্তু গুপ্ত মহাশয়ের সময়ে 'ইংরাজী-নবিশ' বলিয়া সমাজে অনেকের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হইত। ইহার ফলে অনেকের কথোপকথনের ভাষা

একপ্রকার ইংরাজী-বাঙ্গালা মিশ্রিত খেচরান্নে পরিণত হইয়াছিল। এক্ষণেও আমাদিগের ভিতর অনেকে একছত্র বিশুদ্ধ বাঙ্গালা—অর্থাৎ বাঙ্গালার সহিত ইংরাজী কথা না মিশাইয়া—কহিতে পারেন না। আমরা এক্ষণেও present দিই, উপহার দিই না; আমাদিগের বন্ধুকে গাড়ী হইতে drop করিয়া দিয়া যাই, নামাইয়া দিই না; আমাদিগের wifeএর অসুখ হয়, স্ত্রীর নহে; রোগে আমাদিগের treatment হয়, চিকিৎসা হয় না; আমাদিগের death হয়, কিন্তু মরিয়া যাই না। এই অনুকরণ-প্রিয়তার বিসদৃশ উপসর্গ আমাদিগের অশন, বসন, ব্যসন, লৌকিকতা বিষয়ে আমাদিগের সমাজের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যজাতির নিকট উপহাসাস্পদ করিতেছে এবং তাঁহারা আমাদিগের মনুষ্যত্বের বিষয়ে সন্দিহান হইতেছেন। অন্যান্য সভ্যজাতির সদ্‌গুণের আমরা যদি নকল করিতাম, তাহা হইলে কাহারও কিছু বলিবার ছিল না। সেদিন একটী বিবাহব্যাপারে দেখিলাম যে একটী বিলাত-প্রত্যাগত বৃদ্ধ বাঙ্গালী ভদ্রলোক কোট্ প্যাণ্ট্ পরিয়া নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। অবশ্য তিনি তাঁহার কার্য্যস্থান হইতে তখন আসেন নাই, তাঁহার গৃহ হইতে আসিয়াছিলেন। আমার সহোদরপ্রতিম দুইটি আত্মীয়ের অকালমৃত্যুর অব্যবহিত পরে সহানুভূতিজ্ঞাপন নিমিত্ত সেই অদ্ভুত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সেই ভদ্রলোকটীকে এই বাটীতে দুইবার আসিতে দেখিয়াছিলাম। সুখের বিষয় এ শ্রেণীর লোকের ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। কারণ এই বিবাহের সময়ে সেই বাটীতেই তাঁহারই একজন বিলাত-প্রত্যাগত আত্মীয় তাঁহার কিছুক্ষণ পরেই ধুতি ও আলোয়ান পরিধান-পূর্ব্বক নিমন্ত্রণ-রক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন। এই প্রকারের আর একটী উচ্চশিক্ষিত বিলাতপ্রত্যাগত বাঙ্গালী ভদ্রলোক কৃষ্ণনগর

কলেজে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কার্য্য-ব্যপদেশে এক রাত্রির জন্য আমাদিগের অতিথি হইয়াছিলেন। তাঁহাকে আমরা আহারের সময়ে কাপড় ছাড়িয়া আমাদিগের প্রদত্ত ধুতি পরিয়া আসনে বসিবার জন্য অনুরোধ করাতে, তিনি প্যাণ্ট্ ছাড়িলেন বটে, কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে ঢিলা ইজের পরিধান করিয়াছিলেন। আমরা স্বীকার করি যে আমরা অনেক সময়ে আমাদিগের ইংরাজী ভাষায় বিদ্যাবত্তা প্রদর্শনকরিবার জন্য এরূপ ইংরাজী কথার অপব্যবহার করি না। আমরা আমাদিগের মনের ভাব প্রকাশকরিবার জন্য উপযুক্ত বাঙ্গালা কঁথা খুঁজিয়া পাইনা বলিয়া কিম্বা তাহার উপযুক্ত বাঙ্গালা কথা নাই বলিয়া কিম্বা শক্তি অথবা সময়-সংক্ষেপের জন্য (যেমন ফুস্‌ফুসাবরণ-প্রদাহ না বলিয়া Pleurisy শব্দ ব্যবহারকরা) এই প্রকার ইংরাজী কথার প্রয়োগ করি।

আমরা এই প্রসঙ্গে গুপ্তকবির 'ভাষা' ও 'মাতৃভাষা'-শীর্ষক কবিতা সকল বঙ্গদেশবাসীকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। শেষোক্ত কবিতাটী সমস্তই আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম—

ভাষা

"হায় হায় পরিতাপে পরিপূর্ণ দেশ।
দেশের ভাষার প্রতি সকলের দ্বেষ॥
অগাধ দুঃখের জলে সদা ভাসে ভাষা।
কোনমতে নাহি তার জীবনের আশা॥
নিশাযোগে নলিনী যেরূপ হয় ক্ষীণা।
বঙ্গভাষা সেইরূপ দিন দিন দীনা॥
অপমান অনাদর প্রতি ঘরে ঘরে।
কোন মতে কেহ নাহি সমাদর করে॥"

মাতৃভাষা

মায়ের কোলেতে শুয়ে উরুতে মস্তক থুয়ে,
খল খল সহাস্য বদন।
অধরে অমৃত ক্ষরে, আধো আধো মৃদুস্বরে,
আধো আধো বচন-রচন॥
কহিতে অন্তরে আশা, মুখে নাহি ফুটে ভাষা,
ব্যাকুল হয়েছে কত তায়॥
মা-ম্মা-মা-মা-বা-ব্বা-বা-বা, আবো আবো, আবা আবা,
সমুদয় দেববাণী প্রায়॥
ক্রমেতে ফুটিল মুখ, উঠিল মনের সুখ,
একে একে শিখিলে সকল।
মেসো, পিসে, খুড়া, বাপ্, জুজু, ভূত, ছুঁচো, সাপ্,
স্থল, জল, আকাশ, অনল॥
ভাল মন্দ জানিতে না, মল মূত্র মানিতে না,
উপদেশ শিক্ষা হ'ল যত।
পঞ্চমেতে হাতে খড়ি, খাইয়া গুরুর ছড়ি,
পাঠশালে পড়িয়াছ কত॥
যৌবনের আগমনে, জ্ঞানের প্রতিভা মনে,
বস্তু বোধ হইল তোমার।
পুস্তক করিয়া পাঠ, দেখিয়া ভবের নাট,
হিতাহিত করিছ বিচার॥
সে ভাষায় হয়ে প্রীত, পরমেশ-গুণ-গীত,
বৃদ্ধকালে গান কর মুখে।

মাতৃসম মাতৃভাষা, পূরালে তোমার আশা,
তুমি তার সেবা কর সুখে ॥”

গুপ্তকবির দেশবাৎসল্য অকৃত্রিম ছিল। এক্ষণে স্বদেশপ্রীতি জন-সাধারণের মধ্যে বিস্তারলাভ করিয়াছে। বঙ্কিমবাবু বলেন যে ঈশ্বর-গুপ্তের সময়ে ইহা মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। নিম্নে তাঁহার “স্বদেশ” নামক কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—

জান না কি জীব তুমি, জননী জন্মভূমি,
সে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে ॥

* * * *

যার বলে তুমি বলী তার বলে আমি বলি,
ভক্তিভাবে কর তারে স্নেহ।
প্রসূতি তোমার যেই, তাহার প্রসূতি এই,
বসুমাতা মাতা সবাকার ॥

বলিদান প্রথা নীতি ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ, কবি বিবেচনা করিতেন—

“হায় হায়, কি অধর্ম্ম, মুখে বলে ধর্ম্ম ধর্ম্ম,
ছেড়ে ধর্ম্ম, করে কর্ম্ম, মর্ম্ম বোঝা ভার।
“অহিংসা-পরমধর্ম্ম” করেনা প্রচার ॥
কাল্পনিক-আচরণে, হিংসা করে যত জনে,
কিছুমাত্র নাহি মনে দয়ার সঞ্চার।
রচনা করিয়ে বেদ, যাগ, যজ্ঞ, পরিচ্ছেদ,
করিতেছে পশুচ্ছেদ বিবিধ-প্রকার।
হত্যা ক’রে পুণ্য হয়, এই কিরে শাস্ত্রে কয় ?

ওরে তোরা দুরাশয়, অতি দুরাচার।
অধর্ম্মেতে ধর্ম্মলাভ, বিপরীত এই ভাব,
নিষ্ঠুরতা আবির্ভাব, অন্তরে সবার।"

কবির 'জীবের প্রতি' নামক পদ্যে প্রত্যেক মানবের 'আত্মবোধ' কর্ত্তব্য এই উপদেশব্যপদেশে ব্রাহ্মণে অহঙ্কার দূষণীয় কবি বলিয়াছেন—

"কে তুমি, কে তুমি, জীব! কে তুমি তা কও।
যে তুমি, যাহার তুমি, তার তুমি হও॥
দেহে কর আমি বোধ, 'দেহ' তুমি নও।
অংশরূপে হংসরূপে দেহে তুমি রও॥
কে তোমার বহে ভার কার ভার বও।
আমার আমার করি কার ভার সও॥

* * * *

দেহেতে অভেদ ভাব এ কি অপরূপ।
একবার ভাবিলে না আপন স্বরূপ॥
কেবল ভ্রমেতে কর আমার আমার।
অদ্যাবধি আত্মবোধ হলো না তোমার॥
মায়ার কুহকে ভুলে কিছু নও জ্ঞাত।
ভুলিয়াছ পুরাতন 'সখা অবিজ্ঞাত'॥

* * * *

মুকুরে নিরখি মুখ সুখ কতরূপ।
মনে মনে অভিমান হয়েছি স্বরূপ॥
গলদেশে সূত্র দিয়া সূত্র তায় ভারী।
'ব্রাহ্মণ' হয়েছি ব'লে কর কত জারী॥

বেদপাঠে পূজা পাও পণ্ডিত হইয়া।
সবে করে সমাদর কুলীন বলিয়া॥
আপনিই ভবে প'ড়ে না পাও পাথার।
অথচ লোকেরে কর ভব-নদী পার॥
তিন খাঁই 'দড়া' বেঁধে আপনার গলে।
ত্রিলোক বেঁধেছ তুমি কুহকের বলে॥
একে তো মায়ার সূত্রে পড়িয়াছ বাঁধা।
আবার এ সূত্র দেখে লাগিয়াছে ধাঁধা॥
কোথায় সূত্রের গোড়া নিরূপণ নেই।
এক খেয়ে উঠিতেছে কত খেই খেই॥
করিয়াছ আরোহণ অভিমান-রথে।
কেবল করিছ গতি প্রবৃত্তির পথে॥
ছেড়ে তত্ত্ব মদে মত্ত কিসে পাবে পদ।
হারাইলে পূর্ব্বকার সহায় সম্পদ॥
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চতুষ্টয়।
অভিমান সার-মাত্র কিছুই ত নয়॥
'তুমি' কোন বর্ণ নও জাতি তব নাই।
দেহধর্ম্মে অহঙ্কার কেন কর ভাই?
নর নও, নারী নও, তুমি নও কেউ।
ত্রিগুণ-সাগরে কেন গুণিতেছ ঢেউ?
তুমি আমি, আমি তুমি, জেন এই সার।
তুমি আমি এক হ'লে কেবা আর কার?
দেহেতে অভেদ জ্ঞান কর পরিহার।
আমার এ দেহ বলে ছাড় অহঙ্কার॥

বিচারে তোমার তনু কখন তো নয়।
ভূতের ভবন এই ভূতে হবে লয়॥"

চৈতন্যদেবের সহিত ঈশ্বর গুপ্তের কোন তুলনা করা দুঃসাহসিক কার্য্য। কোথায় সেই আদর্শ মানব এবং কোথায় সেই বিবিধ দোষ-গুণ সমন্বিত কবি! তত্রাচ গুপ্ত মহাশয়ের ধর্ম্মবিষয়ক কবিতা পাঠকরিয়া আমাদের মনে হয় যে তাঁহার ভগবানের প্রতি দাস্যভক্তি আন্তরিকতা-পূর্ণ ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে এই কুমারহট্টে শ্রীবাস, শিবানন্দ, কর্ণপূর, বাসুদেবাদি গৌরাঙ্গভক্তগণ মধুরভাবে (শ্রীরাধিকাভাবে) শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিয়াছিলেন। আধুনিক যুগে এই কুমারহট্টের দক্ষিণাংশে কবি রামপ্রসাদ সেন মাতৃভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়াছিলেন এবং এই কুমারহট্টেরই উত্তরাংশে ইহার এক শতাব্দী পরে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পিতৃভাবে ভগবানের সেবা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন—"সাধারণ ঈশ্বরবাদী বা ঈশ্বরভক্তের মত তিনি ঈশ্বরবাদী বা ঈশ্বরভক্ত ছিলেন না। তিনি ঈশ্বরকে নিকটে দেখিতেন; যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেন, যেন মুখোমুখী হইয়া কথা কহিতেন। আপনাকে যথার্থ ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরকে আপনার সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ পিতা বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। মুখোমুখী হইয়া বাপের সঙ্গে বচসা করিতেন। কখন বাপের আদর পাইবার জন্য কোলে বসিতে যাইতেন; আপনি বাপকে কত আদর করিতেন, উত্তর না পাইলে কাঁদাকাটা বাধাইতেন। বলিতে কি, তাঁহার ঈশ্বরে গাঢ় পুত্রবৎ অকৃত্রিম প্রেম দেখিয়া চক্ষের জল রাখা যায় না। অনেক সময়েই দেখিতে পাই যে মূর্ত্তিমান্ ঈশ্বর সম্মুখে পাইতেছেন না, কথার উত্তর পাইতেছেন না বলিয়া তাঁহার অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে, বাপকে বকিয়া ফাটাইয়া দিতেছেন। বাপ নিরাকার নির্গুণ চৈতন্য মাত্র, সাক্ষাৎ

মূর্ত্তিমান্ বাপ নহেন, এ কথা মনে করিতেও অনেক সময়ে তাঁহার কষ্ট হইত—

নির্গুণ ঈশ্বর

"কাতর কিঙ্কর আমি তোমার সন্তান।
আমার জনক তুমি সবার প্রধান॥
বার বার ডাকিতেছি কোথা ভগবান্।
একবার তাহে তুমি নাহি দাও কাণ॥
সর্ব্বদিকে সর্ব্বলোকে কত কথা কয়।
শ্রবণে সে সব রব, প্রবেশ না হয়॥
হায় হায় কব কায়, ঘটিল কি জ্বালা।
জগতের পিতা হয়ে তুমি হ'লে কালা॥
মনে সাধ কথা কই নিকটে আনিয়া।
অধীর হলেম ভেবে, বধির জানিয়া॥"

*   *   *   *

"তুমি হে ঈশ্বরগুপ্ত, ব্যাপ্ত ত্রিসংসার।
আমি হে ঈশ্বরগুপ্ত, কুমার তোমার॥
গুপ্ত হয়ে গুপ্ত-সুতে, ছল কেন কর?
গুপ্ত কায় ব্যক্ত করি, গুপ্তভাব হর॥
পিতৃ নামে নাম পেয়ে, উপাধি ধরেছি।
জন্মভূমি জননীর, কোলেতে বসেছি॥
তুমি গুপ্ত, আমি গুপ্ত, গুপ্ত কিছু নয়।
তবে কেন গুপ্তভাবে, ভাব গুপ্ত রয়?
গুপ্তভাবে চিত্রগুপ্ত, চিত্র করি যবে।
গুপ্ত-সুতে গুপ্ত করি, গুপ্তগৃহে লবে॥

আছি গুপ্ত পরিশেষে, গুপ্ত হব ভেবে।
বল দেখি সে সময়ে, গুপ্ত কোথা রবে?
গুপ্ত হয়ে যখন মুদিব আমি আঁখি।
তখন এ গুপ্ত-সুতে, কিসে দিবে ফাঁকি?"
আর কিছু চাইনে।

"ওহে হরি তোমা ছাড়া কোন দিকে চাইনে,
কোন দিকে চাইনে।
চিরকাল খেটে মরি নাহি পাই মাইনে,
নাহি পাই মাইনে।
বিনা মূলে কিনে লবে লিখেছ কি আইনে,
লিখেছ কি আইনে?

সম্বন্ধ নির্দ্দেশ

"নাস্তিকেরা "নাস্তি" বোলে করিছে নিধন।
'অস্তি' ব'লে আমি করি তোমায় স্থাপন॥
তোমার 'অস্তিত্ববাদ' করেছি যখন।
পাকাপাকি একখানা করিব তখন॥
জন্ম দিয়া 'বাপ' তুমি হয়েছ আমার।
জন্ম দিয়া আমি তবে কে হব তোমার?
যদ্যপি আদর কর মনেতে বিচারি।
এ সুবাদে তোমার তো বাবা হ'তে পারি॥
বার বার 'বাবা' বলে ডেকেছি তোমায়।
একবার 'বাবা' বলে ডাক না আমায়॥

ছেলের এ আবদারে আদর তো চাই।
বাপ বোলে ডাকিলে তো লজ্জা কিছু নাই॥
অধমে বলিতে বাপ লজ্জা যদি হয়।
যা বলিবে তাই বল বিলম্ব না সয়॥
ছেলে বল, দাস বল, বলা কিন্তু চাই।
না বলিলে কোন মতে ছাড়াছাড়ি নাই॥
ফুটে না বলিতে পার ভঙ্গী ক'রে কও।
'ওরে বাবা আত্মারাম' হাবা কেন হও॥
যেরূপে জানাতে হয় সেরূপে জানাও।
যেরূপে মানাতে হয় সেরূপে মানাও॥"

* * * *

"এ ভক্তের স্তুতি নহে—এ বাপের উপর বেটার অভিমান। ধন্য ঈশ্বরচন্দ্র! তুমি পিতৃপদ লাভ করিয়াছ, সন্দেহ নাই। আমরা কেহই তোমার সমালোচক হইবার যোগ্য নহি।"

ভগবদ্ভক্তি-বিরহিত শাস্ত্রপাঠ-সম্বন্ধে গুপ্ত কবি বলিতেছেন—

"লও তুমি যত পার শাস্ত্রের সন্ধান।
হও তুমি পৃথিবীর, পণ্ডিত প্রধান॥
ঈশ্বরের প্রতি যদি প্রেম নাহি রয়।
যত পড়, যত শুন, কিছু কিছু নয়॥"

আমরা এই শক্তিশালী কবির পদ্যাবলী হইতে আর কবিতা উদ্ধৃত করিয়া আমাদের গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধিকরিব না। পরিশেষে আমাদের বক্তব্য যে গুপ্ত-কবির গ্রন্থাবলী পাঠকরা এবং তাঁহার স্মৃতি-বার্ষিকীতে যোগদান করিয়া ইহার উদ্যোগিগণকে উৎসাহিত করা প্রত্যেক বঙ্গদেশ-বাসীর, বিশেষতঃ প্রত্যেক কাঞ্চনপল্লীনিবাসীর উচিত, কারণ বাঙ্গালী-

জাতির প্রতি, বাঙ্গালাদেশের প্রতি এবং বাঙ্গালা ভাষার প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের অকপট এবং প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল, এবং ইহাদিগের উন্নতির নিমিত্ত তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। এরূপ দেশভক্ত এবং এরূপ ভগবদ্ভক্ত কাঞ্চনপল্লীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কাঞ্চনপল্লীর গৌরব সমধিক বৃদ্ধিকরিয়াছিলেন, ইহা প্রত্যেক কাঞ্চনপল্লীবাসীর স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

মধ্যযুগের সংস্কৃত সাহিত্যে কবিকর্ণপূরের স্থান অতিশয় উচ্চে। তাঁহার বিবিধগ্রন্থে তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং গৌরাঙ্গপ্রেম ও ভক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে। আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য। তাঁহার 'অলঙ্কার কৌস্তুভ' বিবিধ মূল তথ্য এবং বিচারপূর্ণ অলঙ্কার-সমন্বিত হওয়ায় অলঙ্কারশাস্ত্রের একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। কাঞ্চনপল্লী কবিকর্ণপূরের ন্যায় পণ্ডিতের জন্মস্থান হওয়ায় গৌরবান্বিতা। গুপ্তকবির ন্যায় কবিকর্ণপূরেরও স্মৃতি-বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। পণ্ডিত বলিয়া তাঁহার স্থান উচ্চ হইলেও গৌরাঙ্গদেবের প্রিয় ভক্ত বলিয়া তাঁহার স্থান শ্রেষ্ঠতর। কবিকর্ণপূরকে তাঁহার স্মৃতিবার্ষিকীর কথা যদি জিজ্ঞাসা করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে তিনি চৈতন্যদেবের কাঞ্চনপল্লীতে পদার্পণের স্মৃতি-বার্ষিকী হইতে বিভিন্ন স্মৃতি-বার্ষিকীর কথা কখন মনেও স্থান দিতেন না।

কবিকর্ণপূরের পাঁচখানি গ্রন্থ আমরা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি—গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, অলঙ্কারকৌস্তুভ এবং আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ। এই পাচখানি গ্রন্থই সংস্কৃত ভাষায় রচিত।

শ্রীকৃষ্ণাবতারের ভক্তগণ গৌরাবতারে কে কিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা জানিবার, সুতরাং উপাসনাসিদ্ধির মহাগ্রন্থ বলিয়া কবিকর্ণ-

পূরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকা বৈষ্ণব-সমাজে বিবেচিত হয়। অনুবাদক শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন তাঁহার এই গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—"শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর সম্প্রদায়ভুক্ত গোস্বামিপাদদিগের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রণালী-বিশুদ্ধ করিয়া উপাসনা না করিলে উপাসনার ফললাভ হয় না। কৃষ্ণলীলায় বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সখী ও সখিগণ যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্য্যা করিতেন, গৌরলীলাতেও তাঁহারা মহান্ত, ঠাকুর এবং গোস্বামী প্রভৃতিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া সেইরূপে পরিচর্য্যা করিয়াছেন। এই সমস্ত পরিদর্শন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রিয়ভক্ত মহাকবি কর্ণপূর "সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং" ইত্যাদি মূল ও স্বরূপাদির স্ব স্ব গ্রন্থ এবং মথুরা ও উৎকল দেশের গ্রন্থানুসারে সেই সেই গৌরভক্তের পূর্ব্বনাম সকল উল্লেখকরিয়া এই গৌরগণোদ্দেশদীপিকা নামক ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রণীত করেন। বৈষ্ণবগণ যিনি যাঁহার পরিবারভুক্ত, তিনি কৃষ্ণলীলার সেই নাম জ্ঞাত হইয়া সেইভাবে নিজগুরুকে চিন্তা করিলে উপাসনা সিদ্ধ হইবে, ইহার অন্যথা করিলে উপাসনা সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই।"

এই গ্রন্থের কতিপয় শ্লোকের রামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃত অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল—"......শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের যে সকল বিখ্যাত পরিবার তাঁহাদের এবং মহানুভব গোপবংশীয়দিগের যে সকল নাম, তাহা আদি পণ্ডিত স্বরূপ প্রভৃতি মহাত্মগণ স্ব স্ব গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সকল অবলোকন তথা উড়িষ্যাদেশীয় ও গৌড়ীয় সাধু মহাত্মাদিগের মুখে শ্রবণকরিয়া স্ববুদ্ধিদ্বারা বিবেচনা পূর্ব্বক মহানুভব কতিপয় সাধুব্যক্তির বারম্বার অনুরোধক্রমে শ্রীপরমানন্দদাস নামক আমি এই সংগ্রহ লিখিতেছি।৫।......যিনি নন্দনন্দন, তিনিই ভক্তরূপে গৌরচন্দ্র; যিনি বৃন্দাবনে হলধর, তিনিই ভক্তরূপে

নিত্যানন্দ ; যিনি শ্রীসদাশিব, তিনিই ভক্তাবতাররূপে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ; শ্রীনিবাস প্রভৃতি যত ভক্ত, তাঁহারাই ভক্তরূপ এবং দ্বিজাগ্রগণ্য গদাধর-পণ্ডিত ভক্তশক্তিরূপ ।১১।······ যিনি সত্যযুগে শুভ্রবর্ণ ও শুক্ল নাম ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ হইয়া মখভুক্ নামধারণ করিয়াছিলেন এবং যিনি দ্বাপরযুগে শ্যাম হইয়া শ্যামনামে অভিহিত হইয়াছিলেন, সেই ভগবান্ কলিযুগে গৌরচন্দ্র নামে অবতীর্ণ হইয়া জগতে বিরাজ করিতেছেন ।২০।······যিনি পর্জন্য নামক গোপাল কৃষ্ণের পিতামহ ছিলেন, পরে তিনিই শ্রীহট্টে উপেন্দ্রমিশ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথায় তাঁহার সাতপুত্র জন্মিয়াছিল। যিনি বৃন্দাবনে মহামান্যা বরীয়সীনাম্নী কৃষ্ণের পিতামহী গোপী ছিলেন, তিনিই এক্ষণে উপেন্দ্র মিশ্রের পত্নী কলাবতী হইয়াছেন ।৩৬॥····· পূর্ব্বে বৃন্দাবনে যাঁহারা প্রেমরসের আকারস্বরূপ যশোদা ও ব্রজরাজ নন্দ ছিলেন, তাঁহারাই এস্থলে শচী এবং জগন্নাথ পুরন্দর নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥৩৭।······যিনি পূর্ব্বে মিথিলাধিপতি রাজা জনক ছিলেন, তিনিই এক্ষণে বল্লভাচার্য্য, কেহ কেহ ইঁহাকে ভীষ্মকও বলিয়া থাকেন, ইহাতে সংশয় নাই ।৪৪।····· পূর্ব্বে মথুরাতে যে সান্দীপনী-মুনি কৃষ্ণের উপনয়ন দিয়াছিলেন, তিনিই এক্ষণে কেশবভারতীরূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন ।৫২।······ পূর্ব্বে যাঁহারা বারুণী ও রেবতবংশসম্ভূতা রেবতী বলদেবের পত্নী ছিলেন, তাঁহারাই এই অবতারে বসুধা এবং জাহ্নবী নামে নিত্যানন্দের দুই পত্নী হয়েন ।······ যিনি পূর্ব্বে নারদ ছিলেন, তিনিই এখন শ্রীবাস পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত। পর্ব্বত-নামা মুনিশ্রেষ্ঠ, যিনি নারদের প্রিয় ছিলেন, তিনিই শ্রীবাসের কনিষ্ঠ সহোদর রামপণ্ডিত ।৯০। পূর্ব্বে যিনি হনূমান্ ছিলেন, এখন তিনি মুরারিগুপ্ত নামে অভিহিত এবং পূর্ব্বে যিনি সুগ্রীবনামা ছিলেন, তিনিই এক্ষণে গোবিন্দানন্দ ।৯১।

······যিনি বেদব্যাস ছিলেন, তিনিই এক্ষণে বৃন্দাবনদাস।১০৯।······ ব্রজে যাঁহারা মধুকণ্ঠ ও মধুব্রত নামে গায়ক ছিলেন, এক্ষণে সেই দুইজন মুকুন্দ এবং বাসুদেব দত্ত নামে গৌরাঙ্গদেবের গায়ক।১৪০।······পূর্ব্বে যিনি প্রেমরূপা শ্রীরাধা বৃন্দাবনের ঈশ্বরী ছিলেন, তিনিই এক্ষণে গৌর-বল্লভ শ্রীগদাধর পণ্ডিত।১৪৭।··· ব্রজে যিনি কাত্যায়নী ছিলেন, তিনি এক্ষণে শ্রীকান্ত সেন।১৭৪।······ পূর্ব্বকালে বৃন্দাবনে বীরাদূতী, যিনি গোপীসকলকে শ্রীকৃষ্ণনিকটে লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে আমার পিতা শিবানন্দ সেন। ব্রজে যিনি বিন্দুমতী ছিলেন, এক্ষণে তিনি আমার জননী।১৭৬।"

এই গ্রন্থের শেষভাগে কবিকর্ণপূরের নামান্তর পুরীদাস ও পরমানন্দ-দাস ছিল, তাহা তিনি লিখিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে তিনি ১৪৯৮ শকে অর্থাৎ ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এইস্থানে তিনি তাঁহার গুরু শ্রীনাথের নামও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই বিষয়ে বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—"কর্ণপূর একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ ও মহাকবি, ইঁহার রচনা অতীব মনোহারিণী। ইনি মহাপ্রভুর অত্যন্ত কৃপাপাত্র। শিবানন্দের সমস্ত গোষ্ঠীকে মহাপ্রভু নিজের বলিয়া জানিতেন। কর্ণপূরও মহাপ্রভুকে 'কুলাধিদৈবত' বলিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন। কর্ণপূরের গুরু শ্রীনাথ বিপ্র। কুমারহট্টে ঐ বিপ্রের স্থাপিত কৃষ্ণদেববিগ্রহ এখনও বর্ত্তমান আছেন। কর্ণপূর মহাপ্রভুর নিকট শ্রীক্ষেত্রে প্রথমে "কৃষ্ণনাম" মহামন্ত্র প্রাপ্ত হইলেও, সামাজিক রীতিতে এই শ্রীনাথের নিকটেই শেষে দীক্ষিত হ'ন। চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য, আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, অলঙ্কারকৌস্তভ, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক (১৪৯৪ শকে), গৌরগণোদ্দেশদীপিকা (১৪৯৮) বৃহদ্গণোদ্দেশ-দীপিকা আর্য্যাশতক, শ্রীভাগবত দশমের টীকা, শ্রীচৈতন্যসহস্রনাম,

কেশবাষ্টক এই দশখানি গ্রন্থ কবি কর্ণপূরের প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শনীতে কবিকর্ণপূরের জন্ম ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত আছে। তিনি দ্বাপর যুগে কে ছিলেন তাহা নিজে বর্ণনা করেন নাই, কিন্তু বৈষ্ণবাচারদর্পণে লিখিত আছে যে তিনি সে সময়ে গুণচূড়ানাম্নী শ্রীরাধিকার সখী ছিলেন। কবিকর্ণপূরের গুরুদেব শ্রীনাথ পণ্ডিত কৃষ্ণলীলায় কে ছিলেন, ইহা বলিতে শাস্ত্রের নিষেধ ছিল; সেইজন্য তিনি লিখেন নাই—

"গুরোর্নাম ন গৃহ্লীয়াদিতি শাস্ত্রানুসারতঃ।
শ্রীশ্রীনাথস্য পূর্ব্বাখ্যা ময়া ন প্রকটীকৃতা ॥২১০॥
ব্যাচকার পারিপাট্যাদ্ যোভাগবত-সংহিতাং।
কুমারহট্টে যৎকীর্ত্তিঃ কৃষ্ণদেবো বিরাজতে ॥২১৮॥"

কিন্তু বৈষ্ণবাচারদর্পণের লেখক শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী ইহা প্রকাশিত করিয়াছেন—শ্রীনাথ কৃষ্ণলীলায় শ্রীরাধিকার চিত্রাঙ্গী নাম্নী সখী ছিলেন। আমরা যদি এই অবতারবাদ না বিশ্বাসকরি তাহা হইলে কবিকর্ণপূর আমাদিগকে নিম্নলিখিত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিবেন, ইহা তিনি এই গ্রন্থে (গৌরগণোদ্দেশদীপিকাতে) স্পষ্টই লিখিয়াছেন— "মীমাংসক, শঠ ও তার্কিক বিশেষতঃ যুক্ত্যনুসন্ধায়ী, যত্নসহকারে ইহাদের নিকট ইহা (এই গ্রন্থ) গোপন করিবে, সর্ব্বদা গৌরাঙ্গপদাশ্রিত শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রদান করিবে। (রামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃত অনুবাদ —২১৩)।" বহরমপুরস্থিত রাধারমণ যন্ত্রালয় এই গ্রন্থ প্রকাশকরিয়াছেন এবং কলিকাতার দেবকীনন্দন ধর্ম্মপ্রকাশ কার্য্যালয় ইহা আমাদিগকে বিক্রয়করিয়াছেন। ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে এই বিস্তৃত অবতারবাদে কবিকর্ণপূরের সমসাময়িক লোকের

ভিতর অনেকে আমাদিগের ন্যায় আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই।

কবিকর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকার অবতারবাদ আমরা বিশ্বাস করিতে সক্ষম না হইলেও, তাঁহার যে অসাধারণ গুরু ও পিতৃ-ভক্তি ছিল, সে বিষয়ে আমাদিগের কোন সংশয় নাই—

"গুরুং নঃ শ্রীনাথাভিধমবনিদেবান্বয়বিধুং
নমো ভূষারত্নং ভুব ইব বিভোরস্য দয়িতং।
যদাস্যাদুন্মীলন্নিরবকবৃন্দাবনরহঃ
কথাস্বাদং লব্ধা জগতি ন জনঃ কোঽপি রমতে ॥৩॥
পিতরং শ্রীশিবানন্দং সেনবংশপ্রদীপকং।
বন্দেঽহং পরায়া ভক্ত্যা পার্ষদাগ্র্যং মহাপ্রভোঃ ॥৪॥"

"এই গৌরাঙ্গদেবের প্রিয়, ব্রাহ্মণবংশের চন্দ্র ও জগতের অলঙ্কার-রত্নস্বরূপ, সেই শ্রীনাথ-নামা গুরুদেবকে নমস্কার করি, যাঁহার বদন-বিনিঃসৃত শ্রীকৃষ্ণের মধুর বৃন্দাবনের নির্জ্জনকেলি-কথাস্বাদ লাভকরিয়া জগতে কোন্ ব্যক্তি না আনন্দিত হইয়া থাকেন? ॥৩॥

যিনি মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনি আমার পিতা সেন-বংশপ্রদীপ শ্রীশিবানন্দসেন, তাঁহাকে পরম ভক্তিসহকারে বন্দনা করি"।

কবিকর্ণপূরের অলঙ্কারকৌস্তুভ সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের (Rhetoric) একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। ইহাতে বৈষ্ণব কর্ণপূর রাধা-কৃষ্ণ প্রেম-বিষয়ক দৃষ্টান্তদ্বারা অলঙ্কার-শাস্ত্র সাধারণের বোধগম্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দৃষ্টান্তগুলি এরূপ সীমাবদ্ধ হওয়াতে যদিও সাধারণ পাঠকের কিয়ৎ-পরিমাণে ক্ষতি হইয়াছে, তত্রাচ বৈষ্ণবসমাজে ইহা যে সমধিক আদৃত হইবে, তাহার কোন সংশয় নাই। এই গ্রন্থের যে অপর দোষ আছে, তাহা সমগ্র সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের দোষ; তাহাকে আমরা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম

বিশ্লেষণ ও বিভেদ (hair-splitting analysis and differentiation) নামে অভিহিত করিতে পারি। ইহার জন্য কবিকর্ণপূর অবশ্য দায়ী নহেন। আমাদিগের পুস্তকে এই গ্রন্থের বিস্তৃত আলোচনা অসম্ভব। আমরা সংক্ষেপে এই গ্রন্থের বিষয় বর্ণনাকরিব।

প্রথমেই গ্রন্থকার তাঁহার পুস্তকের নির্বিঘ্ন পরিসমাপ্তির জন্য চৈতন্য-দেবের গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। তাহার পর 'কাব্য' কাহাকে বলে আলোচনা করিয়াছেন—

"অথ কাব্যং কবিকর্ম্মেতি কবিজিজ্ঞাসায়াং তৎস্বরূপমাহ—
সবীজোহি কবির্জ্ঞেয়ঃ স সর্ব্বাগমকোবিদঃ।
সরসঃ প্রতিভাশালী যদি স্যাদুত্তমস্তদা॥"

('কবি-কর্ম্ম কাব্য' এইরূপে কাব্যপদ ব্যাকরণসিদ্ধ হওয়ায়, কবি কে, এই জিজ্ঞাসা উপস্থিত হওয়াতে, কবির স্বরূপ নিরূপিত হইতেছে।

যিনি সবীজ (প্রাক্তন-সংস্কারবিশিষ্ট) তিনিই কবি; তিনি অলঙ্কারাদি বহু শাস্ত্রজ্ঞ, সরস ও প্রতিভাশালী হইলেই উৎকৃষ্ট হয়েন। [১])

তাহার পরে বিভিন্নপ্রকার কাব্য আলোচনা করিয়া শব্দের তিন-প্রকার বৃত্তি (অর্থ) কর্ণপূর লিখিয়াছেন—অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা— "গঙ্গায় ঘোষ বাস করে, এস্থলে 'গঙ্গা' শব্দ প্রথমতঃ অভিধা-বৃত্তি দ্বারা গঙ্গাপদার্থের বাচক হয়। অভিধা-সমাপ্তির পর ঐ শব্দ লক্ষণাকে আশ্রয় করিয়া তট-পদার্থের প্রতীতি করে। অনন্তর লক্ষণা সমাপ্ত হইলে ব্যঞ্জনাকে আশ্রয়করিয়া শৈত্যপাবনত্বাদিরূপ উক্ত বৃত্তি স্বীকারের প্রয়োজন ব্যক্ত করে।"

যস্যোচ্চারণমাত্রেণ সহজং যৎ প্রতীয়তে।
তস্য তত্র তু যা বৃত্তিঃ সাভিধা—(২য় কি—১৮)

১। প্রায় সমস্ত অনুবাদ রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় কৃত।

শব্দের উচ্চারণ হইলেই, যে অর্থ আমাদিগের মনে উদয় হয়—তাহাকে অভিধা বলে।

অভিধালক্ষণাক্ষেপতাৎপর্য্যাণাং সমাপ্তিতঃ।
ব্যাপারো ধ্বননাদির্য শব্দস্য ব্যঞ্জনা তু সা ॥
"গঙ্গায়াং ঘোষঃ"—ইত্যত্র 'গঙ্গা' শব্দঃ প্রথমং
বাচকত্বেনাভিধাবৃত্তিকঃ অন্যথান্বয়াভাব এব ন স্যাৎ।
অনন্তরমভিধাসমাপ্তৌ লক্ষণামাশ্রিত্য তটং লক্ষয়তি।

তদনন্তরং লক্ষণাসমাপ্তৌ ব্যঞ্জনামাশ্রিত্য শৈত্যপাবনত্বাদিকং প্রয়োজনং ব্যনক্তি (২য় কিঃ—২৯)।

তাহার পরে গ্রন্থকার একাদশ প্রকার রস (**sentiment**) বর্ণনা করিয়াছেন—করুণ (**the pathetic**), অদ্ভুত (**the sublime**), হাস্য (**the ludicrous**), ভয়ানক (**the fearful**), বীভৎস (**the hateful**), বীর (**the heroic**), রৌদ্র (**the angry**), শান্ত (**the quietistic**), বাৎসল্য (**the parental**), শৃঙ্গার অথবা প্রেম (**the sentiment of love**) এবং ভক্তিরস (**the reverential**)। শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বরসের সমন্বয় হইয়াছে---

"সর্ব্বরসাত্মকত্বং শ্রীকৃষ্ণস্য যথা॥
শৃঙ্গারী রাধিকায়াং, সখিষু সকরুণঃ স্বেদদগ্ধেষ্বঘাহে,
বীভৎসী তস্য গর্ভে, ব্রজকুলতনয়াচেলচৌর্য্যে প্রহাসী।
বীরী দৈত্যেষু, রৌদ্রী কুপিতবতি তুরাসাহি, হৈয়ঙ্গবীন-
স্তেয়ে ভীমান্, বিচিত্রী নিজমহসি, শমী দামবন্ধে, স জীয়াৎ ॥১২॥"

(শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বরসাত্মক। তাহার উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। যথা —

যিনি রাধিকার প্রতি শৃঙ্গাররসশালী, সখাসকল অঘাসুরের বিষদাহে

দগ্ধ হইলে তাহাদিগের প্রতি সকরুণ, ঐ অসুরের জঠরে প্রবেশ কালে বীভৎসরসময়, ব্রজকুলবালার বস্ত্রহরণসময়ে হাস্যরসপরায়ণ, দুর্দ্দান্ত দৈত্যদলনে বীররসাশ্রয়ী, কুপিত সুরপতির প্রতি রৌদ্ররসাবতার, হৈয়ঙ্গবীনহরণে ভীতিবিহ্বল, নিজতেজো দর্শনে বিস্ময়নিমগ্ন, দামবন্ধনে শান্তিরসসম্পন্ন, সেই ভগবান্ বাসুদেবের জয় হউক ॥১২॥) ১

প্রথমেই শৃঙ্গাররসের অবতারণা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার প্রেম বিস্তৃতভাবে কবি আলোচনা করিয়াছেন এবং সেই সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারের নায়কনায়িকা ও সখীর এবং তাঁহাদিগের মনের বিভিন্ন অবস্থা দৃষ্টান্তসহকারে বর্ণনা করিয়াছেন।

কবি ব্যভিচারিভাবের দৃষ্টান্ত দিতেছেন। কবিকর্ণপূরের সমস্ত দৃষ্টান্ত রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক। তাঁহার কবিপ্রতিভা বিশেষভাবে তাঁহার আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ ও অলঙ্কারকৌস্তুভে পরিস্ফুট হইয়াছে। কালিদাস ও ভবভূতিকে যদি আমরা প্রথম শ্রেণীর কবি বলিয়া গণ্য করি কবি-কর্ণপূরের স্থান দ্বিতীয় শ্রেণীর উচ্চ স্তরে আমাদিগের দিতেই হইবে।

গ্লানি ঃ—ম্লানানীব মৃণালানি ধত্তেঽঙ্গানি যদঙ্গনা

ততঃ কৃষ্ণানুরাগোঽস্যামন্তর্জ্জ্বর ইব স্থিতঃ।

কৃষ্ণবিরহে কৃষ্ণানুরাগ জ্বরে পরিণত হইয়া গোপীর অঙ্গ শুষ্ক পদ্মের ন্যায় ম্লান করিয়াছে।

শ্রম ঃ—পুষ্পাবচয়নেনালং কুঞ্জে বিশ্রাম্য রাধিকে।

ক্লমঃ কমলপত্রাক্ষি! মুখেন তব কথ্যতে ॥

হে রাধিকে! আর পুষ্পচয়নের প্রয়োজন নাই। তোমার বিশ্রাম করা কর্ত্তব্য, হে পদ্মলোচনে! তোমার মুখেই ক্লান্তি দৃষ্ট হইতেছে।

অথবা

১। ইহাতে বাৎসল্য ও ভক্তিরসের বর্ণনা নাই।

ছায়াপি গমনশ্রান্তা তব সুন্দরি রাধিকে।
আগত্য চরণোপান্তং বিশ্রান্তিমিব যাচতে॥

হে সুন্দরি রাধিকে, তোমাকে দেখিয়া মনে হইতেছে যে তোমার ছায়াও তোমার গমনের জন্য শ্রান্তা হইয়া তোমার চরণপ্রান্তে আসিয়া বিশ্রান্তি প্রার্থনা করিতেছে।

মোহ ঃ—কৃষ্ণোঽতিদুর্ল্লভঃ, প্রেম নবং, বপুরিদং মৃদু।
সহায়োঽস্যা ন কোঽপীতি মূর্চ্ছৈবাধাৎ সহায়তাং॥

কৃষ্ণ অতি দুর্ল্লভ, প্রেমও নব এবং সেইজন্য ইহা ত্যাগ করিতে আমি অসমর্থ; এই শরীরও মৃদু অর্থাৎ বিচ্ছেদসহনে অসমর্থ; ইহার সহায়ও কেহ নাই; মূর্চ্ছাই ইহার একমাত্র সহায়।

স্মৃতি ঃ—বিস্মর্ত্তব্যাঃ কথমমী রাধায়া নয়নোর্ম্ময়ঃ।
যৈঃ সমুন্মূলিতশ্চেতঃ সখে, নৈব প্ররোহতি॥

রাধার নয়নজল কি করিয়া বিস্মৃত হইব? সখে! ইহা আমার চিত্তকে এরূপে উন্মূলিত করিয়াছে যে ইহার অঙ্কুর হইবার আর আশা নাই।

ধৃতি ঃ—ধৈর্য্যং ভজত ভোঃ প্রাণা! গতৈঃ কৃষ্ণঃ ক লপ্স্যতে।
অবধিং দিনমীক্ষধ্বং তদেবাস্থাস্থলং হি বঃ॥

হে জীবন, ধৈর্য্য ধারণ কর; যদি তুমি চলিয়া যাও শ্রীকৃষ্ণকে কোথায় পাইবে? শেষদিন পর্য্যন্ত দেখ; ইহাই তোমার অবলম্বন।

বিষাদঃ—অয়ং সখি! গতো যামঃ শ্যামো বামঃ স নাগতঃ।
উদিতো যামিনীনাথো বিষীদন্তি মমাসবঃ॥

হে সখি, এক প্রহর রাত্রি গত হইয়াছে বাম (প্রতিকূল) শ্রীকৃষ্ণ আসেন নাই, চন্দ্র উদিত হইয়াছে, আমার প্রাণ বিষণ্ণ হইতেছে।

ঔৎসুক্যম্—ধন্যাস্তাঃ সখি! ভাবিন্যঃ স্বপ্নে পশ্যন্তি যা হরিম্।
অভূৎ কং দোষমালক্ষ্য নিদ্রাপি বিমুখী মম॥

হে সখি, যে সুন্দরী স্ত্রীগণ হরিকে স্বপ্নেও দর্শন করেন, তাঁহারা ধন্যা। আমার কোন দোষ দেখিয়া নিদ্রাও আমার প্রতি বিমুখী হইয়াছে!

উগ্রতা—ধিক্ প্রেম ভবতঃ কৃষ্ণ! বক্ষসঃ সহজঃ সখা।
যৎপাদালক্তকৈস্তস্যাঃ কৌস্তুভোঽপ্যধরীকৃতঃ॥

হে কৃষ্ণ! আমার প্রতিপক্ষগোপীর প্রতি তোমার প্রেমে ধিক্, কারণ তাহার পদের অলক্তরাগ তোমার বক্ষঃস্থলের স্বভাবসিদ্ধবন্ধু কৌস্তুভমণিকে নীচে নিক্ষেপ করিয়াছে অর্থাৎ অপমানিত করিয়াছে।

উন্মাদ :—ইতস্ততস্ত্বাং পশ্যামি পাণিভ্যাং ন তু লভ্যসে।
কিমিন্দ্রজালং জানাসি রাধে! কিং বা মম ভ্রমঃ॥

হে রাধে, তোমাকে চতুর্দ্দিকে দেখিতেছি, কিন্তু হস্তদ্বারা তোমাকে ধরিতে পারিতেছি না। তুমি বোধ হয় ইন্দ্রজাল জান কিম্বা ইহা আমার ভ্রম।

তাহার পর কর্ণপূর নানাপ্রকারের শব্দালঙ্কার বিবৃত করিয়া এবং অর্থালঙ্কার আলোচনাকরিয়া বিভিন্ন দোষের (**faults of style and fallacies**) এবং বিভিন্ন রীতির (**style**) বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থালঙ্কারের কতিপয় দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

বিশেষোক্তির (**cause without effect**) একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"বিশেষোক্তিঃ কারণেষু সৎসু কার্য্যস্য নোদয়ঃ।
বিশেষোক্তিনামালঙ্কারঃ॥
যথা॥
উদেতীন্দুঃ পূর্ণো বহতি পবনশ্চন্দনবনাৎ
কুহূকণ্ঠঃ কণ্ঠাৎ কলমবিকলং নির্গময়তি।

প্রিয়ালীনাং মূর্দ্ধ্নঃ শপথরচনা দন্তভৃণতা
পদোপান্তে কৃষ্ণস্তদপি তব মানো ন বিরতঃ ॥"

কারণ-সত্ত্বে কার্য্যের উদয় না হইলে বিশেষোক্তি অলঙ্কার কহে ॥ যথা—•

• পূর্ণেন্দু পরমানন্দে সমুদিত হইতেছেন, চন্দনবন হইতে সুমন্দ পবন প্রবাহিত হইতেছে, কোকিলকুল কলকণ্ঠ হইতে কুহুধ্বনি বিকীর্ণ করিতেছে, প্রিয়সখীসমুদয় শিরঃস্পর্শপূর্ব্বক শপথ ও দন্তে তৃণস্পর্শ-পুরঃসর দিব্য করিতেছে, প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ পদোপান্তে পতিত হইয়াছেন ; অয়ি মানিনি ! তথাপি তোমার নিদারুণ মানের অবসান হইল না !

একপ্রকার অর্থান্তরন্যাসের (Corroboration) দৃষ্টান্ত লিখিত হইল—

"স্বাধর্ম্ম্যাদ্বিশেষঃ সামান্যেন যথা ॥
ত্বমেবাদ্যা সৃষ্টিস্ত্বয়ি ভগবতঃ কেলিশয়নং
ত্বয়া সর্ব্বলোকঃ পরিহরতি তৃষ্ণাপরিভবং ।
ত্বয়াঽপূতঃ পূতো ভবতি তদপি ত্বং ঘনরসঃ
ক্রমান্নীচৈর্ভাবং ব্রজসি মহতামেষ মহিমা ॥)

সাধর্ম্ম্যে সামান্য (general) দ্বারা বিশেষের (particular) সমর্থন, যথা—

হে ঘনরস (জল) ! তুমিই বিধাতার আদ্য সৃষ্টি, তোমাতেই ভগবানের কেলিশয্যা আস্তৃত আছে, তোমাদ্বারাই নিখিললোক পিপাসা-ক্লেশ পরিহার করে, তোমার প্রসাদে অপবিত্র ব্যক্তি পবিত্র হয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তথাপি তুমি ক্রমে নিম্নভাবই প্রাপ্ত হও, মহৎ লোকের ইহাই মহিমা ! ॥

একপ্রকার বিরোধালঙ্কারের (**Antithesis**) দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"অত্র গুণো দ্রব্যেণ ॥

জীবয়তি চ মূর্চ্ছয়তি চ পীবয়তি চ সূক্ষ্ময়ত্যপি চ।

তব মুরলীরবখুরলী নো জানে কিং বিজানাতি ॥"

এখানে দ্রব্যের সহিত গুণের বিরোধ—

অয়ি মুরলীধর! তোমার মুরলীবাদন-লীলা আমাদিগকে কখন জীবিত, কখন মূর্চ্ছিত, কখন স্ফীত, কখনও কৃশীকৃত করিতেছে। হে সখে! জানি না, তোমার ঐ যন্ত্র কি মোহমন্ত্র বিজ্ঞাত আছে!)

ব্যাজস্তুতি (**Irony**) কাহাকে বলে এবং তাহার দৃষ্টান্ত নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"মুখে স্তুতির্নিন্দা বা হৃদয়ে ব্যাজস্তুতিঃ স্যাত্তত্তদন্যথা।

মুখে স্তুতির্নিন্দা বা হৃদয়ে তত্তদন্যথা ॥

ইতি স্তুতেনিন্দা নিন্দায়াঃ স্তুতিরিত্যর্থঃ ॥

ক্রমেণোদা ॥

ন নিস্পৃহস্ত্বৎসদৃশো বিরক্তঃ

স্বকীয় কীর্ত্তাবসি নানুরক্তঃ।

দৃষ্মাত্র নিষ্পাদ্য পরোপকারে

ন কৃষ্ণ কীর্ত্তিং যদুরীকরোষি ॥

অত্র মুখে স্তুতিরন্তর্নিন্দা ॥

ত্বদঙ্ঘ্রিমূলং ভজতাং মুকুন্দ

লাভোঽস্তু দূরে বপুষো নিজস্য।

চিরন্তনস্যাপি ভবেদ্বিনাশঃ

স্বভাব এবৈষ তব প্রসিদ্ধঃ ॥

অত্রমুখে নিন্দাঽন্তঃস্তুতিঃ।
উভয়থৈব ব্যাজস্তুতিঃ॥"

মুখে স্তুতি বা নিন্দা এবং হৃদয়ে সেই সেই বস্তুর অন্যথা হইলে অর্থাৎ স্তুতিস্থানে নিন্দা ও নিন্দাস্থানে স্তুতি প্রতীতিহইলে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার হইয়া থাকে॥

যথা—

হে কৃষ্ণ! তোমার ন্যায় নিস্পৃহ ও বৈরাগ্যশালী আর কেহই নাই, তুমি স্বকীয় কীর্ত্তিতেও অনুরক্ত নহ। দেখ, কটাক্ষমাত্র নিক্ষেপ করিলেও যে পরোপকার সম্পাদিত হয়, তুমি তজ্জনিত কীর্ত্তি উপার্জ্জনেও পরাঙ্মুখ হইয়াছ॥ এই শ্লোকে মুখে স্তুতি অন্তরে নিন্দা হইয়াছে॥

হে মুকুন্দ!' যাহারা তোমার চরণোপান্ত ভজনা করে, তাহাদের অন্য লাভের কথা দূরে থাকুক, তাহাদের চিরন্তন নিজ নিজ শরীরেরও বিনাশ উপস্থিত হয়, তোমার এরূপ স্বভাব প্রসিদ্ধই আছে॥

এই শ্লোকে মুখে নিন্দা ও অন্তরে স্তুতি হইয়াছে।)

পরিসংখ্যা অর্থাৎ প্রশ্নোত্তর-অলঙ্কারের (**Question-answer**) দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল—

"কিং গেয়ং, ব্রজকেলিকর্ম্ম; কিমতি শ্রেয়ঃ, সতাং সংগতিঃ;
কিং স্মর্ত্তব্যমনন্তনাম; কিমনুধ্যেয়ং, মুরারেঃ পদং।
ক স্থেয়ং, ব্রজ এব: কিং শ্রবণয়োরানন্দি, বৃন্দাবন-
ক্রীড়ৈকা; কিমুপাস্যমত্র, মহসী শ্রীকৃষ্ণরাধাভিধে॥
কা বিদ্যা, হরিভক্তিরেব, ন পুনর্বেদাদিনিষ্ণাততা;
কীর্ত্তিঃ কা, ভগবৎপরোঽয়মিতি, যা খ্যাতির্ন দানাদিজা।
কা শ্রীঃ, কৃষ্ণরতির্ন বৈ ধনজনগ্রামাদি-ভূয়িষ্ঠতা;
কিং দুঃখং, ভগবৎপ্রিয়স্য বিরহো, নো হৃদ্ব্রণাদি ব্যথা॥"

(কি কীর্ত্তনীয় ? ব্রজকেলিকথা ; কি অতি শ্রেয়স্কর ? সাধুসঙ্গ ; কি স্মরণীয় ? অনন্তদেবের অনন্ত নাম ; কি ধ্যেয় ? মুরারির পাদপদ্ম ; কোথায় অবস্থান কর্ত্তব্য ? ব্রজপুরে ; শ্রবণযুগলের পরমানন্দজনক কি ? বৃন্দাবনক্রীড়া ; উপাস্য কি ? রাধাশ্যামনামধারী পীত ও কৃষ্ণকান্তি ॥ বিদ্যা কি ? হরিভক্তিই বিদ্যা, বেদাদি-বিচক্ষণতা বিদ্যা নহে । কীর্ত্তি কি ? ইনি পরম ভাগবত, এই বলিয়া যে খ্যাতি, তাহাই কীর্ত্তি ; দানাদিজনিতা খ্যাতি কীর্ত্তি নহে । শ্রী কি ? শ্রীকৃষ্ণে রতিই শ্রী ; ধনজনগ্রামাদিবহুলতা শ্রী নহে । দুঃখ কি ? ভগবৎপ্রিয় ব্যক্তির বিরহই দুঃখ ; হৃদয়ব্রণাদি-ব্যথা দুঃখ নহে ॥)

নিম্নে কারণমালা (Causation-series) অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত দিলাম—

"যথোত্তরং পূর্ব্বপূর্ব্বহেতুকস্য তু হেতুতা ।
তদা কারণমালা স্যাৎ ॥

যথা—

সৎসঙ্গমেনৈব ভবেদ্বিরাগো,
বিরাগতঃ স্যান্মনসো বিশুদ্ধিঃ ।
মনো বিশুদ্ধ্যৈব হরেঃ প্রকাশো,
হরেঃ প্রকাশেন কৃতার্থতা স্যাৎ । ৪২ ॥"

(পূর্ব্ব পূর্ব্ব হেতুক পদার্থের যদি উত্তরোত্তর হেতুতা হয়, তাহা হইলে কারণমালা অলঙ্কার হয়, যথা—

সৎসঙ্গেই বৈরাগ্য জন্মে, বৈরাগ্যেই চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি হেতুই হরিপ্রকাশ প্রাপ্ত হন এবং হরিপ্রকাশেই কৃতার্থতা-প্রাপ্তি ঘটে ॥)

সার-অলঙ্কার (Climax) কাহাকে বলে ও তাহার একটী দৃষ্টান্ত নিম্নে লিখিত হইল—

"সারঃ সাহবধিরুৎকর্ষো যস্তবেত্তত্তরোত্তরং ॥
সারোহলঙ্কারঃ ॥

যথা—

বর্ষেষু ভারতাভিধমিহ সারো ভারতে চ তীর্থানি।
তীর্থেষু চ মথুরৈকা বৃন্দারণ্যং মথুরায়াং ॥ ৪৬ ॥"

(উত্তরোত্তর যে সাবধি উৎকর্ষ, তাহার নাম সার অলঙ্কার ॥

যথা—

বর্ষের মধ্যে ভারতবর্ষই শ্রেষ্ঠ, ভারতবর্ষে তীর্থসমূহ শ্রেষ্ঠ, তীর্থের মধ্যে মথুরা ও মথুরা-মধ্যে বৃন্দারণ্য শ্রেষ্ঠ পদার্থ ॥ ৪৬ ॥)

যথাকথঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্যমুপমা—

"উপমানোপমেয়য়োর্যথা কথঞ্চিদ্যেন কেনাপি সমানেন ধর্ম্মেণ সম্বন্ধ উপমা। স চ অংশেন নতু সর্ব্বৈরংশৈঃ; সর্ব্বাংশত্বেনাভেদাদুপমানোপমেয়ভাব এব ন ভবতীতি ॥

(উপমান ও উপমেয়ের যে কোন প্রকারে সমান ধর্ম্ম দ্বারা যে সম্বন্ধ, তাহাকে উপমা কহে। ঐ সাধর্ম্ম্য সর্ব্বাংশে নহে, কিয়দংশে বুঝিতে হইবে; সর্ব্বাংশে সাধর্ম্ম্য হইলে, অভেদবশতঃ উপমান উপমেয়-ভাবই ঘটে না।)

উপমা-অলঙ্কার (Simile and Metaphor) অনেক প্রকারের—অন্যোন্যোপমার দৃষ্টান্ত দিতেছি—

"হরিরিব রাধা রাধেব হরির্গরিমেব মধুরিমা চ তয়োঃ।
অথ মধুরিমেব গরিমা মহিমেব, কৃপা কৃপেব মহিমা চ ॥

(রাধা হরির সদৃশ, হরিও রাধার সদৃশ, তাঁহাদের মধুরিমা তাঁহাদের গরিমার সমান, তাঁহাদের গরিমাও তাঁহাদের মধুরিমার সমান, তাঁহাদের কৃপা তাঁহাদের মহিমার ন্যায়, তাঁহাদের মহিমাও তাঁহাদের কৃপার ন্যায়।)

উপমেয়োপমার দৃষ্টান্ত দিলাম—

"উপমানস্য নিন্দায়ামযোগ্যত্বে নিষেধতঃ
উপমেয়স্য প্রশংসা সোপমেয়োপমাऽপরা।

* * *

ইন্দীবরং বা দলিতাঞ্জনং বা
নবাম্বুদো বা মঘবন্মণির্বা।
কৃষ্ণস্য ধাম্নঃ সদৃশং ন কিঞ্চি-
ত্তদীয়ধামেব তদীয়ধাম ॥
অত্রাऽযোগ্যত্বে নিষেধঃ।"

যথায় উপমানের নিন্দায় উপমেয়ের প্রশংসা হয়; অথবা উপমানের অযোগ্যতাবশতঃ তাহার নিষেধাধীন উপমেয়ের প্রশংসা হয়, তথায় আর একপ্রকার উপমেয়োপমা হইয়া থাকে—

ইন্দীবর হউক বা দলিতাঞ্জন হউক, নবাম্বুদ হউক অথবা ইন্দ্র-নীলমণি হউক, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গের সদৃশ কোন পদার্থই নাই। তদীয় তনু তদীয় তনুর সহিতই তুলনীয় ॥

এস্থানে অযোগ্যতাবশতঃ নিষেধ হইয়াছে ॥

যে শ্লোক চৈতন্যদেবের সমক্ষে সপ্তম বর্ষে আবৃত্তিকরার জন্য (পৃঃ —৬) পরমানন্দ দাসের 'কবিকর্ণপূর' নাম হইয়াছিল, তাহা মালা-রূপকের (অনেক উপমানের সহিত উপমেয়ের তুলনা) দৃষ্টান্তস্বরূপ কর্ণপূর দিয়াছেন—

"মালারূপকমন্যত্তু জ্ঞেয়ং মালোপমানবং ॥

যথা—

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণো রঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি ॥"

মালোপমার ন্যায় মালারূপকও একপ্রকার হইয়া থাকে ॥

যথা—

শ্রবণযুগলের নীলোৎপল, অক্ষিযুগলের অঞ্জন, বক্ষঃস্থলের ইন্দ্রনীল-মণিদাম, অধিক কি, ব্রজসুন্দরীগণের অখিলমণ্ডন সেই নন্দনন্দনের জয় হউক ॥

কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। ইঁহার চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য এবং চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক হইতে গৌরাঙ্গদেব-সম্বন্ধীয় অনেক বৃত্তান্ত আমরা অবগত হই। এই নাটক দশ অঙ্কে বিভক্ত। প্রথম অঙ্কে বর্ণিত আছে যে উৎকলাধিপতি প্রতাপরুদ্র চৈতন্যদেবের তিরোধানজন্য বিষণ্ণ হইয়া রথযাত্রার সময়ে এই নাটকের অভিনয়নিমিত্ত ইচ্ছা প্রকাশকরিয়াছিলেন। এই অঙ্কেই পারিপার্শ্বিক সূত্রধারকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'অচিন্ত্যপ্রভ সেই মহাপুরুষ কি নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ? সূত্রধার এই প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন যে অদ্বৈতবাদিগণের মত-খণ্ডনের নিমিত্ত এবং শ্রীকৃষ্ণই সবিশেষ ব্রহ্ম এবং নামসঙ্কীর্ত্তনসহ ভক্তিযোগ তাঁহার অদ্বিতীয় সাধন, জগতে প্রচারকরিবার নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই চৈতন্যরূপ ধারণকরিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই অঙ্কেই অধর্ম্ম এবং কলির কথোপকথন প্রসঙ্গে চৈতন্যদেবের ঈশ্বরত্ব প্রমাণকরিবার চেষ্টা করাহইয়াছে এবং তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বের ঘটনাবলী বিবৃত করা হইয়াছে। এই অঙ্কের নাম স্বানন্দাবেশ।

দ্বিতীয় অঙ্কের প্রারম্ভে বিবিধ কপটতপস্বীবর্ণন এবং তদনন্তর বিরাগ এবং ভক্তিদেবীর কথোপকথনব্যপদেশে গৌরাঙ্গদেব এবং তাঁহার ভক্তগণের হরিসঙ্কীর্ত্তন এবং চৈতন্যদেবের রুদ্র, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতি অবতারের অনুকরণ এবং পরিশেষে নিত্যানন্দকে তাঁহার ষড়্ভুজ-

মূর্ত্তিপ্রদর্শন বর্ণিত হইয়াছে। এই অঙ্কের নাম সর্ব্বাবতারদর্শন।

তৃতীয় অঙ্কের নাম দান-লীলা। এই অঙ্কে প্রথমে মৈত্রী ও প্রেমভক্তির এবং তাহারপর পারিপার্শ্বিক ও সূত্রধারের কথোপকথন প্রসঙ্গে চৈতন্যদেব এবং তাঁহার ভক্তগণদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলাভিনয় বর্ণিত আছে।

চতুর্থ অঙ্কের নাম সন্ন্যাস-পরিগ্রহ—এই অঙ্কের প্রথমে শচীদেবী তাঁহার ভগিনীর সহিত কথোপকথনছলে তাঁহার পুত্র গৌরাঙ্গদেব যে সন্ন্যাসগ্রহণ করিবেন, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার পরে চৈতন্যদেবের কাটোয়া গ্রামের কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাসগ্রহণের কথা বর্ণিত আছে।

এই গ্রন্থের পঞ্চম অঙ্কের নাম শ্রীঅদ্বৈতপুরবিলাস। এই অঙ্কে লিখিত আছে যে নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবকে বৃন্দাবনের পথ বলিয়া শান্তিপুরের পথে এবং যমুনা বলিয়া ভাগিরথী দেখাইয়া তাঁহাকে শান্তিপুরস্থিত অদ্বৈতাচার্য্যের ভবনে লইয়া আসিয়াছিলেন। এখানে তাঁহার সহিত নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ এবং শচীদেবী মিলিত হইয়াছিলেন।

ষষ্ঠ অঙ্কের নাম শ্রীসার্ব্বভৌমানুগ্রহ। এই অঙ্কে রত্নাকর এবং তাঁহার পত্নী গঙ্গাদেবীর কথোপকথন-প্রসঙ্গে গৌরাঙ্গদেবের শান্তিপুর হইতে জগদানন্দ, মুকুন্দ, দামোদর ও নিত্যানন্দ সমভিব্যাহারে রেমুণায় গোপীনাথ এবং কটকে সাক্ষীগোপাল-দর্শনানন্তর নীলাচলে জগন্নাথদেব-দর্শন এবং সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে অদ্বৈতবাদ হইতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে আনয়ন বর্ণিত হইয়াছে। গঙ্গাদেবী প্রথমে চৈতন্যদেব তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া (নীলাচলে) যাওয়ার জন্য বিমনায়মানা হইয়াছিলেন। পরে যখন রত্নাকর তাঁহাকে বলিলেন যে তাঁহার (রত্নাকরের) সৌভাগ্যে

তাঁহার পত্নী গঙ্গাদেবীও সৌভাগ্যবতী, তখন তিনি কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বনকরিয়াছিলেন।

সপ্তম অঙ্কের নাম তীর্থপর্য্যটন। এই অঙ্কে উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্র এবং তাঁহার সভাপণ্ডিত সার্ব্বভৌমের সমক্ষে চৈতন্যদেবের সঙ্গী বিপ্রগণ-কর্ত্তৃক চৈতন্যদেবের গোদাবরীতীর্থ পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ এবং তথায় রামানন্দ রায়ের সহিত মিলন এবং রামানন্দের সহিত হরিভক্তি ও প্রেমসম্বন্ধীয় কথোপকথন এবং পরে কর্ণাটপতির মল্লভট্টনামা অমাত্য-কর্ত্তৃক চৈতন্যদেবের অবশিষ্ট দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ এবং তাহার পরে তাঁহার নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন বর্ণিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের অষ্টম অঙ্কের নাম প্রতাপরুদ্রানুগ্রহ। এই অঙ্কে চৈতন্য-দেবের নীলাচলস্থিত ভক্তগণের এবং গৌড় হইতে আগত ভক্তগণের সহিত মিলন এবং সার্ব্বভৌমের অনুরোধে এবং চেষ্টায় এবং প্রতাপ-রুদ্রের আন্তরিক আগ্রহে রাজার প্রতি চৈতন্যদেবের অনুগ্রহ বিবৃত হইয়াছে।

নবম অঙ্কের নাম মথুরাগমন। এই অঙ্কে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীর কথোপকথন-ছলে চৈতন্যদেবের গৌড়দেশ হইয়া মথুরাগমনের অভিপ্রায় বিবৃত হইয়াছে। তাহার পর রাজা প্রতাপরুদ্র এবং সার্ব্বভৌমের কথোপকথনব্যপদেশে চৈতন্যদেবের পাণিহাটী, কুমারহট্ট (হালিসহর এবং কাঞ্চনপল্লী), শান্তিপুর, নবদ্বীপ, নবদ্বীপের অপর পারস্থিত কুলিয়াগ্রাম এবং গৌড়েশ্বরের রাজধানী গমন এবং তথা হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন বর্ণিত হইয়াছে এবং নীলাচল হইতে তাঁহার মথুরা এবং বৃন্দাবনগমন ও বারাণসী প্রয়াগাদি তীর্থদর্শন এবং নীলাচলে প্রত্যাগমন বিবৃত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের দশম এবং শেষঅঙ্কের নাম মহামহোৎসব। এই অঙ্কে

চৈতন্যদেবের পুনরায় গৌড়ভক্তগণের সহিত জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-দর্শন এবং জগন্নাথদেবের মন্দিরমার্জ্জন এবং রথযাত্রা-দর্শন এবং রথযাত্রা-উপলক্ষে হরিনামসঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্য এবং প্রতাপরুদ্রের সহিত তাঁহার মহিষীর চৈতন্যদেব এবং তাঁহার পার্ষদদিগের বিষয়ে কথোপকথন এবং লক্ষ্মীদেবীর হোরা মহোৎসব বর্ণিত হইয়াছে। চৈতন্যদেব তাহার পরে অদ্বৈতাচার্য্যকে, তাঁহার (অদ্বৈতের) অনুরোধ রক্ষা হইবে বলিয়া এই কথা বলিলেন—"আমি বৃন্দাবনমধ্যে অবস্থিত হইয়া সরসচিত্তে প্রচুর আনন্দরসে নিত্যই আত্মাকে নিমগ্ন করতঃ তোমাদিগকেও আমার মত কৃষ্ণবর্ণ ও নিরন্তর বৃন্দারণ্যনিবাসী করিব, এইমাত্র সুমহৎ কার্য্য অবশিষ্ট আছে এবং যাঁহারা দ্বারকাধিপতির দাস্য ও সখ্যরসের পাত্র, তাঁহাদিগকে রাধামাধবের দাস ও সখা করিব, আর যাঁহারা ভগবানের অন্যান্য অবতারে সখ্যাদি ভাব অবলম্বনকরিয়াছিলেন, তাঁহারাও আমাতে একান্তভাবে চিত্ত অর্পণকরতঃ শ্রীবৃন্দাবনের পরিকরমধ্যে পরিগণিত হইবেন।৭৪।"

কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচরিতামৃত অথবা কৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য ১৪৬৪ শকে (১৫৪২ খৃষ্টাব্দে) রচিত হইয়াছিল। ইহার কুড়িটী সর্গ আছে। নিম্নে ইহার সূচীপত্র দিলাম। সূচীপত্র এত সহজ সংস্কৃতে লিখিত যে উহার আর বঙ্গানুবাদ দিলাম না—

১ম সর্গে, গ্রন্থকারস্য শ্রীমচ্চৈতন্যদেববন্দনা, স্বাহঙ্কার-পরিহারঃ। সংক্ষেপতঃ গৌরলীলায়া আদ্যন্তবর্ণনং, তেন ভক্তবিরহশ্চ।

২য় সর্গে, নবদ্বীপনগরী-বর্ণনং, শ্রীবাসপণ্ডিতবর্ণনং, শ্রীজগন্নাথমিশ্রস্য শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তিনঃ কন্যয়া শচীদেব্যা সহ বিবাহঃ, গর্ভঃ, দিক-প্রসন্নতা, শ্রীমচ্চৈতন্যদেবস্য জন্ম, বাল্যলীলা, বিদ্যালাভঃ, মাতরং প্রতি হরিবাসর-

দিনে ভোজননিষেধঃ, শাস্ত্রার্থযুক্ত বাক্যেন পিত্রাদীনাং বিস্ময়ঃ। জগন্নাথমিশ্রস্য দেহত্যাগঃ। এতদ্বর্ণনং।

৩য় সর্গে, পথি বল্লভাচার্য্যকন্যায়া লক্ষ্মীদেব্যাঃ সন্দর্শনং, তত্র চ ক্রমশো মনোরথবৃদ্ধিঃ, বনমালিনামাচার্য্যঘটকেন বিবাহঘটনং, বিস্তরতত্তদ্বর্ণনং, যৌবনসময়ে কালসর্পদংশনাৎ লক্ষ্মীদেব্যাঃ প্রাণবিয়োগঃ, শচীদেব্যা বিলাপঃ, প্রভুণা তচ্ছান্তিঃ, কাশীনাথবিপ্রেণ সনাতনমিশ্রকন্যাবিষ্ণুপ্রিয়য়া সহ বিবাহঘটনং, তৎসম্পাদনঞ্চ। এতদ্বর্ণনং।

৪র্থ সর্গে, শিষ্যেভ্যো বিদ্যাধ্যাপনং, মনসি শ্রীহরিনামপ্রচারস্য বাঞ্ছা, শ্রীবাসাদিভিস্তৎপ্রচারঃ, গয়ায়াং পিণ্ডদানং, গৃহাগমনং, এতদ্বর্ণনং।

৫ম সর্গে, গৃহমাগত্য প্রেমচেষ্টা, নবদ্বীপবিহারঃ। এতদ্বর্ণনং।

৬ষ্ঠ সর্গে, শ্রীবাসাদিগৃহেষু নামমাহাত্ম্যবর্ণনং, অন্যৈঃ সহ তদ্বিচারঃ, নিত্যানন্দপ্রভুণা সহ মেলনং, মুরারিমিশ্রকৃত রামাষ্টকশ্রবণাৎ তস্য রামদাসসংজ্ঞা, জনেভ্যঃ ষড়্ভুজমূর্ত্তিদর্শনদানং, এতদ্বর্ণনং।

৭ম সর্গে, স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণদর্শনং নিত্যানন্দাদিসম্মিলনং, ভক্তিশিক্ষাবিস্তারবর্ণনং।

৮ম সর্গে, শ্রীবাসবিদ্বেষিণং বিপ্রং প্রতি অভিশাপঃ, শ্রীবাসং প্রতি স্বস্য কৃষ্ণভাবপ্রকাশঃ, বৃন্দাবনগমনঞ্চ। এতদ্বর্ণনং।

৯ম সর্গে, বৃন্দাবনে গোপাঙ্গনাভিঃ কৃষ্ণভাবেন বিলাসস্মরণবর্ণনং।

১০ম সর্গে, গোপাঙ্গনানাং প্রেমচেষ্টাবর্ণনং।

১১শ সর্গে, রাধাকৃষ্ণবিলাসসংস্মৃত্যা তদ্ভাবেন বিহারঃ, গোপীভাবাদিচেষ্টা, সন্ন্যাসকরণেচ্ছা, নিত্যানন্দমুখাৎ তচ্ছ্রবণাৎ শচীদেব্যা বিলাপঃ, দণ্ড-গৈরিক-বহির্বাসাদিধারণং, নীলাচলগমনোৎকণ্ঠস্য শচীহস্তাৎ অন্নাদি সংভুজ্য ভক্তেভ্যস্তাং সমর্প্য সন্তোষ্য চ গমনং, কটকে গোপীনাথাদিদর্শনং, পথি লোকবিমোহনং। এতদ্বর্ণনং।

১২শ সর্গে, সার্ব্বভৌমস্য গৃহে গমনং, তেন সহ বিচারঃ, বেদান্তিবরং তং ভক্তিভাজং চকার, তেন প্রভুবন্দনং, তন্মুখাৎ গোদাবরীনদীতীরস্থ ভবানন্দপুত্ররামানন্দ রায়স্য বিবরণং, কুর্ম্মক্ষেত্রে গমনং, দক্ষিণভ্রমণাদি-বর্ণনং।

১৩শ সর্গে, ত্রিমল্লাদিতীর্থদর্শনং, রামভক্তমিলনং, শ্রীরঙ্গতীর্থং দৃষ্ট্বা গোদাবরীতীরে রামানন্দরায়মেলনং, তদ্‌গৃহে ভক্তিপরঃ সিদ্ধান্তঃ (আশ্রম-ধর্ম্মাদারভ্য শ্রীরাধাপ্রেমপর্য্যন্তং পহিলহীতি রায়কৃতং গীতং।) দ্বয়োরালিঙ্গনাদি, প্রদ্যুম্নমিশ্রশিখিমাহিতীপ্রতাপরুদ্রাদিমেলনং, শ্রীনীলাচল-নাথজগন্নাথ-দর্শনং, ত্রিবিধভক্তমেলনং। এতদ্‌বিবরণং।

১৪শ সর্গে, গুণ্ডিচাগৃহসংস্কারঃ, অদ্বৈতাদিভক্তৈঃ সহ নবদ্বীপগমনং, শচীগৃহে দিনদ্বয়ং স্থিতিঃ, অদ্বৈতশিবানন্দাদিভিঃ সহ পুনর্নীলাচলগমনং, পথিতীর্থসন্দর্শনং, স্নানযাত্রামহোৎসবঃ। ইত্যাদি বর্ণনং।

১৫শ সর্গে, বৃন্দাবনলীলাস্মরণাৎ প্রভোবিরহঃ, জগন্নাথমন্দিরাদি-ক্ষালনং, রথযাত্রাবিহারঃ, এতদাদিবর্ণনং।

১৬শ সর্গে, গুণ্ডিচামন্দিরে নৃত্যবিলাসবর্ণনং।

১৭শ সর্গে, নৃত্যবিহারান্তে স্নানভোজনাদি পুরুষোত্তম-বিহারোপ-বনবিলাসবর্ণনং।

১৮শ সর্গে, পুনশ্চ রথযাত্রাদিবিলাসবর্ণনং।

১৯শ সর্গে, বৃন্দাবনগমনং, রামানন্দাদিবিহারঃ, পথিপ্রেমবিহ্বলতা, (চিত্রকবিত্বানি চ), নীলাচলবৃন্দাবনাদৌ গমনাগমনং, প্রতাপরুদ্রাদি-মিলনং, নৌকাযানে বিহারঃ, তত্র নৃত্যকীর্ত্তনাদিবর্ণনং।

২০শ সর্গে, নবদ্বীপগমনং, তত্রসর্ব্বৈর্মেলনং, পুনর্নীলাচলগমনং, তত্র মিলনদর্শনান্তরং স্বধামগমনং, তদ্বিরহে রামানন্দস্য দেহত্যাগাদি-বর্ণনং।

কবিকর্ণপূরের আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ-কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র ব্রজলীলা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা দ্বাবিংশ স্তবকে অথবা খণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়াছে। মঙ্গলাচরণ প্রসঙ্গে লিখিত আছে—(রাধারমণ-যন্ত্র-সংস্করণ-অনুবাদ) —"মহাকবি শ্রীকর্ণপূর নন্দোৎসব হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীরাসলীলা পর্য্যন্ত এবং অধিকন্তু হোলা ও দোলাদি সমগ্র শ্রীকৃষ্ণলীলা এই আলোচ্য গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন। এই গ্রন্থ দ্বাবিংশতি স্তবকে সম্পূর্ণ; তন্মধ্যে প্রথম স্তবকে শ্রীবৃন্দাবন-বর্ণন, তৎপরে ছয় স্তবকে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাবধি বাল্যলীলা, তৎপরে পঞ্চদশ স্তবকে শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর-লীলা বর্ণিত হইয়াছে। (৩-৫)।" ইহার রচনাপ্রণালী অনেকাংশে বাণভট্টের কাদম্বরীর ন্যায়। ইহার নাম এবং ইহাতে বর্ণিত বিষয়সম্বন্ধে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর সুখবর্ত্তনী টীকার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"রসজ্ঞ ব্যক্তিগণের চিত্তবিনোদন ও নিজের আনন্দ-বিধানের নিমিত্তই কর্ণপূর এই ৺কৃষ্ণচরিতময় 'আনন্দবৃন্দাবন' নামক চম্পূকাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। গদ্য-পদ্যময় কাব্যের নাম চম্পূ। আনন্দবৃন্দকে অর্থাৎ আনন্দসমূহকে 'অবতি' অর্থাৎ পালন করে বলিয়াই ইহা 'আনন্দ-বৃন্দাবন'; অথবা আনন্দময় শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণচরিত-গাথা ইহার বর্ণিতব্য বিষয় বলিয়াই ইহা 'আনন্দবৃন্দাবন' নামে অভিহিত। গ্রন্থ-কারের 'কবিকর্ণপূর' নাম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রদত্ত। নিজমুখে এই নাম উল্লেখ তাদৃশ দোষাবহ নহে বলিয়াই গ্রন্থকার কেবল 'কর্ণপূর' নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন কিন্তু তথাপি লজ্জাবশতঃ তৎপূর্ব্বে 'কবি' শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। ১৫।

কুসুমসমূহ যেমনই হউক, গ্রন্থন-কৌশলে সেই কুসুমমালা বিচিত্রই হইয়া থাকে। তাহাতে আবার যদি সেই কুসুমসমূহ সুগন্ধবিশিষ্ট ও রমণীয় হয়, তাহা হইলে ত আর কথাই নাই। অর্থাৎ তাহা অনুপম

বিচিত্রতাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেইরূপ আলোচ্য কাব্য-কুসুম-মালিকাও শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধ-সম্বন্ধীয় শ্রীকৃষ্ণচরিতরূপে মহাসৌরভময়ী এবং বৃন্দাবনসম্বন্ধিনী কথারূপে নিখিলজনের চিত্তাকর্ষণী, সুতরাং অতীব রমণীয়া। ১৬।

বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী গ্রন্থের প্রারম্ভেই কবিকর্ণপূরের কবিপ্রতিভা চৈতন্যদেবের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-আস্বাদন সম্ভূতা ইহা বলিয়াছেন (৫ পৃষ্ঠাও দেখুন)।

> বৎসাস্বাদ্য মুহুঃ স্বয়া রসনয়া প্রাপয্য সৎকাব্যতাং
> দেয়ং ভক্তজনেষু ভাবিষু সুরৈর্দুষ্প্রাপমেতত্ত্বয়া।
> ইত্যাজ্ঞাপয়তেব যেন নিদধে শ্রীকর্ণপূরাননে,
> বাল্যে স্বাঙ্ঘ্রিদলামৃতং গতিরসৌ চৈতন্যচন্দ্রোঽস্তু নঃ॥

'হে বৎস! তোমাকে এই যে দেব-দুর্ল্লভ বস্তু দিতেছি, তুমি নিজের জিহ্বাদ্বারা আস্বাদন করিয়া সৎকাব্যে পরিণত করতঃ ভবিষ্যতের ভক্তমণ্ডলীকে দান করিবে;' ইহা আজ্ঞা করিয়া যিনি বালক কবি-কর্ণপূরের মুখে অমৃতস্বরূপ পদ দিয়াছিলেন, সেই চৈতন্যচন্দ্র আমাদিগের গতি হউন।

এই গ্রন্থের প্রথম স্তবকের প্রথম অংশের নাম মঙ্গলাচরণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচরণকমল-বন্দনা এবং দ্বিতীয়াংশের নাম শ্রীবৃন্দাবন-বর্ণনা অর্থাৎ বৃন্দাবনধামের অলৌকিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বিবৃতি। দ্বিতীয় স্তবকের বিষয় শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা। তৃতীয় স্তবকের নাম পূতনাবধ। চতুর্থ স্তবকের বিষয় শকট-ভঞ্জন এবং তৃণাবর্ত্ত-নিধন। "এই চতুর্থ স্তবকে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ঐশ্বর্য্যশালী শকটোৎক্ষেপন ও চাঞ্চল্যশালী তৃণাবর্ত্ত-বধ এবং স্বীয়বিয়োগজনিত জননীর শোক বর্ণিত হইয়াছে।" "পঞ্চম স্তবকে যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণের জৃম্ভণ (হাই তোলা), রিঙ্গণ (পাদস্খলন),

নামকরণ, গব্যচুরি, মৃত্তিকা-ভক্ষণ ও বিশ্বরূপ-দর্শন এই সকল লীলা বর্ণিত হইয়াছে।" ষষ্ঠ স্তবকে ভাণ্ডভঞ্জন, দামবন্ধন, অর্জ্জুনমোক্ষ, ফলক্রয় ও বৃন্দাবনে গমন—এই সকল লীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।" "সপ্তম স্তবকে বৎসাসুর, অঘাসুর ও বকাসুরবধ, পুলিন-ভোজন, বৎসবালকহারী ব্রহ্মার মোহ ও স্তব বর্ণিত হইয়াছে।" অষ্টম স্তবকে শ্রীকৃষ্ণের যুগপৎ পৌগণ্ড এবং কৈশোর লীলার আবির্ভাব, ক্রমান্বয়ে গুরুপত্নীগণের সেই দশাদ্বয়োচিত লীলার আস্বাদন, ব্রজ-কামিনীগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্ব্বানুরাগ, শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষে মহান্ উৎসব, কন্দুক-ক্রীড়া এবং ধেনুকবধ সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।" নবম স্তবকের নাম বনবিহারলীলা। শ্রীকৃষ্ণ একাকী (অর্থাৎ বলরামের সহিত নয়) অন্যান্য সখাগণের সহিত ধেনুচারণার্থ বনগমন করিয়াছিলেন এবং যমুনাস্থিত দুর্দ্দম কালীয়নাগকে দমন করিয়া তাহার ফণার উপরে নৃত্য করিয়াছিলেন : এ স্তবককে কবিকর্ণপূর 'কালীয়-দমন' নামও দিয়াছেন। দশম স্তবকের নাম নিমন্ত্রণ-স্বীকারকৌতুক অথবা শ্রীকৃষ্ণের রাধিকার হস্তে প্রস্তুত অন্নভোজন বিবৃত হইয়াছে। একাদশ স্তবকে রাধাকৃষ্ণের ঋতুবিহার বর্ণিত হইয়াছে। দ্বাদশ স্তবকে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক গোপীগণের বস্ত্রহরণ বর্ণিত হইয়াছে। ত্রয়োদশ স্তবকে শ্রীকৃষ্ণের কৈশোরলীলা বিস্তারব্যপদেশে যজ্ঞপত্নীদিগের[১] প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্দ্দশ স্তবকে শ্রীকৃষ্ণের বসন্তোৎসব বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চদশ স্তবকের নাম গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ অর্থাৎ গোবর্দ্ধনগিরি ধারণকরিয়া শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবাসীদিগকে আধিদৈবিক বিপদ হইতে উদ্ধার। ষোড়শ স্তবকে গোপীগণকে মুগ্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক গোপদিগকে ব্রহ্মলোক-প্রদর্শন বিবৃত হইয়াছে। সপ্তদশ স্তবকে

১। যজ্ঞে নিযুক্ত ব্রাহ্মণদিগের শ্রীকৃষ্ণপাদরতা পত্নীদিগের (শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম—২৩স)।

শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণের সহিত বিহার বিবৃত হইয়াছে। অষ্টাদশ স্তবকে রাসক্রীড়া করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান বর্ণিত হইয়াছে। উনবিংশ স্তবকে গোপীদিগের কৃষ্ণাদর্শনজনিত বিলাপ, তাঁহাদিগের পুনরায় কৃষ্ণদর্শন এবং প্রশ্ন ও উত্তর বিবৃত হইয়াছে। বিংশ স্তবকে শ্রীকৃষ্ণের গোপীদিগের সহিত রাসলীলা বর্ণিত হইয়াছে। একবিংশ স্তবকে শঙ্খচূড় বধ এবং গোপীগণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের মুরলীহরণ বিবৃত হইয়াছে। দ্বাবিংশ স্তবকে শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণের সহিত দোল-লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বাবিংশ স্তবকে অর্থাৎ গ্রন্থের শেষে কবিকর্ণপূর তাঁহার পিতৃদেব শিবানন্দ সেন এবং তাঁহার গুরু শ্রীনাথ পণ্ডিতের প্রতি ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন—

"চৈতন্যকৃষ্ণ-করুণোদিত বাগ্‌বিভূতিস্তন্মাত্রজীবনধনস্য[১] পুত্রঃ।
শ্রীনাথপাদকমলস্মৃতিশুদ্ধবুদ্ধিশ্চম্পূমিমাং রচিতবান্ কবিকর্ণপূরঃ॥

সংস্কৃতকাব্যের মধ্যযুগের (অর্থাৎ কালিদাসের আবির্ভাবের পর-যুগের) রীতি-অনুসারে (গৌড়ীয় রীতি—**a highly artificial style**) কবিকর্ণপূর তাঁহার আনন্দবৃন্দাবনচম্পূর অনেক স্থল দ্ব্যর্থব্যঞ্জক, পাণ্ডিত্য-পূর্ণ, ও শব্দ ও অলঙ্কারবহুল করিয়া অর্থবোধ সুদূরপরাহত করিয়াছেন। ইহার একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি—এই গ্রন্থের 'বৎস-পালন-লীলা' শীর্ষক সপ্তম স্তবকে শ্রীকৃষ্ণকে বকাসুর গ্রাসকরিল, ইহা বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পর শ্রীকৃষ্ণের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া বকাসুর তাঁহাকে বমন করিয়া ফেলিতে বাধ্য হইল। এই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থা কিরূপ হইল তাহা কর্ণপূর বিবৃত করিতেছেন—"তেনোদ্গীর্ণ এব বিধুন্তুদ-বদনতো নিষ্ক্রান্তশ্চন্দ্র ইব ঘনতরঘনঘটাকোটরতো বহির্গতঃ কিরণমালীব

১। শ্রীশিবানন্দ সেনস্য।

গিরিবরগুহাকুহরতোবিনিষ্ক্রান্তঃ কণ্ঠীরবশাবক ইব দস্তুরতম-তমঃসমূহ সমূঢ়সংসার-কূপতোনির্ম্মুক্তঃ স্বভক্তজন ইব তদ্গালগলিতক্লেদলবাক্লিন্ন-বসনভূষণতয়া শোভাতিশয়মেব বিভ্রাণো ন ভেতব্যমিতি মধুরতর-সপ্রণয়-কুলস্বরমখিল-সখিজনান্ মূর্চ্ছাতো বিরময্য ॥ ৩২॥"

"যেমন রাহুগ্রাসমুক্ত চন্দ্রে পাটলবর্ণ-লেশ দৃষ্ট হয়, সূর্য্য দুঃসহ তেজঃব্যঞ্জক হইলেও যখন তিনি নিবিড় জলদ-জাল হইতে বহির্গত হন, তখন লোকেরা যেমন তাঁহাতে মেঘলেশ অনুভব করিয়া থাকে, যেমন গিরিদরীনিষ্ক্রান্ত সিংহশাবকের গাত্রে ক্রীড়া-কৌতুক-দ্যোতক তদীয় গৈরিকাদি চিহ্নলেশ দৃষ্ট হয়, যেরূপ অতি বন্ধুর, অজ্ঞান এবং মোহপূর্ণ সংসারান্ধকার হইতে নির্মুক্ত ভক্তজনে সংসারাসক্তির লেশ বর্ত্তমান থাকে, সেইরূপ বকাসুরের মুখবিবর হইতে উদ্গীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ অসুরের গলনির্গলিত ক্লেদ-দ্বারা তাঁহার বসনভূষণাদি ঈষৎ আক্লিন্ন হওয়ায় অতিশয় শোভা ধারণকরিলেন এবং "ভয় নাই" বলিয়া অতি মধুরস্বরে সখাগণের মূর্চ্ছাভঙ্গ করিলেন।"—আঃ বৃঃ চঃ—৭ম-৩২।

দ্ব্যর্থপূর্ণ এবং অনুপ্রাসবহুল রচনার আর একটী দৃষ্টান্ত নিম্নে দিলাম (৯ম স্তবক-বনবিহারলীলা—৯০)—

যখন শ্রীকৃষ্ণ কালীয়নাগকে শাস্তি দিতেছিলেন, তখন তাঁহার পত্নীগণ নিরুপায় হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে এই প্রকার স্তুতি করিয়াছিলেন—

"রত্নাকর-তনয়া-করলালিতং তব পদাম্ভোজং ভোজং ভোজমেব মানসমুখেন সুখেন সুযোগিনঃ পরমহংসা হংসা ইব ক্ষীরনীরয়ো নীরমিব পুরুষার্থসার্থমুখ্যমপবর্গমপবর্গযোগ্যং কুর্ব্বন্তি ।৯০॥"

(হংস সকল যেরূপ ক্ষীরাম্বুমিশ্রের কেবল দুগ্ধভাগ গ্রহণকরিয়া জলভাগ পরিত্যাগকরিয়া থাকে, সেইরূপ সুযোগী পরমহংসগণ মানস-সুখে আপনার কমলা-কর-লালিত চরণ-কমল-সুধা পুনঃ পুনঃ

পরম সুখে আস্বাদনকরিয়া পুরুষার্থ-প্রধান মোক্ষকেও পরিহারযোগ্য করিয়া থাকেন। আপনার চরণচিন্তনাস্বাদে ব্রহ্মজ্ঞানসাধ্য মোক্ষের প্রতিও রুচি না হওয়ায় ব্রহ্ম অপেক্ষাও আপনার মাহাত্ম্য প্রত্যুত অধিক বিবেচিত হয় ॥৯০॥)

যেরূপ কল্পনাপ্রসূত বিবিধ অলঙ্কার এবং শব্দবিন্যাস নিমিত্ত গ্রন্থকারের মনোভাব দুর্বোধ্য না হইলেও মাঝে মাঝে কষ্টবোধ্য হইয়াছে, সেইরূপ পৌরাণিক বৃত্তান্তের স্বকপোলকল্পিত পরিবর্ত্তনের দ্বারা মধ্যে মধ্যে তিনি অদ্ভুত পুরাণের সৃষ্টি করিয়াছেন।

আনন্দবৃন্দাবনচম্পূতে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মলীলা-বর্ণনায় লিখিত হইয়াছে—অনাদিকাল হইতে যাঁহারা পিতৃমাতৃ-ভাবসিদ্ধ সেই নন্দ-যশোদার শ্রীগোবিন্দ পুত্রত্ব স্বীকার করিলেন। তাহার পর কংসভয়ে বসুদেব কর্ত্তৃক আনীত তাঁহার তনয় শ্রীবাসুদেব নন্দ-যশোদার তনয় শ্রীগোবিন্দের সহিত মিলিত হইলেন। শ্রীগোবিন্দ-দেহস্থিত শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন শ্রীবাসুদেবের শঙ্খচক্রাদির সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হইল ইত্যাদি (১৯ এবং ২০ শ্লোকের অনুবাদ)। ভগবানের ঐশ্বর্য্য বাসুদেবে এবং তাঁহার মাধুর্য্য গোবিন্দে প্রকটিত হইয়াছিল। কবিকর্ণপূর কোথা হইতে এই মিশ্রণ তথ্যটী পাইলেন আমরা জ্ঞাত নই।[১] অন্ততঃ শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে (৩য় অধ্যায়—৩৭-৪৩) যেস্থানে দেবকীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম লিখিত আছে, সেস্থানে এরূপ বর্ণনা নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের ঐ অংশের খগেন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল—"তখন বসুদেব শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়-অনুসারে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিবার মানসে পুত্র লইয়া যেমন সূতিকাগার হইতে বহির্গত হইতে ইচ্ছা করিলেন, তৎসময়েই অযোনিসম্ভবা যোগমায়া নন্দপত্নী যশোদার গর্ভ হইতে

১। আমার একজন কাঁচরাপাড়ার বন্ধু বলিলেন যে ইহা লঘু-ভাগবতে আছে।

সমুৎপন্ন হইলেন ॥৩৭॥ সেই মহামায়ার প্রভাবে কংস-কারাগারের প্রহরী ও নিকটস্থ পুরবাসীসকল অচেতনপ্রায় হইয়া তৎকালে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। লৌহময় শৃঙ্খল অর্গলে দৃঢ় আবদ্ধ বৃহৎ বৃহৎ কবাটসমূহ উত্তমরূপে রুদ্ধ থাকায় সকলের দুরতিক্রমনীয় হইলেও (৩৮) দিবাকরের সন্দর্শনে নৈশ অন্ধকারের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে করিয়া বসুদেবের দ্বারসকলের সমীপাগমনেই তাহারা আপনা হইতে উন্মোচিত হইয়া গেল। ধীর ও গম্ভীর ভাবে গর্জ্জনকরতঃ বারিবাহ বারি বর্ষণ করিতে লাগিল; অনন্তদেব বসুদেবের উপরে ফণা বিস্তার-পূর্ব্বক বৃষ্টি নিবারণকরতঃ তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন ॥৩৯॥ ইন্দ্রদেবের প্রচুর বর্ষণে গম্ভীরতোয়া যমুনা প্রবলবেগ ধারণকরতঃ তরঙ্গমালায় উচ্ছলিত হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল; কিন্তু সীতাপতির শুভাগমনে সিন্ধুর ন্যায় কৃষ্ণবাহী বসুদেবকে অতিক্রমণার্থ পথ প্রদান করিল ॥৪০॥ অনন্তর শূরবংশাবতংস বসুদেব নন্দরাজের গোকুলে প্রবেশপূর্ব্বক নিদ্রাভিভূত গোপগণের অজ্ঞাতসারে যশোদার শয্যায় নিজপুত্রকে সংস্থাপিত করিলেন এবং তদীয় কন্যা গ্রহণকরিয়া স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪০ ॥ গৃহে উপস্থিত হইয়া দেবকীর শয্যায় কন্যাটী রাখিয়া স্বীয় চরণে পূর্ব্বের ন্যায় শৃঙ্খল বন্ধনকরিয়া রহিলেন ॥ ৪২ ॥ এদিকে নন্দপত্নী যশোদা পরিশ্রান্তা ও মায়াবিমোহিতা হইয়া প্রসবের পরই নিদ্রিতা হইলেন। এমন কি, প্রসব করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু পুত্র কি কন্যা, তাহাও তাঁহার জ্ঞান ছিল না ॥ ৪৩ ॥"

শ্রীকৃষ্ণের দধিভাণ্ডভঞ্জন যাহা ২৪ ছত্রে শ্রীমদ্ভাগবতে (১০ম-৯অঃ-১-১০) বর্ণিত হইয়াছে কবিকর্ণপূর তাহা প্রায় ৭২ ছত্রে (৬ষ্ঠ-১-১৮) বিবৃত করিয়াছেন। প্রথমে আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ (খগেন্দ্র শাস্ত্রীকৃত) দিব এবং পরে কবিকর্ণপূরের আনন্দবৃন্দাবনচম্পূর (রাধা-

রমণ যন্ত্র-সংস্করণ) অনুবাদ দিব। পাঠকগণ দুইটী তুলনা করিলেই দেখিতে পাইবেন যে কর্ণপূর শ্রীমদ্ভাগবত কিরূপ কল্পনাদ্বারা পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত--

"পরে গৃহাভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ বিপর্য্যস্ত উদূখলের উপর উপবেশনকরতঃ শিক্যাস্থ সদ্যোজাত নবনীত নামাইয়া বানরগণকে প্রচুর পরিমাণে প্রদান করিতেছেন এবং শঙ্কিত নয়নে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণকরতঃ স্বয়ং ভোজন করিতেছেন। তখন তিনি (যশোদা) ধীরে ধীরে তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে অগ্রসর হইলেন ॥ ৬ ॥

কৃষ্ণ তখন যষ্টিকরে মাতাকে সমীপে আগমন করিতে দেখিয়া ভীতের ন্যায় উদূখল হইতে অবতরণপূর্ব্বক সত্বর পলায়ন করিলেন; এবং যোগযুক্ত যোগীর মনও যাঁহাকে সহজে ধরিতে পারে না, সেই বিষ্ণুকে ধরিবার নিমিত্ত যশোদা কৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিতা হইলেন ॥ ৭ ॥

বালকের পশ্চাতে দ্রুতবেগে গমন করায় কবরী শিথিল হইয়া প্রসূনসকল পথি মধ্যে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। মন্থরগমনা তন্বঙ্গী যশোদার গুরুনিতম্বভারে গতি রুদ্ধ হইয়া আসিল; তিনি কষ্টে পৃষ্ঠ হইতে বালককে ধরিলেন ॥ ৮ ॥

যশোদা ভয়বিহ্বলনেত্র গোবিন্দের মুখপানে নিরীক্ষণকরতঃ হস্তধারণপূর্ব্বক ভয় প্রদর্শনকরিয়া তিরস্কার করাতে, কৃষ্ণ আপনাকে অপরাধী দেখাইয়া রোদন করিতে করিতে অপর হস্তে চক্ষুদ্বয় মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। অশ্রুজলে লোচনের অঞ্জন চতুর্দ্দিকে প্রলিপ্ত হইয়া গেল ॥ ৯ ॥

প্রেমবতী যশোদা পুত্রের ঐশ্বর্য্য অবগত ছিলেন না; তিনি পুত্রকে

ভীত ও সংত্রস্ত মনে করিয়া যষ্টি পরিত্যাগপূর্ব্বক রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ১০ ॥

আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ—

"অহো! অবহনন অর্থাৎ গোধূমাদির দলন-মর্দ্দন সময় ভিন্ন অন্য সময়ে যে উদূখল অধোমুখে অবস্থিত থাকে খল-নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণ সেই উদূখলের পৃষ্ঠে আরোহণকরিয়া সতর্কভাবে জননীর আগমন-পথে নয়ন ন্যস্ত করিয়া তত্রস্থ নবীন কপিশাবকদিগকে সেই নবনীত ভোজন করাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

অনন্তর চুল্লী হইতে দুগ্ধস্থালী অবতরণ করিয়া নিজ সৌভাগ্যে নিখিল জগজ্জনের নিস্তারকারিণী শ্রীযশোদা যথায় পুত্রকে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন। আহা! অনির্ব্বচনীয় ভাগ্য-ফলেই তিনি এতাদৃশ পুত্র লাভ করিয়াছেন এবং সুনীতিসমূহ-দ্বারাই তাঁহার যশোরাশি-লাভ ঘটিয়াছে। এই জন্যই যশঃ ও কান্তিচ্ছটায় তিনি অতীব রমণীয় শোভা ধারণকরিয়াছেন। এইরূপ কীর্ত্তি-কান্তিময়ী শ্রীযশোদা তখন পুত্রকে কোলে করিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইয়া পুত্রকে যথাস্থানে অবস্থিত না দেখিয়া অত্যন্ত বিষাদিতা হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ কোথায় গেলেন, অনুসন্ধান করিতে করিতে মনে অত্যন্ত আক্ষেপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন—সম্মুখে দধিভাণ্ড ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, আর অগণিত মথিত দধিধারায় প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরভাগ সম্পূর্ণ ধবলিত ও পিচ্ছিলতাযুক্ত হইয়াছে এবং নিক্ষেপ-বেগে খণ্ডিত শত শত কর্পর (খাপরা) পতিত রহিয়াছে। 'হায়! একি অকস্মাৎ ঘটিল, কি কারণে এই দধিভাণ্ড ভগ্ন হইল?' এইরূপ চিন্তা করিয়াও শ্রীযশোদা তাহার প্রকৃত কারণ-নির্ণয়ে সমর্থা হইলেন না। কিন্তু তথায় শিলাখণ্ডসকল পড়িয়া আছে দেখিয়া বুঝিলেন—ইহা নিশ্চয়

শ্রীকৃষ্ণেরই দুষ্কার্য্য! তখন শ্রীযশোদা আপনার নাসাগ্রে সুন্দর বাম-তর্জ্জনী ন্যস্ত করিয়া ক্ষণকাল তাহা দেখিতে দেখিতে বিস্ময়াপন্না হইলেন ॥ ১২ ॥

* * * কিন্তু এইরূপ বিস্ময় ও অহঙ্কার থাকা সত্ত্বেও শ্রীযশোদা অতীব শুদ্ধহৃদয়া ও দয়ালু। তখন তিনি কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশকরিয়া —যাঁহার তেজঃপ্রভাব সর্ব্বত্র অপ্রতিহত এবং লীলা-চৌর্য্যাদি উৎসবে যাঁহার জ্ঞানগর্ব্ব সমধিকরূপে স্ফুরিত হয়, সেই পুত্রের অন্বেষণের নিমিত্ত শ্রীযশোদা যখন বাহিরে আসিলেন ॥ ১৩; আমরি! তখন তাঁহাকে দেখিয়া সেই শ্যামল দুগ্ধপোষ্য মোহনদেবতা (শ্রীকৃষ্ণ) সহসা সভয়ে উঠিয়া চঞ্চলভাবে পলায়নপর হইলেন এবং অবমাননার আশঙ্কায় ক্রমে পরাক্রমের সহিত সবেগে ধাবিত হইতে লাগিলেন। লোক-চরিতা-ভিজ্ঞা জননী শ্রীযশোদাও দ্রুতপদে তাঁহার অনুসরণ করিতে করিতে স্নেহব্যঞ্জক স্বরে বলিতে লাগিলেন—দাঁড়াও, জগতের অদ্বিতীয় ধূর্ত্ত! দাঁড়াও, আর দৌড়িও না, দৌড়িও না' ॥১৪॥

তখন শ্রীকৃষ্ণের মন মান (অভিমান) দ্বারা উন্নত থাকায় তিনি পলাইতে পলাইতে—মা আসিতেছেন কি না আসিতেছেন ঈষৎ গ্রীবা ফিরাইয়া দেখিতে লাগিলেন। যখন দেখিলেন জননী ব্যাকুল-হৃদয়ে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন এবং সৌন্দর্য্যে তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতীব নির্ম্মল হইয়াছে—অমনই তখন শ্রীকৃষ্ণ এই নূতন ভয়ে পুনরায় ধাবিত হইতে লাগিলেন ॥১৫॥

অনন্তর অতিশয় ত্বরিত গতিতে দৌড়াইতে দৌড়াইতে চকিত নয়নে জননীকে বারংবার দেখিবার উদ্দেশ্যে মনোহর গ্রীবাভঙ্গীকরিয়া পশ্চাদ্ভাগে চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপকরিতে লাগিলেন এবং যেন আর দৌড়াইতে পারিতেছেন না, এইরূপ মিথ্যা ক্ষোভ-বশতঃ যেমন কাতর

ও অলস হইয়া পড়িলেন, অমনই তাহাতে জননীর কৃত্রিম ক্রোধপূর্ণ চিত্ত শান্ত-শীতল হইল ॥১৬॥

তখন শ্রীযশোদা কহিলেন—'ধূর্ত্ত! এমন ভাবে আর কতদূর দৌড়াবে? আর কোথায় বা যাবে? অতএব দৌড়াইও না—ঐ স্থানেই দাঁড়াও।' এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ দূরে থাকিয়াই কহিলেন—"যদি তুমি আমাকে প্রহার না কর এবং করতল হইতে যষ্টি ফেলিয়া দাও, তাহা হইলে আমি আর অধিক দূরে পলাইয়া যাইব না।' শ্রীযশোদা পুনরায় কহিলেন—'তাড়নায় যদি তোমার এই ভয়, তবে কেন আজ দধিভাণ্ড ভাঙ্গিয়াছ?' শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—'মা! আর আমি এরূপ কর্ম্ম করিব না'—তুমি হাত হইতে যষ্টি ফেলিয়া দাও ॥১৭॥

এই কথা শুনিয়া শ্রীযশোদা মনে মনে বড়ই বিস্মিতা হইলেন, কিন্তু বাহিরে রোষভাব প্রকাশপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গিয়া যেমন তাঁহাকে ধরিতে উদ্যতা হইলেন, অমনই তখন শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় ত্বরিত পদে ধাবমান হইলেন॥ জননীও পুনরায় তাঁহার অনুধাবন করিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাকুলচিত্তে পুনরায় কহিলেন—'মা! তুমি হাত হইতে ঐ খরতর যষ্টিখানি ফেলিয়া দাও। আর আমাকে তাড়না করিও না। হে অনঘে! যদি তুমি এই কার্য্য কর এবং মারিব না বলিয়া শপথ কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তোমার কাছে যাইব।' শ্রীযশোদা পুত্রের এই কাতরবাক্য শ্রবণকরিয়া তৎক্ষণাৎ হস্ত হইতে যষ্টিখানি ফেলিয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দূর হইতে তাহা দেখিয়া আর ধাবিত হইলেন না, সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥১৮॥"

যদিও কর্ণপূরের অলৌকিক কবিত্বশক্তি তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ কবিতায় ও নাটকে 'চৈতন্যদেব বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণের অবতার এবং তাঁহার পার্ষদগণ বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণের সখা ও সখিগণের অবতার'—

ইহা প্রতিপাদনের নিমিত্ত অদ্ভুত কাল্পনিক সৃষ্টিতে নিয়োজিত হইয়াছে, তত্রাচ শাশ্বত সত্যের ও সৌন্দর্য্যের বিবৃতিতে তাঁহার কাব্য-প্রতিভা স্থানে স্থানে পরিস্ফুরিত হইয়াছে, তাহার কতিপয় দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল—

একজন দর্জ্জী (সৌচিক) নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের সৌন্দর্য্য ও নাম-সংকীর্ত্তনের প্রভাবে বৈষ্ণব হইয়াছিলেন, এই বিষয়ে বিরাগ ভক্তিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন (চৈঃ চঃ নাঃ—২য়-২৬)[১]—

"বিরাগ— কথময়ং নীচযোনিরেতাদৃশসৌভাগ্যভাজনঃ আসীৎ।

ভক্তি— ন জাতিশীলাশ্রম ধর্ম্মবিদ্যা
কুলাদ্যপেক্ষী হি হরেঃ প্রসাদঃ।
যাদৃচ্ছিকোঽসৌ বত নাস্য পাত্রা-
পাত্র ব্যবস্থা প্রতিপত্তিরাস্তে॥

বিরাগ। এই সৌচিক অতি নীচজাতি হইয়াও কিরূপে এমন সৌভাগ্য-শালী হইল?

ভক্তি। করুণাময় সেই ভগবান্, জাতি, স্বভাব, আশ্রম, ধর্ম্ম, বিদ্যা, কুল প্রভৃতির অপেক্ষা না করিয়া এবং পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া সকলের প্রতিই অবলীলাক্রমে প্রসন্ন হইয়া থাকেন।"

চৈতন্যদেব সন্ন্যাসগ্রহণের পর বলিতেছেন—(চৈঃ চঃ নাঃ—৫ম-১)—

শ্রীচৈ। এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা
মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমোমুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব॥"

১। অধিকাংশ অনুবাদ রামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃত।

(শ্রীচৈতন্য। আহা! পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ যাহা অবলম্বনকরিয়াছেন, সেই পরমাত্মনিষ্ঠাকে সম্যক্‌রূপে আশ্রয়করিয়া, ভগবান্ মুকুন্দের পদসেবাদ্বারা অনায়াসে এই দুস্পার সংসার হইতে আমি উত্তীর্ণ হইব।)

জগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও চৈতন্যদেব-দর্শন-জন্য নীলাচলে আগত গৌড়ের ভক্তগণের যাহাতে জগন্নাথদেবদর্শন সুকর হয়, এই নিমিত্ত উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌমকে তাহার সমাধান করিবার নিমিত্ত প্রেরণকরিলেন। সার্ব্বভৌম তাঁহাদিগের হরিসঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্য-দর্শনে মোহিত হইয়া বলিতেছেন (চৈঃ চঃ—না-৮ম-৫০)—

"আনন্দহুংকার গভীরঘোষো
হর্ষানিলোচ্ছ্বাসিততাণ্ডবোর্ম্মিঃ।
লাবণ্যবাহী হরিভক্তিসিন্ধু
শ্চলঃ স্থিরং সিন্ধুমধঃকরোতি॥

(আহা! সম্মুখে এই লাবণ্যজলে পূর্ণগতিশীল, হরিভক্তিরূপ সমুদ্র, আনন্দজনিত হুঙ্কাররূপ গভীর গর্জ্জনদ্বারা ও আহ্লাদ-সমীরণের বেগজনিত নৃত্যরূপ তরঙ্গাবলীদ্বারা এই স্থির সমুদ্রকে পরাজয় করিতেছে।)

চৈতন্যদেব নীলাচলে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইলে যখন তাঁহার ভক্তগণ হরিনাম-কীর্ত্তন-দ্বারা তাঁহার মূর্চ্ছার অপনোদন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে কঞ্চুকী রাজা প্রতাপরুদ্রের মহিষীগণকে বলিতেছেন (চৈঃ চঃ—নাঃ-১০ম-৬৩)—

কঞ্চু। পুর্নিভাল্য অহো অদ্ভুতং॥
যেনৈব গীতেন বভূব মূর্চ্ছা,
তেনৈব ভূয়োঽজনি সংপ্রবোধঃ।

কিমেক এবৈষ স কোঽপি মন্ত্রঃ,
প্রয়োগ-সংহারবিধৌ স্বতন্ত্রঃ ॥

অপিচ ॥ নৃত্যোন্মাদতরঙ্গিনীং বলবতীরানন্দবাত্যা ক্রমা
দত্যুল্লাসয়তি স্ম তত্র জনিতো বীচিতরঙ্গক্রমঃ।
কশ্চিৎ কঞ্চিদনীনশত্তমপরস্তুঞ্চাপরস্তং পর
শ্চেত্যানন্দতরঙ্গজৈব বিধিনাবৃত্তির্ন গীতার্থজা ॥"

কঞ্চুকী। পুনর্ব্বার নির্ণয় করিয়া কহিল, "আহা! কি আশ্চর্য্য! যে সংগীতে (হরিনাম-কীর্ত্তনে) মূর্চ্ছা হইল, সেই সংগীতেই পুনর্ব্বার প্রবোধ হইতেছে, আহা! এইটী (হরিনাম) কি অপূর্ব্ব মন্ত্র, যাহাতে মূর্চ্ছা ও প্রবোধ, এই উভয় কার্য্যই সম্পাদিত হইতেছে! প্রবল আনন্দ-পবনে ইঁহার নৃত্য-সম্ভূত উন্মাদ-তরঙ্গিণী ক্রমে ক্রমে অতীব পরিবর্দ্ধিত হইলে, তাহাতে এইরূপ তরঙ্গাবলী উদ্গত হইতে লাগিল যে, একটী অপরটীকে বিনষ্ট করিয়া নিজ প্রভাব প্রকাশ করিতে লাগিল এবং এইরূপ আনন্দ তরঙ্গ হইতে কত কত ভাবের উদয় হইতে লাগিল তাহা বর্ণনাতীত।"

চৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যে কবিকর্ণপূর দোলপূর্ণিমাতে (শক ১৪০৭, খৃঃ ১৪৮৬) চন্দ্রগ্রহণের সময়ে নবদ্বীপে জগন্নাথমিশ্রের ঔরসে এবং শচী-দেবীর গর্ভে চৈতন্যদেবের জন্মবর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিতেছেন (২য়—৩৯-৪০)—

"তদোপরাগঃ সমভূত্তথা মুহু-
র্হরিং বদেতি ধ্বনিরুচ্চকৈর্নৃণাং।
স্বনামসংকীর্ত্তনমন্যথা নহি
প্রকাশমাত্রেণ ভবেৎ প্রকাশিতং ॥

স্বধানিধিং তৎ সময়ে বিধুন্তুদ
স্তুতোদ সানন্দ মরুন্তুদো ভৃশং।
অলং ত্বয়া সংপ্রতি শীতদীধিতিঃ
সমুদ্গতোন্যোস্তি ভুবীতি ভাবয়ন্ ॥৪০॥

মহাপ্রভুর জন্মসময়ে মানবগণের 'হরিবোল' এই ধ্বনির সহিত গ্রহণ উপস্থিত হইল, ইহা না হইবেই বা কেন? তাঁহার আবির্ভাব-মাত্রে হরিনাম জগতে প্রকাশিত হইবে ॥৩৯॥

তখন রাহু এই বলিয়া চন্দ্রকে গ্রাসকরিতে লাগিল, 'হে নিশানাথ! তুমি আর কেন বৃথা উদয় হইতেছ, ঐ দেখ অপর চন্দ্রমা পৃথিবীতে উদিত হইয়াছেন' ॥৪০॥

চৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যের ১২শ সর্গে (১২৪-৫) কর্ণপূর চৈতন্য-দেবের গোদাবরী-নদীর সমীপে আগমন-প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

"নিষ্কূজশান্তাঃ ক্বচ চণ্ডশব্দ-
প্রতিধ্বনিগ্রস্তদিশঃ ক্বচাপি।
ক্বচ প্রসুপ্তোরুকরাল সত্ত্ব-
শ্বাসাগ্নিদীপ্তা বনভূমিভাগাঃ ॥ ১২৪ ॥
গোদাবরীবেগ মহানিনাদা
ভীমা গিরিপ্রস্রবণা রবেণ।
শ্রীগৌরচন্দ্রস্য বিতেনুরুচ্চৈঃ
সুকোমলং চিত্তমনাপ্তধৈর্য্যং ॥ ১২৫ ॥

যে অরণ্যের ভূভাগসকল কোন স্থানে পশু-পক্ষ্যাদির শব্দ-শূন্য হওয়ায় শান্ত, কোন স্থানে প্রচণ্ড শব্দের প্রতিধ্বনিতে দিক্ সকল গ্রস্ত-প্রায় এবং কোথাও বা প্রসুপ্ত অতি ভয়ানক জন্তুসকলের নিশ্বাসরূপ অগ্নিদ্বারা বনভূভাগ সুদীপ্ত, তথা গোদাবরীর জলবেগের মহানিনাদ

ও ভয়ানক গিরিপ্রস্রবণ (পর্ব্বতের ঝরণা) শ্রীগৌরচন্দ্রের সুকোমল চিত্তকে ধৈর্য্যশূন্য করিতে লাগিল ॥ ১২৪ ॥ ১২৫ ॥"

চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যের ১৫শ সর্গে (৬০) নীলাচলে ভক্তগণ সহ গৌরাঙ্গদেবের গুণ্ডিচা-মার্জ্জনের পরে তাঁহার নৃত্য কর্ণপূর বর্ণনা করিতেছেন—

"সহজ পরমসুস্বরাস্ত এতে
প্রভুপুরতঃ প্রভুনর্ত্তনে তথৈতে।
যদথ জগুরুদারচারুধীরং
তদিহ জনঃ পরিবর্ণয়েদহো কঃ ॥ ৬০ ॥

(প্রভু নৃত্য করিলে পর স্বভাবতঃ মহাসুস্বর ভক্তগণ প্রভুর অগ্রে তদ্রূপই নৃত্যারম্ভ করিলেন এবং অতিসুশ্রাব্য ও সুধীর স্বরে যেরূপ গান করিতে লাগিলেন, অহো! সেই গান এই ভূমণ্ডলে কোন্ ব্যক্তি সম্যক্‌রূপে বর্ণন করিবে ? ॥ ৬০ ॥")

নীলাচলে বলদেবের রথের সম্মুখে প্রণতি করিয়া চৈতন্যদেব যে শ্রীকৃষ্ণের দাস তাহাই তিনি বলিতেছেন (চৈঃ চঃ মঃ—১৬শ-৪)—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতি র্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী নচ গৃহপতি র্নোবনস্থোযতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে—
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দ্দাসদাসানুদাসঃ ॥ ৪ ॥

(ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বর্ণী (ব্রহ্মচারী) গৃহপতি (গৃহস্থ) বনস্থ (বানপ্রস্থ) অথবা যতি (ভিক্ষুক বা সন্ন্যাসী) এই সকল জাতি ও আশ্রম মধ্যে আমি কিছুই নহি, কিন্তু সমুচ্ছলিত পরমানন্দের সম্পূর্ণ সুধাসাগর গোপীভর্ত্তা শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের পাদপদ্মদ্বয়ের দাস দাসের অনুদাস ॥৪॥")

ভারবীর কীরাতার্জ্জুনীয়ের ন্যায় কবিকর্ণপূরের কাব্যে অনুপ্রাস ও

জটিল অর্থপ্রিয়তা নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। চৈতন্যদেব, গোবিন্দ, জগদানন্দ, দামোদর ও পরমানন্দপুরীর সহিত নীলাচল হইতে গৌড়ে আসিতেছেন—(চৈঃ চঃ ম—১৯শ-২৫)—

"গোবিন্দো জগদানন্দঃ শ্রীদামোদরপণ্ডিতঃ।
যতিশ্রেষ্ঠপুরীস্বামী কীর্ত্তয়ন্তঃ সমাযযুঃ ॥ ২৪ ॥
ললল্লীলো ললল্লীলো লোলো লোলো ললল্ললঃ।
লীলালোলো হলিলীলালীং লীলালীং লোললাং ললুঃ ॥২৫"

(তৎপরে গোবিন্দ, জগদানন্দ, দামোদর-পণ্ডিত এবং যতিবর পরমানন্দপুরী ইঁহারা সকলে কীর্ত্তন করিতে করিতে গমন করিলেন ॥২৪

অনন্তর নীলাচললীলাকে বিদূরিত করতঃ ব্রজগমনরূপ-লীলাই যাঁহার অভিপ্রেত সুতরাং তন্নিমিত্তই মহাপ্রভু সতৃষ্ণ ও চঞ্চল হইয়া সমস্ত ভক্তজনকে ত্যাগকরিয়া বিলাসে চঞ্চলমনাঃ হইলেন, তথা অনুগামী ভক্তগণও যাহাতে সেই চঞ্চলমনাঃ গৌরচন্দ্রকে ধরিতে পারা যায় তাদৃশ ভ্রমরগণের লীলাসমূহের ন্যায় বিবিধ লীলা করিতে লাগিলেন।

ইহার তাৎপর্য্যার্থ যথা—বায়ুতে পুষ্প চালিত হইলে মধুলুব্ধ ভ্রমর যেমন কিছুতেই ত্যাগ করে না, বরং বসিবারই চেষ্টা পায়, তদ্রূপ প্রভুপাদানুরক্ত ভক্তগণ বৃন্দাবন-গমনার্থ চঞ্চলচিত্ত প্রভুকে না ছাড়িয়া ধরিবারই চেষ্টা করিতে তৎপর হইলেন ॥ ২৫ ॥)

কবিকর্ণপূর তাঁহার এই মহাকাব্যের (২০শ—৪০-৪১) দুইটী শ্লোকে চৈতন্যদেবের অন্ত্যলীলার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"চতুর্বিংশে তাবৎ প্রকটিতনিজপ্রেমবিবশঃ
প্রকাশ্যং সন্ন্যাসং সমকৃত নবদ্বীপতলতঃ।
ত্রিবর্ষঞ্চ ক্ষেত্রাদপি তত ইতো যন্নগময়-
স্তথা দৃষ্ট্বা যাত্রা ব্যনয়দখিলা বিংশতিসমাঃ ॥৪০॥

ইত্থং চত্বারিংশতা সপ্তভাজা
শ্রীগৌরাঙ্গো হায়নানাং ক্রমেণ।
নানালীলালাস্যমাসাদ্য ভূমৌ
ক্রীড়ন্ ধাম স্বং ততোঽসৌ জগাম ॥ ৪১ ॥"

(মহাপ্রভু চতুর্ব্বিংশ বৎসরে নিজপ্রেম প্রকটন-করতঃ যথেষ্ট বিবশ হইয়া নবদ্বীপ হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণকরিয়াছিলেন এবং শ্রীক্ষেত্র হইতে গমনকরতঃ ইতস্ততঃ গমনাগমনে তিন বৎসর যাপিত করিয়া সমূহ যাত্রা (জগন্নাথদেবের রথযাত্রা প্রভৃতি উৎসব) দর্শন-করতঃ অখিল বিংশতি বৎসর যাপন করিয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥ শ্রীগৌরাঙ্গদেব এইরূপে সাতচল্লিশ বৎসরে যথাক্রমে নানাবিধ লীলানৃত্য বিধানকরতঃ ভূমণ্ডলে ক্রীড়া করিয়া তৎপরে স্বধামে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥)

আনন্দবৃন্দাবনচম্পূতে (৭ম স্তবক-বৎসপালনলীলা-৫৭, রাধারমণ যন্ত্রসংস্করণ) কবি সুমধুর বাক্যবিন্যাসের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের রাখালবেশ বর্ণনা করিয়াছেন—

"বেণুং বামে করকিশলয়ে দক্ষিণে চারু যষ্টিং
কক্ষে বেত্রং দলবিরচিতং শৃঙ্গমত্যদ্ভুতঞ্চ।
বর্হোত্তংসং চিকুরনিকরে বক্ষ্ণ কণ্ঠোপকণ্ঠে
গুঞ্জাহারং কুবলয়যুগং কর্ণয়োশ্চারু বিভ্রৎ ॥ ৫৭ ॥"

(বামকর-কমলে বেণু, দক্ষিণকরে সুচারু-যষ্টি, কক্ষে বেত্র এবং পত্র-বিরচিত অতি অদ্ভুত শিঙ্গা, মস্তকে কেশপাশের উপর শিখিপুচ্ছ-নিৰ্ম্মিত চূড়া, সুন্দর কণ্ঠদেশে গুঞ্জা-হার এবং কর্ণযুগলে মনোহর কুবলয়দ্বয় অতি চমৎকার শোভা বিস্তারকরিয়াছে ॥ ৫৭ ॥")

আয়াসসাধ্য জ্ঞানমার্গ পরিত্যাগকরিয়া যাঁহারা ভক্তিসহকারে ভগ-

বানের শরণ লন, ঈশ্বর তাঁহাদিগের বশীভূত হন—(আঃ বৃঃ চঃ—৭ম স্তবক-১৪৪)—

"বিজহতি যে প্রয়াসমববোধবিধৌ সুধিয়ো
দধতি তবাঙ্ঘ্রিপঙ্করুহভাবমতীব দৃঢ়ং।
অতিকুতুকী স্ববানপি কৃপাব্ধিতরঙ্গচল
স্বমজিত তৈর্জিতো ভবসি নাথ তদীয়বশঃ ॥ ১৪৪ ॥"

(যে সকল পণ্ডিত ব্যক্তি জ্ঞানবিধির জন্য কষ্ট পরিত্যাগকরিয়া আপনার চরণ-কমলের ভাবকে দৃঢ়রূপে ধারণ করেন, আপনি অতি কুতূহলী এবং স্বাধীন হইয়াও কৃপাসমুদ্রের তরঙ্গপ্রভাবে অত্যন্ত চঞ্চল হন, সুতরাং হে অজিত! হে নাথ! অবশেষে আপনি সেই সুধীগণের নিকট পরাজিত হইয়া তাঁহাদিগের বশীভূত হইয়া থাকেন ॥ ১৪৪ ॥")

শ্রীকৃষ্ণসকাশে শ্রীরাধা-প্রেরিত শুক প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীরাধাকে বলিতেছে (৮ম—১৪৪)—

(গদ্যম্) "উক্তঞ্চ সখায়ং লক্ষ্মীকৃত্য জনান্তিকং সখে কুসুমাসব!
(পদ্যম্) 'ন বনগমনে নাঽপ্যাসঙ্গে বয়স্যগণৈঃ সমং,
ন চ মুরলিকাগানে মোদো ন ধেনুগণাবনে।
ইমমশৃণবং যাবৎকীরোত্তমানন-নিঃসৃতং
কমপি দয়িতালাপং গাঢ়ানুরাগভরালসম্ ॥"

(তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) জনান্তিকে এক সখাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—সখে কুসুমাসব!—

"এই শুকোত্তম-মুখ-নিঃসৃত সুন্দর,
মধুর দয়িতালাপ—অমৃত-নির্ঝর,
গাঢ় অনুরাগভরে অতীব অলস,
যে হ'তে ক'রেছে মোর শ্রবণ পরশ;

সে হ'তে আমোদ নাই বন-যাত্রা রঙ্গে,
বয়স্যগণের সহ কিম্বা ক্রীড়া সঙ্গে,
মুরলিকা-গানে কিম্বা ধেনুর রক্ষণে,
কিছুতেই সুখ নাই জানিও এক্ষণে" ॥)

কবি গোপীগণের পরস্পর বাক্যালাপ বর্ণনাকরিতেছেন—৮ম স্তবক—

"ঈদৃশা পুরুষভূষণেন যা
ভূষয়ন্তি হৃদয়ং ন সুভ্রুবঃ।
ধিক্ তদীয় কুলশীলযৌবনং
ধিক্ তদীয় গুণরূপ-সম্পদঃ ॥ ৯৫ ॥
জীবিতং সখি পণীকৃতং ময়া
কিং গুরোশ্চ সুহৃদশ্চ মে ভয়ম্
লভ্যতে স যদি কস্য বা ভয়ং
লভ্যতে ন যদি কস্য বা ভয়ম ॥ ৯৬ ॥

কিঞ্চ— মাধবো যদি নিহন্তি হন্যতাং
বান্ধবো যদি জহাতি হীয়তাং।
সাধবো যদি হসন্তি হস্যতাং
মাধবঃ স্বয়মুরীকৃতো ময়া ॥৯৭॥

কিঞ্চ— ব্রীড়াং বিলোড়য়তি লুঞ্চতি ধৈর্য্যমার্য্য-
ভীতিং ভিনত্তি পরিলুম্পতি চিত্তবৃত্তিম্।
নাম্নৈব যস্য কলিতং শ্রবণোপকণ্ঠে
দৃষ্টঃ স কিং ন কুরুতাং সখিমদ্বিধানাম্ ॥৯৮॥"

("যে সকল সুলোচনা, এ দুর্লভ পুরুষ-ভূষণ—
হৃদয়ের ভূষারূপে নাহি করে সাদরে গ্রহণ ;

ধিক্ তার কুল-শীল ধিক্ তার নবীন যৌবনে,
ধিক্ তার গুণরূপে, শতধিক্ সম্পদ রতনে ॥৯৫॥
সে মোর হৃদয়নিধি যদি সখি! ক্ষণতরে পাই,
তা'হলে এ বিশ্বমাঝে এ জীবনে কারে লো ডরাই?
না লভিলেও তাঁরে সখি! বিরহ-বিধুরা বঁধুয়ার,
মরণার্থী এ অভাগী বল আর ভয় করে কার ॥৯৬॥

অপর এক সখি বলিতেছেন—

"যদি লো মাধব মোরে ক্ষণতরে করে অঙ্গীকার,
সরবস্ব সঁপে দিই বিকাইয়া চরণে তাঁহার।
তা'তে লো মাধব যদি রোষভরে করেন নিধন,
করুন, সহাস্যমুখে ল'ব বরি' সে সুখ-মরণ!
যদি বা বান্ধবগণ ঘৃণাভরে ত্যজেন আমায়,
ত্যজিলেও তা'তে সখি! কিবা দুঃখ কিবা আসে যায়?
হাসে যদি সাধুজন হেরি মোর এই আচরণ,
হাসুন যথেচ্ছ তাঁরা, হো'ক সব অঙ্গের ভূষণ ॥৯৭॥

অন্য এক সখী বলিতেছেন—

"শুধু নাম-মাত্র যাঁর, পরশিয়া মোর শ্রুতিমূল,
ভাঙ্গিল লাজের বাঁধ ধৈর্য্যহারা করিল আকুল।
টুটিল ধর্ম্মের ভিত্তি না মানিল বাধা বিড়ম্বন,
মুহূর্ত্তে মরমে পশি চিত্ত-বৃত্তি করিল হরণ।
নামপরতাপে শুধু ঘটিল গো এ হেন বিকার,
না জানি কি ঘটে সখি! যদি মিলে দরশন তাঁর ॥৯৮॥"[১]

যদি কবিকর্ণপূর আর কিছু না লিখিয়া কেবল এই কয়টী শ্লোক

১। রাধারমণ যন্ত্র সংস্করণ, দেবকীনন্দন ধর্ম্মপ্রকাশ-কার্য্যালয়—বিক্রেতা।

রচনা করিতেন, তাহা হইলেও মধুর শব্দবিন্যাসের জন্য এবং অতুলনীয় ভগবদ্ভক্তি ও প্রেমের জন্য বৈষ্ণব-জগতে তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিতেন।

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতেছেন (আঃ বৃঃ-৭ম)—

তব গুণসাগরস্য গুণমেকমপীশ্বর কে
গণয়িতুমীশতে হিতকৃতে হ্যবতীর্ণবতঃ।
অপি ধরণীরজাংস্যপি চ ভানি তুষারকণা
অপি গণনীয়তাং দধতি কস্য চ কালবশাৎ॥ ১৫১

তব তদনুগ্রহগ্রহিলতাধ্বনি দত্তদৃশো
নিজ-নিয়তিক্রমোপগত-দুঃখসুখোপভুজঃ।
বচনবপুর্মনোভিরনুসন্দধতশ্চ ভবৎ-
পদকমলং ভবন্তি তব ধামনি দায়ভৃতঃ॥ ১৫২

অতিরসবর্ষিণীং তব পদাম্বুজভক্তিবিধা-
মহহবিহায় যঃ প্রযততে হ্যববোধকৃতে।
স ন লভতে শ্রমাদপরমণ্বপি হন্ত ফলং
তুষবুষঘাততো নহি কদাপি ফলোপগমঃ॥ ১৪৭

বিজহতি যে প্রয়াসমববোধবিধৌ সুধিয়ো
দধতি তবাঙ্ঘ্রিপঙ্করুহভাবমতীব দৃঢ়ং।
অপি কুতুকী স্ববানপি কৃপাব্ধিতরঙ্গচল-
দৃগঞ্জিত তৈর্জিতো ভবসি নাথ তদীয়বশঃ॥ ১৪৮

ধূলি-রাশি, তারা-রাজি, তুষারের কণা,
কালবশে হ'তে পারে তাহারো গণনা ;
বিশ্বহিত জন্য প্রভো ! অবতীর্ণ তুমি,
তব গুণ পরিমাণ কি করিব আমি ?
গুণের সাগর তুমি সুধী-জ্ঞানাতীত,
একটী গুণেরো তথ্য নহি আমি জ্ঞাত। ১৫১

তব অনুগ্রহে রাখে সনির্ব্বন্ধ-দৃষ্টি,
সুখ-দুঃখভোগে যা'র নাহিক বিরক্তি,
কায়মনোবাক্যে ভজে তব পাদপদ্ম,
সেই জন যায় প্রভো ! আপনার সদ্ম। ১৫২

আনন্দ-বর্ষিণী তব পদাম্বুজে ভক্তি,
ইহা ত্যজি জ্ঞান-চর্চ্চা-প্রতি করে মতি,
শ্রম-ব্যতিরিক্ত হায় ! নাহি লাভ তার,
যথা তুষাঘাত হ'তে ধান্য-বহিষ্কার। ১৪৭

কষ্টসাধ্য জ্ঞানমার্গ ত্যজি সুধীগণ,
তব পাদপদ্মে রতি করিয়া অর্পণ,
যদিও কুতুকী তুমি অজিত, স্বাধীন,
দয়ার সাগর হও ভক্তের অধীন। ১৪৮। সঃ

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা শ্রীকৃষ্ণকে উপেক্ষাকরিলেন—(আঃ বৃঃ চঃ—

'স'-চিহ্নিত অনুবাদ গ্রন্থকার-কৃত।

১৩শ-১২৮), কিন্তু তাঁহাদিগের পত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণকে সর্মাধিক শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিয়াছিলেন—

"ধীগ্‌দীক্ষাং ধীগ্‌-উদারতাং, ধিগধিকাং বিদ্যাং, ধিগাত্মজ্ঞতাং।
ধিক্‌শীলং চ, ধিগ্‌-অধ্বরাদিরচনাং, ধিক্‌পৌরুষং, ধিগ্‌-ধিয়ম্‌॥
ধিগ্‌-ধ্যানাসনধারণাদিকং, অহো ধিঙ্‌মন্ত্রতংজ্ঞতাং।
শ্রীকৃষ্ণপ্রণয়েন হীনমনসাং ধিগ্‌জন্ম, ধিগ্‌জীবিতম্‌" ॥

ধিক্‌ তার দীক্ষা, দান, বিদ্যা আর জ্ঞান।
ধিক্‌ যজ্ঞ, শীল, বীর্য্য, বুদ্ধি-অভিমান ॥
ধিক্‌ মন্ত্রজ্ঞতা, ধ্যান, ধারণা, আসন।
ধিক্‌ জন্ম, প্রাণ, যার কৃষ্ণে নাহি মন ॥—সঃ

গোবর্দ্ধন-গিরি-ধারণপূর্ব্বক ব্রজবাসীদিগকে আধিদৈবিক বিপদ হইতে রক্ষা করিলে তাঁহারা বলিতেছেন—

"জয় জয় কৃষ্ণ প্রণয়-সতৃষ্ণ, দ্বিষতি মহোষ্ণ[১], প্রধনিষু ধৃষ্ণগ্‌[২]
জয় জয় ধীর ব্রজবরবীর, প্রকটাভীর-শ্যামশরীর[৩] ॥"

(আঃ বৃঃ চঃ—১৫শ-২২৫)

ত্রিলোকশোকভঞ্জনং স্বভক্তচিত্তরঞ্জনং
ভবপ্রবাহখণ্ডনং[৪] শিখণ্ডখণ্ডমণ্ডনং[৫]।

১। শত্রুদিগের প্রতি অতিশয় ক্রোধান্বিত।

২। প্রধনিষু (যোদ্ধৃবর্গের মধ্যে) ধৃষ্ণক্‌ (হে সাহসী)।

৩। আভীর (গোপ)-কুলে যিনি শ্যামশরীর প্রকট (ব্যক্ত) করিয়াছেন।

৪। যিনি সংসারের প্রবাহ (ক্রমিক চলন) অর্থাৎ সংসারে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন নিবারিত করেন।

৫। যাঁহার ময়ূরপুচ্ছ আভরণ।

স্ফুরৎকলিন্দনন্দিনীতটান্তকান্তকাননে
তমস্তমালগঞ্জনং[৬] ভজামহেমহন্মহঃ[৭] ॥

(আঃ বৃঃ চঃ—১৫শ-২৩৩)

শ্রীকৃষ্ণ রাসক্রীড়া করিতে করিতে গোপীগণের নিকট হইতে সহসা অন্তর্হিত হইলে তাঁহারা এই প্রকারে তাঁহাদিগের হৃদয়ের বেদনা জ্ঞাপনকরিয়াছিলেন—(আঃ বৃঃ—১৯শ স্তবক)—

অথ কোমলমঞ্জুলস্বরং যদরোদীদবলাগণস্তদা ।
তদভূন্মৃগপক্ষিসংসদাং শ্রুতিরম্যং হৃদয়স্য দাহকম্ ॥১
সুদৃশাং প্রীয়কীর্ত্তিকীর্ত্তনৈঃ করুণক্রন্দনকণ্ঠনিস্বনঃ ।
স্থিরজঙ্গমচিত্তকর্ষণে ললিতং গানমিব ব্যরাজত ॥২
বিরহোরস এব মূর্ত্তিমান্ যদভূৎ কোমলরোদনস্বনঃ ।
তমথ স্বরতালমূর্চ্ছনা শ্রুতয়স্তুল্যশুচোঽনুভেজিরে ॥৩
জয়তি প্রিয়তে বতারতো ব্রজএব শ্রয়তে যমিন্দিরা[৮] ।
বত তত্র বসন্নয়ং জনঃ কথমেবং লভতে পরাভবম্ ॥৪
অনুরাগিণমঙ্গনাগণং বনভূমাবপহায় তাবকম্[৯] ।
কথমন্তরধাঃ[১০] কৃপানিধে প্রিয় দৃশ্যো ভব তস্য চক্ষুষাম্ ॥৫

৬। যিনি উজ্জ্বল-যমুনাতীরস্থ রমণীয় কাননের কৃষ্ণবর্ণতমালতরুকে তিরস্কারকরেন অর্থাৎ শোভায় পরাজিত করেন।

৭। মহন্মহঃ (শ্রেষ্ঠতেজঃ) ভজামহে (আমরা ভজনা করি)।

৮। বত (খেদে, বিস্ময়ে বা) হে প্রিয় যঃ তে ব্রজঃ অরতঃ ব্রজঃ—বৈরাগ্য-মার্গঃ—এব জয়তি, যম্ (ব্রজম্) ইন্দিরা (লক্ষ্মীঃ) শ্রয়তে &c.। অথবা—হে প্রিয় তেঽবতারতঃ (তোমার অবতার হইতে) (যঃ) ব্রজএব—যে ব্রজই—জয়তি &c. এবং যাহাকে আপনার অবতারের জন্য।

৯। তব ইদং = তাবকং।

১০। অন্তর + অধাঃ।

অনুকাননকুঞ্জমন্দিরং প্রতিবর্ত্ম প্রতিবৃক্ষবীরুধম্।
তব মার্গণখিন্নচেতসঃ স্বজনান্ নন্দয় দৃশ্যতাং গতঃ ॥৬
নিশিতেন দৃগঞ্চলেন[১১] হে সবিষেণেব শরেণ নো মনঃ।
বিনিকৃন্তসি হন্ত যোষিতাং তদয়ং কিং বত নৈব নো বধঃ ॥৭
অথ নো বধ এব তে মতো যদি হা হন্ত বৃথা স্ম রক্ষিতাঃ।
বিষবারিদবানলাদিতো ঘনবর্ষাকরকাদিপাততঃ ॥৮
অথ বা সকলাবনেঽবিতা[১২] বত যূয়ং চ তথেতি ভাষসে।
পরুষৈরুদিতৈর্বিনাশ্য[১৩] কিং পুনরস্মাকমসূনপালয়ঃ[১৪] ॥৯
ন তবেহিতহেতুরক্ষ্যতে[১৫] পরমস্বেচ্ছ কুতূহলাৎপরঃ।
ন বত ব্যতিরিক্তমিষ্যতে[১৬] ঽমৃতসঞ্জীবনতঃ কুতূহলম্ ॥১০
ন হি জীবয়িতুং পরিশ্রমস্তব দূরস্থিতজীবিতা হি নঃ।
তব দর্শনএব তদ্ভবেৎ, ত্বদৃতে নো ন হি জীবিতং পরম্ ॥১১
ন হি বল্লববংশজো ভবান্ গতভীর্বল্লবযোষিতাং বধে[১৭]।
সহবাস-সগোত্র সম্পদে বত যঃ কোপি ভবেদনুগ্রহী ॥ ১২
দ্রুহিণেন ন বিশ্বগুপ্তয়ে ত্বমভিষ্টুত্য ভুবি প্রকাশিতঃ।
অথ বিশ্বগতা হি মাদৃশীর্বত গোপায়সি কিং ন মুহ্যতি[১৮] ॥১৩

১১। দৃগঞ্চলেন = দৃক্ — অঞ্চলেন = দৃষ্টি-নিক্ষেপেন, অঞ্চ্ (গমনার্থে)।

১২। সকলানাং অবনে (রক্ষণে) অবিতা (রক্ষিতা)।

১৩। উদিতৈঃ—বাক্যৈঃ। ১৪। অপালয়ঃ—রক্ষিতবানসি।

১৫। ঈহিতস্য (তাদৃশচেষ্টিতস্য) হেতুঃ অক্ষ্যতে (লক্ষ্যতে)

১৬। ব্যতিরিক্তিং অন্যৎ কুতূহলম্।

১৭। (বল্লব-গোপ-যোষিতাং) বধে গতভীঃ (নির্ভীকঃ) ভবান্ বল্লববংশ ন হি। যঃ কোপি—সর্ব্বোপি।

১৮। বিশ্বগতা মাদৃশীঃ মুহ্যতি, কিং ন গোপায়সি, (রক্ষসি)? 'মাদৃশী' লক্ষ্মী শব্দের ন্যায় রূপ হইয়াছে, অর্থাৎ প্রথমার একবচনে 'মাদৃশীঃ' হইয়াছে।

ভবভীতিজুষাং কৃতাভয়ং রতিভাজামভিলাষবর্ষকম্।
কমলাকরলালিতং প্রভো কুরু[19] নঃ শীর্ষণি[20] পাণিপল্লবম্ ॥১৪
স্বজনস্ময়খণ্ডন প্রিয়ব্রজদুঃখক্ষয়বীর ধীর নঃ।
ভজ নির্গতশঙ্ক কিঙ্করীর্মুখচন্দ্রং দ্রুতমেব দর্শয় ॥ ১৫

*　　　*　　　*

বচসা মধুনোপি মঞ্জুনা মধুরার্থেন সুকোমলেন নঃ।
চিরকালমুপোষিতে ইব শ্রবণে জীবিতনাথ তর্পয় ॥ ১৭

*　　　*　　　*

অঘহন্তৃ-স্তুতং[21] কবীশ্বরৈঃ শ্রুতিকান্তং বত তপ্তজীবনম্।
কথয়ন্তি ভবৎকথামৃতং মৃতসঞ্জীবনমন্বহং বুধাঃ ॥ ১৯
অনুরাগবতাং তু চেতসামমৃতং বা কিমু বা হলাহলঃ।
সুখদং চ সুদুঃখদং চ তন্নহি বিদ্মস্তব কীদৃশং বচঃ ॥ ২০

১৯। স্থাপয়।

২০। 'শীর্ষন্' কখন কখন 'শিরস্' স্থানে ব্যবহৃত হয়।

২১। অঘ-হন্তা বলিয়া স্তুত অথবা পূজিত। অঘ—(১) দুঃখ, পাপ; (২) অঘাসুর—পূতনা ও বকের ভ্রাতা সর্পাকৃতি অসুর; ইহার বধ আনন্দ বৃন্দাবনচম্পূর সপ্তম স্তবকে বর্ণিত হইয়াছে। তাৎপর্য্য—শ্রেষ্ঠ কবিগণ আপনাকে পাপ এবং দুঃখদূরকারী বলিয়া স্তুতি করেন; এ স্তব কর্ণকে সন্তুষ্ট করে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনি আমাদিগের দুঃখ নাশ না করিয়া আপনার অদর্শন দ্বারা আমাদিগের জীবনকে উত্তপ্ত অর্থাৎ পীড়িত করিতেছেন। এইরূপ জ্ঞানিগণ আপনার কথাকে অমৃত এবং মৃত-সঞ্জীবন বলিয়া বর্ণনা করেন, কিন্তু আমাদিগের পক্ষে উহা বিপরীতভাবে কার্য্য করিতেছে। যদিও এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের কথা গোপীগণ শুনিতে পাইতেছেন না, তত্রাচ শ্রীকৃষ্ণ যে সকল বাক্য পূর্ব্বে বলিয়াছেন, সেই সকল কথা স্মরণকরিয়া গোপীগণ এরূপ বলিতেছেন।

অমৃতেন নিষেবিতং বহিঃ খুরসারোহৃতধারমন্তরে[২২]।
চরিতং চ বচশ্চ তে সমং রতিমন্তো হি বিদন্তি তত্ত্বতঃ[২৩] ॥ ২১

*　　　　*　　　　*

অণুমাত্রমপীহ[২৪] বর্ত্ততে ন তরাং[২৫] প্রেম হি মাদৃশীষু বঃ।
তিলমাত্রমপীহ তে ক্লমং ন সমর্থা বয়মীক্ষিতুং তব ॥২৩
ব্রজতি ব্রজতো গবাং ব্রজং[২৬] বিপিনে চারয়িতুং যদা ভবান্।
চরণৌ তব খিন্নতত্তৃণৈরিতি নঃ খিদ্যতি মানসং তদা ॥২৪
নবপদ্মপলাশকোমলং ক্ক তব শ্রীময়মঙ্ঘ্রি-যুগ্মকম্।
ক্ক স তীক্ষ্ণতরস্তৃণাঙ্কুরঃ স্মরণং তন্মরণায় নো ভবেৎ ॥ ২৫

*　　　　*　　　　*

পতিপুত্র-সুহৃৎ-সহোদরান্ তৃণকল্পানতিমুচ্য তেন্তিকম্[২৭]।
কিতবোপগতাঃ পুনঃ কথং বিপিনে নো নিশিকষ্টমত্যজঃ ॥৩৮

শ্রীকৃষ্ণ বিরহ-ক্লিষ্ট ব্রজগোপীগণ।
কোমল মধুর স্বরে করয়ে ক্রন্দন ॥
মুগ্ধ হয় মৃগ পক্ষী করিয়া শ্রবণ।
চিত্তে পশি করে স্বর হৃদয়-দহন ॥১

২২। অহৃতধারঃ—যাহার ধার হৃত অর্থাৎ নষ্ট হয় নাই; খুরসারঃ—ক্ষুরশ্রেষ্ঠঃ; অর্থাৎ সুতীক্ষ্ণ ক্ষুর।

২৩। তত্ত্বতঃ—স্বরূপতঃ; যাথার্থ্যতঃ।

২৪—ইহ—(ক) এ সংসারে, (খ) এ সময়ে।

২৫। তরাং—অতিতরাং (অব্যয়), অণুমাত্রমপি অতিতরাং ন—অণুমাত্ররূপে অধিক নয়, একেবারেই অধিক নয়।

২৬। সমূহং।

২৭। তে—অন্তিকম্।

সুন্দরী-করুণ-কণ্ঠে কৃষ্ণ-গুণ-গান।
স্থাবর জঙ্গম মোহে সুমধুর তান ॥২
শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-রস হয়ে মূর্ত্তিমান্।
মধুর ক্রন্দনরূপে হয় দৃশ্যমান্ ॥
স্বর, তাল, মূর্চ্ছনা হইয়া শোকাকার।
কোমল রোদন-স্বন করে অনুকার ॥৩
বৈরাগ্য-পথের ন্যায় যাহা জয়যুক্ত।
ওহে প্রিয়! হয় যাহা ইন্দিরা-সেবিত ॥
সে ব্রজে করিয়া বাস, জানি না কারণ।
কেন পরাভব লভে অধিবাসিগণ? ৪

অথবা

তব অবতারহেতু ব্রজ জয়-যুক্ত,
তন্নিমিত্ত হ'ল ইহা ইন্দিরা-আশ্রিত।
তথায় করিয়ে বাস, বড়ই বিস্ময়,
কি জন্য মোদের প্রিয়! অমঙ্গল হয়? ৪
বন-ভূমে ত্যজি তব অনুরাগিগণ।
কি কারণে হল, প্রিয়! তব অদর্শন?
কোথা প্রিয়তম তুমি দয়ার সাগর।
কেন নাহি হও তুমি চক্ষুর গোচর? ৫
প্রত্যেক কানন, কুঞ্জ, পথ, বৃক্ষ, লতা।
প্রত্যেক মন্দির ভ্রমে লইতে বারতা ॥
তব অন্বেষণে খিন্ন তোমার স্বজন।
আনন্দিত কর সবে দিয়া দরশন ॥ ৬
নিশিত বিষাক্ত তব কটাক্ষ-ক্ষেপণ।

বিঁধিয়াছে ওহে প্রিয়! আমাদের মন ॥
এরূপে করেছ হায়! হৃদয়-ছেদন,
ইহা কি না হয় তব স্ত্রীজন-হনন? ৭
যদি আমাদের বধ তব অভিপ্রায়।
তবে কেন মো'সবারে বৃথা তুমি হায়!
বিষ-বারি, দাবানল, ঘন-বরিষণ,
করকা-পতন হ'তে করিলে রক্ষণ? ৮
সকলের রক্ষা হেতু মোদের রক্ষণ,
হয় যদি ইহা তব নির্দ্দয় বচন—
এ পরুষ বাক্যে হবে মোদের মরণ,
কেন তবে মো সবারে করিলে পালন।৯

(পালন=রক্ষণ)।

জীবিত-মারণ কিম্বা মৃত-সঞ্জীবন,
কুতূহল বিনা তব কি আছে কারণ?
মোদের নাহিক অন্য কিছু অনুমান,
স্বেচ্ছাময় তুমি সর্ব্ব কর্ম্মের নিদান। ১০
দূরেতে মোদের এবে হয় অবস্থান।
শ্রম কিছু নাহি তব দিতে প্রাণ-দান ॥
তব দরশন-মাত্র পাইব জীবন।
তোমা ছাড়া আর কিছু নাহি প্রাণ-ধন ॥ ১১
গোপীগণ-বধে তব কিছু নাহি ভয়,
গোপবংশে জন্ম তব মনে নাহি লয়।
সগোত্র, ঐশ্বর্য্যযুক্ত, বাস এক স্থানে,
অনুগ্রাহী হয় ইহা সর্ব্বলোক জানে। ১২

বিশ্বরক্ষা-হেতু ব্রহ্মা তোমা স্তুতি করে,
প্রকাশিল তোমা সবে কহে এ সংসারে।
কেমনে বিশ্বাস ইহা সত্য বলি করি?
রক্ষা নাহি কর, বিশ্ববাসী মোরা মরি। ১৩

(তোমা স্তুতি করে=তোমার নিকটে গিয়া তোমাকে স্তব করিয়া)।

ভব-ভয়ে ভীত যারা, ভয় কর দূর।
প্রীতি-ভাজনের কর অভিলাষ পূর॥
স্থাপিয়ে মস্তকে হস্ত কমলা-সেবিত।
কর প্রভো! আমাদের ব্যথা দূরীভূত॥ ১৪
স্বজনের গর্ব্ব ধীর! করিলে খণ্ডন;
সমর্থ ব্রজের দুঃখ করিতে মোচন॥
মোসবার গর্ব্ব খর্ব্ব; ভয় নাহি কর,
দেখাইয়া চন্দ্রমুখ দাসী-দুঃখ হর॥ ১৫

*　　*　　*　　*

মধু হ'তে মিষ্টতর কোমল বচন,
অর্থ তার কমনীয় শ্রুতিবিমোহন,
শুনাইয়া কর নাথ! তৃষ্ণা নিবারণ,
বহুদিন উপবাসী মোদের শ্রবণ। ১৭

*　　*　　*　　*

দুঃখহন্তা বলি স্তুতি করে কবিগণ,
মৃতকে জীবয় তব অমৃতভাষণ,
প্রতিদিন এই কথা বলে জ্ঞানিগণ,
শ্রুতি-কমনীয় কিন্তু জীবন-তাপন। ১৯
অমৃত ও বিষ তা'রা করে তুল্য জ্ঞান,

তোমাতে যা'দের চিত্ত হয় রতিমান্,
নাহি জানি মোরা তব অনুরাগিজন,
সুখদ দুঃখদ কিম্বা তোমার বচন ॥ ২০
অমৃত-নিষিক্ত বাক্য তোমার বাহিরে,
তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার-সম বিন্ধয়ে অন্তরে।
তোমা-প্রতি অনুরক্ত হয় যেই জন,
জানয়ে সমান তব চরিত, বচন ॥ ২১

* * *

মোসবার প্রতি তব নাহি কিছু প্রীতি।
মোদের অসহ্য তব তিল-মাত্র ক্লান্তি ॥ ২৩
ব্রজ ছাড়ি যবে তুমি করেছ গমন।
কাননে গো-ব্রজ [১] লয়ে করিতে চারণ ॥
তৃণ-গণ পীড়া দেয় চরণ-যুগলে।
ব্যথা মোরা অনুভবি চিত্ত-অন্তঃস্থলে ॥ ২৪
নব-পদ্মপলাশ-সন্নিভ সুকোমল,
কি শোভা প্রকাশে তব চরণযুগল ॥
গোচারণ-জন্য তুমি বনে যবে যাও।
তীক্ষ্ণতর তৃণাঙ্কুর হতে ব্যথা পাও।
যখন বেদনা তব করি হে স্মরণ,
তখনি হয় না কেন মোদের মরণ ?—২৫

* *

পুত্র, মিত্র, পতি, ভ্রাতা তৃণবৎ ত্যজি।
তোমার অন্তিকে আসি মোরা তোমা ভজি

১। গো-সমূহ।

গভীর নিশীথে শঠ! কেন দিয়া পীড়া।
পরিত্যাগ-করি গেলা নাহি হল ব্রীড়া? ৩৮—সঃ।

(আঃ বৃঃ চঃ—১৯শ-৯৯-১০০)—

কৃষ্ণস্য প্রশ্নঃ; উত্তরং তাসাং (গোপীনাং) যথা—

ক উপাস্যো যো রসবান্, কঃ সরসো যঃ পদং প্রেম্নঃ,
কিং প্রেম যদবিয়োগং, কঃ স বিয়োগো ন যেন জীবস্তি॥
কিং দুঃখং প্রিয়-বিরহঃ, কিং প্রিয়মতি দুর্লভং যদিহ।
কিং দুর্লভং প্রকারৈরখিলৈরপি লভ্যতে ন হি যৎ॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রশ্ন করিতেছেন; গোপীগণ তাহার উত্তর দিতেছেন—

উপাস্য কাহাকে কয়? রসের যিনি আশ্রয়।
সরস কাহাকে বলে? প্রেমের আকর হ'লে।
প্রেমন্ কাহাকে বলে? বিয়োগবিহীন হলে।
বিয়োগ কাহাকে কয়? যাহাতে জীবন যায়।
মহদ্দুঃখ কারে বলে? প্রিয়ের বিচ্ছেদ হলে।
প্রিয়তম কারে জানি? জগতে দুর্লভ যিনি।
দুর্লভ কাহাকে কয়? কিছুতেই লভ্য নয়। —সঃ।

(ইহাকে প্রশ্নোত্তর অথবা উত্তর অলঙ্কার বলে।)

(আঃ বৃঃ চঃ-২২শ-৩৬)—

"নীরাজিতো মধুরমঙ্গলগানপূর্ব্বং দীপৈর্ম্মহামণিময়ৈর্বনদেবতাভিঃ।
ব্যাপারয়ন্নয়নমদ্ভুতদোলশিল্পে শ্রীরাধয়া সহ বভৌ কুতুকী মুকুন্দঃ॥"

মঙ্গল-সঙ্গীত গায় বনদেবীগণ।
মণিময় দীপ দিয়া করে নিরাজন॥
শোভে কৃষ্ণ রাধা সহ হর্ষেতে মগন।
নিবিষ্ট করিয়া দোলশিল্পেতে নয়ন॥ —সঃ।

কবিকর্ণপূরের (পরমানন্দ দাসের) একটী পদ আমরা শ্রীরাধানাথ কাবাসী সম্পাদিত পদকল্পতরু হইতে সংগৃহীত করিতে সক্ষম হইয়াছি—

দুহুঁ [১] অতি কাতর কুঞ্জ সঞে [২] নিকসল [৩]
সব সহচরীগণ মেলি।
দুঁহুজন-নয়নে প্রেমজল ঝর ঝর
ঐছনে [৪] গৃহে চলি গেলি॥
কীয়ে [৫] রাধা মাধব লীলা।
সোঙরিতে [৬] খেদ [৭] ভেদ করু অন্তর
গলি গলি যাও ত শিলা॥
বিমনহিঁ [৮] নিজ নিজ মন্দিরে দুঁহু জন
শুতল পালঙ্ক-শয়ানে।
সখীগণ নিজ নিজ মন্দিরে ঘুমল
ঐছন [৯] ভেল [১০] বিহানে [১১]॥
গুরুজন জাগল সূরয উদয় হৈল
সবহুঁ [১২] ভেল পরকাশ।
শ্রীরূপমঞ্জরী চরণ হৃদয়ে ধরি
কহে পরমানন্দ দাস॥ ২৯০৭॥

তৃতীয়তঃ (পৃঃ ১৩৪ দেখুন)—কাঁচরাপাড়ায় চৈতন্যদেবের পদার্পণের এবং তাঁহার (কাঁচরাপাড়া-অধিবাসী) ভক্তমণ্ডলীর স্মৃতিবার্ষিকী।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে শিবানন্দ সেন, তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কবিকর্ণপূর, বাসুদেব দত্ত এবং সম্ভবতঃ পণ্ডিত জগদানন্দ কাঁচরাপাড়ার

১। দুই জনই (শ্রীকৃষ্ণ ও রাধা)। ২। হইতে। ৩। বহির্গত হইল। ৪। ঐরূপে। ৫। কেমন। ৬। স্মরণ করিতে। ৭। সামান্য। ৮। নিশ্চিত ব্যাকুল হইয়া। ৯। ঐরূপে। ১০। হইল। ১১। প্রভাত। ১২। সর্ব্ব ; সকল।

অধিবাসী ছিলেন। শ্রীনাথ পণ্ডিত কাঁচরাপাড়ার অধিবাসী হউন্ আর না হউন্, কৃষ্ণদেব-বিগ্রহের পূজার জন্য তাঁহাকে কাঁচরাপাড়ায় বাস করিতে হইত। শ্রীনাথ-সম্বন্ধে কবিকর্ণপূর তাঁহার চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে (১০ম অঙ্কে) যাহা লিখিয়াছেন তাহার রামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃত বঙ্গানুবাদ এই—"তাঁহাদিগের মধ্যে তরুণবয়স্ক মধুর-মূর্ত্তি, পরমসুন্দর ও স্বতঃসিদ্ধ প্রেমে যাঁহার অন্তর ও বাহির অতীব সরস এবং যাঁহার দর্শন-মাত্রে নয়ন অপূর্ব্ব আনন্দরসে পূর্ণ হয়, সেই শ্রীনাথ নামক ব্রাহ্মণকে" অদ্বৈতাচার্য্য বলিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহাকে নীলাচলের নিভৃত স্থানে লইয়া গিয়া গৌরাঙ্গদেবের অনুগ্রহভাজন করিয়া দিবেন। সেইজন্য তিনি একবার শিবানন্দের সঙ্গে না যাইয়া অদ্বৈতাচার্য্যের সহিত নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন। কবিকর্ণপূর তাঁহার গুরুদেব শ্রীনাথকে বন্দনাকরিয়া তাঁহার আনন্দবৃন্দাবনচম্পূর মঙ্গলাচরণ-অধ্যায়ে (প্রথম স্তবক—৫ম শ্লোকের রামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃত বঙ্গানুবাদ) লিখিয়াছেন —"যিনি (শ্রীনাথনামা কৃষ্ণদেব-বিগ্রহের [১] পূজক ব্রাহ্মণ) ব্রাহ্মণবংশ-রূপ সমুদ্রে চন্দ্রস্বরূপ (অর্থাৎ জলনিধি হইতে যেমন চন্দ্রের উৎপত্তি, সেইরূপ যিনি পবিত্র ভূদেববংশ-সম্ভূত) এবং চন্দ্র যেমন শিবমূর্ত্তির ভূষণ সেইরূপ যিনি এই পৃথিবীর ভূষণমণি-বিশেষ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রিয়-পাত্র সেই শ্রীনাথপণ্ডিতনামা আমাদের গুরুদেবকে আমি প্রণাম করি। তাঁহার শ্রীমুখনির্গলিত বৃন্দাবনের নির্দ্দোষ নিভৃত লীলা-কথামৃতের (শ্রীমদ্ভাগবতের) আস্বাদ গ্রহণকরিয়া জগতে কোন্ ব্যক্তি না সেই অমৃত-ভোগ্য স্থলের অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনধামের প্রতি আসক্ত হয় ?"

১। কৃষ্ণদেবের বর্ত্তমান সেবায়েত-মহাশয়েরা এই বিগ্রহের 'কৃষ্ণ-রাই' নাম দিয়াছেন। বাগেরখাল হইতে কৃষ্ণদেবের মন্দিরের উত্তর প্রাচীর পর্য্যন্ত কাঁচরাপাড়া গ্রামের নাম কৃষ্ণবাটী হইয়াছে।

শ্রীনাথপণ্ডিত যে গৌরাঙ্গদেবের অনুগ্রহ-ভাজন ছিলেন, তাহা আমরা চৈতন্যচরিতামৃত (আদি-১০ম-৮৮) হইতে দেখাইয়াছি—(পৃঃ ৩০ দেখুন)—

শ্রীনাথপণ্ডিত প্রভুর কৃপার ভাজন।
যাঁর কৃষ্ণসেবা [১] দেখি বশ ত্রিভুবন ॥

শিবানন্দ সেনের ভাগিনেয় শ্রীকান্ত সেন অন্ততঃ নীলাচলে গমনের সময় যে তাঁহার কাঁচরাপাড়াস্থিত মাতুলালয়ে আসিতেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। একবার নীলাচল হইতে শ্রীকান্ত সেন চৈতন্য-দেবের আদেশ লইয়া শিবানন্দ সেনের নিকট আসিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শ্রীকান্ত একজন সরল স্বাধীনচেতা গৌরাঙ্গভক্ত যুবক ছিলেন। নীলাচল যাইবার পথে পারঘাটে শিবানন্দ প্রতি নিত্যানন্দের ব্যবহার (লাথিমারা) আমরা কিছুতেই অনুমোদন করিতে পারি না। তাঁহার বাসস্থান পাইতে সামান্য বিলম্ব হওয়াতে শিবানন্দের প্রতি তিনি অতিশয় কটুবাক্যও প্রয়োগ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহাতে শিবানন্দের কোন দোষ ছিল না। শিবানন্দ ধৈর্য্য-সহকারে প্রকৃত বৈষ্ণবের ন্যায় এ সমস্ত অপমান সহ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতুলের প্রতি নিত্যা-নন্দের এইরূপ অন্যায় আচরণ দেখিয়া শ্রীকান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া ভক্তমণ্ডলী পরিত্যাগকরিয়া একলা নীলাচলে গৌরাঙ্গদেব-সকাশে উপনীত হইয়া-ছিলেন। নিত্যানন্দের লাথিমারা-ব্যাধির আর একটী দৃষ্টান্ত বৃন্দাবন দাস দিয়াছেন (চৈঃ ভাঃ—আদি ৮ম)। নন্দীগ্রাম হইতে নিত্যানন্দ বৌদ্ধের ভবনে যাইলেন—

তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন।
দেখিলেন প্রভু বসি আছে বৌদ্ধগণ ॥

১। কাঁচরাপাড়ার কৃষ্ণদেব বিগ্রহ পূজা।

জিজ্ঞাসেন প্রভু কেহো উত্তর না করে।
ক্রুদ্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে॥
পলাইল বৌদ্ধগণ হাসিয়া হাসিয়া।
বনে ভ্রমে নিত্যানন্দ নির্ভয় হইয়া॥

এই লাথিমারার বৈশিষ্ট্য এই যে যিনি লাথি খাইতেন, তিনি আনন্দিত হইতেন। বৃন্দাবনদাসও লাথির ভক্ত ছিলেন মনে হয়; কারণ তিনি বলিতেছেন (ঐ)—

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥
কোন চৈতন্যের লোক নিত্যানন্দ প্রতি।
মন্দ বলে হেন দেখ সে কেবল স্তুতি॥

কিন্তু নিত্যানন্দের মত দয়ার্দ্র আদর্শ বৈষ্ণব, যিনি দুষ্ট মাধাই-কর্তৃক কলসীখণ্ড দ্বারা মস্তকে গুরুতররূপে আহত হইয়া তাহার প্রতি অমানুষিক ক্ষমাপ্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং প্রতিশোধোদ্যত সঙ্গিগণকে শান্ত করিয়াছিলেন এবং পরে চৈতন্যদেবের অনুরোধে উচ্চ-জাত্যভিমানী হিন্দু-নিপীড়িত অবনত-শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের মনে হরিভক্তি ও প্রেম সঞ্চারিত করিয়া তাহাদিগকে উচ্চশ্রেণীর সমকক্ষ করিয়াছিলেন, সেই নিত্যানন্দ কথায় কথায় লাথি ব্যবহারকরিবেন ইহা সহজে বিশ্বাস করিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। বৈষ্ণব-গ্রন্থকারগণ বোধহয় মনে করিয়াছিলেন যে বৌদ্ধদিগকে নিত্যানন্দদ্বারা পদাহত করিলেই পৃথিবী হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম অপসারিত হইবে। বৃন্দাবনদাস হইতে অমিয়নিমাই-চরিত প্রণেতা এইরূপ কল্পনার আশ্রয় গ্রহণকরিয়াছেন (১ম খণ্ড-পৃঃ ২৬০-৬১)—মাধাই কলসীর কাণাদ্বারা নিত্যানন্দের মস্তক রক্তাক্ত

করিয়াছেন। চৈতন্যদেব ক্রুদ্ধ হইয়া 'উচ্চৈস্বরে 'চক্র চক্র' বলিয়া ডাকিলেন'। যখন নিমাই উচ্চৈস্বরে 'চক্র, চক্র' বলিয়া আহ্বান করিলেন, তখন সকলেই স্তম্ভিত হইলেন। মুরারিগুপ্তের শরীরে শ্রীহনূমান প্রকাশ হইতেন। হনূমান তখন মুরারির দেহে প্রকাশ করিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে বলিতেছেন, "প্রভু! সুদর্শনকে কেন স্মরণ করিতেছেন? আমাকে অনুমতি দিন, আমি এখনই ও দুবেটাকে যমঘর পাঠাইয়া দিই।"

নিতাই পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া দেখেন, যে সুদর্শন চক্র অগ্নির আকার ধারণ করিয়া জগাই মাধাইয়ের দিকে আসিতেছে। তখন নিতাই ব্যস্ত হইয়া সুদর্শন-চক্রকে করযোড়ে সম্বোধনকরিয়া বলিতেছেন, 'সুদর্শন! ক্ষমা দাও! তুমি এই দুই ভাইকে মারিও না। আমি প্রভুর চরণ ধরিয়া, এই দুই ভায়ের প্রাণ ভিক্ষা লইতেছি।' ইত্যাদি। ইঁহারা নিত্যানন্দকে সহগুণ ও দয়ার অবতার করিতে গিয়া চৈতন্যদেবকে কি করিয়াছেন? ইহার সহিত গোবিন্দদাসের করচায় (পৃঃ-৮২) লিখিত চৈতন্যদেবের মাড়ুয়া ব্রাহ্মণের প্রতি আচরণ তুলনা করিয়া দেখুন।

শিবানন্দ সেন কতগুলি 'পদ' রচনা করিয়াছিলেন। আমরা নিম্নলিখিত 'পদ' দুইটী ৺সতীশচন্দ্র রায় সংগৃহীত পদকল্পতরুর চতুর্থভাগ হইতে এস্থানে উদ্ধৃত করিলাম—

(গৌরী)

"সোণার বরণ গোরা প্রেম বিনোদিয়া।
প্রেম-জলে ভাসাইল নগর নদীয়া॥
পরিসর বুক বাহি পড়ে প্রেমধারা।
নাহি জানে দিবানিশি প্রেমে মাতোয়ারা॥

গোবিন্দের [১] অঙ্গে পহু [২] অঙ্গ হেলাইয়া।
বৃন্দাবন-গুণ শুনে মগন হইয়া॥
রাধা রাধা বলি পহু পড়ে মূরছিয়া।
শিবানন্দ কান্দে পহুর ভাব না বুঝিয়া॥১৯।২০৬৫॥"

(পঠমঞ্জরী)

"জয় জয় পণ্ডিত গোসাঞি [১]।
যার কৃপা-বলে সে চৈতন্য-গুণ গাই॥
হেন সে গৌরাঙ্গচন্দ্রে যাহার পিরীতি।
গদাধর-প্রাণনাথ [২] যাহে নাম-খ্যাতি॥
গৌরগত প্রাণ প্রেম কে বুঝিতে পারে।
ক্ষেত্র-বাস কৃষ্ণ-সেবা যার লাগি ছাড়ে॥
গদাইর গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গের গদাধর।
শ্রীরাম জানকী যেন এক কলেবর॥
যেন [৩] একপ্রাণ রাধা বৃন্দাবন-চন্দ্র।
তেন [৪] গৌর গদাধর প্রেমের তরঙ্গ॥
কহে শিবানন্দ পহু যার অনুরাগে।
শ্যাম-তনু গৌর হইয়া প্রেম মাগে॥৩।২২৮৫॥"

১। সম্ভবতঃ—গোবিন্দ কর্ম্মকার, যিনি ভৃত্যের কার্য্য করিতেন।

২। প্রভু—গৌরাঙ্গদেব।

১ এবং ২। গৌরাঙ্গদেব গদাধর পণ্ডিতকে সাতিশয় স্নেহকরিতেন। গৌরাঙ্গদেব যখন নীলাচল হইতে নবদ্বীপে আসিতেছিলেন, চৈতন্যদেবের নিষেধসত্ত্বেও গদাধর শ্রীক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ ছাড়িয়া তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ-মধ্য-১৬শ-৫৪-৫৮)। বৈষ্ণবেরা বলেন যে গদাধর কৃষ্ণলীলায় রাধিকা ছিলেন।

৩। যেরূপ। ৪। সেইরূপ।

"দূতি মুখে শুনাইতে ঐছন [১] ভাষ।
ঝর ঝর লোচন ঘন ঘন শ্বাস॥
পরিহরি [২] মথুরা করল পয়ান [৩]।
লোরেহি [৪] পন্থ [৫] বিপথ নাহি জান॥
দূতি অনুসারে চললি অনুসারি।
ছুটল কুঞ্জর-গতি অনিবারি॥
কর ধরি দূতী মিলাওল কুঞ্জে।
চিরদিনে পওল আনন্দ-পুঞ্জে॥
হের সখী জয় জয় মঙ্গল দেল।
শিবানন্দ সহচরী জীবন ভেল [৬]।

উপরিলিখিত পদ হইতে গৌরাঙ্গভক্ত গদাধর-পণ্ডিতের প্রতি এবং গৌরাঙ্গদেবের প্রতি শিবানন্দের অকৃত্রিম এবং ঐকান্তিক ভক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। শিবানন্দ সেন তাঁহার আরাধ্য দেবতা চৈতন্যদেবের জন্য সকল অপমান এবং কষ্ট সহ্য করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন। শিবানন্দ প্রতি বৎসর রথের সময়ে গৌড়ের ভক্তমণ্ডলীকে লইয়া নীলাচলে যাইতেন; কখন কখনও স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা দেখিবার জন্যও যাইতেন (চৈঃ চঃ নাঃ-১০ম-১৩)। সচরাচর বৈশাখ মাসে শ্রীবাস তাঁহার প্রতিবেশী শিবানন্দ ও বাসুদেব দত্তকে লইয়া নবদ্বীপে যাইয়া শচীদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। তাহার পর ভক্তগণ শান্তিপুরে

১। ঐরূপ। ২। ত্যাগকরিয়া। ৩। প্রয়াণ। ৪। নয়নজলে। ৫। পথ। ৬। হইল; পূর্ব্বে যিনি বীরাদূতী ছিলেন এবং গোপীগণকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট লইয়া যাইতেন, তিনি গৌরাঙ্গলীলায় শিবানন্দ সেন হইয়াছিলেন এবং ভক্তগণকে নীলাচলে চৈতন্যদেবের নিকটে লইয়া যাইতেন।

অদ্বৈত আচার্য্যের নিকট আসিতেন এবং তথা হইতে সকলে নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিতেন (চৈঃ চঃ-মধ্য-১৪শ-১৩)।

একবার ভক্তগণ যাহাতে স্নানযাত্রা ভাল করিয়া দেখিতে পান, সেই জন্য প্রতাপরুদ্র তাঁহার মহিষীদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট চক্রবেষ্ট (উচ্চ বেদী) ইঁহাদিগকে ব্যবহারকরিবার অনুমতি দিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ নাঃ-১০ম-২৪)।

নীলাচলে গমনের সময়ে গৌড়ের ভক্তগণ কি করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেন, কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচরিত মহাকাব্যে (১৪শ সর্গ-২৯-৩১) বর্ণিত হইয়াছে—

"অথ তে শ্রীলগৌরাঙ্গচরণপ্রেমবিহ্বলাঃ।
তস্যৈব গুণনামাদি কীর্ত্তয়ন্তোমুদং যযুঃ ॥২৯॥
কীর্ত্তনং প্রাতরারভ্য সন্ধ্যায়ামথবা নিশি।
কুর্ব্বন্তি তেঽথ বিশ্রামং পথিকৃত্যং তথাততঃ ॥৩০॥
এবং দিনং কীর্ত্তনেন নৃত্যেন চ মহাশয়াঃ।
বিনীয় বর্ত্মনি যযুঃ পরমোৎসুকচেতসঃ ॥৩১॥"

(অনন্তর ভক্তগণ শ্রীল গৌরাঙ্গদেবের পাদপদ্মের প্রেমে মহাবিহ্বল হইয়া তাঁহারই গুণ-নামাদি কীর্ত্তনকরতঃ প্রীতিলাভ করিলেন ॥২৯॥ ইঁহারা সকলে প্রাতঃকালেই কীর্ত্তন আরম্ভকরিয়া সন্ধ্যার সময়ে অথবা রাত্রিতে বিশ্রাম করেন, তৎপরে পথের অন্যান্য কার্য্য সকল সমাধাকরিয়া থাকেন। এইরূপে পরম উৎসুক চিত্তে মহাত্মা ভক্তগণ পথিমধ্যে কীর্ত্তনানন্দে দিন যাপনকরিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন ॥৩০॥৩১ ॥

পদকল্পতরুতে গৌড়ের ভক্তগণের নীলাচল-যাত্রা বর্ণিত হইয়াছে—

গোরা-গুণে প্রাণ কান্দে কি বুদ্ধি করিব।

গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব ?
কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া ?
দুর্ল্লভ হরির নাম কে দিবে যাচিয়া ?
আকিঞ্চন দেখি কেবা উঠিবে কান্দিয়া ?
গোরা বিনু শূন্য হৈল সকল নদীয়া ॥
বাসুদেব ঘোষ কান্দে গুণ সোঙরিয়া [১] ।
কেমনে রহিবে প্রাণ গোরা না দেখিয়া ?২২৮০ ॥

(পদকল্পতরু) ।

গৌরাঙ্গ-বিরহে সবে বিভোর হইয়া ।
সকল ভকতগণ একত্র মিলিয়া ॥
নিত্যানন্দ প্রভুসনে যুকতি করিল ।
অদ্বৈত-আচার্য্য পাশে সবাই চলিল ॥
গৌরাঙ্গ দেখিতে সবে নীলাচলে যাব ।
দেখিয়া সে চাঁদ-মুখ হিয়া জুড়াইব ॥
শ্রীনিবাস, হরিদাস, মুরারি, মুকুন্দ ।
বাসুদেব, নরহরি, সেন শিবানন্দ ॥
সকল ভকত মেলি যায় নীলাচল ।
প্রেমদাস কহে সব হইবে সফল ॥২২৮১॥

শচী মাতার আজ্ঞা লঞা, সকল ভকত ধাঞা
চলিলেন নীলাচল-পুরে ॥
শ্রীনিবাস, হরিদাস, অদ্বৈত-আচার্য্য পাশ
মিলিলা সকল সহচরে ॥

১। স্মরিয়া।

অদ্বৈত নিতাই সঙ্গে মিলিয়া কৌতুক-রঙ্গে
নীলাচল-পথে চলি যায়।
অতি উৎকণ্ঠিত মনে দেখিতে গৌরাঙ্গচাঁদে
অনুরাগে আকুল-হিয়ায় ॥
পথে দেবালয়গণ করি কত দঁরশন,
উত্তরিলা আঠারনালাতে।
সকল ভকত সাথে কীর্ত্তন করিয়া পথে,
যায় সবে গৌরাঙ্গ দেখিতে ॥
কীর্ত্তনের মহারোল, ঘন ঘন হরিবোল,
অদ্বৈত নিতাই মাঝে নাচে।
গগনে উঠিল ধ্বনি, নীলাচল-বাসী শুনি,
দেখিবারে ধায় আগে পাছে ॥
শুনিয়া গৌরাঙ্গ-হরি স্বরূপাদি সঙ্গে করি
পথে আসি দিলা দরশন।
মিলিলা সবার সঙ্গে প্রেম পরিপূর্ণ অঙ্গে
প্রেমদাসের আনন্দিত মন ॥২২৮৩॥

ইঁহারা (বিশেষতঃ শিবানন্দ সেন ও বাসুদেব দত্ত) জগন্নাথদেবের ও গৌরাঙ্গদেবের স্নানের জন্য গঙ্গাজল লইয়া পুরীতে যাইতেন (চৈঃ চঃ মঃ-১৪শ-৯৮-১০২) এবং রথযাত্রা দেখিয়া,কখন কখন স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা দেখিয়া গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। রথযাত্রার সময়ে সাত সম্প্রদায়ের ভক্তগণ লইয়া গৌরাঙ্গদেবের কীর্ত্তন নিম্নলিখিত (পদকল্পতরু হইতে সংগৃহীত) পদে বিবৃত হইয়াছে—

নীলাচলে জগন্নাথ রায়।
গুণ্ডিচা-মন্দিরে চলি যায় ॥

অপরূপ রথের সাজনি।
তাহে চড়ি যায় যদুমণি॥
দেখিয়া আমার গৌরহরি।
নিজগণ লৈয়া এক করি॥
মাল্য চন্দন সবে দিয়া।
জগন্নাথ নিকটে যাইয়া॥
রথ বেড়ি সাত সম্প্রদায়।
কীর্ত্তন করয়ে গোরা রায়
আজানুলম্বিত বাহু তুলি।
ঘন উঠে হরি হরি বলি॥
গগন ভেদিল সেই ধ্বনি।
অন্য আর কিছুই না শুনি।
নিতাই, অদ্বৈত, হরিদাস।
নাচে বক্রেশ্বর, শ্রীনিবাস॥
মুকুন্দ, স্বরূপ, রাম রায়।
মন বুঝি উচ্চস্বরে গায়॥
গোবিন্দ, মাধব, বাসু ঘোষ।
যার গানে অধিক সন্তোষ॥
বসু রামানন্দ, নরহরি।
গদাধরপণ্ডিতাদি করি॥
দ্বিজ হরিদাস, বিষ্ণুদাস।
ইহা সবার গানেতে উল্লাস॥
এই মত কীর্ত্তন নর্ত্তনে।
কতদূর করিল গমনে।

এ সবার পদরেণু আশ।
করি কহে বৈষ্ণবের দাস ॥১৫৪৬॥

অপরূপ রথ আগে।
নাচে গোরা রায়, সবে মেলি গায়
যত যত মহাভাগে ॥
ভাবেতে অবশ, কি রাতি দিবস,
আবেশে কিছু না জানে।
জগন্নাথ-মুখ দেখি মহা সুখ,
নাচে গর গর মনে ॥
খোল করতাল, কীর্ত্তন রসাল।
ঘন ঘন হরিবোল।
জয় জয় ধ্বনি, সুর নর মুনি,
গগনে উঠয়ে রোল ॥
নীলাচল-বাসী, আর নানা দেশী,
লোকের উথল হিয়া।
প্রেমের পাথারে সবাই সাঁতারে,
দুখী যদু অভাগিয়া ॥১৫৪৮॥
নাচে শচীনন্দন দেখি রূপ, সনাতন,
গান করে স্বরূপ-দামোদর।
গায় রায় রামানন্দ, মুকুন্দ, মাধবানন্দ,
বাসু ঘোষ, গোবিন্দ, শঙ্কর ॥
প্রভুর দক্ষিণ পাশে, নাচে নরহরি দাসে,
বামে নাচে প্রিয় গদাধর।

নাচিতে নাচিতে প্রভু আউলাঞা পড়য়ে কভু,
ভাবাবেশে ধরে দোঁহার কর ॥
নিত্যানন্দ-মুখ হেরি, বলে পহুঁ [১] হরি হরি,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাকে উচ্চস্বরে।
সোঙরি [২] শ্রীবৃন্দাবন, প্রাণ করে উচাটন,
পরশ করয়ে রায়ের করে ॥
শ্রীনিবাস, হরিদাস নাচে গায় প্রেমোল্লাস,
প্রভুর সাত্বিক ভাবাবেশ।
ইহ [৩] রস প্রেম ধন পাওল জগ-জন,
গোবিন্দ মাগয়ে এক লেশ ॥১৫৫১॥

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শিবানন্দ ক্ষমতাশালী এবং ধনশালী লোক না হইলে এরূপ বিপ্লবের সময়ে প্রতি বৎসর ভক্তমণ্ডলীকে নীলাচলে লইয়া যাইতে কখনও সাহস করিতেন না এবং সক্ষমও হইতেন না—"হন্ত ইদানীং গৌড়াধিপতের্যবনভূপালস্য গজপতিনা সহ বিরোধে গমনাগমনমেব ন বর্ত্ততে (চৈঃ চঃ নাঃ—৬-১৪) অর্থাৎ এ সময়ে গৌড়াধিপতি যবন রাজার সহিত প্রতাপরুদ্রের বিবাদ থাকাতে, কাহারও গমনাগমন নাই।" এই বিরোধ ব্যতীত, অনেক দুষ্ট ঘট্টপাল এবং দস্যু গৌড় হইতে নীলাচলের পথ বিপদসঙ্কুল করিয়াছিল—

"গ্রামে গ্রামে পটুকপটিনো ঘট্টপালা যএতে,
যেঽরণ্যানীচরাগিরিচরা বাটপাটচ্চরাশ্চ [৪] ॥

(চৈঃ চঃ নাঃ—৬ষ্ঠ-১৬)

১। প্রভু। ২। স্মরণ করিয়া। ৩। এই।
৪। বাট্‌পাড়্‌।

পুনরায় (চৈঃ চঃ না—১০ম-১) কবিকর্ণপূর একজন বৈদেশিক দ্বারা বলাইতেছেন—

"বৈদেশিকঃ। শ্রুতং ময়া প্রত্যব্দমেব গুণ্ডিচাসময়ে অদ্বৈতাচার্য্যাদয়ঃ সর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদর্শনার্থং গচ্ছন্তি, তেষামভিভাবকতয়া শিবানন্দনামা কশ্চিত্তস্যৈব ভগবতঃ পার্ষদোবর্ত্মনঃ কণ্টকায়মানানাং ঘট্টপালানাং ঘট্টদেয়াদিনিঘ্নবিঘ্ননিবারক আচাণ্ডালমপি প্রতিপাল্য নয়তি তদহমপি তমনুসন্দধামি যথা তস্য সঙ্গ এব গম্যতে।"

(বৈদেশিক। আমি শুনিয়াছি প্রতি বৎসর রথযাত্রাসময়ে অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি, সকলেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দর্শন নিমিত্ত গমন করিয়া থাকেন এবং সেই প্রভুর পার্ষদ শিবানন্দনামে একব্যক্তি সকলের অভিভাবকরূপে পথের কণ্টকতুল্য ঘট্টপালগণের করগ্রহণাদিরূপ বিঘ্ন নিবারণ করতঃ চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকল জাতিকেই সংরক্ষণপূর্ব্বক লইয়া গিয়া থাকেন; অতএব আমি তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারি, তবে তাঁহার অনুসন্ধান করি)।

একবার শিবানন্দ এবং তাঁহার সহযাত্রীদিগের দেয় বর্দ্ধিত শুল্ক এবং পূর্ব্ববৎসরের বাকি শুল্ক রেমুণার ঘট্টপালকে (ঘাটিয়াল—চৈঃ চঃ-মধ্য-১৬শ-১১) দিতে শিবানন্দ সক্ষম না হওয়াতে তাঁহাকে (কারণ তিনি সকল যাত্রীর প্রতিভূ অর্থাৎ জামিন হইতেন) কাষ্ঠনির্ম্মিত কারাগারের মধ্যে কিছুকাল বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। প্রতাপরুদ্র সে সময়ে দক্ষিণে গিয়াছিলেন বলিয়া এরূপ করিতে সে সাহস করিয়াছিল (চৈঃ চঃ নাঃ—১০ম-৫)। ঘট্টপালব্যতীত সীমাধিকারী (Boundary officer) ছিল। উৎকল (ওড্র) ও গৌড়ের মধ্যে সীমায় উৎকালরাজ প্রতাপরুদ্রের একজন সীমাধিকারী এবং গৌড়ের রাজার একজন

মুসলমান (তুরস্ক) সীমাধিকারী ছিল। পরস্পরের সন্ধি না হইলে যাত্রীরা অতিশয় নির্য্যাতিত হইতেন (চৈঃ চঃ নাঃ—৯ম-২৬ ; চৈঃ চঃ—মধ্য-১৬শ-৬৫)। পিচ্ছলদা পর্য্যন্ত তাহাদের অধিকার ছিল। দানী ও ঘট্টপালের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল কিনা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। যখন চৈতন্যদেব প্রথমে নীলাচলে যাইতেছিলেন (চৈঃ ভাঃ—অন্ত্য-২য়)—

"কতদূর গেলে মাত্র দানী দুরাচার।
রাখিলেন, দান চাহে, না দেয় যাইবার॥"

(চৈঃ চঃ মঃ—১১শ-৭৭)

অমী দানাদানোল্লসিতহৃদয়ৈর্দানিনিবহৈ-
র্ন কুত্রাপি শ্রীমৎপরিবৃঢ় [১]-কৃপাঢ্যা রুরুধিরে।

(আদান-প্রদানেই যাহাদিগের চিত্ত উল্লসিত সেই দানিনিবহ মহাপ্রভুর কৃপাঢ্য ভক্তগণকে কেহই অবরোধ করে নাই)।

ইহাদিগের তত্ত্বাবধানে পারঘাট সকল থাকিত। ইহাদিগকে সন্তুষ্ট না করিতে পারিলে নৌকা পাওয়া যাইত না। সম্ভবতঃ পারঘাট ব্যতীত শুল্ক-আদায়ের অন্যান্য স্থানও ইহাদিগের তত্ত্বাবধানে থাকিত।

সে সময়ে স্বাধীন নৃপতিসকলও বহিঃশত্রুআক্রমণের দুশ্চিন্তায় সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকিতেন। সেইজন্য চৈতন্যদেবকে গৌড়হইয়া বৃন্দাবন-গমনের ইচ্ছা পরিত্যাগকরিতে হইয়াছিল এবং তিনি রামকেলি হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অধিক অনুচর থাকিলেই রাজা সন্দেহ করিতেন যে ইহারা তাঁহারা শত্রুপক্ষীয় লোক। চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে প্রতাপরুদ্রকে দৌবারিক বলিতেছে—(রা, সি, কৃত অনুবাদ—চৈঃ চঃ নাঃ-৭-৩১)—

১। শ্রীমৎপ্রভু।

দৌবারিক—মহারাজ! অতিবেগে কতগুলি লোক আসিতেছে।

রাজা—তাহারা নিরস্ত্র কি অস্ত্রধারী তাহা জানিয়া আইস।"

অকপট বৈষ্ণব হইলেও শিবানন্দ গৃহী, বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন এবং মিত-ব্যয়ী ছিলেন। ইহা না হইলে তাঁহাকে বাসুদেব দত্তের আয়-ব্যয়ের তত্ত্বাবধারণ করিতে চৈতন্যদেব কখনই অনুরোধ করিতেন না। ইহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

জগদানন্দ পণ্ডিত [১] চৈতন্যদেবের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের পর যখন তিনি তাঁহার মাতার অনুমতি লইয়া অদ্বৈতাচার্য্যের শান্তিপুরস্থিত গৃহ হইতে নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন জগদানন্দ, মুকুন্দ, গদাধর, নিত্যানন্দ, গোবিন্দ প্রভৃতির সহিত চৈতন্যদেবকে অনুসরণ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে গৌরাঙ্গদেবের অন্ত্যলীলা পর্য্যন্ত অধিকাংশ সময় তিনি চৈতন্যদেবের নিকট নীলাচলে বাস করিতেন। যদি তাঁহার সন্দেহ হইত যে কেহ চৈতন্যদেবকে প্রকৃত সম্মান প্রদর্শনকরিতেছেন না, তাহা হইলে তিনি তাঁহার প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইতেন। চৈতন্যদেবকে উত্তমরূপে স্নান করাইতে, ভোজন করাইতে ও শয়ন করাইতে তিনি সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। গৌরাঙ্গদেব বৈরাগ্যধর্ম্ম অবলম্বনকরায় জগদানন্দের অনুরোধ রক্ষাকরিতে অসমর্থ হইলে, জগদানন্দ অভিমানে গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিনের পর দিন উপবাস করিতেন। জগদানন্দ শিবানন্দকে সমধিক স্নেহ করিতেন॥ চৈতন্যদেব কুমারহট্টে শ্রীবাসের গৃহে আসিলেই জগদানন্দ যাইয়া শিবানন্দকে সংবাদ দিয়াছিলেন এবং গঙ্গার ঘাট হইতে শিবানন্দের বাটী পর্য্যন্ত পথ সুসজ্জিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চরণোদকদ্বারা শিবানন্দের গৃহ ও

১। তিরোভাব—১৪৫৬ শক (খ্রীঃ ১৫৩৫), পৌষ, শুক্লতৃতীয়া (বৈষ্ণবদিগ্-দর্শনী মতে)।

পরিজনবর্গকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু বাসুদেব দত্তকে তাঁহার সংবাদ দিবার কথা চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে নাই। বাসুদেব দত্তের গৃহের দিকের পথ দত্ত মহাশয়ই সম্ভবতঃ সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে জগদানন্দ চৈতন্যদেবের একজন প্রিয়তম ভক্ত হইলেও তাঁহার সামান্য অভিমান ছিল এবং তিনি সমদর্শী লোক ছিলেন না।

জগদানন্দের গৃহ সম্ভবতঃ কুমারহট্টের উত্তরাংশে (বর্ত্তমান কাঞ্চন-পল্লীতে) শিবানন্দ সেনের গৃহের নিকটে ছিল। একবার চৈতন্যদেব শিবানন্দ প্রভৃতিকে নীলাচল হইতে শ্রীকান্তসেনদ্বারা বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে সে বৎসর তাঁহাদিগের নীলাচলে আসিতে হইবে না এবং তিনিই নিজে পৌষমাসে শিবানন্দের নিকটে আসিবেন এবং জগদানন্দের নিকট ভিক্ষা করিবেন। মূলে আছে (চৈঃ চঃনাঃ—৯-৯)—

"শিবানন্দোঽপি ভবন্মাতুলো বক্তব্যঃ পৌষে মাসি তত্রোপসন্নেন ময়া ভবিতব্যং, তত্র জগদানন্দোঽস্তি, তত্রৈব ভিক্ষা কর্ত্তব্যা।"

প্রথম ও দ্বিতীয় 'তত্র' এর অর্থ—শিবানন্দের গ্রামে অর্থাৎ কুমার-হট্টের উত্তরাংশে। তৃতীয় 'তত্র' শব্দের অর্থ—কবিকর্ণপূর নিজেই করিয়াছেন—জগদানন্দস্য গৃহে। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে জগদানন্দের গৃহও শিবানন্দের বাটীর নিকটে অবস্থিত ছিল।

চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস-গ্রহণানন্তর নীলাচলে গমনের পরে শচীদেবী, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, শ্রীবাস, চন্দ্রশেখরাদি নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ জগদানন্দ-আনিত নীলাচলের সংবাদনিমিত্ত কিরূপ উদ্‌গ্রীব হইতেন, তাহা নিম্ন-লিখিত পদগুলি হইতে সহজেই অনুমিত হইবে—

"নীলাচল হইতে শচীরে দেখিতে
আইসে জগদানন্দ।

রহি কত দূরে দেখে নদীয়ারে
গোকুলপুরের ছন্দ ॥
ভাবয়ে পণ্ডিত রায়।
পাই কি না পাই শচীরে দেখিতে
এই অনুমানে যায় ॥

* * * *

ক্ষণেক রহিয়া চলিলা উঠিয়া
পণ্ডিত জগদানন্দ।
প্রবেশি নগরে দেখে ঘরে ঘরে
লোক সব নিরানন্দ ॥
না মেলে পসার [১] না করে আহার
কারো মুখে নাহি হাসি।
নগরে নাগরী কান্দয়ে গুমরি
থাকয়ে বিরলে বসি ॥
দেখিয়া নগর ঠাকুরের ঘর
প্রবেশ করল যাই।
আধ মরা হেন ভূমে অচেতন
পড়িয়া আছেন আই [২] ॥
প্রভুর রমণী সেহো অনাথিনী
প্রভুরে হইয়া হারা।
পড়িয়া আছেন মলিন বসন,
মুদল-নয়ানে ধারা ॥

১। দোকান। ২। চৈতন্যদেবও তাঁহার মাতাকে 'আই' বলিতেন—চৈঃ চঃ মধ্য ৩য়-১৩৯—প্রভু ত কান্দিয়া কহে, শুন মোর আই। তোমার শরীর এই মোর কিছু নাই।'

দাস দাসী সব আছয়ে নীরব,
দেখিয়া পথিক জন।
সুধাইছে তারে, কহ দেখি মোরে,
কোথা হৈতে আগমন ॥
পণ্ডিত কহেন মোর আগমন
নীলাচলপুর হৈতে।
গৌরাঙ্গসুন্দর পাঠাইল মোরে
তোমা সবারে দেখিতে ॥
শুনিয়া বচন, সজল নয়ন,
শচীরে কহল গিয়া।
আর এক জন চলিল তখন
শ্রীবাস-মন্দিরে ধাইয়া ॥
শুনিয়া শ্রীবাস, মালিনী উল্লাস,
যত নবদ্বীপ-বাসী।
মরা হেন ছিল, অমনি ধাইল,
পরাণ পাইল আসি ॥
মালিনী আসিয়া শচী বিষ্ণুপ্রিয়া
উঠাইল যতন করি।
তাহারে কহিল পণ্ডিত আইল,
পাঠাইল গৌরহরি ॥
শুনি শচী আই, সচকিত চাই,
দেখিলেন পণ্ডিতেরে।
কহে তার ঠাঁই, আমার নিমাই
আসিয়াছে কতদূরে ॥

দেখি প্রেম-সীমা, স্নেহের মহিমা,
পণ্ডিত কান্দিয়া কয়।
সেই গৌরমণি, যুগে যুগে জানি,
তুয়া প্রেম-বশ হয় ॥
হেন নীত রীত, গৌরাঙ্গ-চরিত
সবাকারে শুনাইয়া।
পণ্ডিত রহিলা নদীয়া নগরে,
সবাকার সুখ দিয়া ॥
চন্দ্রশেখর, পশুর সোসর [১],
বিষয়-বিষেতে প্রীত।
গৌরাঙ্গ-চরিত পরম অমৃত
তাহাতে না লয় চিত ॥
আর না হেরিব প্রসর কপালে
অলকা-তিলক-কাচ[২]।
আর না হেরিব সোণার কমলে
নয়ন-খঞ্জন নাচ ॥
আর না নাচিবে আপনার ঘরে
আর না দেখিব চাইয়া ॥

* * *

নির্দ্দয় কেশব ভারতী আসিয়া
মাথায় পাড়িল বাজ।
গৌরাঙ্গ সুন্দর না দেখি কেমনে
রহিব নদীয়া মাঝ ॥

১। সদৃশ। ২। কাচ-সাজ।

কেবা হেন জন আনিবে এখন
আমার গৌরাঙ্গ রায়।
শ্বাশুড়ী বধূর রোদন শুনিতে
বংশী গড়াগড়ি যায় ॥১৮৫৬॥"

পরমানন্দদাস, পুরীদাস অথবা কবিকর্ণপূরের গৌরাঙ্গভক্তি, পাণ্ডিত্য, তাঁহার বিবিধ গ্রন্থ পাঠ করিলেই উপলব্ধি হয়। কাঁচরাপাড়া যে কুমারহট্টের অন্তর্গত ছিল এবং চৈতন্যদেব কাঁচরাপাড়ায় পদার্পণ করিয়া কোন্ কোন্ ভাগ্যবান্‌কে অনুগৃহীত করিয়াছিলেন, ইহার বিস্তৃত বিবরণ কবিকর্ণপূরের গ্রন্থগুলি হইতে আমরা অবগত হই।

গৌরাঙ্গদেবের ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে বাসুদেবের ন্যায় ভক্ত এ সংসারে বিরল। তিনি যীশুখৃষ্টের ন্যায় সকলের পাপের ভার নিজে বহন করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। বাসুদেব দত্ত সম্বন্ধে কবিকর্ণপূর তাঁহার চৈতন্যচরিত মহাকাব্যে (১৩শ-১৪৬) লিখিয়াছেন—

"শ্রীবাসুদেব ইতি দত্তকুলৈকরত্নং
গৌরাঙ্গচন্দ্রমবলোক্য ঝটিত্যমন্দং ॥
শশ্বদ্বভূব খলু জীবন-নির্বিশেষো
নিঃশেষ-তৎপ্রণয়সিন্ধুনিমগ্ন এষঃ ॥ ১৪৬ ॥"

(অপর শ্রীমান্ বাসুদেব-নামক দত্তকুলের একমাত্র রত্নস্বরূপ একজন ভক্ত গৌরচন্দ্রকে দর্শনকরতঃ শীঘ্র তদীয় সম্পূর্ণ জীবনস্বরূপ ও নিয়তই অসীম প্রণয়ার্ণবে নিমগ্নপ্রায় হইলেন ॥ ১৪৬)

তাঁহাকে নিঃস্বার্থতা, দানশীলতা, এবং মানবপ্রীতির অবতার বলিলে কিছুই অত্যুক্তি হয় না। বাসুদেব দত্তের কনিষ্ঠ মুকুন্দ একজন বিখ্যাত গায়ক এবং চৈতন্যদেবের সহপাঠী ছিলেন; তাঁহাকেও চৈতন্যদেব সমধিক স্নেহ করিতেন। বাসুদেব দত্তও চৈতন্যদেবের একজন গায়ক

ছিলেন (গৌ-গ-দী—১৪০)। বাসুদেবের একটী পুত্র চৈতন্যদেবকে দর্শন করিবার জন্য নীলাচলে আসিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ নাঃ—৮ম ও ১০ম অঙ্ক)।

ঈশ্বর-প্রতিম চৈতন্যদেবের, চরিত্র-বিশ্লেষণ আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র মানবের পক্ষে দুষ্কর। যিনি সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক নিজসুখে জলাঞ্জলি দিয়া জনসাধারণের মন হইতে মোক্ষলাভের অন্তরায় বিষয়াসক্তি ও পাপ দূরীকরণমানসে সমগ্র ভারতবর্ষে হরিনাম এবং বিশুদ্ধ ভগবৎপ্রেম ও ভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন, সেই চৈতন্যদেবকে নমস্কার।

সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে চৈতন্যদেব কিরূপ হইয়াছিলেন, অমিয়-নিমাই-চরিতে (২য় খণ্ড-পৃঃ-৩৪৪-৫) তাহার একটি সুন্দর বর্ণনা আছে—"শ্রীজগন্নাথ-শচীনন্দন নিমাই এখন হইলেন ভারতীর শিষ্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। জগতের যত পুরুষ সকলেই এখন তাঁহার পিতা, যত রমণী সকলেই তাঁহার মাতা। নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী শ্রীনবদ্বীপে, কৃষ্ণচৈতন্যের বাড়ী নাই, কি বাড়ী—অনন্তের পথে। তিনি পূর্ব্বে শচীর ভবনে বাস করিতেন, এখন বৃক্ষতলবাসী হইলেন। যখন নিমাই-পণ্ডিত কৃষ্ণচৈতন্য হইলেন, তখন তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হইল, তিনি তাঁহার জননীকে ত্যাগ করিলেন, ঘরণীকে ত্যাগ করিলেন, তাঁহার নবদ্বীপ গমন করিবার আর অধিকার থাকিল না, গৃহ-মধ্যে বাস করিতে আর পারিবেন না। তাঁহার আর কোন সম্পত্তি রহিল না, সম্পত্তি স্পর্শ করিতেও অধিকার রহিল না। তাঁহার সম্পত্তির মধ্যে বাঁশের একখানি যষ্টি যাহাকে "দণ্ড" বলে; কমণ্ডলু অর্থাৎ কাঠের কি নারিকেলের মালার জলপাত্র; একখানি কৌপীন; আর দুইখানি বহির্ব্বাস; এবং শীত-নিবারণের নিমিত্ত একখানি ছেঁড়া কাঁথা। নিমাইয়ের কৃষ্ণচৈতন্য নামধারণ করায় তাঁহার শয্যায় শয়ন করিবার অধিকার গেল, উপকরণ

সহিত অন্নগ্রহণ করিবার অধিকার গেল। এমন কি, অঙ্গে তৈল মর্দ্দনের অধিকারও রহিল না।"

যিনি বৈরাগ্যব্রত গ্রহণকরিয়াও জননীর প্রতি স্নেহের ও ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন সেই গৌরাঙ্গদেবকে নমস্কার। যখন চৈতন্যদেব সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক শান্তিপুরে অদ্বৈত-আচার্য্যের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ-মধ্য-৩য় পঃ)—

"যদ্যপি সহসা আমি করিঞাছি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমা সভা হৈতে নহিব উদাস॥
তোমা সভা না ছাড়িব যাবৎ আমি জীব।
মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে সন্ন্যাস করিয়া।
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া॥"

শচীদেবী এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে নীলাচলে অবস্থান করিতে আদেশ দিলে সেই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়াছিলেন। নীলাচল হইতে তিনি যখন শান্তিপুরে অদ্বৈত-আবাসে অবস্থান করিতেছিলেন তখন তিনি বৃন্দাবনে যাইবার জন্য শচীদেবীর অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

"মাতার চরণ ধরি বহু বিনয় কৈল।
বৃন্দাবন যাইতে প্রভু তাঁর আজ্ঞা লৈল॥"

(চৈঃ চঃ-মধ্য-১৬শ পঃ-৯৯)

অদ্বৈতপ্রকাশে (২১ অধ্যায়)—

"একদিন মহাপ্রভু বসিয়া নির্জ্জনে।
অতি প্রিয়তম শ্রীজগদানন্দে ভণে॥
গৌড় দেশে চল তুহুঁ ত্বরিত গমনে।
পহিলে নদীয়া যাইবা মোর জন্মস্থানে॥

মাতৃপদে কহিবা মোর কোটি নমস্কার।
যাঁহা তাঁহা থাকোঁ মুঞি তাঁহান কিঙ্কর॥
পুত্র হঞা পুত্রধর্ম্ম পালিতে নারিনু।
ইথে তান্ পদে মহা অপরাধী হৈনু॥
কোটি যুগে তান্ ঋণ নারিমু শোধিতে।
অপরাধ ক্ষমে যদি নিজ দয়ামৃতে॥
তবেহ পাইমু রক্ষা নতুবা পতন।
তাহান্ শ্রীপাদপদ্মে লইনু শরণ॥"

কিন্তু বৈষ্ণবগ্রন্থকারগণ চৈতন্যদেবকে ঈশ্বর প্রমাণকরিবার জন্য তাঁহাকে তাঁহার মাতৃদেবীর মস্তকের উপরে পদস্থাপনের কথা লিখিয়াছেন (অমিয়-নিমাই-চরিত-৩য় খণ্ড-৪র্থ অধ্যায়-২৩৬)—

"তাহার পরে যদি শচীনন্দন শ্রীভগবান্ হইতে পৃথক্ বস্তু হইতেন, আর তাঁহার দেহটী শ্রীভগবানের না হইয়া একজন মনুষ্যের হইত, তবে শ্রীভগবান্ সেই দেহে প্রকাশ পাইয়া, কুলবতীগণের মস্তকে শ্রীপাদ দিয়া বলিতেন না যে, "তোমাদের চিত্ত আমাতে হউক," অর্থাৎ আমাকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ কর। আবার তাহা হইলে শ্রীভগবান্ সেই দেহে প্রকাশ পাইয়া সেই দেহের পদ, তাঁহার দেহধারী বৃদ্ধা জননীর মস্তকে দিতেন না। শ্রীভগবান্-কর্ত্তৃক এরূপ মূঢ়তার কার্য্য সম্ভব হয় না। শ্রীঅদ্বৈত দম্ভ করিয়া বলিয়াছিলেন, জগন্নাথ-সুত যদি "তিনি" হয়েন, তবেই কেবল তাঁহার মস্তকে চরণ দিতে সক্ষম হইবেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাই করিলেন, আর তখনি শ্রীঅদ্বৈত স্বীকার করিলেন যে, প্রভু স্বয়ং আসিয়াছেন। আবার শ্রীশচীর মস্তকে পা দিয়া শ্রীভগবান্ ইহাই প্রমাণ করিলেন যে. তিনি আর শচীনন্দন পৃথক্ বস্তু নন্, আর শচী-নন্দনের যে দেহ, উহা তাঁহার নিজের দেহ। আর যদিও বাহ্য

সম্পর্কে শচী তাঁহার জননী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি শচীর পিতা। আরও দেখাইলেন যে, যদিও শচী অতি বৃদ্ধা, কিন্তু তিনি তাহা অপেক্ষা অনেক প্রাচীন।" অমিয়নিমাইচরিত-প্রণেতা এই বৃত্তান্তের অধিকাংশ কবিকর্ণপূরের চৈতন্য-চরিত মহাকাব্যের পঞ্চম সর্গ হইতে সংগৃহীত করিয়াছেন। কবিকর্ণপূর বলিতেছেন যে নবদ্বীপস্থ শ্রীবাস্-গৃহে আগমনপূর্ব্বক পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিয়া চৈতন্যদেব সূর্য্যকে নিজ তেজোরাশি দ্বারা লঘুরূপে তিরোহিত করিলেন (৫৭)। তাহার পর শ্রীবাসের ভ্রাতৃপত্নীগণকে 'তোমরা মৎপরায়ণা হও' বলিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তাঁহাদিগের মস্তকে পাদপদ্ম সমর্পণ করিলেন (৭৩)। শ্রীবাসের অনুরোধে চৈতন্যদেব শচীদেবীর মস্তকে 'শ্রীমৎপাদপদ্ম' অর্পণ করিলেন (৮৮)। শ্রীবাস, কবিকর্ণপূর ইত্যাদির মতে শচী-দেবীর মস্তকে তাঁহার পাদপদ্ম স্থাপন না করিলে চৈতন্যদেবের ঈশ্বরত্ব অপূর্ণ থাকিত। বাল্মীকি রামচন্দ্রের কৌশল্যা-মস্তকে পদস্থাপনের কথা ত বলেন নাই। চৈতন্যদেবের যেরূপ ঐকান্তিকী মাতৃভক্তি ছিল তাহাতে এরূপ অস্বাভাবিকী বর্ণনা বিশ্বাসকরিতে আমাদিগের ইচ্ছা হয় না।

যিনি ভক্তগণের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী ছিলেন, যিনি জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে ভক্তগণের মঙ্গলবিধানে সর্ব্বদা প্রয়াসী ছিলেন, যিনি ভক্তগণকে নিজ-সন্তানাপেক্ষা অধিকতর স্নেহ করিতেন, সেই চৈতন্য-দেবকে নমস্কার। যিনি সাতিশয় বিদ্বান্ ও জ্ঞানী হইলেও বিদ্যা এবং জ্ঞানাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক তর্কপ্রয়াসী প্রতিদ্বন্দ্বীকে জয়পত্র লিখিয়া দিতে প্রায় সর্ব্বদা উদ্যত ছিলেন, সেই কৃষ্ণভক্ত বিনয়ের অবতার চৈতন্য-দেবকে নমস্কার। চৈতন্যদেব রঘুনাথ দাসকে বৈষ্ণবের কি কর্ত্তব্য এই উপদেশ-প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়াছিলেন—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মানদেন কীৰ্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ ॥"
(চৈঃ চঃ-অন্ত্য-৬ষ্ঠ-৮৫)

'যিনি তৃণাপেক্ষাও সুনীচ, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু এবং স্বয়ং অমানী হইয়া পরকে মান দেন, সেই ব্যক্তি-কর্তৃকই শ্রীহরি সর্ব্বদা কীর্ত্তনীয় হইয়া থাকেন'।

চৈতন্যদেব বলিতেন যে বৈষ্ণবের নিরভিমান হওয়া উচিত এবং যিনি বিনীত হইয়া কৃষ্ণনাম লন, তাঁহারই হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম উদয় হয়। যথা—চৈতন্যচরিতামৃতে (অন্ত্য-২০শ পঃ)—

"উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান॥
এইমত হৈঞা যেই, কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তার প্রেম উপজয়॥"১৩॥

তিনি অন্ততঃ সন্ন্যাসগ্রহণের পর বৃথা তর্কে প্রায়ই প্রবৃত্ত হন নাই— যথা (গোঃ কঃ-পৃঃ ৩১)—

"তার পরে তৃপদীনগরে প্রভু যায়।
শ্রীরামের মূর্ত্তি দেখি পড়িলা ধূলায়॥
বহুতর রামাত বৈষ্ণব তথা থাকে।
বিচার করিতে তারা ফেরে কত পাকে॥
মথুরা নামেতে এক রামাত পণ্ডিত।
বড়ই তাকিক বলি নগরে বিদিত॥
প্রভুর সম্মুখে আসি বিচার মাগয়ে।
যোড় হাতে প্রভু কন্ জড়-সড় হয়ে॥

মথুরা ঠাকুর ! মুহি বিচার না জানি ।
তোমার নিকটে শতবার হারি মানি ॥
শ্রীরামের ভক্ত তুমি বৈষ্ণব গোঁসাই ।
তোমারে ভজিলে কত তত্ত্ব কথা পাই ॥
বিরক্ত রামাত হয়ে জিগীষার বশী ।
শুক্লবস্ত্রে কেন দাও দুই হাতে মসী ॥
বল কিছু তত্ত্ব-কথা শুনিয়া শ্রবণে ।
পবিত্র হউক লোক তোমার বচনে ॥
শুনিতেছি তর্কে তুমি বড়ই নিপুণ ।
শুষ্ক তর্ক করিয়া নাহিক কোন গুণ ॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব জীবতত্ত্ব মায়াবাদ ।
ব্যাখ্যা করি সুধারস করাও আস্বাদ ॥
যেই তত্ত্বে জীবগণ চরিতার্থ হয় ।
সেই কথা ব্যাখ্যা করি বল মহাশয় ॥
নাহি প্রয়োজন বহু বাত বিতণ্ডায় ।
দয়া করি সূক্ষ্মতত্ত্ব বলহ আমায় ॥
বলিতে বলিতে প্রভু হরিবোল বলি ।
মাতিয়া উঠিল নামে হয়ে কুতূহলী ॥
কোথায় বসন কোথায় উত্তরীয় বাস ।
লোমাঞ্চিত কলেবর ঘন বহে শ্বাস ॥
আছাড় খাইয়া তবে পড়িলা ধরায় ।
অচেতন হইলা প্রভু যেন জড় প্রায় ॥
যতেক রামাতগণ ভাব নিরখিয়া ।
নাচিতে লাগিল সবে প্রভুরে বেড়িয়া ॥

কেহ বলে এ সন্ন্যাসী মানুষ ত নয় ।
চরণে পড়িয়া কেহ বিলুণ্ঠিত হয় ॥
অতঃপর সেইস্থান ছাড়িয়া চলিলা ।
পিছে পিছে কতদূর মথুরা ধাইলা ॥”

যিনি শাশ্বত সত্য সহজ ভাষায় বিবৃতি, হরিনাম-সংকীর্ত্তন এবং অনির্ব্বচনীয় ভাবাবেশ দ্বারা ভগবদ্‌ভক্তি পাপিষ্ঠের হৃদয়েও সঞ্চারিত করিতেন, সেই গৌরাঙ্গদেবকে নমস্কার ।

আমার দয়াল প্রভু নাগর নগরে ।
প্রাতে উঠি চলিলেন কৃষ্ণ-প্রেমভরে ॥
ধূলা-মাখা জটা-বাঁধা অন্য কথা নাই ।
পথে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি চলিছে নিমাই ॥
নাগর নগরে আছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ।
সেইখানে গিয়া প্রভু করিলা বন্দন ॥
নগরেতে বহুতর লোক করে বাস ।
সেইখানে হরিনাম করিলা প্রকাশ ॥
প্রভুর প্রেমের গতি হেরে পুরবাসী ।
আবালবনিতা সবে হইলা উদাসী ॥
তিন দিন নৃত্যগীত সেইখানে করে ।
এই কথা প্রচারিল নগরে নগরে ॥
দশ ক্রোশ হতে লোক আসিয়া জুটিল ।
একে একে সবে প্রভু হরিনাম দিল ॥
এমন দয়াল প্রভু কভু দেখি নাই ।
ঘরে ঘরে নাম দেয় চৈতন্য গোঁসাই ॥

এইখানে ছিল এক দুরাত্মা ব্রাহ্মণ।
প্রভুরে কপট বলি করিল তাড়ন ॥
দলবল লয়ে সেই ব্রাহ্মণ ঠাকুর।
দয়াল প্রভুরে বলে 'দূর, দূর, দূর' ॥
ব্রাহ্মণ ঠাকুর বলে, 'অরে জুয়াচোর!
কপট সন্ন্যাসী সেজে করিতেছ জোর,
গ্রাম্য লোক মজাইছ ধর্ম্মশিক্ষা-ছলে,
এইদণ্ডে তাড়াইব প্রকাশিয়া বলে' ॥
প্রভুর সম্মুখে আসি কত গালি দিলা।
তার কটুবাক্য প্রভু হাসি উড়াইলা ॥
ব্রাহ্মণে ডাকিয়া শেষে চৈতন্য-গোঁসাই।
বল মোরে মেরে তুমি হরি বল ভাই ॥
আর যত লোক ছিল তাঁর চারি ভিতে।
বিপ্রের আচার দেখি ধাইল মারিতে ॥
দয়াল চৈতন্যদেব মনে বিচারিয়া।
কহিতে লাগিল বাণী বিপ্রে সম্বোধিয়া ॥
"শুন ওহে দয়াময় ব্রাহ্মণ ঠাকুর।
হরি হরি বল সুখ পাইবে প্রচুর ॥
অনিত্য দেহেতে আর কোন সুখ নাই।
হরিনামে মজিয়া আনন্দ কর ভাই ॥
জড়পিণ্ড এই দেহ মরণসময়।
কেহ নাহি সঙ্গে যাবে এই ত নিশ্চয় ॥
ভাই, বন্ধু, দারা, সুত কেহ কার নয়।
সবে বস্ত্র, অলঙ্কার অর্থদাস হয় ॥

শৃগাল, কুক্কুরে খাবে অনিত্য শরীর।
পচিয়া গলিয়া যাবে এই কর স্থির॥
হরি বলি বাহু তুলি নাচ মোর সনে।
যাইতে হবে না আর শমন-সদনে॥
দারা বল, পুত্র বল, বেদিয়ার খেলা।
দিন দুই তরে করে সংসারেতে মেলা॥
খাবার লাগিয়া ছল করে পরিবার।
ভাব দেখি ভাই তুমি কে হয় তোমার॥
গলে দিয়া প্রেম-ফাঁশি নারী জোরে টানে।
সেই টানে বোকা কর্ত্তা মরেন পরাণে॥
মুখেতে মধুর ভাষা, অন্তরেতে বিষ।
অর্থ না পাইলে হাতে করে খিস্‌মিশ্‌॥
যেতে নাহি দেয় কদাচন তত্ত্বপথে।
বন্ধনে ফেলিয়া ধ্বংস করে মনোরথে॥
রমণীর প্রেম হয় গরল সমান।
অমৃত বলিয়া তাহা মূর্খ করে পান॥
মৃত্যুকালে পুত্র কন্যা নিকটে আসিয়া।
বলে, 'বাবা মোর তরে গেলা কি করিয়া'॥
এই সব মনে করি সাধু বিপ্র ভাই।
ভক্তিসহ হরি বল এই ভিক্ষা চাই॥
আমাকে আঘাত কর তাতে দুঃখ নাই।
প্রাণ ভরি হরি বল এই ভিক্ষা চাই॥
ভক্তি-ভরে হরি বল নাম সঙ্গে যাবে।
তাহাতে অনন্তকাল নিত্য সুখ পাবে॥"

চারিদিকে যত লোক ছিল দাঁড়াইয়া।
প্রভুর কথায় সবে উঠিল মাতিয়া ॥
হরি বোল বলি সবে নাচিতে লাগিল।
পাষণ্ড বিপ্রের চিত্ত বিশুদ্ধ হইল ॥
বিপ্র মাতি হরিনামে প্রভুর কৃপায়।
প্রভুর চরণতলে পড়িলা ধরায় ॥ (গোঃ কঃ-৩৩ পৃঃ)

যিনি ক্ষণিক ভগবদ্‌বিরহেও চঞ্চল হইয়া উঠিতেন, যিনি এ বিচ্ছেদ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইলে একেবারে উন্মত্ত হইতেন, যিনি নীলাচলে কাশীমিশ্রের আবাসের নিভৃত কক্ষে দুইজন সংযমী ভক্ত লইয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধুর সম্বন্ধ উপলব্ধিকরিতেন, সেই মানবদেবতাকে নমস্কার। যিনি যৌবনে সকল বিলাসিতা পরিহারকরিয়াছিলেন, যিনি প্রিয়তম ভক্তের অনুরোধেও সুগন্ধি তৈল এবং উপাধান ব্যবহার করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, যিনি অনাবৃত ভূমিকে শয্যা বলিয়া গ্রহণ করিতেন, যিনি সামান্য ভিক্ষালব্ধ অন্নে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন, যিনি সন্ন্যাসধর্ম্মের অণুমাত্র ব্যতিক্রমের জন্য ভক্ত দামোদরের ও ছিদ্রান্বেষী রামচন্দ্রপুরীর তিরস্কার কৃতজ্ঞতা ও আনন্দের সহিত শিরোধার্য্য করিয়াছিলেন, সেই চৈতন্যদেবকে নমস্কার। যিনি প্রবল পরাক্রান্ত উৎকলাধিপতি প্রতাপরুদ্রের সবিনয় প্রার্থনা, রাজা বিষয়ী (প্রভূত ক্ষমতা ও ধনের অধিকারী) বলিয়া, অনেকবার প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন এবং যিনি রামানন্দ রায় ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য দ্বারা বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া প্রতাপরুদ্রের ঐকান্তিকী ভগবদ্‌ভক্তি দর্শনানন্তর তাঁহার সকাশে তাঁহাকে আসিতে অনুমতি দিয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গদেবকে নমস্কার। যিনি ধনসঞ্চয়কে ঘৃণা করিলেও গৃহিভক্তের অমিতব্যয় পছন্দ করিতেন না এবং সংসারীদিগকে আত্ম-

নির্ভর হইতে উপদেশ দিতেন, যিনি ন্যস্ত সম্পত্তির রক্ষক হইয়া ভক্ষক হইলে (যেমন রাজা প্রতাপরুদ্রের ধনাপহারক গোপীনাথ) সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইতেন এবং তাহার শাস্তি বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন এবং প্রিয়তম ভক্তের নিকট তাহার জন্য অনুরোধ করিতে বিরত হইতেন, সেই গৌরাঙ্গদেবকে নমস্কার। যিনি চিত্ত কলুষিত হওয়ার শঙ্কায় কোন ✓ স্ত্রীলোককে তাঁহার সন্নিকটে আসিতে দিতেন না, যিনি জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে স্ত্রীপুরুষের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিতেন, যিনি বারনারী হইলেও সত্যবাই, লক্ষ্মীবাই, ইন্দিরা এবং বারমুখী প্রভৃতি রমণীদিগকে তাঁহার হিতৈষী ভক্তমণ্ডলীর পরামর্শের বিরুদ্ধে ভগবৎপ্রেম বিতরণ করিয়া উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন, যিনি পন্থভীল, নরোজী প্রভৃতি রক্তপিপাসু দস্যুদিগকে রামস্বামীর ন্যায় ভক্তের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া হরিনামে মত্ত করিয়াছিলেন,[১] সেই গৌরাঙ্গ-দেবকে নমস্কার। যিনি সর্ব্ববিধ কপটতাকে ঘৃণা করিতেন, যিনি রঘুনাথ দাসের 'মর্কট-বৈরাগ্য' অর্থাৎ অন্তরে বিষয়াসক্তি ও বাহিরে বৈরাগ্য সন্দর্শন করিয়া 'বৈরাগ্যের সময় হয় নাই' বলিয়া তাঁহাকে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ দিয়াছিলেন, সেই অসাধারণ আন্তরিকতার অবতার চৈতন্যদেবকে নমস্কার।[২]

১। "প্রভু বলে ভয় নাহি কর রামস্বামী,
হরিনামে দস্যুগণে মাতাইব আমি।" (গো কঃ-৫৬)

২। "স্থির হঞা ঘরে যাহ, না হইও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল ॥
মর্কট-বৈরাগ্য না করিহ লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা ॥
অন্তর-নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন উদ্ধার ॥" (চৈঃ চঃ-মধ্য-১৬শ পঃ-৯৫)

যিনি আত্মসংযম-বিষয়ে কোনপ্রকার ক্রটী সন্দর্শনকরিলে প্রিয়তম ভক্ত হইলেও (যেমন ছোট হরিদাস ও কালা কৃষ্ণদাস) তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিতেন, সেই পূতচরিত্র চৈতন্যদেবকে নমস্কার। যিনি বারংবার 'স্বয়ং ভগবান্' বলিয়া ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা অভিহিত হইলে, কর্ণে হস্তপ্রদান করিতেন এবং তাঁহাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া তাঁহাকে 'অপরাধী' করিতেছেন এই কথা বলিতেন, সেই সত্যের মূর্ত্ত প্রতীক গৌরাঙ্গদেবকে নমস্কার। যিনি যবন-সেবার জন্য ঘৃণিত, কণ্ডুক্লিষ্ট, তৃণ হইতেও সুনীচ সনাতনের সাতিশয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে বারংবার আলিঙ্গন করিতেন, সেই দয়ার অবতার গৌরাঙ্গদেবকে নমস্কার। যিনি রাজা প্রতাপরুদ্রের কর্ম্মচারীর নিকট যবন হরিদাসের জন্য নীলাচলের পুষ্পোদ্যানে একটী নির্জ্জন ঘর ভিক্ষাকরিয়াছিলেন এবং যিনি এই কৃষ্ণভক্তি, ধৈর্য্য ও বিনয়ের অবতারকে প্রেমাবেশে প্রত্যহ গাঢ় আলিঙ্গন করিতেন এবং যিনি ইঁহার মৃত্যু হইলে, ইঁহার দেহ লইয়া উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিয়াছিলেন এবং সমুদ্রতীরে এই পবিত্র দেহ সমাহিত করণানন্তর ভিক্ষা করিয়া ইঁহার আত্মার মঙ্গলের জন্য মহোৎসব করিয়াছিলেন, সেই দীনতারণ ভক্তবৎসল চৈতন্যদেবকে নমস্কার।

"হরিদাস কহে না ছুঁইহ মোরে।
মুই নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে॥
প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপোদান॥

নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজ ন্যাসী[১] হৈতে তুমি পরম পাবন॥
চৈঃ-চঃ-মধ্য-২১১শ-৯৭।

ইঁহাকে হরিদাস ঠাকুরও বলিত। ইনি প্রত্যহ তিন লক্ষ কৃষ্ণনাম করিতেন। চৈতন্যদেব প্রত্যহ মহাপ্রসাদ ইঁহার নীলাচলস্থিত কুটীরে লইয়া যাইতেন (চৈঃ-চঃ-আদি-১০ম-৩৬-৩৯)। হরিদাসঠাকুর (খৃঃ ১৪৪৯-১৫২৫) বড় হরিদাস ও ছোট হরিদাস হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি; ইঁহারা উভয়েই চৈতন্যদেবের কীর্ত্তনীয়া ছিলেন (ঐ-১১২)। রামচন্দ্র খাঁ প্রভৃতি দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তি ইঁহার (হরিদাস ঠাকুরের) উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছিল, কিন্তু ইনি বৈষ্ণবধর্ম্ম হইতে বিচলিত হন্ নাই (চৈঃ চঃ-অন্ত্য-৪র্থ পঃ)। বৃন্দাবনদাস হরিদাসঠাকুরের বিবরণ তাঁহার চৈতন্যভাগবতে (আদি-১৪শ) লিখিয়াছেন। হরিদাসের জন্মস্থান যশোহর জেলায় বনগ্রামের সন্নিকটে বুঢ়ন গ্রাম। তিনি এই গ্রাম ত্যাগকরিয়া শান্তিপুরের নিকটস্থ ফুলিয়াগ্রামে থাকিয়া অদ্বৈতাচার্য্য সহিত কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনকরিতেন। এক মুসলমান কাজী হরিদাসের মুসলমান ধর্ম্ম ত্যাগকরিয়া বৈষ্ণব হওয়ার জন্য তাঁহাকে অনেক উৎপীড়নকরিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে বৈষ্ণবধর্ম্ম ত্যাগ করাইতে সক্ষম হয় নাই।

যিনি ভুঁইমালীর[২] উচ্ছিষ্টভোজী অকপট ভক্ত কালিদাসের ভূয়সী

১। সন্ন্যাসী।

২। ভুঁইমালী—(ভূসুন্দর) পূর্ব্ব বঙ্গবাসী কৃষিজীবী নিকৃষ্ট জাতিবিশেষ। পাল্কী-বহন ও দাসবৃত্তি ইহাদের উপজীবিকা।......তাহাদের মধ্যে বড় ভাগিয়া ও ছোটভাগিয়া নামে দুইটা স্বতন্ত্র থাক আছে। উহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি সামাজিক আচার ব্যবহার প্রচলিত নাই। প্রথমোক্ত ভুঁইমালিগণ কৃষি, গীত, বাদ্য ও পাল্কীবহন প্রভৃতি কার্য্য করে, কিন্তু শেষোক্ত শ্রেণীর ভুঁইমালিগণ ময়লাফেলার কার্য্য করে।— বিশ্বকোষ।

প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং যিনি এই প্রসঙ্গে, ভূঁইমালী যদি প্রকৃত কৃষ্ণভক্ত হন্, তিনি সম্মানার্হ—ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, সেই নীচজাতি-বৎসল পূতচরিত্র গৌরাঙ্গদেবকে নমস্কার। কালিদাস রঘুনাথ দাসের জ্ঞাতি-খুড়া ছিলেন। "রঘুনাথ দাসের তেঁহো হয় জ্ঞাতি খুড়া"—(চৈঃ চঃ-অন্ত্য-১৬শ পঃ)। চৈতন্যদেবের সময়ে তিন 'রঘুনাথ' ছিলেন—রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ বৈদ্য, ও রঘুনাথ দাস (চৈঃ চঃ-আদি-১ম পঃ)[১]। ঝড়ু ভূঁইমালী (চৈঃ চঃ-অন্ত্য-১৬শ পঃ) কালিদাসকে বলিলেন "আমি নীচ জাতি তুমি অতিথি সর্ব্বোত্তম;" পুনরায়—"আমি অতি নীচ জাতি তুমি সজ্জন রায়।" রঘুনাথের যে জাতি কালিদাসেরও সেই জাতি। সপ্তগ্রাম মুলুকের ম্লেচ্ছ চৌধুরীর (অধিকারী) নিকট হইতে হিরণ্যদাস (রঘুনাথ দাসের জ্যেষ্ঠতাত; রঘুনাথ গোবর্দ্ধনের পুত্র—চৈঃ চঃ-মধ্য-১৬শ পঃ-৯০) বারলক্ষ টাকায় সপ্তগ্রাম মোকতা (lease) লইয়াছিলেন। সপ্তগ্রামের আয় কুড়িলক্ষ টাকা ছিল, কিন্তু হিরণ্যদাস বারলক্ষের অধিক চৌধুরীকে বাৎসরিক খাজনা দিতে অস্বীকৃত হওয়াতে এবং চৌধুরীর উৎপীড়নের ভয়ে হিরণ্যদাসের সপ্তগ্রাম হইতে পলায়নের পর, তিনি রঘুনাথকে বান্ধিয়া নিজগৃহে আনয়নপূর্ব্বক শাস্তি দিতে উদ্যত হইলে, দাস-পরিবারের কায়স্থ-বুদ্ধি আছে বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল এবং তিনি রঘুনাথকে শাস্তি দিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন—যথা চৈতন্য-চরিতামৃতে-(অন্ত্য-৬ষ্ঠ পঃ)—

"প্রতিদিন রঘুনাথে করয়ে ভর্ৎসনা,
'বাপ, জ্যেঠা আন, নহে পাইবে যাতনা';

১। বোধ হয় আর একজন অদ্বৈতশাখার 'রঘুনাথ' ছিলেন (চৈঃ চঃ-আদি-১২শ-৬৮)।

মারিতে আনায়, যদি দেখে রঘুনাথে,
মন ফিরি যায় তবে না পারে মারিতে ;
বিশেষে কায়স্থ-বুদ্ধ্যে অন্তরে করে ডর,
মুখে তর্জ্জে গর্জ্জে, মারিতে সভয় অন্তর ॥"

কালিদাস ঝড়ু ভূঁইমালীকে আম্রফল ভেট দিয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার পত্নীকে নমস্কারকরিলেন এবং ঝড়ুর পদরজঃ তাঁহার মস্তকের উপর দিতে ঝড়ুকে অনুরোধ করিলেন। ঝড়ু ইহা করিতে অসম্মত হইলে কালিদাস হরিভক্তিবিলাস এবং শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে প্রমাণ করিলেন যে যাহার কৃষ্ণে মতি নাই, তাহারই জাতি নীচ। তাহার পর কালিদাস ঝড়ুঠাকুরের উচ্ছিষ্ট আম্রের আঁঠি আস্বাদনকরিয়া নীলাচলে আসিলেন। চৈতন্যদেবও তাঁহার প্রতি "বহু" কৃপা করিলেন (চৈঃ চঃ-অন্ত্য-১৬শ পঃ)।

যিনি বৈরাগ্যব্রত অবলম্বন-পুর্ব্বক মানবকে ভগবানের প্রতি নির্ম্মল ও নিঃস্বার্থ প্রেম ও ভক্তি শিক্ষা দিয়া মানবের মোক্ষপথ সুগম করিয়াছিলেন সেই চৈতন্যদেবকে নমস্কার। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে (অন্ত্য-২০শ পঃ), শ্রীরাধা বলিতেছেন—

"যে গোপী করে গো মোর দ্বেষে,
কৃষ্ণের করে সন্তোষে,
কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ।
মুই তার ঘরে যায়া,
তারে সেবি দাসী হৈয়া ;
তবে মোর সুখের উল্লাস ॥"৮

অর্থাৎ প্রকৃতভক্ত নিজের সুখলিপ্সা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগকরিয়া বিশুদ্ধ প্রেম ও ভক্তির সহিত ঈশ্বরের উপাসনা করিবেন। গৌরাঙ্গদেব

নিজে তাঁহার আরাধ্যদেবতাকে এইরূপে পূজা করিতেন এবং সেই নিমিত্তই তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করিতেন যে সংসারে থাকিলে ধন, যশঃ, প্রভৃতি বিবিধ পার্থিব কাম্য বস্তু নিজের তৃপ্তি ও সুখের নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট মানবের প্রার্থনা করিতে হইবে এবং বিশুদ্ধ প্রেম ও ভক্তি-অভাবে মানবহৃদয় ভগবানের চরণপ্রান্তে উপনীত হইতে পারিবে না—

ধন, জন নাহি মাগি, কবিতা, সুন্দরী,
শুদ্ধভক্তি কৃষ্ণ! মোরে দেহ কৃপা করি'—

(চৈঃ চঃ-অন্ত্য-২০শ-১৬)

প্রকৃতভক্ত নিজের সুখেচ্ছা সম্যক্ পরিত্যাগপূর্ব্বক কি করিয়া ভগবানের সন্তোষ হয়, কেবল তাহাতেই সচেষ্ট হইবেন। এইরূপে শেষ দ্বাদশ বৎসর (খৃঃ ১৫২১-৩৩) চৈতন্যদেব নীলাচলের গম্ভীরাতে স্বরূপদামোদর ও রামানন্দরায়ের সহিত ভগবৎপ্রেম উপলব্ধিকরিয়াছিলেন।

'দ্বাদশ বৎসর ঐছে দশা রাত্রিদিনে।
কৃষ্ণরস আস্বাদয়ে দুই বন্ধু সনে॥'

(চৈঃ চঃ-অন্ত্য-২০শ-২৮)

যেমন শিবানন্দ, জগদানন্দ, বাসুদেব, কবিকর্ণপূর, শ্রীকান্ত এবং শ্রীনাথ গৌরাঙ্গদেবের ভক্তগণের মধ্যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সেইরূপ গৌরাঙ্গদেব সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের ভক্তগণের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবকে কেন আমরা ঈশ্বর বলিতে কুণ্ঠিত হই, তাহার কারণ এই যে তিনি নিজেকে কখনও ঈশ্বর বলিয়া পরিচয় দেন নাই এবং কেহ ঈশ্বর বলিলেই তিনি সঙ্কুচিত ও ক্রুদ্ধ হইতেন। আমাদিগের মত ক্ষুদ্র মানব ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের অকৃত্রিম

ভক্তের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখিতে সক্ষম হয় না, কারণ ভগবানের অকপট ভক্তের এবং আমাদিগের মধ্যে ব্যবধান অপরিমেয়। আমরা এ বিষয়ে চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য, গোবিন্দ-দাসের করচা এবং চৈতন্যচরিতামৃত হইতে কতকগুলি ছত্র উদ্ধৃত করিব—যথা (১) চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে (৬ষ্ঠ, ৭৪; চৈঃ চঃ মঃ-১২শ পঃ-৮৮; চৈঃ চঃ মধ্য-৬ষ্ঠ-১৭৮)—

"বৈরাগ্য-বিদ্যা—নিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥৮৬॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥৮৭॥"

(এক পুরাতন পুরুষ সেই ভগবান্, বৈরাগ্য, বিদ্যা ও নিজভক্তি-যোগ শিক্ষা দিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামক শরীর ধারণ করিয়াছেন, সেই পরম কারুণিক পরমেশ্বরের আমি শরণাগত হইলাম ॥৮৬॥

এবং যিনি কালপ্রভাবে বিলুপ্ত এই ভক্তিযোগকে প্রকাশ করিতে কৃষ্ণচৈতন্য নামে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার চরণকমলে আমার চিত্তভ্রমর প্রগাঢ়ভাবে বিলীন হউক ॥৮৭॥)-রাঃ বিঃ কৃত অনুবাদ।

সার্ব্বভৌম এই দুইটী শ্লোক চৈতন্যদেবকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। মুকুন্দদত্ত শ্লোক দুইটী দেখিয়াছিলেন এবং ভিত্তিতে লিখিয়া রাখিয়া চৈতন্যদেবের হস্তে সার্ব্বভৌমের পত্র দিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে জগদানন্দ পত্র দিয়াছিলেন; কিন্তু কবিকর্ণপূরের মতে মুকুন্দ

দিয়াছিলেন। উভয়েই বলেন চৈতন্যদেব পত্রখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন।

(২) বৃন্দাবনের বৈষ্ণবেরা চৈতন্যদেবকে কৃষ্ণাবতার বলিলেন—(চৈঃ চঃ মধ্য-১৮শ-৩৭-৩৮ এবং ৪০)—

"লোক কহে, 'সন্ন্যাসী তুমি জঙ্গম নারায়ণ,
বৃন্দাবনে হৈলা তুমি কৃষ্ণ অবতার।
তোমা দেখি সব লোক হৈল নিস্তার' ॥৩৭॥
প্রভু কহে, বিষ্ণু! বিষ্ণু! ইহা না কহিয়।
জীবাধমে বিষ্ণু-জ্ঞান কভু না করিহ॥
সন্ন্যাসী চিৎকণ জীব কিরণকণসম।
ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম॥
জীব ঈশ্বরতত্ত্ব কভু নহে সম।
জ্বলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥৩৮॥

(৩) চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্যভ্রমণ হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমনের পরে যখন কাশীমিশ্র ও মহাপাত্র এবং জগন্নাথদেবের গোপালকগণ চৈতন্যদেবকে প্রণাম করিলেন তখন তিনি বলিলেন (চৈঃ চঃ নাঃ-৮ম-৪ ; রাঃ বিঃ কৃত অনুবাদ)—

'আহা! একি! আপনারা ভগবৎপার্ষদ, অতএব আমার আরাধনীয়, তবে কেন এরূপ অযোগ্য কার্য্য করিলেন? (এই বলিয়া সকলকে প্রণামপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিলেন)।

(৪) কাশীর প্রকাশানন্দ সরস্বতী চৈতন্যদেবকে 'ভগবান্' বলিলে, তিনি বলিয়াছিলেন—(চৈঃ চঃ-মধ্য-২৫শ-৪১)—

প্রভু কহে, বিষ্ণু! বিষ্ণু! আমি ক্ষুদ্র জীব হীন।
জীবে বিষ্ণু মানি এই অপরাধ চিহ্ন॥

জীবে বিষ্ণুবুদ্ধি করে যেই, ব্রহ্মরুদ্রসম।
নারায়ণে মানে, তার পাষণ্ড গণন ॥

(অর্থাৎ—প্রভু বলিলেন, বিষ্ণু! বিষ্ণু! আমি ক্ষুদ্র হীন জীব। জীব এবং বিষ্ণু অভিন্নভাবা অপরাধের কার্য্য। আর যে ব্যক্তি জীবে বিষ্ণুবুদ্ধি করে এবং নারায়ণকে ব্রহ্ম ও রুদ্রের সমান বলিয়া মানে, তাহাকে পাষণ্ড বলিয়া গণনা করা উচিত। নারায়ণকে···উচিত-এ অংশ চৈতন্যদেব বলিয়াছেন কিনা সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে।)

(৫) চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে (৮ম-৭)—

"সার্ব্বভৌম। ভগবন্, জগন্নাথস্য ভবতশ্চ কৃষ্ণচৈতন্যত্বমবিশিষ্টমেব তথাপ্যস্তি কশ্চিদ্ভেদঃ, অসৌ দারুব্রহ্ম, ভবান্ নরব্রহ্ম ॥ ভগবান্। কর্ণৌ পিধায় ॥

অত্যুক্তিরেষা তব, সার্ব্বভৌম!
তনোতি কামং শ্রবসোঃ কটুত্বং।"

(রাঃ বিঃ অনুবাদ—"সার্ব্বভৌম। ভগবন্! জগন্নাথ ও আপনি উভয়েই যদিচ কৃষ্ণচৈতন্য, তথাপি কিঞ্চিৎ ভেদ আছে, কারণ ইনি দারুব্রহ্ম, আপনি নরবহ্ম।

ভগবান্। (কর্ণে হস্ত দিয়া) হে সার্ব্বভৌম! তোমার এই অত্যুক্তি, অত্যন্ত শ্রবণ-কটু হইয়াছে")।

(৬) গোবিন্দদাসের করচা (৩১ পৃঃ)—চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্যে গিরীশ্বর-নামক শিবলিঙ্গের নিকট এক সন্ন্যাসীর সমক্ষে হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন—

"চেতনা পাইয়া তবে মোর প্রভুবর।
উঠিয়া বসিল অঙ্গ ধূলায় ধূসর ॥

ছটফটি করিতে লাগিল ন্যাসিবর[১]।
প্রভুরে নেহারি বলে তুমি সে ঈশ্বর ॥
সন্ন্যাসীর বাক্যে প্রভু কর্ণে দিয়া হাত।
বার বার বলে, 'ন্যাসী[২] ! ছাড় ইহ বাত' ॥"

(৭) পুনরায় ঐ করচায় ৩৭ পৃষ্ঠাতে—দাক্ষিণাত্যে 'পদ্মকোট'-তীর্থের অষ্টভুজা ভগবতীদেবীর সম্মুখে চৈতন্যদেব উপনীত হইলে, একজন অন্ধ ভক্ত তাঁহাকে বলিলেন—

"অন্ধ বলে, 'কেন ছল, করুণা-নিধান !
অন্ধ বলি দয়া কর তুমি ভগবান্ ॥
* * *
পর্ব্বত উপাড় পিপীড়ার পদ দিয়া।
পঙ্গু লঙ্ঘে হিমালয় তোমারে স্মরিয়া ॥
অগস্ত্য শোষিলা সিন্ধু তোমার কৃপায়।
বিষপানে প্রহ্লাদের মৃত্যু নাহি হয়' ॥
* * *
অন্ধের শুনিয়া বাণী চৈতন্য গোঁসাই।
বলে, 'অপরাধী মোরে কেন কর ভাই ॥
সকল হৃদয়ে হরি করেন বসতি।
জিজ্ঞাসিয়া দেখহ বলিবে ভগবতী ॥
উচ্চারিলে যে কথা শুনিতে তাহা নাই।
মিছে কেন অপরাধী কর মোরে ভাই ॥

১। সন্ন্যাসিশ্রেষ্ঠ।
২। সন্ন্যাসী।

সামান্য মনুষ্য আমি অধম পামর।
ভ্রান্তি-কূপে পড়িয়াছে তোমার অন্তর' ॥"

(৮) ঐ করচায় ৩৮ পৃষ্ঠায়—দাক্ষিণাত্যে পদ্মকোট হইতে চৈতন্যদেব ত্রিপাত্রনগরে গমন করিয়া চণ্ডেশ্বর-শিব-দর্শনানন্তর সন্নিহিত বিল্ববৃক্ষতলে শৈব-দলপতি সুপণ্ডিত ভর্গদেবকে দেখিতে পাইলেন। ভর্গদেব তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিলেন—

"ঈশ্বরের অবতার হয় এই জন।
প্রণাম করহ সবে ধরিয়া চরণ ॥
এই কথা বলি ভর্গ প্রণাম করিল।
দশনে রসনা কাটি প্রভু পিছাইল ॥
প্রভু বলে, 'ছি ছি ভর্গ! কি বলিলে তুমি?
নদীয়া নগরে হয় মোর জন্মভূমি ॥
সামান্য মানুষ আমি এই ত নিশ্চয়।
অবতার বলি কেন কর মিছে ভয় ॥
ঈশ্বরের অবতার বলি বারে বারে।
অপরাধী কর কেন তোমরা আমারে?
তীর্থ করিবারে আসিয়াছি তব ঠাঁই।
হরি বলি বাহু তুলে নাচ সবে ভাই ॥
অবতার বলি কেন কর গণ্ডগোল?
এস সবে মিলে বলি হরি হরি বোল ॥
ঈশ্বরের অবতার না বলিও কভু।
সাক্ষাৎ শঙ্কর তুমি জগতের প্রভু' ॥"

চৈতন্যদেবের এরূপ আন্তরিকতাপূর্ণ বাক্যেও ভর্গদেবের বিশ্বাস হইল না। তিনি গৌরাঙ্গদেবকে পুনরায় বলিলেন—

"যে তোমারে না চিনেছে তার কাছে গিয়া।
রাখহ কৌশলে নিজ রূপ লুকাইয়া ॥

*　　*　　*

কৃপা করি দেখা যদি দিলে অধমেরে।
চরণ তুলিয়া দেহ মাথার উপরে ॥
বৃদ্ধের বচন শুনি শচীর কুমার।
বলে, 'কেন অপরাধী কর বার বার ॥
এথায় আসিনু সাধুদরশন লাগি।
আছুক পুণ্যের কথা কলুষের ভাগী' ॥"

(৯) চৈতন্যদেব কখন কখনও নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের দাস বলিয়া গণ্য করিতেন; যথা চৈতন্যচরিতামৃতে (অন্ত্য-২০শ পরিচ্ছেদে)—

"ধন, জন নাহি মাগো[১] কবিতা, সুন্দরী।
শুদ্ধভক্তি, কৃষ্ণ! মোরে দেহ কৃপা করি ॥
অতি দৈন্যে পুন মাগে দাস্যভক্তি-দান।
আপনাকে করি সংসারি-জীব-অভিমান ॥

*　　*　　*

তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছো[২] ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হইয়া ॥
কৃপা করি কর মোরে পদধূলি-সম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন ॥
পুনঃ অতি উৎকণ্ঠা দৈন্য হইল উদ্গম।
কৃষ্ণঠাঞি মাগে প্রেম নামসঙ্কীর্ত্তন ॥" ১৮

(১০) পুনরায় চৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য-প্রথম পরিচ্ছেদ)—

১। মাগি; প্রার্থনা করি। ২। পড়িয়াছি।

"একদিন শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
মহাপ্রভুর গুণগাঞা করেন কীর্ত্তন ॥
শুনি ভক্তগণে প্রভু কহে ক্রোধমনে,
'কৃষ্ণনাম-গুণ ছাড়ি কি কর কীর্ত্তনে ?
ঔদ্ধত্য করিতে জানি হৈল সভার মন।
স্বতন্ত্র হইয়া সবে নাশালে ভুবন ॥"

* * *

ইহা হইতে অনুমিত হইবে যে যখন শ্রীবাসাদিভক্তগণ চৈতন্যদেবকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন; তাঁহাদিগের স্তুতিকরণকে ঔদ্ধত্য বলিলেন, এবং আরও বলিলেন যে তাঁহারা 'স্বতন্ত্র' অর্থাৎ স্বাধীন হইয়া দেশকে নাশকরিতেছেন। চৈতন্যদেবের তিরস্কারের উত্তরে যখন শ্রীবাস তাঁহার ঈশ্বরত্ব-গোপনের কারণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গৌরাঙ্গদেব পুনরায় শ্রীবাসকে বলিলেন—

"প্রভু কহেন, 'শ্রীবাস! ছাড় বিড়ম্বনা।
সেই সব কর যাতে আমার যাতনা'[১] ॥"

চৈতন্যদেবের এরূপ সত্য ও আন্তরিকতাপূর্ণ উক্তি যদি আমরা সন্দেহ করি, তাহা হইলে প্রকারান্তরে আমাদিগের তাঁহাতে মিথ্যা-প্রিয়তা, অন্ততঃ কপটতা আরোপ করিতে হয়। ✓

(১) চৈতন্যচরিত মহাকাব্যে (১১শ সর্গ-৫৬) কবিকর্ণপূর গৌরাঙ্গদেবের কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাসগ্রহণের কথা-বর্ণনাব্যপদেশে তাঁহাতে ছলনা আরোপ করিয়াছেন—

১। চৈতন্যভাগবত-অন্ত্য-৯ম অধ্যায়েও চৈতন্যদেবের তাঁহার নিজের নাম-সঙ্কীর্ত্তনের জন্য বিরক্তির বর্ণনা আছে।

"গুরুর্ভূত্বা ব্যাজাৎ স্বয়মিব পুরা শিষ্যবিধিনা
ততো মন্ত্রং লেভে জগতি করুণামেব বিকিরন্।
ততো রোমাঞ্চাঢ্যং দ্বিগমিষুমবেক্ষ্য প্রভুমসৌ।
গৃহাণেত্যুক্ত্বায়ারুণবসনদণ্ডাদিকমদাৎ ॥৫৬॥"

(গৌরাঙ্গদেব ত্রিভুবনের গুরু হইয়াও **ছলপূর্ব্বক** নিজেই শিষ্য হইয়া জগন্মণ্ডলে কারুণ্য বিস্তারকরতঃ কেশবভারতীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপরে কেশবভারতী রোমাঞ্চিতাঙ্গ গৌরাঙ্গদেবকে গমনেচ্ছু দেখিয়া, 'গ্রহণ কর', এই বাক্য উচ্চারণকরতঃ শীঘ্র অরুণবর্ণ বস্ত্র এবং দণ্ড প্রভৃতি অর্পণ করিলেন—রাঃ-বিঃ-কৃত অনুবাদ)।

(২) চৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা (কৃষ্ণদাস কবিরাজ) হইতে অমিয়নিমাইচরিত গ্রন্থপ্রণেতা পর্য্যন্ত চৈতন্যদেবকে ঈশ্বর প্রমাণ-করিবার জন্য তাঁহাকে কি করিয়াছেন, তাহার একটী দৃষ্টান্ত নিম্নে দিলাম—(অমিয়-নিমাইচরিত—৩য় খণ্ড ৫ম অধ্যায়-পৃঃ—২৩৭)—"শ্রীবিশ্বরূপ (চৈতন্যদেবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা যিনি সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন) নিত্যানন্দের দেহে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেন, এমন কি, শচীর কখন কখন ভ্রম হইত যেন নিত্যানন্দ তাঁহার সেই হারাণ পুত্র বিশ্বরূপ। সেই নিত্যানন্দের নিকট শ্রীগৌরাঙ্গ বলিতেছেন যে, তিনি অনুমতি পাইলে তাঁহার দাদা বিশ্বরূপের অনুসন্ধানে যাইবেন।

এখন বিশ্বরূপ যে জগতে নাই, তাহা কি শ্রীগৌরাঙ্গ জানিতেন না? তাঁহাকে যাই ভাব, এ কথা তাঁহার না জানিবার কোন কারণ ছিল না, কারণ শচীব্যতীত পৃথিবী-সমেত এ কথা জানিতেন যে বিশ্বরূপ অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে পাণ্ডুপুরে দেহত্যাগ করিয়াছেন। অতএব প্রভুও জানিতেন। তবে তিনি কিরূপে বলিলেন যে বিশ্বরূপের

অনুসন্ধানে গমন করিবেন? শ্রীচরিতামৃত (মধ্য-৭ম-১০) এ কথার এই উত্তর দিতেছেন, যথা—

বিশ্বরূপ-অদর্শন জানেন সকল।
দাক্ষিণাত্য উদ্ধারিতে পাতেন এই ছল॥

অর্থাৎ জীব-উদ্ধার, ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচার, প্রভুর একটী প্রধান কার্য্য। কিন্তু তাহা তিনি সহজ অবস্থায় মুখে বলিতেন না, এমন কি বলিতেও কুণ্ঠিত হইতেন, কারণ সে অবস্থায় তিনি দীন হইতে দীন। দক্ষিণদেশে ভক্তিধর্ম্ম প্রচারকরা তাঁহার কর্ত্তব্য, ইহা সাব্যস্ত করিয়াছেন। সুতরাং দক্ষিণদেশে গমন করিবেন, ইহা তাঁহার স্থির সঙ্কল্প। তাই অনুমতি চাহিতেছেন। এ কথা বলিতে পারিতেন যে, 'শ্রীপাদ আমাকে অনুমতি কর, আমি দক্ষিণদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতে যাইব।' কিন্তু প্রভু দৈন্যের অবতার। সহজ অবস্থায় যিনি ভক্তগণের প্রত্যেকের হস্ত ধরিয়া ক্রন্দন করিয়া দিবানিশি বলিতেছেন, "তোমরা ভক্ত, আমাকে কৃপা করিয়া বল, আমার কিরূপে শ্রীকৃষ্ণে মতি হয়," তিনি কি মুখাগ্রে এই দম্ভের কথা আনিতে পারেন যে, "আমি দেশ উদ্ধার করিতে যাইব?" অথচ দক্ষিণদেশ উদ্ধার করিতে যাইতে হইবে। কিন্তু কি বলিয়া যাইবেন। তাহাই বিশ্বরূপের অনুসন্ধানে গমন করিবেন, এই **ছল** পাতিলেন।" ইঁহাদের মতে চৈতন্যদেব ঈশ্বর, সেইজন্য সর্ব্বজ্ঞ। যখন তিনি বলিলেন যে তিনি বিশ্বরূপকে দাক্ষিণাত্যে অনুসন্ধানকরিতে যাইতেছেন, তখন তিনি জানেন যে বিশ্বরূপ দেহত্যাগ করিয়াছেন। তত্রাচ যদিও তিনি বস্তুতঃ দাক্ষিণাত্যে ভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারের নিমিত্ত যাইতেছেন, তিনি বিশ্বরূপ-অনুসন্ধানে যাইতেছেন এই কথা বলিয়া **ছলনা** করিলেন।

আমরা বলি যে চৈতন্যদেব নিজেতে কখনও ঈশ্বরত্ব আরোপ করেন

নাই। দ্বিতীয়তঃ তিনি সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন না। তৃতীয়তঃ তিনি ভ্রাতৃস্নেহবশতঃ জ্যেষ্ঠভ্রাতার অনুসন্ধানে এবং সেই সঙ্গে ভক্তি-ধর্ম্মপ্রচারের জন্য দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের আদর্শ পূত-চরিত্রে মিথ্যাবাদিতা ও ছলনার স্থান ছিল না। অমিয়-নিমাই-চরিত-প্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত হইতে কেবল দুইছত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য গমনের পূর্ব্বে নীলাচলের ভক্তমণ্ডলীকে বলিতেছেন (চৈঃ চঃ-মধ্য-৭ম-৮-১০)—

"এবে সভা স্থানে মুঞি মাগো এই দানে।
সভে মেলি আজ্ঞা দেহ যাইব দক্ষিণে॥
বিশ্বরূপ উদ্দেশ্যে আমি অবশ্য যাইব।
একাকী যাইব কাহো সঙ্গে না লইব॥
সেতুবন্ধ হইতে আমি না আসি যাবৎ।
নীলাচলে তুমি সব রহিবে তাবৎ॥
বিশ্বরূপের সিদ্ধি-প্রাপ্তি জানেন সকল।
দক্ষিণদেশ উদ্ধারিতে করে এই **ছল**॥

পুনরায় চৈতন্যদেব সার্ব্বভৌমকে বলিতেছেন—

"সন্ন্যাস করি বিশ্বরূপ গিয়াছে দক্ষিণে।
অবশ্য করিব আমি তার অন্বেষণে॥
আজ্ঞা দেহ দক্ষিণে আমি অবশ্য চলিব।
তোমার আজ্ঞাতে শুভে লেউটি আসিব॥

(চৈঃ চঃ-মধ্য-৭ম-৩১)

পাঠকগণ বিচার করিবেন 'বিশ্বরূপ উদ্দেশে আমি **অবশ্য** যাইব,' '**অবশ্য** করিব আমি তার অন্বেষণে,' চৈতন্যদেবের এই আন্তরিকতাপূর্ণ বাক্যের ভিতর ছলনা (অর্থাৎ মিথ্যাবাদিতা) আছে

কিনা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় প্রভৃতির মতে চৈতন্যদেবে 'ছলনা' যদি থাকে তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু 'সর্ব্বজ্ঞতা' থাকা চাই। আমরা মনে করি যে দাক্ষিণাত্যভ্রমণ-দ্বারা তাঁহার প্রধান অভিপ্রায় 'বিশ্বরূপ-অনুসন্ধান' তিনি সিদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে ভক্তিধর্ম্মপ্রচার-কার্য্য সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং পরে শেষোক্ত কর্ম্মই তাঁহার প্রধান কার্য্য হইয়াছিল। কবিকর্ণ-পূরের চৈতন্যচরিতামৃত-কাব্যে বিশ্বরূপ-অনুসন্ধানের কথা নাই। লেখা আছে যে নীলাচলে আঠারদিন থাকিয়া এবং জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার আজ্ঞা লইয়া 'যযৌ প্রমোদাদ্দিশি দক্ষিণস্যাং' অর্থাৎ হর্ষভরে দক্ষিণদিকে যাত্রা করিলেন (১২শ-৯৪-৯৫)।

কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে (৭ম-২, অনুবাদ) লেখা আছে যে সার্ব্বভৌম প্রতাপরুদ্রকে বলিলেন যে চৈতন্যদেব কয়েকদিন হইল দক্ষিণদিকে গিয়াছেন। রাজা সার্ব্বভৌমকে কেন তিনি জগন্নাথদেবের সামীপ্য ছাড়িয়া গমন করিয়াছেন জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি উত্তর দিতে একটু ইতস্ততঃ করিলেন, কারণ চৈতন্যদেবকে ভগবান্ বলিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে ভগবানের তীর্থযাত্রাই বা কি করিয়া বলেন? সার্ব্বভৌমের উত্তর এই—তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ইতি সামান্যানামেব মহতাময়ং নিসর্গঃ। অয়ন্তু ভগবানেব স্বয়ং' অর্থাৎ সাধারণ মহদ্ব্যক্তিদের এই স্বভাব যে তাঁহারা তাঁহাদিগের অন্তরে ভগবান্‌কে স্থাপিত করিয়া তীর্থসকলকে পবিত্র করেন, কিন্তু ইনি ত স্বয়ং ভগবান্! (অতএব ইঁহার তীর্থযাত্রার কোন প্রয়োজন নাই)।

(৪) মাধবেন্দ্রপুরী কৃষ্ণ-উপাসক ছিলেন। পরমানন্দপুরী ও ঈশ্বরপুরী মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। চৈতন্যদেব ঈশ্বরপুরীর শিষ্য।

সেইজন্য তিনি পরমানন্দপুরীকে অতিশয় সম্মান করিতেন। নীলাচলে তিনি আসিলে, চৈতন্যদেব তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। অমনি কর্ণপূরের মনে সন্দেহের উদয় হইল—চৈতন্যদেব 'ঈশ্বর', তিনি কেন প্রণাম করিবেন? কর্ণপূর ইহার কৈফিয়ৎ (explanation) দিতেছেন—

অথ গৌরমহাপ্রভোঃ পদ-
দ্বয়পদ্মং যতিরাড়্ ব্যলোকয়ৎ
অনমৎ স্বয়মীশ্বরোঽপি তং
স্থবিরত্বেন কৃতাদরোদয়ঃ ॥

চৈঃ চঃ মঃ-১৩শ-১২৫।

অর্থাৎ যতিশ্রেষ্ঠ পরমানন্দপুরী চৈতন্যদেবের চরণকমলযুগল দর্শন করিলেন। চৈতন্যদেব নিজে ঈশ্বর হইলেও পরমানন্দপুরী বৃদ্ধ বলিয়া সমাদরপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

(৫) চৈতন্যদেবের ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করিতে যাইয়া কতপ্রকার কষ্ট কল্পনার আশ্রয়গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, তাহার আর একটী দৃষ্টান্ত নিম্নে দিতেছি। আমরা জানি যে হরি-সংকীর্ত্তন দ্বারা ও হরিনাম-জপ দ্বারা হরিভক্তি বা কৃষ্ণভক্তি-প্রচার গৌরাঙ্গদেবের একটী প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—যথা চৈতন্যচরিতামৃতে (৪র্থ পঃ)—

"চতুর্থ শ্লোকের অর্থ এই কৈল সার।
প্রেমনাম প্রচারিতে এই অবতার॥"

পুনরায় (অন্ত্য-২০শ পঃ)—

"হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রামরায়।
নাম-সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥

নাম-সংকীর্ত্তন হইতে সর্ব্বানর্থ-নাশ।
সর্ব্ব-শুভোদয় কৃষ্ণে পরম উল্লাস॥

* * *

উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান॥
এই মত হৈঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে তার প্রেম উপজয়॥
কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য বাড়িলা।
শুদ্ধভক্তি কৃষ্ণঠাঞি মাগিতে লাগিলা॥"

চৈতন্যদেবের দ্বিতীয় প্রধান উদ্দেশ্য যে 'মধুর' ভাবে কৃষ্ণের উপাসনা অপেক্ষা শ্রেয়সী উপাসনা আর নাই, ইহা প্রমাণ করা; যে বিশুদ্ধ ভক্তি ও প্রেমের সহিত শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহা অন্য সকল প্রকার উপাসনা হইতে শ্রেষ্ঠতর; ইহাতে অণুমাত্র কাম কিম্বা স্বার্থপরতা নাই; কিন্তু এরূপ উপাসনাতে ভক্তের কেবল চেষ্টা হইবে কি করিয়া তাঁহার প্রেমও ভক্তির বস্তুকে (ভগবান্‌কে) তিনি সুখী করিতে পারেন। ভক্তের এই আত্মোৎসর্গ চৈতন্যদেব রাধাভাবে এইরূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন—

"কিবা তেঁহো লম্পট, শঠ, ধৃষ্ট, সুকপট,
অন্যনারীগণ করি সাত।
মোরে দিতে মনঃ-পীড়া,
মোর আগে করে ক্রীড়া,
তবু তেঁহো মোর প্রাণনাথ॥
না গণি আপন দুঃখ,

সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য।"

(চৈঃ চঃ-অন্ত্য-২০শ পঃ)

ভগবানে এরূপ আত্মোৎসর্গ চৈতন্যদেবের ন্যায় আদর্শভক্তের পক্ষেই সম্ভব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ভক্তের এ প্রেমে স্বার্থপরতা কিম্বা কামের লেশমাত্র নাই, যথা চৈতন্যচরিতামৃতে (আদি-৪র্থ-পঃ)—

"গোপীগণের প্রেমরূঢ় মহাভাবনাম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মলপ্রেম কভু নহে কাম॥
* * *
কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ কাঞ্চন যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
* * *
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল॥
* * *
কৃষ্ণলাগি আর সর্ব্ব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥"

এই আদর্শ ঈশ্বরভক্তকে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন প্রমাণ করিবার জন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় বলিতেছেন যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য অসীম—যথা চৈতন্যচরিতামৃতে (আদি ৪র্থ পঃ)

"স্বমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার॥
অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহো নাঞি পায় সীমা॥

এই প্রেমদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি ॥

* * *

দর্পণাদ্যে যদি দেখি আপন মাধুরী।
আস্বাদিতে লোভ হয় আস্বাদিতে নারি ॥
বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকা স্বরূপ হইতে তবে মন ধায় ॥”

পুনরায় ঐ গ্রন্থে (আদি ৬ষ্ঠ পঃ ৮৯-৯০)—

“অন্যের কার্য্য আছুক আপনে শ্রীকৃষ্ণ।
আপন মাধুর্য্যপানে হইয়া সতৃষ্ণ ॥
স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে করেন যতন।
ভক্তভাব বিনু নহে তার আস্বাদন ॥
ভক্তভাব অঙ্গীকরি হৈলা অবতীর্ণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে সর্ব্বভাবে পূর্ণ ॥”

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন যে সেইজন্য নিজে শ্রীকৃষ্ণ হইলেও গৌরাঙ্গদেব নিজের সম্পূর্ণ মাধুর্য্য উপভোগকরিবার নিমিত্ত রাধাভাবে (ভক্তভাবে) শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন।

(৬) ইহা অপেক্ষাও অদ্ভুত কল্পনা গৌরগণোদ্দেশদীপিকা প্রভৃতিতে দৃষ্ট হয়, যথা গরুড় পণ্ডিত গরুড়ের অবতার, রামচন্দ্রপুরী জটিলা ও বিভীষণের মিলিত অবতার, মুরারি গুপ্ত হনূমানের অবতার, গোবিন্দানন্দ সুগ্রীবের অবতার ইত্যাদি। এইরূপ অবতারসৃষ্টিতে নানাপ্রকার অসঙ্গতির উদ্ভব হওয়া বিচিত্র নহে। কবিকর্ণপূর বলেন যে (১) রামানন্দ রায় অর্জ্জুন (রাখাল) ও অর্জ্জুন-পাণ্ডবের মিলিত অবতার। (২) কেহ কেহ বলেন রামানন্দ ললিতা-গোপীর অবতার।

(৩) আবার কেহ কেহ বলেন যে অর্জ্জুন (পাণ্ডব), অর্জ্জুনীয়া-নাম্নী কোনও গোপীর সহিত মিলিত হইয়া রামানন্দ নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (৪) আবার কেহ কেহ বলেন ললিতা, অর্জ্জুনীয়া এবং অর্জ্জুন-পাণ্ডব— এই তিনজনে মিলিয়া রামানন্দ রায় হইয়াছেন। আবার অর্জ্জুন (রাখাল) পরমেশ্বর দাসরূপেও অবতীর্ণ হইয়াছেন।

(৭) মুরারিগুপ্তের করচায় ও লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে এইরূপ কল্পনার আশ্রয় গ্রহণকরিয়া গ্রন্থকারগণ ত্রেতাযুগের বিভীষণের সহিত নীলাচলে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ বর্ণনাকরিয়াছেন। বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ চৈতন্যদেবের ঈশ্বরত্ব প্রমাণকরিবার নিমিত্ত তাঁহার বিভিন্ন মূর্ত্তিধারণ ও বিবৃত করিয়াছেন।

চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে (১ম অঙ্কে) শচীদেবীকর্ত্তৃক তাঁহার পুত্র চৈতন্যদেবের চরণযুগলধারণও বর্ণিত আছে (৮৫)! শচীদেবী ইহা কেন করিলেন? শ্রীবাস ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন (রাঃ বিঃ কৃত অনুবাদ), "পূর্ব্বে সঙ্কীর্ত্তন-সহকারে ইঁহার (চৈতন্যদেবের) সহিত আমরা সতত বিচরণ করিতাম। কিন্তু ইঁহার জননী শচীদেবী ইঁহাকে সামান্য পুত্র জ্ঞানকরিয়া 'আমার তনয়কে অন্যায় উপদেশ দিয়া ইহারা উন্মত্ত করিয়াছে এবং তাহার সাংসারিক প্রবৃত্তি একেবারে বিনষ্ট করিয়াছে,' ইহা বলিয়া আমাদিগকে বিবিধপ্রকার ভৎর্সনা করিয়াছেন" (৮২)। মাতার এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য শ্রীবাসাদি ভক্তগণ শচীদেবী-দ্বারা তাঁহার পুত্রের চরণগ্রহণ করাইয়াছিলেন।

কবিকর্ণপূর তাঁহার চৈতন্যচরিতমহাকাব্যে (৫ম-৮৮) শচী-দেবীকে চৈতন্যদেবের চরণযুগল ধারণ করাইয়া সন্তুষ্ট হন নাই; শচীদেবীর মস্তকের উপরে চৈতন্যদেবকে দিয়া পাদপদ্ম ন্যস্ত করাই-য়াছেন; কারণ ইহা না করিলে চৈতন্যদেবের ঈশ্বরত্ব সম্পূর্ণ হইতনা!—

ইত্যুক্তে সতি সহসা মহাশয়োঽস্যা
মূর্দ্ধ্নি শ্রীযুতপদপঙ্কজং সনাথঃ।
আধায় প্রথিতকৃপস্তথৈব তস্যৈ
কারুণ্যং পরিকিরন্নুবাচ হৃষ্টঃ॥

শ্রীবাস এই বাক্য বলিলে মহদন্তঃকরণ মহাপ্রভু শচীদেবীর মস্তকে শ্রীমৎপাদপদ্ম শীঘ্র অর্পণপূর্ব্বক কৃপাপ্রকাশকরতঃ তাঁহার প্রতি তদ্রূপ কারুণ্য বিস্তারকরিয়া হৃষ্টচিত্তে কহিলেন।

চৈতন্যদেব সন্ন্যাসগ্রহণানন্তর শান্তিপুরে অদ্বৈতালয়ে আসিবার পরে আচার্য্য তাঁহার বাটীতে শচীদেবীকে লইয়া আসিলেন (চৈঃ চঃ—মধ্য-৩য়—১৩৩-৪৪—

শচী লঞা আইলা আচার্য্য অদ্বৈতভবন॥
শচী আগে প্রভু দণ্ডবৎ হঞা।
কান্দিতে লাগিলা শচী কোলেতে করিঞা॥
দোঁহার দর্শনে দোঁহে হইলা বিহ্বল।
কেশ না দেখিয়া শচী হইলা বিকল॥
অঙ্গ মোছে মুখে চুম্বে করে নিরীক্ষণ।
দেখিতে না পায় অশ্রু ভরিল নয়ন॥
কান্দিয়া কহেন শচী, 'বাছারে নিমাই।
বিশ্বরূপ সম না করিহ নিঠুরাই॥
সন্ন্যাসী হইয়া পুন না দিল দর্শন।
তুমি তৈছে কৈলে মোর হইব মরণ'॥
প্রভু ত কান্দিয়া কহে, 'শুন মোর আই।
তোমার শরীর এই, মোর কিছু নাই॥

তোমার পালিত দেহ জন্ম তোমা হৈতে।
কোটী জন্মে তোমার ঋণ না পারি শোধিতে॥
জানি বা না জানি কৈল যগুপি সন্ন্যাস।
তথাপি তোমাকে কভু নহিব উদাস॥
তুমি যাঁহা কহ মুই তাঁহাই রহিমু।
তুমি যেই আজ্ঞা দেহ সেই ত করিমু'॥
এত বলি পুন পুন করে নমস্কার।
তুষ্ট হঞা আই কোলে করে বার বার॥
তবে আই লঞা আচার্য্য গেলা অভ্যন্তর।

উপরিলিখিত বিবরণ হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে এবং চৈতন্যচরিতমহাকাব্যে চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার মাতৃদেবীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার বর্ণিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার ন্যায় আদর্শ মাতৃভক্তের পক্ষে অসম্ভব। গৌরাঙ্গদেবের ভক্তগণের এইরূপ অদ্ভুত কল্পনা তাঁহার ভক্তিধর্ম্মপ্রচারে সাহায্য করিয়াছে কিম্বা বাধা দিয়াছে তাহা সুধীগণের বিবেচ্য।

চৈতন্যদেবের উচ্চ আদর্শ অনেকেই অনুকরণ করিতে পারিতেন না। এমন কি অদ্বৈতাচার্য্য দুইবার চৈতন্যদেবের নিকটে নিজের আচরণের জন্য সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন। একবার উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রের নিকট তাঁহার (অদ্বৈতাচার্য্যের) অনুচর কমলাকান্ত বিশ্বাস (ওরফে বাউলিয়া বিশ্বাস) এক পত্র পাঠাইয়াছিলেন এবং তাহাতে লিখিয়াছিলেন—অদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বর, দৈবাৎ তাঁহার ঋণ হইয়াছে এবং এই ঋণ শোধ দিবার জন্য তিনশত টাকা প্রয়োজন হইয়াছে। চৈতন্যদেবের হস্তে এই পত্র দৈবক্রমে পৌছিলে তিনি বিরক্ত হইয়া তাঁহার ভৃত্য গোবিন্দকে

বলিয়াছিলেন যে কমলাকান্ত যেন তাঁহার আবাসে আর না আসে (চৈঃ চঃ—আদি-১২শ পঃ—২৫-৪২)। আচার্য্য বলিয়াছিলেন যে তিনি এ বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন। সমস্ত ছত্রগুলি উদ্ধৃত করিলাম—

"কমলাকান্ত নাম হয় আচার্য্য কিঙ্কর।
আচার্য্যের ব্যবহার তাঁহার গোচর ॥২৫॥
নীলাচলে তিঁহো এক পত্রিকা লিখিয়া।
প্রতাপরুদ্রের পাশ দিলা পাঠাইয়া ॥২৬॥
সেই ত পত্রীর কথা আচার্য্য না জানে।
কোন পাকে সেই পত্রী আইলা প্রভুর স্থানে ॥২৭॥
সেই পত্রীতে লিখিয়াছেন এইত লিখন।
ঈশ্বরত্বে আচার্য্যের করিয়া স্থাপন ॥
কিন্তু তার দৈবে কিছু হইয়াছে ঋণ।
ঋণ শোধিবারে চাহি টাকা শত তিন ॥২৮॥
পত্র পড়ি প্রভুর মনে হৈল কিছু দুঃখ।
বাহিরে হাঁসিয়া কিছু কহে চন্দ্রমুখ ॥২৯॥
আচার্য্যে স্থাপিয়াছেন করিয়া ঈশ্বর।
ইথে দোষ নাঞি আচার্য্য দৈবত ঈশ্বর ॥
ঈশ্বরের দৈন্যকরি করিয়াছেন ভিক্ষা।
অতএব দণ্ড করি করাইব শিক্ষা ॥৩০॥
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল ঞিহা আজি হৈতে।
বাউলিয়া বিশ্বাসেরে না দিবে আসিতে ॥
দণ্ড শুনি বিশ্বাস হৈলা পরম দুঃখিত।
শুনিঞা প্রভুর দণ্ড আচার্য্য হর্ষিত ॥

বিশ্বাসেরে কহে, 'তুমি বড় ভাগ্যবান্।
তোমারে করিল দণ্ড প্রভু ভগবান্ ॥৩২॥
পূর্ব্বে মহাপ্রভু মোরে করেন সম্মান।
দুঃখ পাঞা মনে আমি কৈল অনুমান ॥
মুক্তি শ্রেষ্ঠ করি কৈল বাশিষ্ট ব্যাখ্যান।
ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু মোরে কৈল অপমান ॥৩৩॥
দণ্ড পাঞা হৈল মোর পরম আনন্দ।
যে দণ্ড পাইল ভাগ্যবন্ত শ্রীমুকুন্দ ॥
যে দণ্ড পাইলেন শ্রীশচী ভাগ্যবতী।
সে দণ্ড প্রসাদ অন্য লোক পাবে কতি ॥'
এত কহি আচার্য্য তাঁরে করিঞা আশ্বাস।
আনন্দিত হৈয়া আইলা মহাপ্রভুর পাশ ॥
প্রভুকে কহেন, 'তোমার না বুঝিয়ে লীলা।
আমা হইতে প্রসাদ পাত্র হইল কমলা ॥
আমারে যে কভু নাহি হয় সে প্রসাদ।
তোমার চরণে আজি কি কৈল অপরাধ ॥'
এত শুনি মহাপ্রভু হাঁসিতে লাগিলা।
বোলাইলা কমলাকান্তে প্রসন্ন হইলা ॥৩৭॥
আচার্য্য কহে, 'ঞিহায় কেনে দিলে দরশন।
দুই পরকারে মোর করে বিড়ম্বন ॥৩৮॥'
শুনিঞা প্রভুর মন প্রসন্ন হইল।
দুহাঁর অন্তর কথা দুঁহে সে বুঝিল ॥৩৯॥
প্রভু কহে, 'বাউলিয়া তোঁ ঐছে কাহে কর।
আচার্য্যের লজ্জা ধর্ম্ম হানি সে আচর ॥৪০॥

প্রতিগ্রহ না করিহ কভু রাজধন।
বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন॥
মন দুষ্ট হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
কৃষ্ণ-স্মৃতি বিনু হয় নিষ্ফল জীবন॥৪১॥
লোক লজ্জা হয় ধর্ম্ম কীর্ত্তি হয় হানি।
এই কর্ম্ম না করিহ কভু ইহা জানি' ॥৪২॥

অদ্বৈতাচার্য্য যখন বলিয়াছেন যে তিনি এ বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন, আমরা তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য। কিন্তু একবার যখন তিনি গৌড়ের ভক্তমণ্ডলীর সহিত নীলাচলে আসিতেছিলেন, তখন প্রতাপ-রুদ্রের যান চড়িয়া কটকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন এবং চৈতন্যের ভয়ে বাসুদেব দত্তকে ও অন্যান্য কতিপয় ভক্তকে সঙ্গে লইয়াছিলেন—(তিনি কি 'দলপুরু' করিবার জন্য এ প্রকার কার্য্য করিয়াছিলেন ?)। আমরা এ বিষয়ে চৈতন্যচরিতমহাকাব্য হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম (১৪শ পঃ—৫৬-৬৬)—

"তত এতে মহাত্মানো রম্যাং যাজপুরীং যযুঃ।
কৃত্বা বৈতরণীস্নানং জগ্মুর্নগরমধ্যতঃ ॥৫৭॥
অথ প্রতাপরুদ্রেণ স্বপ্নং দৃষ্ট্বা মহাত্মনা।
প্রেষিতো যানমুত্থাপ্য তদীয়োঽদ্বৈতমানয়ৎ ॥৫৮॥
রাজসংভাষণং কর্ত্তুং গন্তুং মামিতি সংবিদন্।
কিং বদিষ্যতি নাথোঽসাবিতিচিন্তাকুলোঽভবৎ ॥৫৯॥
ঈশ্বরোপ্যেষ গৌরাঙ্গচন্দ্রভীত্যাশু বেপিতঃ।
শ্রীবাসুদেবদত্তং তং নিনায় নিজসঙ্গতঃ ॥৬০॥
কেচিৎ তৎসঙ্গতো জগ্মুরদ্বৈতানুগতা জনাঃ।
কটকস্য পথা তে চ শ্রীগৌরচরণাশ্রয়াঃ ॥৬১॥

অন্যে তু হরিদাসাদ্যা মহাত্মানো মহাশয়াঃ।
শ্রীবাসং পুরতঃ কৃত্বা হংসেশ্বরপথৈর্যযুঃ ॥৬২॥
তদ্দিনং তত্র সংনীয় দৃষ্ট্বা চ তমুমাপতিং।
প্রাতরুত্থায় সুখিতাঃ পরিতস্তে মুদা যযুঃ ॥৬৩॥
কিয়দ্দূরে হি তে তিষ্ঠৎশ্রীবাসপ্রমুখা জনাঃ।
নিকটং গচ্ছতাং তেষামুৎকণ্ঠা দ্বিগুণাভবৎ ॥৬৪॥
বিলোকিতব্যা গৌরাঙ্গনখচন্দ্রচ্ছটা ইতি।
অদ্বৈতোঽপি ততস্তত্র মিলিতোঽভূৎমহামতিঃ ॥৬৫॥
একত্রৈব মিলিত্বা তে যযুঃ কমলকেপুরে,
মুদা পরময়া যুক্তাঃ কীর্ত্তয়ন্তোঽভিতোঽভিতঃ ॥৬৬"

(তৎপরে মহাত্মা (গৌড়ীয়) ভক্তগণ রমণীয় যাজপুরী গমন করিয়া বৈতরণী-নদীতে স্নানকরতঃ নগর-মধ্যে গমন করিলেন ॥৫৭॥

অনন্তর মহাত্মা প্রতাপরুদ্র স্বপ্ন দেখিয়া স্বীয় যানে আরোহণকরাইয়া অদ্বৈতকে আনয়ন করিলেন ॥৫৮॥

আমি রাজসম্ভাষণ করিতে যাইতেছি ইহা জানিতে পারিলে, নাথ অর্থাৎ গৌরচন্দ্র আমাকে কি বলিবেন এইরূপ চিন্তায় আকুল হইলেন॥ অদ্বৈত-প্রভু ঈশ্বর হইলেও গৌরাঙ্গচন্দ্রের ভয়ে কম্পিত-কলেবর হইয়া শ্রীবাসুদেব দত্তকে আপনার সঙ্গে লইলেন ॥৫৯॥৬০॥

কতকগুলি গৌরাঙ্গপদাশ্রিত ভক্তগণ অদ্বৈতের অনুগামী হইয়া তৎসঙ্গেই কটকপথে গমন করিলেন ॥৬১॥

অন্যদিন মহাত্মা হরিদাসাদি ভক্ত মহাশয়গণ শ্রীবাসপণ্ডিতকে অগ্রে করিয়া হংসেশ্বর-পথে গমন করিলেন ॥৬২॥

ভক্তগণ উমাপতিদর্শন-করতঃ সেইদিন তথায় যাপিত করিয়া

প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করতঃ সুখিত হইয়া অতিহর্ষে গমন করিলেন ॥৬৩॥

শ্রীবাস প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কিয়দ্দূর গমন করিয়া অবস্থিতি করিলেন, তৎপরে তাঁহাদিগের নিকটে অন্যান্য ভক্তগণ সমাগত হইলে শ্রীবাসাদির উৎকণ্ঠা দ্বিগুণতর হইল ॥৬৪॥

তৎপরে গৌরাঙ্গের নখচন্দ্রের ছটা দর্শন করিতে হইবে এই বাসনায় মহামতি অদ্বৈতও তথায় মিলিত হইলেন এবং একত্রে মিলিত হইয়া সকলে পরমানন্দে সম্যক্ হরিসঙ্কীর্ত্তনকরতঃ কমলপুরে গমন করিলেন ॥৬৫॥৬৬॥)

চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকেও (১০ম-২০) এ সম্বন্ধে কিছু লিখিত হইয়াছে—

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব—স্বামিন্ পুরীশ্বর হংহো স্বরূপ অস্মিন্নব্দে এতেষাং কৃতে খল্বমী মদ্দর্শনং লপ্স্যন্তে ॥

উভৌ। স্বগতং অহো কঃ সন্দর্ভোঽস্য বচসঃ ভবতু স্বয়মেব স্ফুটিষ্যতি ॥

মহা। অস্মিন্নব্দে ভূপালদর্শনমাচার্য্যস্য ভবিষ্যতি ॥

শ্রীকান্ত। দেব ময়া দূরাদেবাগতং তেন তদনভিজ্ঞোঽস্মি ॥১৯॥

পরমানন্দপুরী-স্বরূপৌ। স্বগতং অহো অবগতং গতেঽব্দেঽদ্বৈতাচার্য্যেণ যদ্ভূপালঃ সম্ভাষিতস্তেন স এবাক্রোশোঽস্যাপি ভগবতো মনসি

[মহাপ্রভু। স্বামিন্ পুরীশ্বর! অহে স্বরূপ! এই বৎসর ইহাদিগের (প্রতাপরুদ্র প্রভৃতির) জন্যেই ইহারা আমার দর্শন পাইবে।

উভয়ে। (মনে মনে) এই বাক্যের তাৎপর্য্য কি বুঝিতে পারিলাম না, যা হউক আপনিই স্পষ্ট হইবে।

মহাপ্রভু। এই বৎসর আচার্য্যের রাজদর্শন হইবে।

শ্রীকান্ত। দেব! আমরা দূর হইতে আসিয়াছি অতএব ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিতেছি না ॥১৯॥

পুরীশ্বর ও স্বরূপ। (মনে মনে) আহা! বুঝিয়াছি গত বৎসর অদ্বৈতাচার্য্য মহারাজের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন তজ্জন্য আক্রোশ অদ্যাপি প্রভুর মনে রহিয়াছে।]

ইহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি গৃহী বৈষ্ণবের পক্ষে চৈতন্যদেবের উচ্চ আদর্শের অনুকরণ অসম্ভব হইয়াছিল। আচার্য্যের দুই বিবাহ; সীতাদেবীর গর্ভে পাঁচ ও শ্রীদেবীর গর্ভে দুই পুত্র জন্মিয়াছিল। আচার্য্যের জন্ম খৃঃ ১৪৩৪, দেহত্যাগ খৃঃ ১৫৫৭; মৃত্যুকালে তাঁহার একশত চব্বিশ বৎসর বয়স হইয়াছিল।[১] এই সাত পুত্রেরও সম্ভবতঃ অনেক পুত্র ও কন্যা হইয়াছিল। এরূপ বৃহৎ সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত, তিনি প্রতাপরুদ্রের নিকট হইতে মধ্যে মধ্যে কিছু অর্থ লইতেন, তাহাতে কাহারও আপত্তি করা উচিত নয়।

বিষয়াসক্তি-বিষয়ে চৈতন্যদেবের কি মত, কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-কৃত চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডের নবম অধ্যায় হইতে আমরা অবগত হইতে পারি। বিদ্যানগরের ভবানন্দ রায়, ক্ষমতাশালী ও ধনবান্ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র (চৈঃ চঃ—আদি-১০১-৪)—

.. ..রায় ভবানন্দ,
যাঁহার মিলনে প্রভু পাইল আনন্দ,
আলিঙ্গনকরি তাঁরে বলিল বচন,
'তুমি পাণ্ডু, পঞ্চপাণ্ডব তোমার নন্দন;

১। ১লা বৈশাখের (১৩৪০ সাল) আনন্দবাজার পত্রিকাতে একজন মধ্যপ্রদেশ-বাসীর বর্ত্তমান বয়স ১৫০ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। তিনি টিপুসুলতানের সমসাময়িক।

রামানন্দ রায়, পট্টনায়ক বাণীনাথ,
কলানিধি, সুধানিধি, আর গোপীনাথ,
এই পঞ্চ পুত্র তোমার মোর প্রেমপাত্র,
রামানন্দ সহ মোর দেহভেদমাত্র।'

জ্যেষ্ঠ রামানন্দ রায় উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রের রাজমহেন্দ্রী তালুকের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার আর একপুত্র গোপীনাথ মালজাঠ্যা দণ্ডপাঠ তালুকের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার আর একজন পুত্র বাণীনাথও বোধহয় প্রতাপরুদ্রের একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। প্রতাপ-রুদ্র ভবানন্দরায়ের গোষ্ঠীকে ভালবাসিতেন। তাঁহারা অনেক সময়ে রাজার প্রাপ্য সমস্ত অর্থ রাজাকে না দিলেও তাঁহাদিগকে রাজা শাস্তি দিতেন না, উপরন্তু প্রাপ্য টাকা ছাড়িয়া দিতেন। রাজা জগন্নাথ-মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক কাশীমিশ্রকে বলিতেছেন—

ভবানন্দের পুত্র সব মোর প্রিয়তম।
ইহা সভাকারে মুঞি দেখো আত্মসম॥
অতএব যাঁহা যাঁহা দেও অধিকার।
খায় পিয়ে লুটে বিলায় না করোঁ বিচার॥
রাজমহেন্দ্রীর রাজা কৈলু রামানন্দ রায়।
যে খাইলে যেবা দিলে নাহি তার দায়॥
গোপীনাথ এই মত বিষয় করিঞা।
দুই চারি লক্ষ কাহন রহেত খাইঞা॥
কিছু দেয় কিছু না দেয় না করি বিচার।
জানা সহ অপ্রীত, দুঃখ পাইল এবার॥৩৯॥

কিন্তু একবার গোপীনাথ রাজার প্রাপ্য দুইলক্ষ টাকা দিতে অপারগ হইলে, রাজা বাকী টাকার নিমিত্ত তাগাদা করিলেন।

গোপীনাথ বলিলেন যে তাঁহার হাতে টাকা নাই, এক্ষণে রাজা তাঁহার দশ বারটী মূল্যবান্ ঘোঁড়া লইতে পারেন এবং পরে তাঁহার সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া রাজার প্রাপ্যের অবশিষ্ট টাকা তিনি রাজ-সরকারে দিবেন। যুবরাজ পুরুষোত্তম-জানাকে গোপীনাথের ঘোঁড়ার মূল্য নিরূপণ করিবার নিমিত্ত রাজা পাঠাইলেন। রাজপুত্রের একটী মুদ্রা-দোষ ছিল যে কথা কহিবার সময় তিনি আকাশের দিকে চাহিতেন এবং পুনরায় মাথা নীচু করিতেন। তিনি আসিয়া ঘোঁড়ার ন্যায্য মূল্যাপেক্ষা অল্পমূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া গোপীনাথের সহিত দেনাপাওনার হিসাব করিতে লাগিলেন। গোপীনাথ ক্রুদ্ধ হইয়া রাজপুত্রকে পরিহাস করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার ঘোঁড়াসকল যখন তাহাদের গ্রীবা উন্নত করিয়া উর্দ্ধদিকে চাহিতেছে না, তখন তাহাদের এত অল্প মূল্য হইতে পারে না। রাজপুত্র গোপীনাথের বিদ্রূপে রাগান্বিত হইয়া রাজাকে সমস্ত বিষয় জানাইলেন ; এবং রাজাকে বলিলেন যে গোপীনাথের টাকা আছে এবং তাহাকে চাঙ্গে চড়াইলেই, তাহার নিকট হইতে প্রাপ্য টাকা সমস্তই আদায় হইবে। রাজা রাজপুত্রের কথাতে সম্মতি দিলেন। রাজা কেবল প্রাপ্য টাকার জন্য গোপীনাথকে শাস্তিদিতে উদ্যত হন্ নাই ; গোপীনাথকৃত তাঁহার পুত্রের অপমানই তাঁহার সম্মতির প্রধান কারণ।

'পুরুষোত্তম জানারে তেঁহো কৈল পরিহাস।
সেই জানা তারে মিথ্যা দেখাইল ত্রাস' ॥৩৩॥

গোপীনাথকে ভয়প্রদর্শন রাজার ইচ্ছা ছিল, সত্য সত্যই তাহাকে উচ্চ মঞ্চ হইতে খড়্গের উপর নিক্ষেপকরিয়া বধ করিবার অভিলাষ তাঁহার ছিল না।

গোপীনাথকে চাঙ্গে চড়াইবার পরে একজন লোক আসিয়া গোপী-

নাথের শাস্তির কথা চৈতন্যদেবকে জ্ঞাপন করিল। চৈতন্যদেব ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। চৈতন্যদেব ইহা শুনিয়া বলিলেন যে রাজার কোনও দোষ নাই, রাজার প্রাপ্য টাকা রাজাকে দিতেই হইবে এবং না দিলে রাজা দোষীকে দণ্ড দিতে পারেন; এবং আরও বলিলেন রাজার প্রাপ্য টাকা দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই প্রত্যেক রাজকর্ম্মচারীর নিজের জন্য ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্যে ব্যয় করা উচিত; গোপীনাথ অসচ্চরিত্রতার জন্য রাজার প্রাপ্য টাকা অপব্যয় করিয়াছেন। আরও তিনজন লোক গোপীনাথের আসন্ন মৃত্যু, এই কথা চৈতন্যদেবকে জানাইলে এবং স্বরূপদামোদরাদি গোপীনাথের নিমিত্ত রাজাকে অনুরোধ করিতে চৈতন্যদেবকে বলিলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাঁহারা কি চান্ যে তিনি রাজার নিকট গিয়া দুইলক্ষ টাকার নিমিত্ত আঁচল পাতিবেন; এবং বলিলেন যে যদিও তিনি ইহা করেন, তিনি পাচ গণ্ডা কড়ির পাত্র, রাজা এত টাকাই বা তাঁহার মত ভিক্ষুক সন্ন্যাসীকে দিবেন কেন? তাঁহাদিগের উচিত যে তাঁহার কাছে না আসিয়া :যন তাঁহারা জগন্নাথদেবের শরণ লন, কারণ এ বিপদ হইতে গোপীনাথকে রক্ষা করা অথবা না করা সমস্তই জগন্নাথদেবের উপর নির্ভর করিতেছে।

প্রতাপরুদ্রের অন্যতম উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হরিচন্দন রাজাকে চৈতন্যদেবের ঐ সকল কথা বলিলে, রাজা বলিলেন যে তিনি গোপীনাথের নিকট হইতে তাঁহার প্রাপ্য টাকা আদায় করিতে চাহিয়াছেন এবং তাঁহাকে বধ করিবার ইচ্ছা তাঁহার একেবারেই নাই। হরিচন্দন রাজপুত্রকে রাজার আদেশ জ্ঞাপন করিলে তিনি গোপীনাথকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত করিলেন, এবং উচিত মূল্যে তাঁহার ঘোড়া লইলেন এবং বাকী টাকা গোপীনাথ কিস্তিবন্দী করিয়া দিতে সম্মত হইলে তিনি তাহাকে বাটী যাইতে অনুমতি দিলেন।

এই সময়ে জগন্নাথদেবের মন্দিরের অধ্যক্ষ কাশীমিশ্র[১] চৈতন্যদেবের নিকট আসিলে চৈতন্যদেব উদ্বেগের সহিত মিশ্রকে বলিলেন যে, ভবানন্দের পুত্রেরা রাজদ্রব্যের অযথা ব্যয় করিবে, রাজা তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য টাকা না পাওয়াতে তাহাদিগকে দণ্ড দিবেন, এবং গোপীনাথপ্রভৃতি রাজ-কর্ম্মচারীরা তাঁহার মত ভিক্ষুক সন্ন্যাসীকে তাঁহাদের দুঃখের কথা জানাইয়া মনঃপীড়া দিবেন, তিনি ইহা একেবারেই পছন্দ করেন না এবং সেইজন্য তিনি নীলাচল ত্যাগকরিয়া আলালনাথে গিয়া বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। কাশীমিশ্র চৈতন্যদেবের কথা শুনিয়া অতিশয় কাতর হইলেন এবং তাঁহার চরণে ধরিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে কেবল চৈতন্যদেবের জন্যই প্রতাপরুদ্রের একটী প্রধান শাসকের কার্য্য রামানন্দ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সনাতন মন্ত্রিত্ব ত্যাগকরিয়াছেন, এবং রঘুনাথ দাস প্রভূত ধনসম্পদ এবং আত্মীয়গণ ত্যাগকরিয়া নীলাচলে ভিক্ষা করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহকরিতেছেন এবং উক্ত মহানুভব ব্যক্তিদিগের ন্যায় শুদ্ধ ভক্তি সকলের হঠাৎ হইতে পারে না এবং গোপীনাথের এরূপ ভক্তি ক্রমশঃ হইবে। তিনি বলিলেন—

"রামানন্দের ভাই গোপীনাথ মহাশয়।
তোমা হইতে বিষয়-বাঞ্ছা তার ইচ্ছা নয়।"

অর্থাৎ বিষয়াসক্তি এবং চৈতন্যদেবের দয়া এই দুইটীর ভিতরে চৈতন্যদেবের দয়া অধিকতর মূল্যবান্, ইহা গোপীনাথও মনে করেন। 'শুদ্ধভক্তি' কাহাকে বলে কাশীমিশ্র শ্রীমদ্ভাগবতের (১০ম-১৪-৮) শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন—

১। জগন্নাথদেবের মন্দিরের অধ্যক্ষ এবং পূজাসম্বন্ধীয় বিবাদনিষ্পত্তিকারী (ভগবতঃ সর্ব্বাধিকারী প্রাড়্ বিবাকঃ—চৈঃ চঃ নাঃ—৮ম-৩)।

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভি-র্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥

ব্রহ্মা কহিলেন, 'হে ভগবন্, কবে আপনার কৃপা হইবে এই প্রতীক্ষা করিয়া যিনি আত্মকৃত কর্ম্মফল ভোগ করেন এবং কায়মনোবাক্যে আপনাকে (বিষ্ণুকে) নমস্কারপূর্ব্বক জীবনধারণ করেন, তিনি মুক্তি পাইবার উপযুক্ত ব্যক্তি।' এই শাশ্বত সত্য কবিকর্ণপূর তাঁহার আনন্দবৃন্দাবনচম্পূর সপ্তম স্তবকের ১৫২ শ্লোকেও বিবৃত করিয়াছেন। (১৭৯ পৃঃ দেখুন)

কাশীমিশ্র প্রতাপরুদ্রকে চৈতন্যদেবের আলালনাথগমনের অভিপ্রায় জ্ঞাপনকরিলে, রাজা অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং বলিলেন যে 'দুইলক্ষ টাকা' ত 'ছার পদার্থ', তিনি চৈতন্যদেবের পদে রাজ্য এবং প্রাণ উৎসর্গকরিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছেন এবং যাহাতে চৈতন্যদেব নীলাচল না ত্যাগ করেন, তাহার জন্য মিশ্রমহোদয় যেন বিশেষ চেষ্টা করেন। কাশীমিশ্র বলিলেন যে প্রাপ্য টাকা রাজার ত্যাগকরা চৈতন্যদেব একেবারেই ইচ্ছা করেন না। রাজা বলিলেন ভবানন্দের গোষ্ঠী তাঁহার অতিশয় প্রিয় এবং পুরুষোত্তম জানাকে গোপীনাথ পরিহাসকরার জন্য যুবরাজ পুরুষোত্তম তাঁহাকে মিথ্যা ত্রাস দেখাইয়াছেন। রাজা গোপীনাথকে তৎক্ষণাৎ ডাকাইয়া আনিয়া গোপীনাথের নিকট হইতে তাঁহার প্রাপ্য সমস্ত টাকা ক্ষমা করিলেন, পুনরায় সেই জমীদারীর শাসনভার তাঁহাকে দিলেন, তাঁহার বেতন দ্বিগুণ করিয়া দিলেন, এবং তাঁহার সম্মানার্থ তাঁহাকে 'নেতধটি' অর্থাৎ পট্টবস্ত্র উপহার দিলেন।

চৈতন্যদেবের কৃপায় উৎকলরাজের তাঁহার প্রতি এত অনুগ্রহ ইহা উপলব্ধি করিয়া গোপীনাথ তাঁহার পিতা এবং ভ্রাতাদিগের সহিত চৈতন্যদেবের সকাশে গমন করিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলেন এবং শুদ্ধভক্তি অর্থাৎ বিষয়াসক্তি-শূন্যতা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন। চৈতন্যদেব বলিলেন যে তাঁহাদিগের পোষ্য অনেক, এবং সকলে সন্ন্যাসী হইলে তাঁহাদিগের ভরণপোষণ কি করিয়া হইবে? তিনি আরও বলিলেন যে গোপীনাথ যেন রাজকার্য্য ত্যাগ না করেন; কিন্তু তিনি যেন ভবিষ্যতে রাজার প্রাপ্য ধন তাঁহাকে প্রদান করিয়া তাঁহার নিজের প্রাপ্য ধন 'ধর্ম্মকর্ম্মে' ব্যয় করেন এবং কোনও প্রকার 'অসদ্ব্যয়' না করেন, কারণ ইহাতে মনুষ্যের ইহকাল এবং পরকাল, উভয়ই নষ্ট হয়।

পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে প্রতাপরুদ্রের নিকট হইতে অদ্বৈতাচার্য্যের ধনপ্রার্থনা এবং তাঁহার সহিত বেশি 'মেলামেশা' চৈতন্যদেব পছন্দ করেন নাই। কিন্তু গোপীনাথ বিষয়-ত্যাগ করিতে চাহিলেও চৈতন্যদেব তাঁহাকে রাজকার্য্য করিয়া তাঁহার পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে অদ্বৈতাচার্য্যের ন্যায় ধর্ম্মপ্রচারকের ও সমাজ-সংস্কারকের বৈরাগ্যব্রত অবলম্বন করা বিশেষ কর্ত্তব্য। এরূপ ব্যক্তির বিষয়াসক্তি পরিহারকরা উচিত এবং তাঁহার বিষয়াসক্ত লোকদিগের সহিত সংস্রব যতদূর সম্ভব ত্যাগকরা কর্ত্তব্য।

চৈতন্যদেব উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রকে শেষে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহার বিস্তৃত বিবরণ চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকের অষ্টম অঙ্কে আছে। প্রথমে সার্ব্বভৌম যখন চৈতন্যদেবকে বলিলেন যে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য রাজা অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, চৈতন্যদেব সার্ব্ব-

ভৌমকে বলিলেন যে তাঁহার মত লোকের এরূপ অনুরোধ করা উচিত হয় নাই এবং এই শ্লোক আবৃত্তি করিলেন—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণোহপ্যসাধু॥—২৭

ভবার্ণবপারোৎসুক নিঃস্পৃহ যে জন,
ভগবানে দৃষ্টি রাখি করয়ে ভজন,
বিষাপেক্ষা ক্ষতিকর জানে সেই জন,
বিষয়ী, রমণী সহ তাহার মিলন॥—সঃ

ইহা শুনিয়া প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌমকে বলিয়াছিলেন—

অদর্শনীয়ানপি নীচজাতীন্,
স বীক্ষতে চারু তথাপি নো মাং।
মদেকবর্জ্জং কৃপয়িষ্যতীতি,
নির্ণীয় কিং সোহবততার দেবঃ।—৩৪

দর্শন-অযোগ্য হয় সর্ব্ব নীচ জাতি,
প্রভুর করুণ দৃষ্টি তাহাদের প্রতি।
সকলেই হয় পাত্র প্রভুর দয়ার,
আমাকে বর্জ্জিতে বুঝি তাঁর অবতার॥—সঃ

পরে যখন সার্ব্বভৌমের পরামর্শানুসারে রাজবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক ধৌত বস্ত্রযুগল পরিধানকরতঃ উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্র জগন্নাথদেবের

রথের সম্মুখে সঙ্কীর্ত্তনে ও নর্ত্তনে পরিশ্রান্ত ও আনন্দাবেশে মুদ্রিতনয়ন চৈতন্যদেবের চরণযুগল দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন, তখন চৈতন্যদেবও আনন্দাবেশে এবং মুদ্রিতনয়নেই রাজাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন (চৈঃ চঃ নাঃ-৮ম-৭১)।

আমরা (পৃঃ ১৯০ দেখুন) পূর্ব্বেই বলিয়াছি চৈতন্যদেবের কাঞ্চনপল্লীতে পদার্পণ এবং তাঁহার কাঞ্চনপল্লীনিবাসী বাসুদেবপ্রভৃতি ভক্তগণের স্মৃতিবার্ষিকীঅনুষ্ঠান প্রত্যেক কাঁচরাপাড়া-অধিবাসীর কর্ত্তব্য। এই বাৎসরিক অনুষ্ঠান-উৎসব দুইদিনে হইতে পারে।

প্রথমতঃ রথযাত্রার দিনে; কারণ প্রতিবৎসর রথযাত্রার সময়ে গৌড়ের ভক্তগণ শিবানন্দসমভিব্যাহারে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা এবং চৈতন্যদেবের সংদর্শন জন্য নীলাচলে গমন করিতেন। সেই নিমিত্ত শিবানন্দ সেনের এবং কবিকর্ণপূরের গুরু শ্রীনাথপণ্ডিতস্থাপিত কাঞ্চনপল্লীর কৃষ্ণদেববিগ্রহের রথযাত্রা-উপলক্ষে, কৃষ্ণদেবের মন্দির-প্রাঙ্গণে এই স্মৃতি-মহোৎসব প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

দাক্ষিণাত্য হইতে নীলাচলে চৈতন্যদেবের প্রত্যাগমনের পরে এবং রথযাত্রা-উপলক্ষে গৌড়ের ভক্তগণের নীলাচলে আগমনের পরে চৈতন্যদেবের সহিত শিবানন্দ, বাসুদেবদত্ত, শ্রীকান্ত প্রভৃতির প্রথম পরিচয় হয় (চৈঃ চঃ নাঃ—৮ম-৫৪)। জগদানন্দ ও মুকুন্দকে চৈতন্যদেব পূর্ব্বহইতেই বিশেষরূপে জানিতেন। শিবানন্দসুত কবিকর্ণপূর তাঁহার চৈতন্যচরিতমহাকাব্যে (১৩শ-১২৭) লিখিয়াছেন—

মুরারিগুপ্তেন সমং প্রযাতঃ
শ্রীমান শিবানন্দ ইতি প্রসিদ্ধঃ।
আলোকয়ত্তং প্রথমং তমীশং
স্বসৌভগস্তোমমিবাথ মূর্ত্তং ॥

'শিবানন্দ মুরারিগুপ্তের সহিত (নীলাচলে) গমন করিয়া স্বীয়সৌভাগ্যরাশির ন্যায় মূর্ত্তিমান্ ঈশ্বরকে (চৈতন্যদেবকে) প্রথম দর্শন করিয়াছিলেন।'

মাঝেরপাড়ার ও মালিপাড়ার রায় মহাশয়েরা বলেন যে শিবানন্দ সেন ও কবি কর্ণপূর তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ। কিন্তু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বিশ্বকোষের জন্য কাঁচরাপাড়াতে যাইয়া ঈশানচন্দ্র অধিকারী মহাশয় প্রভৃতি অধিবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া লিখিয়াছেন যে কবি কর্ণপূর বিবাহ করেন নাই। এমন হইতে পারে যে রায় মহাশয়েরা (রায় উপাধি; ইঁহারা 'সেনগুপ্ত') শিবানন্দের অন্য দুই পুত্রের বংশধর। কৃষ্ণদেবের বিগ্রহগঠনের সম্বন্ধে অন্ততঃ দুইটী গল্প প্রচলিত আছে—একটী ডাক্তার বটকৃষ্ণরায় বলিয়াছেন। দ্বিতীয়টীতে অতিরঞ্জন সামান্যই আছে বলিয়া এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। এটী শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় অধিকারী মহাশয়দিগের নিকট হইতে সংগৃহীত করিয়াছেন—"কাঞ্চনপল্লীনিবাসী সেন শিবানন্দ নামে এক সন্ন্যাসী উক্ত শ্রীনাথের (যাঁহার নাম কৃষ্ণদেব বিগ্রহের পদ্মাসনে ক্ষোদিত আছে) এক শিষ্য ছিলেন। তিনি (শিবানন্দ) স্বপ্নাদেশমত একখানি কাল পাথর ভাগীরথীতে প্রাপ্ত হন এবং তাহাতে ভাস্কর-দ্বারা বিগ্রহ প্রস্তুত করাইয়া গুরুদেবকে (শ্রীনাথকে) অর্পণ করেন।" 'স্বপ্নাদেশ' যদিও আমরা বাদ দিই, তাহা হইলে এই বিবরণ আমাদিগের পূর্ব্বলিখিত বিবরণ হইতে বিভিন্ন নয়। শিবানন্দ এবং শ্রীনাথ কৃষ্ণদেবরায়ের মন্দির কোথায় নির্ম্মিত করিয়াছিলেন, কিম্বা তাহার পরে কচুরায় কোথায় মন্দির স্থাপনকরিয়াছিলেন বলা সুকঠিন, কারণ উভয় মন্দিরই গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত হওয়ার পরে বর্ত্তমান মন্দির কলিকাতার মল্লিক মহাশয়েরা নির্ম্মিত করাইয়াছেন। শিবা-

নন্দের, কবিকর্ণপূরের এবং শ্রীনাথের বাসগৃহ কোনস্থানে ছিল, তাহাও ইঁহারা কেহ নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারেন না, কারণ সে সময়ে অধিকাংশ বাটী ভাগীরথীর পূর্ব্ব উপকূলে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং ভাগীরথীর পূর্ব্ব তটভূমি ভগ্ন হইতে আরম্ভ হইলে, অধিবাসীরা তাঁহাদের বর্ত্তমান গৃহগুলি নির্ম্মাণকরাইয়াছিলেন। মন্দিরগাত্রে যাহা লিখিত আছে তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে ১৭০৮ শকে অর্থাৎ ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে (কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা-নিবাসী) নয়ানচাঁদ মল্লিক মহাশয়ের পুত্রদ্বয় শ্রীনিমাইচরণ ও গৌরচরণ কাঁচরাপাড়া গ্রামের বাজারের নিকটস্থ বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণকরাইয়াদিয়াছিলেন। বৈষ্ণবচরিতাভিধানে লিখিত আছে যে ইঁহারা মাহেশের জগন্নাথদেবের মন্দিরও ভাগীরথীতে নিমগ্ন হইলে ১১৬২ সালে অর্থাৎ ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন। নিমাই মল্লিক মহাশয়ের পুত্র শ্রীমণি মল্লিক, তাঁহার পুত্র শ্রীযদুনাথ মল্লিক।

আমরা পূর্ব্বেই কবিকর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকা হইতে প্রমাণ করিয়াছি যে কৃষ্ণদেববিগ্রহের [১] প্রতিষ্ঠাতা শিবানন্দ সেনের এবং তৎপুত্র কবিকর্ণপূরের গুরু শ্রীনাথ পণ্ডিত। কাঁচরাপাড়াগ্রামে প্রবাদ আছে যে সেন শিবানন্দ এই বিগ্রহ স্থাপনকরিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ গুরুদেবের (শ্রীনাথের) কৃষ্ণদেব-বিগ্রহের প্রতিষ্ঠার এবং মন্দিরনির্ম্মাণের সমস্ত ব্যয়নির্ব্বাহ শিবানন্দ করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবাচারদর্পণে (পৃঃ ৩৪৮) শ্রীনাথপণ্ডিতসম্বন্ধে লেখা আছে—

চিত্রাঙ্গী যে সখী এবে শ্রীনাথ পণ্ডিত।
গৌরাঙ্গের শাখা কাঁচরাপাড়াতে বিদিত॥

১। ১৯১ পৃষ্ঠার footnote দেখুন।

কৃষ্ণরায়শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠাকরিল।
সেবা করি সেন শিবানন্দে সমর্পিল॥

শিবানন্দ যে একজন ধনবান্ এবং ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন তাহা নানা বিপদ্সঙ্কুল পথ দিয়া গৌড়ের ভক্তগণকে নীলাচলে চৈতন্যদেবের নিকট তাঁহার লইয়া যাওয়া এবং তাঁহাদিগের 'ঘাটি সমাধান' অর্থাৎ দুষ্ট ঘট্টপাল (ঘাটোয়াল) দিগের সহিত শুল্কনির্দ্ধারণ এবং পরে তাহাদিগকে শুল্কপ্রদান এবং যাত্রীদিগের বাসস্থানের ও ক্ষুন্নি-বৃত্তির সমাধান হইতে আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি।

কৃষ্ণদেব-বিগ্রহের বর্ত্তমান সেবায়েৎ (অধিকারী, মুখোপাধ্যায়) মহাশয়েরা বলেন যে তাঁহারা শ্রীনাথের দৌহিত্রের বংশধর। বীরেন্দ্র বাবু ও জিতেন্দ্রবাবু—৺ মধুসূদন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় ও চতুর্থ পুত্র—বলেন যে শ্রীনাথের বাটী-সংলগ্ন একটী আম্রবৃক্ষ এখনও বর্ত্তমান আছে। এই আম্রবৃক্ষসম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও শ্রীনাথ পণ্ডিতের বাসস্থান সেই আম্রবৃক্ষের সন্নিকটে ছিল, তাহার কোন সংশয় নাই।

রথযাত্রার দিবস ভিন্ন স্মৃতি-সভার আর একটী শুভ দিবস আছে—যেদিন চৈতন্যদেব কাঁচরাপাড়ায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃতে (আদি—১৩শ—৭-৮) আছে—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি।
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ,
চৌদ্দশত পঞ্চায়ন্নে হৈলা অন্তর্দ্ধান॥
চব্বিশ বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস।
নিরন্তর কৈল প্রেমশক্তির প্রকাশ॥

চব্বিশ বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস।
চব্বিশ বৎসর কৈলা নীলাচলে বাস॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
কভু দক্ষিণ, কভু গৌড়, কভু বৃন্দাবন॥
অষ্টাদশ বৎসর রহিল নীলাচলে।
কৃষ্ণপ্রেম নামামৃতে ভাসাইল সকলে॥

উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা হইতে অনুমিত হইবে যে চৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে (ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে) অর্থাৎ ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ১৪৫৫ শকে অর্থাৎ ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগকরিয়াছিলেন।

গৌরাঙ্গদেবের অন্তর্দ্ধানবিষয়ে সাধারণতঃ এই প্রবাদ আছে, যেমন অদ্বৈতপ্রকাশে (২১শ অধ্যায়ে)—

একদিন গোরা জগন্নাথে নিরখিয়া,
শ্রীমন্দিরে প্রবেশিলা 'হা নাথ' বলিয়া।
প্রবেশমাত্রেতে দ্বার স্বয়ং রুদ্ধ হৈল,
ভক্তগণ-মনে বহু আশঙ্কা জন্মিল।
কিছুকাল পরে স্বয়ং কপাট খুলিলা,
গৌরাঙ্গাপ্রকট সভে অনুমান কৈলা।

লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে (শেষখণ্ডে) গৌরাঙ্গদেবের অপ্রকটের নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত লিখিত আছে—

হেনকালে মহাপ্রভু কাশীমিশ্রদ্বারে।
বৃন্দাবন কথা কহে ব্যথিত অন্তরে॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া জগন্নাথ দেখিবারে।
ক্রমে ক্রমে গিয়া উত্তরিলা সিংহদ্বারে॥

সঙ্গে নিজজন যত তেমতি চলিল।
সত্বরে মন্দির ভিতর উত্তরিল॥
নিরখে বদন প্রভু দেখিতে না পায়।
সেইখানে মনে প্রভু চিন্তিল উপায়॥
তখন দুয়ারে নিজ লাগিল কপাট।
সত্বরে চলিয়া গেল অন্তরে উচাট॥
আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে।
নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে॥

* * *

কৃপাকর জগন্নাথ, পতিত পাবন।
কলিযুগ আইল এই দেহত শরণ॥

* * *

তৃতীয় প্রহরবেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥

অতএব ১৪৫৫ শকে (১৫৩৩ খৃঃ), আষাঢ়মাসের সপ্তমী তিথিতে, রবিবার বেলা ১২টা হইতে ৩টার মধ্যে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। দিগ্‌দর্শনীতে প্রথম আষাঢ় অর্থাৎ ১লা আষাঢ় তাঁহার তিরোভাবের তারিখ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। টোটা-গোপীনাথ-মন্দিরে তাঁহার অন্তর্দ্ধানের কথা কেহ কেহ বলেন।

অদ্বৈতাচার্য্য ও নিত্যানন্দের খড়দহে মিলন এবং তাহার পরে নিত্যানন্দের অন্তর্দ্ধান অদ্বৈতপ্রকাশে (২২শ অধ্যায়ে) বর্ণিত হইয়াছে—

অষ্টমদিবসে শ্রীঅদ্বৈত মহারঙ্গে।
গৌরগুণ কীর্ত্তন করয়ে ভক্তসঙ্গে॥

মধ্যে নাচে নিত্যানন্দ প্রেমে অগেয়ান [১]।
শ্রীগৌরাঙ্গ পাদ-পদ্ম করিয়া ধেয়ান ॥
যতেক মহান্ত প্রেমে বাহ্য পাশরিলা।
অলক্ষ্যেতে নিত্যানন্দ অন্তর্দ্ধান হৈলা ॥

নিত্যানন্দ বীরভূমজেলার, মল্লারপুর ষ্টেশানের নিকট একচক্রা গ্রামে ১৩৯৫ শকে, অর্থাৎ ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং খড়দহে ১৪৬৪ শকে অর্থাৎ ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

অদ্বৈতাচার্য্য ১৩৫৫ শকে অর্থাৎ ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্টজেলার লাউড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শান্তিপুরে তাঁহার জীবনের অধিকাংশ অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং ১৪৭৮ শকে অর্থাৎ ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে শান্তিপুরে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন—অদ্বৈত প্রকাশ, ২২শ অধ্যায়—

গৌরগুণ শুনি প্রভুর [২] প্রেম উথলিল।
সংকীর্ত্তন-মধ্যে আসি নাচিতে লাগিল ॥

* * *

হটাৎ মদনগোপালের শ্রীমন্দিরে গেলা।
প্রাকৃতজনের প্রভু অগোচর হৈলা ॥

উপরিলিখিত বিবরণসমূহ হইতে অনুমিত হইবে যে বৈষ্ণবগ্রন্থকারগণ গৌরাঙ্গদেব, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্যের তিরোভাব সাধারণ মানবের দেহত্যাগের মত হয় নাই, ইহা বলেন। চৈতন্যদেবের দেহত্যাগ সম্ভবতঃ তাঁহার সমুদ্রে পতনের জন্য হইয়াছিল, ইহা কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ পাঠ করিলেই মনে হয়।

১। অজ্ঞান। ২। অদ্বৈতাচার্য্যের।

"এইমত মহাপ্রভু ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আইটোটা হইতে সমুদ্র দেখে আচম্বিতে॥

* • •

যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা।
অলক্ষিতে যাই সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিলা।
পড়িতে হইল মূর্চ্ছা কিছুই না জানে।
কভু ডুবায়, কভু ভাসায় তরঙ্গের গণে॥

• • •

কোলার্কের দিকে প্রভুকে তরঙ্গে লঞা যায়।
কভু ডুবাইয়া রাখে, কভু বা ভাসায়॥

স্বরূপদামোদরাদি ভক্তগণ গম্ভীরা হইতে গৌরাঙ্গদেবের প্রস্থান অবগত হইয়া জগন্নাথমন্দিরে, গুণ্ডিচামন্দিরে, নরেন্দ্রসরোবরে, চটক-পর্ব্বতে, কোলার্কে এবং সমুদ্রতীরে তাঁহাকে অন্বেষণকরিতেলাগিলেন। এক জেলে বড় মৎস্য বলিয়া তাঁহার মৃতদেহ জাল-দ্বারা সমুদ্র হইতে তীরে উঠাইয়াছিল—

অস্থি-সন্ধি ছাড়ি হয় দীর্ঘাকার,

* • *

জলে শ্বেত তনু বালু লাগিয়াছে গায়,
অতি দীর্ঘ শিথিল তনু চর্ম্ম নটকায়। ৯

কবিরাজ মহাশয় লিখিয়াছেন যে কৃষ্ণনামকীর্ত্তন উচ্চৈঃস্বরে করিলে তিনি পুনর্জীবিত হইয়াছিলেন।

১৩৪০ সালের 'ভারতবর্ষে' বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় চৈতন্য-দেবের তিরোধানের বিষয় আলোচনাকরিয়াছেন। তিনি বলেন যে রায়বাহাদুর দীনেশ সেন জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল হইতে স্থির করিয়াছেন

যে যখন রথযাত্রার সময়ে চৈতন্যদেব নৃত্য করিতেছিলেন সেই সময়ে তাঁহার পায়ে আঘাত লাগে, তাহাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হয়। (১) চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন যে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবতের পরে ইহা রচিত হইয়াছে 'কারণ জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে বৃন্দাবনের গ্রন্থের উল্লেখ আছে।' (২) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে দুইটী সাংঘাতিক ভুল তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন—প্রথমতঃ চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের বয়সসম্বন্ধে জয়ানন্দ বলিয়াছেন যে সে সময়ে তাঁহার কুড়ি বৎসর বয়স হইয়াছিল; কিন্তু অধিকাংশ চৈতন্যদেব-সম্বন্ধীয় গ্রন্থে ২৪ বৎসর বয়সে তাঁহার সন্ন্যাস হইয়াছিল লিখিত আছে। দ্বিতীয়তঃ চৈতন্যদেব তাঁহার পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে গয়াতে গিয়াছিলেন, ইহাও অন্যান্য গ্রন্থে নাই। অতএব আমরাও মনে করি যে জয়ানন্দ যাহা বলিয়াছেন তাহা 'অকাট্য' সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। অবশ্য আমরা একই প্রকারে অর্থাৎ 'অলৌকিক ভাবে' —চৈতন্যদেবের, নিত্যানন্দের ও অদ্বৈতাচার্য্যের অপ্রকট হওয়া বিশ্বাস করি না। চৈতন্যদেবের তিরোভাব যে স্বাভাবিক রূপে হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু যদিই তিনি গুণ্ডিচাগৃহে দেহত্যাগকরিয়াথাকেন, তাহা হইলেও: হরিদাসের মত তাঁহারও শরীর সমুদ্রতীরে সমাহিত হইয়াছিল। যদিও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল আমরা সংগ্রহকরিতেপারিনাই, তত্রাচ চৈতন্যদেবের দেহত্যাগের বর্ণনা আমরা যদুনাথ সরকার মহাশয়ের চৈতন্যদেবের জীবনী ও উপদেশ (Chaitanya's life and teachings) হইতে উদ্ধৃত করিলাম—The last scene may be thus translated from Jayananda's Chaitanyamangal, p. 150—'When dancing at the car-festival in the month

of Asharh, His left toe was suddenly pierced by a brick……With all his followers He sported in the water of the Narendra tank……On the 6th day of the moon, the pain in His toe grew severer and He was forced to take to His bed in the garden. Here He told the Pandit Gosvami that He would leave the earth next night at 10 o' clock. Celestial garlands of many-coloured flowers were thrown on Him from the unseen. Celestial singers began to dance on the highway. The Gods began to cry out, 'Bring the heavenly chariot.' The Master mounted into Vishnu's car with the figure of Garuda on its spire."

জয়ানন্দের বৃত্তান্ত যাঁহারা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন তাঁহারাও কি পুষ্পবর্ষণ, বিদ্যাধর-সঙ্গীত, বিষ্ণুরথ আগমন ইত্যাদিও বিশ্বাস করেন? লোচনদাস তিরোধানের সময় তৃতীয় প্রহর বলিয়াছেন, জয়ানন্দ রাত্রি দশটা বলিয়াছেন। জয়ানন্দ সম্ভবতঃ একটী গুজবের উপর নির্ভর করিয়া চৈতন্যদেবের দেহত্যাগের বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন। যদি এরূপ কোন ঘটনা ঘটিত কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে নিশ্চয়ই ইহার বর্ণনা থাকিত। তাহার পরে এরূপ লেখা অবশ্য থাকিত যে চৈতন্যদেবের আঘাত গুরুতর হইলেও তাঁহার কর্ণে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তনকরায় তিনি পুনর্জীবিত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন যে সমস্ত রাত্রি চৈতন্যদেব সমুদ্রজলে নিমগ্ন থাকিয়াও হরিনাম শ্রবণকরিয়া সঞ্জীবিত হইলেন।

আমরা বিশ্বাস করি যে সমুদ্রজলে পতনজন্য চৈতন্যদেবের দেহত্যাগ হইয়াছিল। অনেক অন্বেষণের পরে শেষরাত্রিতে ভক্তসকলের; একজন জেলের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল (চৈঃ চঃ-অন্ত্য-১৮শ-১২)। সে এই দেহ জালদ্বারা তীরে উঠাইয়া মৃত বলিয়া মনে করিয়াছিল। হরিদাসের দেহের মত বালুকারাশিতে তাঁহার দেহ সমাহিত হইয়াছিল। আমাদিগের মনে হয় অতিপ্রত্যূষে এবং অতি সঙ্গোপনে এ কার্য্যটী ভক্তদিগের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। এই প্রশ্ন হইতে পারে যে স্বাভাবিকভাবে চৈতন্যদেবের মৃত্যু হইয়াছে এ কথা জীবনীলেখকেরা বলেন নাই কেন? ইহার উত্তর এই—যে তাঁহারা যে জন্য চৈতন্যদেবের সুদর্শনচক্র-আহ্বান, চতুর্ভুজ, ষড়্‌ভুজ, এবং নৃসিংহ-মূর্ত্তি-পরিগ্রহ, বিভীষণের সহিত সাক্ষাৎ প্রভৃতির অবতারণাকরিয়াছেন, সেই কারণে তাঁহারা চৈতন্যদেবের অস্বাভাবিক-রূপে অদৃশ্য হওয়ার কথাও বলিয়াছেন।

কর্ণপূরের চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যে লিখিত আছে যে সাতচল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। চব্বিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া কেবল তিনবৎসর দাক্ষিণাত্য, মথুরা ইত্যাদি ভ্রমণে অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং বিংশতি বৎসর নীলাচলে অবস্থান করিয়া জগন্নাথদেবের রথাগ্রে গৌড়ের ভক্তগণসহিত নৃত্য ও কীর্ত্তন করিয়াছিলেন (১৮শ-৬১ ; ২০শ-৪০-৪১)। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে যে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া নীলাচলে আসিবার পরে দক্ষিণভ্রমণে, নীলাচলঅবস্থানে, গৌড়গমনে এবং বৃন্দাবনগমনে চৈতন্যদেবের ছয় বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে আঠার বৎসর অর্থাৎ তাঁহার ত্রিশ বৎসর বয়স হইতে আটচল্লিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অর্থাৎ

১৫১৬ হইতে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দেহত্যাগ পর্য্যন্ত তিনি নীলাচলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন—

"বৃন্দাবন হইতে যদি নীলাচলে আইলা।
আঠারবর্ষ তাঁহা বাস কাঁহো নাহি গেলা॥"
(চৈঃচঃ-মধ্য-১ম-৩)

চৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য-৭মপঃ) আছে—

"মাঘ শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস,
ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস॥
ফাল্গুনের শেষে সে দোলযাত্রা দেখিল,
প্রেমাবেশে তাঁহা বহু নৃত্যগীত কৈল॥
চৈত্রে রহি কৈল সার্ব্বভৌম বিমোচন;
বৈশাখ প্রথমে দক্ষিণ যাইতে হইল মন॥"

এই বিবরণ হইতে ইহা বুঝিতে পারা যায় যে ১৪৩১ শকে (১৫১০ খৃঃ) মাঘমাসে গৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। তিনি ফাল্গুনে পুরীতে আসেন। ১৪৩২ শকে (১৫১০ খৃঃ) ৭ই বৈশাখে তিনি দাক্ষিণাত্যাভিমুখে যাত্রা করেন; যথা গোবিন্দদাসের করচার ২১ পৃষ্ঠায়—

"অনন্তর সার্ব্বভৌমে ভক্তি করি দান্।
দক্ষিণযাত্রার লাগি হৈলা আগুয়ান্॥
তিনমাস [১] কাল মোর চৈতন্য গোঁসাই।
পুরীতে রহিলা সঙ্গে করিয়া নিতাই॥

১। গোবিন্দ বলিতেছেন যে চৈতন্যদেব সন্ন্যাসগ্রহণের পরে নীলাচলে আসিয়া এস্থানে তিন মাস অবস্থান করিয়া দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিতেছেন যে ফালগুন, চৈত্র ও বৈশাখের কতিপয় দিবস নীলাচলে তিনি অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অতএব গোবিন্দদাসের ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণনার মধ্যে বিশেষ

তারপরে বৈশাখের সপ্তম দিবসে।
দক্ষিণে করিলা যাত্রা ভাসি প্রেমরসে॥"

এই করচার ৪২ পৃষ্ঠায় আছে—

"তারপরে তাম্রপর্ণী-নদী দেখা দিল।
স্নান করিবারে প্রভু সেখানে চলিল॥
মাঘী পুর্ণিমার দিনে তাম্রপর্ণীধারে।
বহুত অতিথি আসে স্নান করিবারে॥
সেইস্থানে একপক্ষ অপেক্ষা করিয়া।
মাঘী পূর্ণিমার দিন স্নান করি গিয়া॥"

ইহা হইতে অনুমিত হইবে যে ১৪৩২ শকের (১৫১১ খৃঃ) মাঘী পূর্ণিমাতে তাম্রপর্ণী (দাক্ষিণাত্যের তিন্নেবেলী নগরের নিকট) নদীতে গৌরাঙ্গদেব স্নান করিয়াছিলেন। তাহার পর দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য নগর ভ্রমণকরিয়া পশ্চিম উপকূল দিয়া তিনি উত্তরদিকে দ্বারকায় আসিয়াছিলেন। তাহার পর পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়া ১৪৩৩ শকে (১৫১২ খৃঃ) ৩রা মাঘ নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। যথা গোবিন্দ দাসের করচার ৮৪ পৃষ্ঠায়—

"মাঘের তৃতীয় দিনে মোর গোরারায়।
সাঙ্গোপাঙ্গ সহ মিলি পুরীতে পৌছায়॥"

পার্থক্য নাই। কিন্তু কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচরিত মহাকাব্যে চৈতন্যদেবের নীলাচলে অবস্থান 'অষ্টাদশাহনি' অর্থাৎ আঠারদিন কথিত হইয়াছে—(চৈঃ চঃ ম-১২শ-৯৪)। কবিকর্ণপূরের এই কাব্যটী তাঁহার অষ্টাদশবর্ষ বয়সে রচিত। ইহা পড়িলেই মনে হয় যে কর্ণপূর অনেকস্থলে ঐতিহাসিকতা অপেক্ষা কল্পনাপ্রসূত বিবরণকে অধিকতর মূল্যবান্ বিবেচনা করিয়াছেন। নীলাচলে আসিয়া বাসুদেব সার্ব্বভৌমাদিকে চৈতন্যদেবের নিজ মতে আনয়ন ইত্যাদি কার্য্য আঠার দিনের মধ্যে সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব।

তাহার পর চৈতন্য চরিতামৃতে (মধ্য-১৬শপ-৩৭) এইরূপ বর্ণিত আছে—

"এইমত মহাপ্রভুর চারিবর্ষ গেল।
দক্ষিণ যাইতে আসিতে দুই বর্ষ হইল॥
আর দুই বর্ষ চাহে বৃন্দাবন যাইতে।
রামানন্দ হঠে [১] প্রভু না পারে চালতে॥
পঞ্চবর্ষে গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
রথদেখি না রহিলা গৌড়েরে চলিলা॥
তবে প্রভু সার্ব্বভৌম রামানন্দ-স্থানে।
আলিঙ্গন করি কহে মধুর বচনে॥
বহুত উৎকণ্ঠা মোর যাইতে বৃন্দাবন।
তোমা সভার হঠে দুই বর্ষ না কৈল গমন।
অবশ্য বলিব দুঁহে করহ সম্মতি।
তোমা দুঁহা বিনে মোর নাহি অন্য গতি॥
গৌড়-দেশে হয় মোর দুই সমাশ্রয়।
জননী, জাহ্নবী এই দুই দয়াময়॥
গৌড়দেশ দিয়া যাব তা সভা দেখিয়া।
তুমি দোঁহে আজ্ঞা দেহ প্রসন্ন হইয়া॥
শুনি প্রভুর বাণী দুঁহে মনে বিচারয়।
প্রভুসনে অতি হঠ কভু ভাল নয়॥
দুঁহে কহে এবে বর্ষা চলিতে নারিবা।
বিজয়া-দশমী আইলে অবশ্য চলিবা।"

১। পাঠে—বাধাদেওয়াতে।

আনন্দে বরিষা প্রভু কৈল সমাধান।
বিজয়া-দশমী দিনে করিলা প্রয়াণ॥"

ইহা হইতে বুঝা যায় যে ১৪৩১ শকে চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণকরিয়াছিলেন। তাহার পর সেই বৎসরই নীলাচলে আসিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যভ্রমণে দুই বৎসর অতীত হইয়াছিল। আমরা দেখিয়াছি যে তিনি ১৪৩৩ শকে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, তাহার পর আর দুই বৎসর বৃন্দাবনে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু সার্ব্বভৌম ও রামানন্দ নানা প্রকারের বাধা দেওয়ার নিমিত্ত যাইতে পারেন নাই।

এক পৌষমাসে শিবানন্দ তাঁহার গৃহে চৈতন্যদেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন,কিন্তু (চৈঃ চঃ নাঃ-৯ম-১০) তিনি রামানন্দ রায়ের অনুরোধে আসিতে পারেন নাই—(রাঃ বি-অনুবাদ) 'অনন্তর যথা নিয়মিত সময়ে (চৈতন্যদেব শিবানন্দ বাসস্থানে অর্থাৎ কুমারহট্টে) আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে গোদাবরী হইতে সমাগত রামানন্দরায়ের উপরোধে আর আসিতে পারিলেন না।' পুনরায় (ঐ-১৩)—

'স্ত্রী—নাথ! রামানন্দ চৈতন্যদেবকে গৌড় যাইতে নিষেধ করিলেন কেন তাহা বল।

পুরুষ—প্রিয়ে! রামানন্দ অতিশয় অনুরাগী, সুতরাং প্রভুর বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা সহিতে অসমর্থ। তজ্জন্যই তাঁহার উপরোধে ভগবান্ মথুরা-গমনেচ্ছু হইয়াও আজকাল করিয়া দুই বৎসর বিলম্ব করিয়াছেন।'

দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাগমনের পরে দুইবর্ষ অতীত হইলে অর্থাৎ ১৪৩৫ শকে তিনি বৃন্দাবন-যাত্রা স্থির করিলেন। পঞ্চমবর্ষে অর্থাৎ গৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাসের পঞ্চমবর্ষে (১৪৩৫ শকের ফাল্গুনে ৪ বৎসর অতীত হইয়াছিল) অর্থাৎ ১৪৩৬ শকে রথ-যাত্রা দেখিয়াই গৌড়ের

ভক্তগণ গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ঐ বৎসরের বর্ষাকাল অতীত হইলে অর্থাৎ ১৪৩৬ শকের (১৫১৪ খৃঃ) বিজয়া-দশমীতে জননী শচীদেবী এবং ভাগীরথী দেখিবার অভিপ্রায়ে গৌরাঙ্গদেব নীলাচল পরিত্যাগকরিয়াছিলেন।

নবদ্বীপ যাইবার পথে তিনি নৌকাযোগে পানিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে আসিয়াছিলেন। বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শনীতে লিখিত আছে যে কার্ত্তিকমাসের কৃষ্ণা দ্বাদশীতে [১] পাণিহাটীতে তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন। চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকের ৯ম অঙ্কের ৩০ হইতে ৩২ শ্লোকে বর্ণিত আছে যে চৈতন্যদেব একরাত্রি পাণিহাটীতে অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং তাহার পর দিনই (কৃষ্ণা ত্রয়োদশী দিবসে) কুমারহট্টে (হালিসহরে) শ্রীবাসপণ্ডিতের বাটীতে নৌকাযোগে গমন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণাত্রয়োদশীর রাত্রিশেষে গৌরাঙ্গদেব পুনরায় তরণীতে আরোহণপূর্ব্বক শিবানন্দের ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শিবানন্দগৃহে ক্ষণকাল অবস্থান করিয়া বাসুদেবের আবাসে আসিয়া-

১। আমরা পাণিহাটী-নিবাসী প্রত্নতত্ত্ববিশারদ অমূল্যচরণ রায় ভট্ট মহাশয়কে চৈতন্যদেবের পাণিহাটী-আগমনের তারিখের বিষয় লিখিয়াছিলাম; তিনি বলিয়াছেন এই তারিখ-সম্বন্ধীয় প্রবাদ চৈতন্যদেবের পাণিহাটীতে পদার্পণের সময় হইতেই এইস্থানে প্রচলিত আছে। বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী গ্রন্থপ্রণেতা মুরারিলাল অধিকারী মহাশয় আমাদিগকে লিখিয়াছেন—"শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সন্ন্যাসের পর জননী ও জন্মভূমি দর্শন করিতে আসিয়া শ্রীশ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শান্তিপুর-আলয়ে শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর তিরোভাববাসরে উৎসব করিয়াছিলেন। ঐ তিথি হইতে প্রামাণিক গ্রন্থ-অভাবে অমিয়নিমাইচরিত ধরিয়া দিনগণনা করিলে রাঘব-ভবনে তাঁহার আগমন কৃষ্ণাদ্বাদশীতে পাইবেন বলিয়া মনে হয়।"

১৩৪০ সালের (খৃঃ ১৯৩৩-৩৪) গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার ৪৪১ পৃষ্ঠায়, বৈষ্ণবদিগের পর্ব্বদিনবর্ণনাব্যপদেশে লিখিত আছে—"শ্রীপাট পাণিহাটীতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের আগমন-উপলক্ষে কালিপূজার ৪দিন পূর্ব্বে কৃষ্ণাদ্বাদশীতে তিথি পূজা হয়।"

১৮

ছিলেন। এবং সেইস্থানে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া নৌকারোহণ-পূর্ব্বক শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে উপনীত হইয়াছিলেন। অতএব আমরা দেখিতেছি ১৪৩৬ শকে (১৫১৪ খ্রীঃ) কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে কাঁচরাপাড়ায় শিবানন্দ সেন ও বাসুদেব দত্ত মহাশয়দিগের গৃহে চৈতন্যদেব পদার্পণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে অর্থাৎ শ্যামা পূজার পূর্ব্ব দিনেও এই স্মৃতিসভা কৃষ্ণ-দেবের মন্দিরপ্রাঙ্গণে আহুত হইতে পারে।

পাণিহাটীতে রাঘবের আশ্রমে এবং কুমারহট্টে শ্রীবাসের গৃহে এবং ঐ গ্রামের উত্তর ভাগে শিবানন্দ সেন এবং বাসুদেব দত্তের বাটীতে চৈতন্যদেবের অবস্থান বিষয়ে কবিকর্ণপূররচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত' মহাকাব্যের এবং তৎপ্রণীত 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের বর্ণনায় বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। চৈতন্যচরিত মহাকাব্যে লিখিত আছে যে রাঘবাশ্রমে গৌরচন্দ্র পাঁচদিন যাপন করিয়াছিলেন (২০শ সর্গ-১৩), এবং শ্রীবাসের গৃহে দুইতিন দিন অবস্থানকরতঃ প্রাণিমাত্রের প্রতি দয়ালু হইয়া সর্ব্বত্রই অনুকম্পাবিধান করিয়াছিলেন"............"রাত্রিকালে এক চোর (গৌরাঙ্গদেব) নৌকায় সেই গ্রামের উত্তরভাগে (বর্ত্তমান কাঞ্চনপল্লীতে) অন্য দেশ (নীলাচল কিম্বা পাণিহাটী) হইতে আসিয়া বাসুদেবের গৃহ বলিয়া গমনকরতঃ শিবানন্দের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এই গৃহে এক রাত্রি যাপনকরিয়া ঐ গ্রামের উত্তরে (কুমারহট্টের উত্তরে অর্থাৎ কাঞ্চনপল্লীতে) ভিক্ষা করিয়াছিলেন এবং সেই গ্রামের লক্ষসংখ্যক লোকের সহিত নৌকারূঢ় হইয়া শান্তিপুরে গমন করিয়াছিলেন" (২০শ সর্গ, ১৪-১৮)[১]। এই মহাকাব্যে শ্রীবাসের গৃহ কোন গ্রামে তাহা কবিকর্ণপূর লিখেন নাই। কবিকর্ণপূর

১। রামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃত অনুবাদ।

স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি মুরারিগুপ্তের করচা অবলম্বনকরিয়া এই মহাকাব্য রচনাকরিয়াছিলেন এবং চৈতন্যদেবের তিরোধানের নয় বৎসর পরে ১৪৬৪শকে (১৫৪২ খৃঃ) এই গ্রন্থ রচনাকরিয়াছিলেন। ইহাতে কতিপয় ঐতিহাসিক তথ্য থাকিলেও ইহাকে মহাকাব্যে পরিণত করিবার জন্য গ্রন্থকার অতিরঞ্জনের আশ্রয় গ্রহণকরিয়াছিলেন এবং তৎকৃত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের শেষভাগে এই নাটকের ঘটনাবলীর সত্যতা সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা তাঁহার মহাকাব্যসম্বন্ধে তিনি লিখেন নাই। এই নাটকখানি ১৪৯৪ শকে অর্থাৎ ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল, গ্রন্থকার বলিয়াছেন। এই নাটকের ১০ম অঙ্কের শেষে কবিকর্ণপূর লিখিয়াছেন—

. ..."চরিতমিদমমী কল্পিতং নোবিদন্তু ॥

শ্রীচৈতন্যকথা যথামতি যথাদৃষ্টং যথাকর্ণিতং

জগ্রন্থে কিয়তী তদীয়কৃপয়া বালেন যেয়ং ময়া

এতাং (চৈতন্যকথাং) তৎপ্রিয়মণ্ডলে শিব-শিব-স্মৃত্যৈকশেষং গতে

কো জানাতু শৃণোতু কস্তদনয়া কৃষ্ণঃ স্বয়ং প্রীয়তাং ॥"

"তাঁহারা এই লীলাকে যেন আমার স্বকপোল-কল্পিত বলিয়া জ্ঞান না করেন, এইমাত্র প্রার্থনা। আমি যেমন দেখিয়াছি ও যেমন শুনিয়াছি তদনুসারে এই শ্রীচৈতন্যের পবিত্র কথাবলীকে যথামতি গ্রন্থরূপে নিবদ্ধ করিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহার প্রিয়মণ্ডলী একেবারেই অন্তর্হিত, সুতরাং ইহা কে জানিবে আর কেবা শুনিবে, তবে এইমাত্র প্রার্থনা, যেন এই কথার কীর্তনগুণে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন [১]।"

১। রামনারায়ণ বিদ্যারত্নকৃত অনুবাদ।

কবিকর্ণপূর ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী ও বৈষ্ণবচরিতাভিধান)। চৈতন্যচরিত মহাকাব্য ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৮ বৎসর বয়সে তিনি রচনাকরিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ৪৮ বৎসর বয়সে তিনি প্রকাশকরিয়াছিলেন। ১৮ বৎসর বয়সের রচনায় কল্পনার আধিক্য থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কর্ণপূর মুরারিগুপ্তের করচা দেখিয়া এই মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। মুরারিগুপ্ত তাঁহার গ্রন্থ ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে (১৪৩৫ শকে) সমাপ্ত করেন। এই পুস্তকে চৈতন্যদেবের বরাহমূর্ত্তিধারণ, ষড়্‌ভূজমূর্ত্তিপ্রদর্শন, বৃন্দাবনে যাইয়া কৃষ্ণলীলার সমস্ত মূর্ত্তিপ্রকাশ (২৫ সর্গ), এমন কি বিভীষণের সহিত সাক্ষাৎ (২১ সর্গ) বর্ণিত হইয়াছে।

উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা হইতে অনুমিত হইবে যে চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকের বর্ণনা চৈতন্যচরিতমহাকাব্যের বর্ণনা অপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনা চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের বর্ণনাকে সমর্থন করে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থের মধ্যখণ্ডের ১৬শ পরিচ্ছেদে রাঘব পণ্ডিতের পাণিহাটীস্থ আশ্রমে চৈতন্যদেবের একদিন মাত্র অবস্থিতির কথা লিখিত আছে এবং তাহার পরদিন প্রাতে কুমারহট্টে শ্রীবাসের বাটীআগমনের কথা বর্ণিত আছে। তাহার পরে তিনি শিবানন্দ এবং বাসুদেবের গৃহে আসিয়াছিলেন এ কথাও লিখিত আছে। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে চৈতন্যদেবের নীলাচল হইতে শান্তিপুর এবং নবদ্বীপ হইয়া রূপ ও সনাতনের বাসস্থান রামকেলি গ্রামে [১] গমনের সময়ে তাঁহার পাণিহাটী ও কুমারহট্টে অবস্থিতির কোন বর্ণনা নাই। বৃন্দাবনদাস অতি সংক্ষেপে চৈতন্য-

১। মালদহের দক্ষিণ-পূর্ব্বে ৮।৯ ক্রোশ দূরে অবস্থিত (N. L. Dey)।

দেবের নীলাচল হইতে নবদ্বীপে আগমন বর্ণনা করিয়াছেন—অন্ত্য খণ্ড-তৃতীয় অধ্যায়—

"ঠাকুর থাকিয়া কত দিন নীলাচলে।
পুনঃ গৌড়দেশে আইলেন কুতূহলে॥
গঙ্গাপ্রতি মহা অনুরাগ বাঢ়াইয়া।
অতি শীঘ্র গৌড়দেশে আইল চলিয়া॥
সার্ব্বভৌম-ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি নাম।
শান্ত দান্ত ধর্ম্মশীল মহা ভাগ্যবান্॥
সব পারিষদ সঙ্গে শ্রীগৌরসুন্দর।
আচম্বিতে আসি উত্তরিলা তার ঘর॥"

বিদ্যাবাচস্পতি নবদ্বীপে অবস্থান করিতেন। এইস্থান হইতে চৈতন্যদেব রূপ ও সনাতনের বাসস্থান রামকেলি গ্রামে গিয়াছিলেন। সেইস্থান হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে তিনি শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যগৃহে দশ দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সেস্থান হইতে তিনি কুমারহট্টে শ্রীবাসগৃহে (পুনরায়) আসিয়াছিলেন (৫ম অধ্যায়)—

"কতদিন থাকি প্রভু অদ্বৈতের গৃহে।
আইলা কুমারহট্ট—শ্রীবাস মন্দিরে॥

* • *

বাসুদেব দত্ত আইলেন সেই ক্ষণে।
শিবানন্দ সেন আদি আপ্তবর্গ সনে॥

* * *

কতদিন থাকি প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
তবে গেলা পাণিহাটি রাঘবমন্দিরে॥

হেন মতে পাণিহাটি-গ্রাম ধন্য করি।
আছিলেন কতদিন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে।
মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে॥
সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে।
প্রভু দেখি ভাগবত লাগিলা পঢ়িতে॥

*

প্রভু বলে, 'ভাগবত এমন পঢ়িতে।
কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে॥'
এতেকে তোমার নাম ভাগবতাচার্য্য।
ইহা বিনা আর কোন না করিহ কার্য্য॥'

* • *

এই মত প্রতি গ্রামে গ্রামে গঙ্গাতীরে।
রহিয়া রহিয়া প্রভু ভক্তের মন্দিরে॥
সবার করিয়া মনোরথ পূর্ণকাম।
পুনঃ আইলেন প্রভু নীলাচল ধাম॥"

উপরিলিখিত বৃত্তান্ত হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে রামকেলি হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমনের সময়ে চৈতন্যদেব পুনবায় শান্তিপুর, কুমারহট্ট এবং পাণিহাটীতে আগমন করিয়াছিলেন। এবার কুমারহট্টের দক্ষিণাংশে শ্রীবাসের আলয়ে শিবানন্দ এবং বাসুদেবের সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং তিনি কুমারহট্টের উত্তরাংশে কাঞ্চনপল্লীতে শিবানন্দ এবং বাসুদেবের বাসস্থানে গমন করেন নাই। শ্রীবাসের বাটী হইতে তিনি পুনরায় পাণিহাটীতে আগমন-পূর্ব্বক বরাহনগর প্রভৃতি গঙ্গাতীরস্থ গ্রাম দিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন

করিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতমহাকাব্যে কবিকর্ণপূর চৈতন্যদেবের নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে কুমারহট্টের দক্ষিণাংশে শ্রীবাসের গৃহে এবং পাণিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের বাটীতে দীর্ঘ অবস্থানের সহিত তাঁহার নীলাচল হইতে নবদ্বীপ যাইবার পথে স্বল্প অবস্থান মিশ্রিত করিয়াছেন। যখন চৈতন্যদেব নীলাচল হইতে গৌড়ে আসিতেছিলেন, তখন তিনি জননী ও জাহ্নবীকে দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন। পাণিহাটী প্রভৃতি স্থানে গঙ্গা দেখিতে পাইলেও নবদ্বীপে শচীদেবীকে দেখিবার জন্য তিনি অতিশয় উৎসুক হইয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি যে রাঘব ও শ্রীবাসের বাটীতে একরাত্রির অধিক সময় অতিবাহিত করিবেন, ইহা সম্ভব হইতে পারে না।

শিবানন্দ সেন, তৎপুত্র কবিকর্ণপূর, বাসুদেব দত্ত ও জগদানন্দ পণ্ডিত মহোদয়দিগের আবির্ভাব ও তিরোভাবের কিম্বা চৈতন্যদেবের কাঞ্চনপল্লীতে শুভ পদার্পণের তারিখ ১৩৪০ সালের গুপ্তপ্রেসপঞ্জিকার কোন স্থানে দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু ইহাতে বিখ্যাত, অবিখ্যাত অনেক বৈষ্ণবের আবির্ভাব ও তিরোভাব, এমন কি দেওঘরসন্নিহিত একটী আধুনিক গ্রামের জগদ্ধাত্রীপূজা পর্য্যন্ত উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার কারণ কাঁচরাপাড়ার অধিবাসীদিগের জড়তা, নিশ্চেষ্টতা (apathy, indifference) ব্যতীত আর কিছুই নয়।

চৈতন্যদেব স্বর্গগত হইলেও তিনি আমাদের কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নিশ্চয়ই মনে করিতেছেন যে বর্ত্তমানে আমাদের ভিতর অনেক হিন্দু তাঁহার উপদেশের মর্ম্মগ্রহণ করিতে অপারগ হইয়াছেন। আমরা শারীরিক কারণের জন্য উচ্ছিষ্টভোজনের পক্ষপাতী নই। ভূঁইমালীর উচ্ছিষ্টভোজনের নিমিত্ত চৈতন্যদেব যে কালিদাসকে প্রশংসা করিয়াছিলেন তাহার প্রকৃত অর্থ এই যে ভূঁইমালীও যদি অকপট ভক্ত হন,

তিনি উচ্চজাতিদিগেরও সম্মানার্হ, কারণ তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং কুসংস্কারাধীন শ্লোকাভিমানী উচ্চজাতির হিন্দুগণ দেবমন্দিরের দ্বার তাঁহার সম্বন্ধে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেও, তাঁহার হৃদয়ের মন্দিরে তাঁহার প্রিয়তম দেবতা সর্ব্বদাই অধিষ্ঠিত আছেন। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে চৈতন্যদেবের সময়ে নীচজাতি অদর্শনীয় ছিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেব তাঁহাদিগকে সমধিক কৃপা করিতেন। (২৫৭ পৃঃ দেখুন)।

(১) রামানন্দ রায় শূদ্র হইলেও এবং সনাতন যবনসেবার জন্য 'পতিত' হইলেও তাঁহাদিগের নিকট হইতে চৈতন্যদেব কৃষ্ণপ্রেম শিক্ষা করিতে অপমান জ্ঞানকরেন নাই—যথা চৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য-৮ম পঃ-১৮)—

রামানন্দ রায় চৈতন্যদেবকে বলিতেছেন—

"সার্ব্বভৌমে তোমার কৃপা তার এই চিহ্ন।
অস্পৃশ্য স্পর্শিলে হঞা তার প্রেমাধীন॥
কাঁহা তুমি ঈশ্বর সাক্ষাৎ নারায়ণ।
কাঁহা মুঞি রাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধম॥
মোর দর্শন তোমার বেদে নিষেধয়।
মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা বেদভয়॥"

* * *

ইহার উত্তরে গৌরাঙ্গদেব বলিলেন—(ঐ-২৪)—

"প্রভু কহে তুমি ভাগবতোত্তম।
তোমার দর্শনে সভার দ্রবীভূত মন॥
আনের কা কথা আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী।
আমি হ তোমার স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসি॥

এই জানি কঠিন মোর হৃদয় শোধিতে।
সার্ব্বভৌম কহিলেন তোমারে মিলিতে॥"

নীলাচলে প্রদ্যুম্ন মিশ্র (ব্রাহ্মণ) চৈতন্যদেবের নিকট কৃষ্ণকথা শুনিতে চাহিলে তিনি তাঁহাকে শূদ্র রামানন্দ রায়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন—(চৈঃ-চঃ-অন্ত্য-৫ম-২-৪)—

"একদিন প্রদ্যুম্ন মিশ্র প্রভুর চরণে।
দণ্ডবৎ করি কিছু কৈল নিবেদনে॥
শুন প্রভু মুঞি দীন গৃহস্থ অধম।
কোন ভাগ্যে পাইঞাছো তোমার দুর্ল্লভ চরণ॥
কৃষ্ণকথা শুনিবারে মোর ইচ্ছা হয়।
কৃষ্ণকথা কহ মোরে হইয়া সদয়॥
প্রভু কহে কৃষ্ণকথা আমি নাহি জানি।
সবে রামানন্দ জানে তার মুখে শুনি॥
ভাগ্য তোমার কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন।
রামানন্দ পাশ যাই করহ শ্রবণ॥"

(২) সনাতনও নিজের নীচজাতিত্ব চৈতন্যদেবের নিকটে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ-মধ্য-২৪শ পঃ-২১৭)—

"পুনঃ সনাতন কহে যুড়ি দুই করে।
প্রভু আজ্ঞা দিল বৈষ্ণব-স্মৃতি করিবারে॥
মুঞি নীচজাতি কিছু না জানো আচার।
মোহ হৈতে কৈছে হয় স্মৃতিপরচার॥
সূত্র করি দিশা [১] যদি কর উপদেশ।
আপনে করহ যদি হৃদয়ে প্রবেশ॥

১। রীতি; প্রণালী।

তবে তার দিশা স্ফুরে মো নীচ হৃদয়ে।
ঈশ্বর তুমি যে কহাও সেই সিদ্ধ হয়ে॥
প্রভু কহে যে করিতে করিবে তুমি মন।
কৃষ্ণ সেই সেই তোমায় করাবে স্ফুরণ॥"

(৩) দ্বিজরাজ (ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ) অসাধারণ পণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য হরিদাসঠাকুর যবন হইলেও তাঁহার ঐকান্তিকী কৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গভক্তি দেখিয়া তাঁহাকে বারংবার প্রণাম করিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ মঃ-১৪শ-৪৭-৪৮)—

"হরিদাসং সমালোচ্য ভক্তিমানভবন্মহান্।
দণ্ডবদ্ভুবি হৃষ্টোঽসৌ পতিত্বা পুলকাচিতঃ॥৪৭
চকার ভূরিশঃ শ্রীমান্ প্রণামান্নতকন্ধরঃ।
কুলজাত্যনপেক্ষায় হরিদাসায় তে নমঃ॥৪৮"

(সার্ব্বভৌম) হরিদাসকে দেখিয়া হৃষ্ট এবং পুলকাকুল কলেবরে দণ্ডের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইয়া মহান্ ভক্তিমান্ হইলেন—৪৭।

"যাঁহাতে কুল ও জাতির অপেক্ষা নাই, সেই হরিদাসকে নমস্কার" এই বাক্য প্রয়োগকরতঃ শ্রীমান্ সার্ব্বভৌম নতকন্ধর হইয়া হরিদাসকে বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলেন॥৪৮॥

(৪) পুনরায় ঐ গ্রন্থে (১৭শ-১৪-১৫)—

"ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহং॥১৫॥
ইতি সংনিপঠ্য মধুরং মহাপ্রভুঃ
প্রণনাম ভূমিষু নিপত্য দণ্ডবৎ।"

চতুর্বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ আমার ভক্ত নহে কিন্তু আমার ভক্ত যদি শ্বপচ অর্থাৎ চণ্ডাল হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তিও আমার প্রিয়;

আমি তাহাকে দান করি এবং তাহারই নিকট হইতে গ্রহণ করি; আমি যেমন পূজনীয়, সে ব্যক্তিও তদ্রূপ পূজনীয় হয় ॥১৫॥

মহাপ্রভু এই শ্লোকটী মধুরস্বরে পাঠকরতঃ ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন।

চৈতন্যদেব সনাতনকে বলিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ-অন্ত্য-৪র্থ-২২)—

নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যে না ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি-বিচার॥
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনী বড় অভিমান॥

চৈতন্যদেব রামানন্দরায়কে বলিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ মধ্য-৮ম-৮৪)—

তোমার স্থানে আইলাম তোমার মহিমা শুনিয়া।
তুমি মোরে স্তুতি কর সন্ন্যাসী জানিয়া॥
কিবা বিপ্র, কিবা শূদ্র, ন্যাসী কেনে নয় [১]।
যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ব-বেত্তা সেই গুরু হয়॥

(৫) বল্লভভট্ট রূপ ও অনুপমকে আলিঙ্গন করিতে চাহিলে চৈতন্যদেব রহস্য করিয়া তাঁহাকে বলিলেন (চৈঃ চঃ-মধ্য-১৯শ-২৯-৩১)—

"ঞিহা না স্পর্শিহ ইহোঁ জাতি অতি হীন।
বৈদিক যাজ্ঞিক তুমি কুলীন প্রবীণ॥
দুহাঁর মুখে কৃষ্ণনাম নিরন্তর শুনি।
ভট্ট কহে প্রভুর কিছু ইঙ্গিত ভঙ্গী জানি॥

১। সন্ন্যাসী হউক না কেন।

ইহাঁর মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্ত্তন।
ইহঁত অধম নহে, হয় সর্ব্বোত্তম ॥২৯॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৩৩।৭)

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্ [১]।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥৩০॥

পদানুসরণ (নগেন্দ্র রায়)—

"আহা যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বর্ত্তমান, সে চণ্ডাল হইলেও গরীয়ান্, যাঁহারা তোমার নামগ্রহণ করেন তাঁহাদের তপস্যা, হোম, তীর্থস্নান, সদাচার ও বেদাদি অধ্যয়ন করা হয়।"

"শুনি মহাপ্রভু তারে বহু প্রশংসিলা।
প্রেমাবিষ্ট হঞা শ্লোক পঢ়িতে লাগিলা ॥৩১॥"

(৬) গৌরাঙ্গদেব নীলাচলে অবস্থিতির সময়ে আচণ্ডালে প্রেম-ভক্তি বিতরণ করিতেন (চৈঃ চঃ-মধ্য-১ম)—

'অন্ত্যলীলার সূত্র এবে শুন ভক্তগণ ॥
বৃন্দাবন হৈতে যদি নীলাচলে আইলা।
আঠারো বর্ষ তাঁহা বাস কাঁহো নাহি গেলা ॥
প্রতি বর্ষ আইসেন গৌড়ের ভক্তগণ।
চারিমাস রহে প্রভুর সঙ্গে সম্মিলন ॥

১। 'তব' স্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে। বিবক্ষাবশাৎ কারকাণি; আর্ষ প্রয়োগও বলা যাইতে পারে। কিম্বা ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্ম্মণি স্থানিনঃ—ত্বাং স্তোতুং। এইরূপ ষষ্ঠী স্থানে চতুর্থীর প্রয়োগ মুরারিগুপ্তের করচাতে আছে ২১শ-১৭-"বিভীষণো নাম ত্যক্ত্বা প্রযযৌ স চ।"

নিরন্তর নৃত্যগীত কীর্ত্তন-বিলাস।
আচণ্ডালে প্রেমভক্তি করিলা প্রকাশ ॥'

চৈতন্যদেবের নারীজাতির প্রতি আচরণে অনেক অসঙ্গতি আছে, ইহা প্রথমে আমাদিগের মনে হয়; কিন্তু ধীরভাবে আলোচনা করিলে এ বিষয়ের অনেক সন্দেহের নিরাকরণ হয়।

(১) গোবিন্দ দাসের করচার, ২৪ পৃষ্ঠায় সত্যবাই ও লক্ষ্মীবাই নাম্নী বেশ্যাদ্বয়ের চৈতন্যদেবদ্বারা উদ্ধার বর্ণিত আছে। দাক্ষিণাত্যে বটেশ্বর মন্দিরের নিকটে চৈতন্যদেবকে পরীক্ষাকরিবার জন্য তীর্থরাম নামা এক ধনবান্ যুবক সত্যবাই ও লক্ষ্মীবাই নাম্নী বারনারীদ্বয়কে তাঁহার নিকটে লইয়া আসিলে এবং তাহারা বেশ্যাজনোচিত হাব-ভাব প্রদর্শন করিলে,—

"সত্যেরে করিলা প্রভু মাতৃ-সম্বোধন ॥
থর থরি কাঁপে সত্য প্রভুর বচনে।
ইহা দেখি লক্ষ্মী বড় ভয় পায় মনে ॥
কিছুই বিকার নাহি প্রভুর মনেতে।
ধেয়ে গিয়া সত্যবালা পড়ে চরণেতে ॥
'কেন অপরাধী কর আমারে জননী'।
এইমাত্র বলি প্রভু পড়িলা ধরণী ॥
খসিল জটার ভার ধূলায় ধূসর।
অনুরাগে থর থর কাঁপে কলেবর ॥
সব এলো থেলো হলো প্রভুর আমার।
কোথা লক্ষ্মী কোথা সত্য নাহি দেখি আর ॥
নাচিতে লাগিলা প্রভু বলি হরি হরি।
লোমাঞ্চিত কলেবর অশ্রু দর দরি ॥

গিয়াছে কৌপীন খসি কোথা বহির্বাস।
উলঙ্গ হইয়া নাচে ঘন বহে শ্বাস॥
আছাড়িয়া পড়ে নাহি মানে কাঁটা খোঁচা।
ছিঁড়ে গেল কণ্ঠ হ'তে মালিকার গোছা॥
না খাইয়া অস্থিচর্ম্ম হইয়াছে সার।
ক্ষীণ অঙ্গে বহিতেছে শোণিতের ধার॥
হরি নামে মত্ত হয়ে নাচে গোরা রায়।
অঙ্গ হতে অদভূত তেজ বাহিরায়॥
ইহা দেখি সেই ধনী মনে চমকিল।
চরণতলেতে পড়ি আশ্রয় লইল॥
চরণে দলেন তারে নাহি বাহ্যজ্ঞান।
হরি ব'লে বাহুতুলে নাচে আগুয়ান্॥
সত্যেরে বাহুতে ছাঁদি বলে, 'বল হরি।
হরি বল প্রাণেশ্বর মুকুন্দ মুরারি[১]॥'
কোথা প্রভু, কোথায় বা মুকুন্দ, মুরারি।
অজ্ঞান হইলা সবে এই ভাব হেরি॥
হরি-নামে মত্ত প্রভু নাহি বাহ্য জ্ঞান।
ঘাড়ি ভেঙ্গে পড়িতেছে আকুল পরাণ॥
মুখে লালা অঙ্গে ধূলা নাহিক বসন।
কণ্টকিত কলেবর মুদিত নয়ন॥

১। চৈতন্যদেব বলিলেন, 'আমার প্রাণেশ্বর হরি, মুকুন্দ ও মুরারির—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন নাম—উচ্চারণ কর'। গোবিন্দ মনে করিলেন যে, চৈতন্যদেব তাঁহার অনুচর মুকুন্দ ও মুরারিকে সম্বোধনকরিতেছেন।

ভাব দেখি যত বৌদ্ধ বলে হরি হরি।
শুনিয়া গোরার চক্ষে বহে অশ্রুবারি ॥
পিচকিরি সম অশ্রু বহিতে লাগিল।
ইহা দেখি তীর্থরাম কাঁদিয়া উঠিল ॥
বড়ই পাষণ্ড মুহি বলে তীর্থরাম।
কৃপা করি দেহ মোরে প্রভু হরি-নাম ॥
তীর্থরাম পাষণ্ডেরে করি আলিঙ্গন।
প্রভু বলে তীর্থরাম তুমি সাধুজন ॥
পবিত্র হইনু আমি পরশি তোমারে।
"তুমি ত প্রধান ভক্ত" কহে বারে বারে ॥

চৈতন্যদেবের এইরূপ ভাবাবেশ বাসুদেবঘোষাদি ভক্তগণ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ভগবানের বিরহে অতীব শোকার্ত্ত হইয়া এবং ভগবদ্দর্শনে অতিশয় আনন্দিত হইয়া জ্ঞানশূন্য হইতেন—

"সিংহদ্বার ত্যজি গোরা সমুদ্র আড়ে ধায়।
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ সবারে সুধায় ॥
চৌদিগে ভকতগণ হরি-গুণ গায়।
মাঝে কনয়া-গিরি [১] ধূলায় লোটায় ॥
আছাড়িয়া পড়ে অঙ্গ ভূমে গড়ি যায়।
দীঘল শরীরে গোরা পড়ি মূরছায় ॥
উত্তান-নয়ন মুখে ফেন বাহিরায়।
বাসুদেব ঘোষের হিয়া বিদরিয়া যায় ॥১৬৬৪॥

১। চৈতন্যদেবের সোণার মত রং ছিল এবং তিনি দীর্ঘাকার ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে কনকগিরি বলিত।

চেতন পাইয়া গোরা রায়।
ভূমে পড়ি ইতি উতি চায়॥
সমুখে স্বরূপ রাম রায়।
দেখি পহুঁ করে হায় হায়॥
কাঁহা মোর মুরলী-বদন।
এখনি পাইনু দরশন॥
ওহে নাথ পরম করুণ।
কৃপা করি দেহ দরশন॥
এত বিলপয়ে গোরাচান্দে।
দেখিয়া ভকতগণ কান্দে॥১৬৬৫॥

কি বলিব বিধাতারে এ দুখ সহায়।
গোরা-মুখ হেরি কেনে পরাণ না যায়॥
মলিন বদনে বসি আঁখি-যুগ ঝরে।
আকাশ-গঙ্গার ধারা সুমেরু-শিখরে॥
ক্ষণে মুখ শির ঘষে ক্ষণে উঠি ধায়।
অতি দুরবল ভূমে পড়ি মুরছায়॥
নাসায় নাহিক শ্বাস দেখি সবে কান্দে।
চৈতন্যদাসের [২] হিয়া থির নাহি বান্ধে॥১৮৬৮॥

(পদকল্পতরু)

২। এ চৈতন্যদাস শিবানন্দ সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র কি না আমরা নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি না। কারণ এই নামে বৈষ্ণবদিগদর্শনী মতে অন্ততঃ আর দুই জন চৈতন্যদাস ছিলেন।

(২) তাহার পর জিজুরীতে গমনপূর্ব্বক চৈতন্যদেব মুরারি-দিগকে উদ্ধারকরিয়াছিলেন। ইহাদের নির্দ্দয় পিতামাতা ইহাদিগকে খাণ্ডবা-দেবতার দাসী করিয়া বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বনকরিতে বাধ্য করিয়াছিল। ইহারা অনেক তীর্থযাত্রীকে প্রলোভন-দ্বারা পাপপথের পথিক করিত। যথা গোবিন্দদাসের করচার ৫৫ পৃষ্ঠায়—

"খাণ্ডবা নামেতে দেব আছে জিজুরীতে।
প্রভুর সহিতে যাই খাণ্ডবা দেখিতে॥
যে নারীর বিবাহ না হয় নানা বাদে।
তার পরিণয় হয় খাণ্ডবা-প্রসাদে॥
খাণ্ডবার কাছে কন্যা পিতামাতা আনি।
খাণ্ডবারে কন্যা দেয় বহু ভক্তি মানি॥
দরিদ্র পিতার কন্যা এখানে থাকিয়া।
খাণ্ডবার সেবা করে আদর করিয়া॥
খাণ্ডবারে পতি ভাবি কত শত নারী।
ক্রমে ক্রমে হইয়াছে পথের ভিকারী॥
প্রতারিত হয়ে সবে খাণ্ডবার স্থানে।
বেশ্যাবৃত্তি কত নারী করিছে এখানে॥
খাণ্ডবার পত্নী বলি পাপ কর্ম্ম করে।
তাহাদের বড়ই দুর্গতি হয় পরে॥
তীর্থ করিবারে এথা আসে বহু জন।
কৌশলে তাদের করে নরকে পাতন॥
এই স্থানে আসে যত দরিদ্র কুমারী।
বিয়া করে বলে মোরা খাণ্ডবার নারী॥

ইহা শুনি দেখিবারে প্রভু নারীগণে।
উপস্থিত হৈলা তথা অতি সঙ্গোপনে॥
ইঁহাদের ডাকে লোকে মুরারি বলিয়া।
প্রভুর হইল দয়া মুরারি দেখিয়া॥
মুরারিগণের দুঃখ শুনিলে শ্রবণে।
দয়া উপজয়ে অতি নিঠুরের মনে॥
কেমন নিঠুর পিতা বলিতে না পারি।
কেমনে মুরারি করে আপন কুমারী॥
এই বাক্য শুনি প্রভু যত নারীগণে।
উদ্ধার করিতে যায় মুরারিপ্রাঙ্গণে॥
মুহি বলি সে স্থানেতে গিয়া কায নাই
না শুনিলা মোর বাণী চৈতন্য গোঁসাই
মুরারিপল্লীর মধ্যে মোর প্রভু গিয়া।
পবিত্র করিল সবে হরিনাম দিয়া॥
রমণীগণের দুঃখ সহিতে না পারি।
উদ্ধারকরিতে চাহে যতেক মুরারি॥
আশ্চর্য্য প্রভুর ভাব শুনি নিজ কাণে।
ক্রমে ক্রমে বহু নারী আসে এই স্থানে
নারীগণে বলে প্রভু কর হরিনাম।
নাম-বলে অবশ্য পাইবে নিত্যধাম॥
বড়ই দয়াল হরি অগতির গতি।
তাঁহাকে ভাবহ সবে নিজ নিজ পতি॥
কৃষ্ণকে পাইতে পতি যত গোপীগণ।
কাত্যায়নী-ব্রত করে হয়ে শুদ্ধমন॥

কৃষ্ণ পতি হইলে না রবে ভবভয়।
কৃষ্ণ সকলের পতি জানহ নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সদা ডাক ভক্তি-ভরে।
সর্ব্বদা বলহ মুখে 'হরে কৃষ্ণ হরে ॥'
এত বলি প্রভু মোর নাম আরম্ভিল।
অমনি তাঁহার দেহ পুলকে পূরিল ॥
দেখিয়া প্রভুর ভাব যত নারীগণ।
পূজিতে লাগিলা সবে প্রভুর চরণ ॥
প্রভু বলে ভিক্ষা করি গৃহস্থের দ্বারে।
নিতান্ত অস্পৃশ্য মুহি ছুঁওনা আমারে ॥
ভক্তি করি হরি বল ঘুচিবেক তাপ।
নামবলে ভস্ম হবে সকলের পাপ ॥
না বুঝিয়া যেই জন পাপে মগ্ন হয়।
হরিনামবলে তার পাপ হয় ক্ষয় ॥
উপদেশ শুনি যত খাণ্ডবার নারী।
প্রভুর নিকটে দাঁড়াইলা সারি সারি ॥
আসিয়া ইন্দিরা বাই করযোড়ে কয়।
দয়া কর আমারে সন্ন্যাসী-মহাশয় ॥
বৃদ্ধ হইয়াছি মুহি কুকর্ম্ম করিয়া।
উদ্ধার করহ মোরে পদধূলি দিয়া ॥
এত বলি ইন্দিরা ধূলায় লুটি যায়।
নাম দিয়া প্রভু উদ্ধারিল ইন্দিরায় ॥
হরিনাম পেয়ে তবে ইন্দিরা-সুন্দরী।
গৃহ থেকে বাহিরিল সব ত্যাগকরি ॥

সেই দিন হইতে যত খাণ্ডবার নারী।
মত্ত হইলা হরিনামে চক্ষে বহে বারি ॥
এমন দয়াল প্রভু কভু দেখি নাই।
কত পাপী উদ্ধারিল লেখা জোখা নাই।"

(৩) তাহার পর ঘোগানামক গ্রামে বারমুখী-নাম্নী বেশ্যাকে গৌরাঙ্গদেব উদ্ধারকরিয়াছিলেন; যথা গোবিন্দদাসের করচায় (৬৩-৬৭ পৃঃ)—

"বারমুখী নামে বেশ্যা থাকে এক ঠাঁই।
তাহার ধনের কথা কহিবারে নাই ॥
বেশ্যাবৃত্তি করি সাধিয়াছে বহু ধন।
বহু মূল্য হয় তার বসনভূষণ ॥
প্রকাণ্ড বাড়ীর মধ্যে বারমুখী থাকে।
হরিতে ধনীর ধন ফিরে পাকে পাকে ॥
* * *
প্রকাণ্ড বাগিচা নাম পিয়ার কানন।
কাননের ধারে প্রভু করিলা গমন ॥
অতি বড় নিম্ববৃক্ষ আছে এই স্থানে।
কি ভাবিয়া প্রভু গিয়া বসিলা সেখানে ॥
* * *
নাম আরম্ভিলা প্রভু দিয়া করতালি ॥
* * *
বহুতর লোক ছুটে নাম শুনিবারে।
অশ্রু বহে প্রভুর নয়নে শতধারে ॥

পিচ্‌কিরিসম অশ্রু বহিতে লাগিল।
তাহা দেখি ঘোগাবাসী আশ্চর্য্য হইল॥
দেখিয়া প্রভুর সেই হরিসঙ্কীর্ত্তন।
মাতিয়া উঠিল প্রেমে দুই চারি জন॥
গ্রাম্য লোকজনের নয়নে বহে বারি।
বহু লোক আসি দাঁড়াইলা সারি সারি॥

* * *

আধ-নিমীলিত চক্ষু জটা এলায়েছে।
ধূলামাটী মেখে অঙ্গ মলিন হয়েছে॥
'কোথায় প্রাণের কৃষ্ণ' এই বলি ডাকে।
কখন বা হাত তুলি উর্দ্ধ মুখে থাকে॥
'গোবিন্দরে! কাঁহা কৃষ্ণ মিলাও আনিয়া।
কোথায় প্রাণের কৃষ্ণ দেহ দেখাইয়া॥'
একবার ঐ বলি ধাইয়া যাইল।
বাহু পশারিয়া নিম্বে জড়ায়ে ধরিল॥
ঈশ্বরের প্রেমে মত্ত হইল নিমাই।
এমন উন্মাদ মুহি কভু দেখি নাই॥
বহুদিন সঙ্গে থাকি ফিরি নানা দেশ।
দেখি নাই কেনে দিন এমন আবেশ॥

* * *

প্রকাণ্ড এক গর্ত্ত ছিল সড়কের ধারে।
আবেশে গড়ায়ে পড়ে তাহার ভিতরে॥
একজন দুষ্ট আসি করি হানা পানা।
প্রভুরে বলিলা, 'কেন কর প্রবঞ্চনা॥

গ্রাম্য লোকে ভুলাইয়া অর্থ লবে হরি।
তাই বেড়াইছ তুমি হরিধ্বনি করি॥
সন্ন্যাসীর পরীক্ষা লইতে আসিয়াছি।
কত শত কপট সন্ন্যাসী দেখিয়াছি॥'
সে পাষণ্ড এই কথা কহিলা যখন।
প্রহার করিতে তারে চাহে গ্রাম্য জন॥
প্রভু বলে, 'ভাই সব মারিবে কাহারে।
হরিনাম সুধা পান করাও উহারে॥
পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ হয়েছে উহার।
উহার বদনে সুধা দেহ এক বার॥
ভক্তিবিনা শুকায়েছে উহার হৃদয়।
নাম দিয়া নাশহ উহার যমভয়॥
মরুভূমি সম হয় পাষণ্ডের মন।
উৎপাদিকা শক্তি তাহে করহ অর্পণ॥'
'এস সাধু মোর কাছে হরিনাম দিব।
তোমার পাপের ভার উতারিয়া নিব॥
সব তাপ দূর হবে এই মন্ত্র-বলে।
হরিনাম মন্ত্র পাঠে সদ্য ফল ফলে॥
এই মহামন্ত্র পাঠ করে যেই জন।
সে পাপী নরকে কভু না করে গমন॥
এমন সুলভ মন্ত্র থাকিতে জগতে।
পাপী কেন অনর্থক ফিরে মন্দ পথে॥
এত বলি মহাপ্রভু তার কাছে গিয়া।
হরিনাম সুধা কর্ণে দিলেন ঢালিয়া॥

দয়াল চৈতন্য জীবে করিতে নিস্তার।
ভ্রমিছেন ইতি উতি হয়ে নির্ব্বিকার॥
জানালা হইতে দেখি এসব ব্যাপার।
বারমুখী মনে মনে করয়ে বিচার॥
আশ্চর্য্য প্রভুর দয়া দেখিয়া নয়নে।
আপনারে ধিক্ দেয় বসিয়া নির্জ্জনে॥
বারমুখী বলে, ‘ছি ছি অর্থের লাগিয়া।
দিনে শতবার দেহ ফেলাই বেচিয়া॥
পাপমূর্ত্তি পরপুরুষের সঙ্গে মেলি।
ছি ছি নিত্য নিত্য আমি করি কাম-কেলি॥
এই যে সন্ন্যাসী দেখি ঈশ্বর-সমান।
সব ছাড়ি যাই মুহি এর বিদ্যমান॥
সন্ন্যাসীর টাকাকড়ি সঙ্গে কিছু নাই।
তবে কেন উহারে দেখিয়া সুখ পাই॥
কেন বা নরক-ভোগ ঘরে বসে করি।
আমার প্রতি কি দয়া না করিবে হরি॥
বালাজী দুষ্টের কাণে কি মন্ত্র পড়িয়া।
এই ত সন্ন্যাসী দিলা উদ্ধারকরিয়া॥
ইহার নিকটে গিয়া পাপক্ষয় করি।
কাছে গিয়া জড়াইয়া পদ চাপি ধরি॥’

ক্ষণকাল পরে বেশ্যা নামিয়া আসিল।
মীরানামে তার দাসী পেছনে চলিল॥

বারমুখী বলে তবে বিনয়ে মীরারে।
আজি হৈতে সর্ব্ব ধন দিলাম তোমারে।
বহু অর্থ আছে মোর সব তুচ্ছ করি।
'আজি হৈতে হইলাম পথের ভিকারী ॥'
এলাইয়া দিলা কেশ বারমুখী দাসী।
স্থির বিদ্যুতের পাশে যেন মেঘরাশি ॥
নিতম্ব ছাড়িয়া পড়ে দীর্ঘ কেশজাল।
নয়ন মুদিয়া রহে শচীর দুলাল ॥
আশ্চর্য্য রূপের ছটা সকলে দেখিয়া।
তাহার বদন পানে রহে তাকাইয়া ॥
বারমুখী হাত যোড়ি কহে বার বার।
'বন্ধন কাটিয়া দেহ সন্ন্যাসী আমার ॥
বড়ই পাপিষ্ঠা মুহি নরকের কীট।
যদি দয়া নাহি কর যাব পিট পিট ॥
দাসীরে বলিয়া দেহ কিসে ত্রাণ পাব।
মরণান্তে যমভয় কিরূপে এড়াব ॥
এই পাপ-দেহে আর কিবা প্রয়োজন।
এত বলি দীর্ঘ কেশ করিলা ছেদন ॥
সামান্য বসন পরি লজ্জা নিবারিল।
যোড় হস্তে প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইল ॥
প্রভু বলে, 'বারমুখী তুই চারি কথা।
তোমারে কহিয়া দেই করহ সর্ব্বথা ॥
এই স্থানে করি তুমি তুলসী-কানন।
তার মাঝে থাকি কর কৃষ্ণের সাধন ॥'

'তুমি কৃষ্ণ, তুমি হরি,' বারমুখী বলে।
এইমাত্র বলি পড়ে প্রভু-পদতলে॥
বারমুখী পদতলে যখন পড়িল।
তিন চারি পদ প্রভু অমনি হটিল॥
আর যত লোক ছিল কাছে দাঁড়াইয়া।
ধন্য ধন্য করে সবে বেশ্যারে দেখিয়া॥"

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে চৈতন্যদেব নিজে সত্যবাই, লক্ষ্মীবাই কিম্বা বারমুখীর নিকট যান্ নাই। তাহারা তাঁহার নিকট আসিয়াছিল। ইন্দিরা প্রভৃতি মুরারির নিকট তিনি গিয়াছিলেন, কারণ তাহারা স্বেচ্ছায় এই জঘন্য বৃত্তি অবলম্বন করে নাই, তাহাদের নিষ্ঠুর পিতামাতা বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে তাহাদিগকে বাধ্য করিয়াছিল এবং তাহারা দেবস্থান অপবিত্র করিতেছিল এবং অনেক তীর্থ-যাত্রীকে প্রলুব্ধ করিয়া পাপপথে লইয়া যাইতেছিল। সত্যবাইকে যখন তিনি আলিঙ্গনকরিয়াছিলেন তখন ভগবৎপ্রেমাবেশ-নিমিত্ত তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ছিল না, তাঁহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল এবং তিনি তীর্থরামকে পদদলিত করিতেছিলেন।

(৪) তিনি যেরূপ অজ্ঞানাবস্থায় সত্যবাইকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি নীলাচলের সন্নিহিত যমেশ্বরটোটায় দূর হইতে গীতগোবিন্দের সুমধুর গুর্জ্জরীরাগ শ্রবণে উন্মত্ত হইয়া শিজের কাঁটা অগ্রাহ্য করিয়া গায়িকা-অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন, কিন্তু যখন তাঁহার ভৃত্য গোবিন্দ তাহাকে ধরিয়া কোলে লইলেন এবং দেবদাসী গান করিতেছে এই কথা তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, তখন তিনি বলিলেন—

"প্রভু কহে গোবিন্দ আজি রাখিলে জীবন।
স্ত্রীস্পর্শ হইলে আমার হইত মরণ॥"

(চৈঃ চঃ-অন্ত্য-১৩শ)

এই প্রশ্ন হইতে পারে যে গোবিন্দকে সত্যবাই-আলিঙ্গনের পরে চৈতন্যদেব এরূপ কথা বলেন নাই কেন। আমাদের মনে হয় যে গোবিন্দ নিজের ত্রুটী বুঝিতে পারিয়া এবং চৈতন্যদেব শুনিলে সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইবেন ভাবিয়া তিনি এ বিষয়ের কোন উল্লেখ করেন নাই। চৈতন্যদেবও সে সময়ে অজ্ঞান থাকার নিমিত্ত এ বিষয় একেবারেই অবগত হন্ নাই।

নীলাচলে একটী 'তপস্বিনী সতী', 'সুন্দরী যুবতী' উড়িয়া ব্রাহ্মণ-বিধবার পুত্র চৈতন্যদেবের নিকট প্রত্যহ আসিতেন এবং সে পিতৃহীন বলিয়া ও তাহার 'মহাসুন্দর মৃদু ব্যবহার' দেখিয়া, তিনি তাহাকে স্নেহ প্রদর্শনকরিতেন। চৈতন্যদেবের এরূপ আচরণ লোকচক্ষুতে নিন্দনীয় হইতে পারে, এ কথা দামোদর তাঁহাকে বলিলে তিনি আন্তরিক সন্তোষপ্রকাশ করিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ-অন্ত্য-৩য় প)।

(৫) চৈতন্যদেব সন্ন্যাসগ্রহণের পর কেবল তাঁহার মাতা ও মাতৃস্থানীয়া মালিনীর ন্যায় (শ্রীবাসের পত্নী, চৈঃ চঃ-অন্ত্য-১২ প-২৩) দুই একজন স্ত্রীলোককে তাঁহার নিকটে আসিতে দিতেন। বারমুখী দুষ্টবালাজীর উদ্ধারের পর নিজের অধোগতির জন্য মর্ম্মাহতা হইয়া চৈতন্যদেবের সমক্ষে নিজের স্বাভাবিক বেশে আসিলে, তিনি চক্ষু মুদিয়া রহিয়াছিলেন। কিন্তু যখন বারমুখী তাহার দীর্ঘ কেশ কর্ত্তন-পূর্ব্বক সামান্য বসন পরিধানকরিয়া তাঁহার নিকট আসিল, তখন তিনি তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিলেন এবং বারমুখী তাঁহার পদতলে পড়িলে তিনি তিন চারি পদ পশ্চাতে যাইলেন।

(৬) চৈতন্যদেব রাজদর্শন ও স্ত্রীদর্শন বিষের ন্যায় পরিত্যাগ করিতেন—

"সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজদরশন।
স্ত্রী-দরশন সম বিষের ভক্ষণ॥"

(চৈঃ চঃ-মধ্য-১১শ পঃ-৬)

নীলাচলে সমাগত বৈষ্ণবগণের পত্নীরা দূর হইতে তাঁহাকে দর্শন করিতেন—

"এথা সব বৈষ্ণবগণ আসিঞা মিলিলা॥
পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু সভার মিলন।
স্ত্রীসব দূরে রহি কৈল প্রভুর দর্শন॥"

(চৈঃ চঃ-অন্ত্য-১২শ পঃ-১৬)

(৭) ছোট হরিদাস নামে একজন গৌরাঙ্গদেবের ভক্ত কীর্ত্তনীয়া ছিলেন (চৈঃ চঃ-অন্ত্য-২য় পঃ-৪৬)। বৈষ্ণব ভগবান্-আচার্য্য চৈতন্যদেবকে ভিক্ষা দিবার মানসে শুক্লচাউলের (আতপ তণ্ডুলের) নিমিত্ত বৈষ্ণব শিখিমাহিতীর 'বৃদ্ধাতপস্বিনী, পরমবৈষ্ণবী' ভগ্নী মাধবীদেবীর নিকট হরিদাসকে পাঠাইয়াছিলেন। যখন চৈতন্যদেব জানিতে পারিলেন যে হরিদাস মাধবীর নিকট হইতে চাউল-সংগ্রহ করিয়াছিলেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন—

"প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥"

অর্থাৎ কাষ্ঠনির্ম্মিতা স্ত্রীমূর্ত্তিও মুনির মনকে প্রলুব্ধ করিতে পারে।

ইহার পরে স্বরূপ, পরমানন্দপুরী প্রভৃতি প্রিয়তম ভক্তগণের

অনুরোধ-সত্ত্বেও তিনি ছোট হরিদাসকে তাঁহার সমক্ষে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে তাঁহাকে হরিদাসের বিষয়ে আর অনুরোধ করিলে তিনি নীলাচল পরিত্যাগকরিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবেন (চৈঃ চঃ-অন্ত্য-২য়-৫৫)। হরিদাস মর্ম্মাহত হইয়া প্রয়াগের ত্রিবেণীতে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

চৈতন্যদেব তাঁহার দাক্ষিণাত্যভ্রমণের সঙ্গী কুলীনব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাসকে এক ভট্টমারি-স্ত্রীর প্রতি আসক্তিনিমিত্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

(৮) একবার (চৈঃ চঃ-অন্ত্য ১৪শ পঃ-১১) নীলাচলে যখন চৈতন্যদেব জগন্নাথদেবের মন্দিরের অভ্যন্তরে গরুড়-মূর্ত্তির পশ্চাৎ হইতে জগন্নাথদেবকে দর্শন করিতেছিলেন, অত্যন্ত ভিড় হওয়াতে 'এক উড়িয়া স্ত্রী' গরুড়ের উপর চড়িয়া ও চৈতন্যদেবের 'কান্ধের' উপর তাহার 'পদদিঞা' জগন্নাথদেবকে দেখিতে লাগিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া গোবিন্দ তাহাকে তিরস্কারকরিলেন—

"দেখি গোবিন্দ অস্ত-ব্যস্তে স্ত্রীকে বর্জ্জিলা।
তারে নামাইতে প্রভু গোবিন্দে নিষেধিলা॥

*　　　*　　　*

জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু মনপ্রাণে।
মোর কান্ধে পদ দিঞাছে তাহা নাহি জানে॥
অহো ভাগ্যবতী এই বন্দ ইহার পায়।
ইহার প্রসাদে ঐছে আমার বা হয়॥"

ইহা হইতে অনুমিত হইবে যে চৈতন্যদেব নারীজাতিকে ঘৃণা করিতেন না, কিন্তু পাছে অবাধ মিশ্রণে তাঁহার চিত্ত কলুষিত হয় এবং তিনি আদর্শ সন্ন্যাসধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হন এবং তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাকে অনুকরণকরিয়া বিশুদ্ধ ভক্তি ও প্রেমের পথ হইতে ভ্রষ্ট হন, সেইজন্য

তিনি এ বিষয়ে একটী কঠিন নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। এই উড়িয়া নারী চৈতন্যদেবের স্কন্ধে পদ স্থাপিত করিয়া একাগ্রচিত্তে তাঁহার প্রিয়তম দেবতাকে দর্শনকরিতেছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে এ নিয়মের ব্যতিক্রম চৈতন্যদেব করিয়াছিলেন, কারণ ইনি তাঁহার ভগবদুপাসনায় অন্তরায় না হইয়া সহায়ক হইয়াছিলেন। ছোট হরিদাস সম্ভবতঃ যুবক ছিলেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে পূর্ব্বে বোধহয় চৈতন্যদেব কিছু শুনিয়া থাকিবেন, সেইজন্য তাঁহার প্রতি এরূপ কঠোর ব্যবহার করিয়াছিলেন।

আমরা চৈতন্যভাগবতে (অন্ত্য-৬ষ্ঠ অধ্যায়ে) দেখিতে পাই যে তিনি নিত্যানন্দ সম্বন্ধে এই শ্লোক রচনাকরিয়াছিলেন—

"গৃহ্ণীয়াদ্ যবণীপাণিং বিশেদ্ বা শৌণ্ডিকালয়ম্।
তথাপি ব্রহ্মণোবন্দ্যং নিত্যানন্দপদাম্বুজং ॥"

চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে সমধিক স্নেহ ও সম্মান করিতেন। গৌড়ে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারবিষয়ে, অদ্বৈতাচার্য্য, বিশেষতঃ নিত্যানন্দ, চৈতন্য-দেবকে অনেক সাহায্যকরিয়াছিলেন। যবনীকে বিবাহ করিলে নিত্যানন্দের জাতি যাইতে পারিত, কিন্তু তাঁহার নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক অবনতি নিশ্চয়ই যে হইত, ইহা জোর করিয়া বলা যায় না। কারণ (বড়) হরিদাসও ত যবন ছিলেন। শৌণ্ডিকালয়ে প্রবেশ এবং সুরাপান দুইটা বিভিন্ন জিনিষ। চৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন যে নিত্যানন্দের ভগবদ্ভক্তি ও প্রেম এত উচ্চ শ্রেণীর ছিল যে এ সকল দূষণীয় কার্য্যদ্বারা তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতি ব্যাহত হইত না। ইহা নিত্যানন্দকে বড় করিবার নিমিত্ত একটা 'কথার কথা' বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

রামানন্দরায়ের বৈষ্ণবত্ব-সম্বন্ধেও চৈতন্যদেবের অতিশয় উচ্চ ধারণা ছিল। তিনি জগন্নাথবল্লভ-নামক নাটকের অভিনয়জন্য দুইটী

দেবদাসীকে শিক্ষাদান করিতেন (চৈঃ চঃ-অন্ত্য-৫ম পঃ) এবং নিজহস্তে তাহাদিগের বেশভূষা সম্পাদনকরিতেন। রামানন্দের নিকট 'কৃষ্ণকথা' শুনিবার নিমিত্ত চৈতন্যদেব প্রদ্যুম্নমিশ্রকে প্রেরণ করিলে, প্রদ্যুম্ন রামানন্দের এরূপ আচরণের বিষয় তাঁহাকে জ্ঞাপনকরিলেন; কিন্তু চৈতন্যদেব তাঁহাকে বলিলেন—

"আমি ত সন্ন্যাসী আপনাকে বিরক্ত করি মানি।
দর্শন দূরে প্রকৃতির নাম যদি শুনি॥
তবহু বিকার পায় আমা সভার মন।
প্রকৃতি-দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন॥
রামানন্দ রায়ের কথা শুন সর্ব্বজন।
কহিবার কথা নহে আশ্চয্য কথন॥

* * *

নির্ব্বিকার দেহমন কাষ্ঠ পাষাণসম।
আশ্চর্য্য তরুণীস্পর্শে নির্ব্বিকার মন॥
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।
তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার॥"

আমাদিগের মনে হয় নিত্যানন্দের সম্বন্ধে চৈতন্যদেবের শ্লোক এবং রামানন্দ-সম্বন্ধে তাঁহার এই সকল উক্তি তাঁহার বৈষ্ণবভক্তগণ তাঁহাদিগের কল্পনাশক্তি-দ্বারা উদ্ভাবিত করিয়াছেন। রামানন্দ-সম্বন্ধে কতকগুলি কথা চৈতন্যদেবকে আরোপ করা হইয়াছে যাহা চৈতন্যদেবের ন্যায় সংযমী ও নিষ্কলঙ্ক সন্ন্যাসীর উক্তি বলিয়া কখন গ্রহণ করা যাইতে পারে না। এই সকল বর্ণনার উদ্দেশ্য চৈতন্যদেব অপেক্ষা নিত্যানন্দ ও রামানন্দরায়কে শ্রেষ্ঠতর প্রতিপন্ন করা।

যাঁহারা ভগবৎপ্রেমাবেশে সংজ্ঞাহীন চৈতন্যদেবের সত্যবাই-

আলিঙ্গন গোবিন্দদাসের করচাতে লিখিত হইয়াছে বলিয়া এই করচা 'অপ্রামাণিক' বলেন, তাঁহারা কৃষ্ণদাসকবিরাজরচিত চৈতন্য-চরিতামৃতের (অন্ত্য-৫ম পঃ-১৭)—এই ছত্রগুলি—'রামানন্দ রায়ের কথা * * * * নির্ব্বিকার মন,' বিশেষতঃ—'কহিবার কথা * * * স্পর্শন'—চৈতন্যদেবের বাক্য বলিয়া বর্ণিত হওয়ায়, চৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ততঃ এই অংশকে অপ্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করেন না কেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না।

চৈতন্যদেবের মানব-প্রীতি তাঁহার মুরারিগণের উদ্ধারে দেখিয়াছি। নারোজী প্রভৃতি রক্তপিপাসু দস্যুগণের উদ্ধারকার্য্যে তাঁহার এই প্রীতি আরও পরিস্ফুরিত হইয়াছিল, কারণ তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া এই নিষ্ঠুর ও দুর্দ্দান্ত মানবশত্রুদিগের উদ্ধারসাধন করিয়াছিলেন। মুরারিগণের পল্লীতে যাইতে গোবিন্দ তাঁহাকে যেরূপ নিষেধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ নির্দ্দয়-দস্যু-অধ্যুষিত চোরানন্দী-অরণ্যে প্রবেশ করিতে রামস্বামীপ্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু দয়ার অবতার গৌরাঙ্গদেব পাপিষ্ঠ দস্যুগণের উদ্ধার-বাসনায় তাঁহাদিগের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন এবং নিজের জীবন বিপদ্গ্রস্ত করিতে দ্বিধা-বোধ করেন নাই—যথা গোবিন্দদাসের করচায় (৫৬-৫৭ পৃষ্ঠা)—

"মুরারিগণের ভক্তি দেখিয়া নয়নে।
প্রভাতে যাইতে চাহে চোরানন্দী-বনে॥
গ্রাম্যলোক বলে সেথা কিবা প্রয়োজন।
পাপের আকর হয় চোরানন্দী-বন॥
চোরানন্দী-বনে বহু ডাকাতের বাস।
সেখানে যাইতে কেন কর অভিলাষ॥

প্রভুবলে যাব মুহি চোরানন্দী-বন।
চোরানন্দী দেখে সিদ্ধ হবে প্রয়োজন॥
গ্রাম্যলোক বলে সেথা না যাও সন্ন্যাসী।
সাধুর গমন সেথা নাহি ভালবাসি॥
বহু চোর বহু দস্যু থাকে সেইস্থানে।
জীবন সংশয় হবে যাইলে সেখানে॥
প্রভু বলে, 'কিবা মোর লবে দস্যুগণ।
এখনি সেখানে মুহি করিব গমন॥'
রামস্বামী বলে 'প্রভু, চোরানন্দী-বন।
কোন তীর্থ নহে তথা কিবা প্রয়োজন॥
যদি কোন অমঙ্গল করে দস্যুগণ।
তোমার বিরহে লোক ত্যজিবে জীবন॥'
প্রভু বলে, 'ভয় নাহি কর রামস্বামী।
হরিনামে দস্যুগণে মাতাইব আমি॥'
এত বলি প্রভু চোরানন্দীতে চলিল।
চোরানন্দী গিয়া বৃক্ষতলায় বসিল॥
এইস্থানে আড্ডা করি বহু দুষ্টজন।
ডাকাতি করিয়া করে জীবন যাপন॥
একজন লোক আসি কাঁই মাই করি।
কি কহিল আমি সব বুঝিতে না পারি॥
তার বাক্য বুলি সব প্রভু সমজিয়া।
কাঁই মাই করি তারে দিলেন বুঝিয়া॥
সেই লোক ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল।
ইতি উতি তাকাইয়া বনে প্রবেশিল॥

নারোজী নামেতে এক মহাবলবান্।
অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে করি হৈল আগুয়ান্॥
দুই চারিজন ক্রমে আসি দেখা দিলা।
সন্ন্যাসী দেখিয়া সবে প্রণাম করিলা॥
নারোজী বলিলা, 'তুমি চল মোর স্থানে।
আজিকার রজনীতে থাকিবে সেখানে॥'
নারোজীর কথা শুনি প্রভু তবে বলে।
'রাত্রি কাটাইব আজি থাকি বৃক্ষতলে॥'
শুনিয়া প্রভুর বাক্য নারোজী শ্রবণে।
ভিক্ষা আনি দিতে বলে দুই চারিজনে॥
নারোজীর কথা শুনি ছুটিল সবাই।
যোগাসনে হরিনামে বসিল নিমাই॥
কেহ কাষ্ঠ চিনি আনে কেহ বা তণ্ডুল।
কেহ দুগ্ধ কেহ ঘৃত কেহ ফলমূল॥
রাশি রাশি খাদ্য আনি তারা যোগাইল।
বহু খাদ্য দেখে মোর লালসা বাড়িল॥
বহুদেশ ভ্রমিলাম প্রভুর সহিতে।
এত খাদ্য কোন স্থানে না পাই দেখিতে॥
নানা দ্রব্য যোগাইয়া চারিদিক্ ঘেরি।
দাঁড়াইলা নারোজীর লোক সারি সারি॥
হরিনাম কল্পিতে করিতে প্রভু মোর।
সেইকালে কৃষ্ণপ্রেমে হইলা বিভোর॥
কোথা রহে দুগ্ধ চিনি কোথায় তণ্ডুল।
পদস্পর্শে ছিন্ন ভিন্ন হৈলা ফলমূল॥

দুই চারি জন বলে, 'কেমন সন্ন্যাসী।
ইচ্ছা করি নষ্ট করে খাদ্যদ্রব্য-রাশি'॥
নারোজী বলিল, "কভু দেখি নাই হেন।
সন্ন্যাসী দেখিয়া মোর প্রাণ কাঁদে কেন॥
কত পাপ করিয়াছি কে পারে বলিতে।
আজি কেন ইচ্ছা হয় কৌপীন পরিতে॥
কিসের লাগিয়া আজি প্রাণ মোর কাঁদে॥
আমি কি দিলাম পদ সন্ন্যাসীর ফাঁদে॥
নষ্ট কৈল সব দ্রব্য নাহি কর ভয়।
পুনঃ যোগাইব আনি এই দ্রব্য চয়'॥
এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নারোজী আপনি।
এক দৃষ্টে চেয়ে দেখে গোরা-গুণমণি॥
প্রভুর নয়ন বাহি অশ্রুধারা বহে।
পুতুলের প্রায় সবে দাঁড়াইয়া রহে॥
এই কথা শুনি ক্রমে ডাকাতের দল।
একে একে দেখা দিল ছাড়ি বনস্থল॥
অপরাহ্নকালে মোর গোরা-গুণমণি।
প্রেমে মূরছিত হয়ে পড়িলা ধরণী॥
প্রেমে গদগদ তনু ধূলায় ধূসর।
অশ্রুধারা হৃদয়েতে পড়ে দর দর॥
কান্দিয়া নারোজী বলে, 'শুনহ সন্ন্যাসী।
কি মন্ত্র পড়িলে তুমি বলহ প্রকাশি॥
দেখিয়া তোমার ভাব হয় মোর মনে।
আর না করিব পাপ থাকি এই বনে॥

ষাটি বর্ষ বয়ঃক্রম হয়েছে আমার।
পাপ কার্য্য না করিব ছাড়ির সংসার॥
অতি দুরাচার আমি ব্রাহ্মণতনয়।
মোরে পদধূলি দিতে না কর সংশয়॥
পুত্রকন্যা নাহি মোর নাহিক সংসার।
তবে কেন পাপকর্ম্ম করি আমি আর॥
উদর পোষণহয় লোকে ভিক্ষা দিলে।
তবে কেন থাকি মুহি দস্যুসহ মিলে॥
বড় ঘৃণা হইয়াছে কুকর্ম্মের প্রতি।
আর না রহিব মুহি দস্যুদলপতি'॥
এত বলি নারোজী দলের প্রতি চায়।
অস্ত্র শস্ত্র সেই দণ্ডে টানিয়া ফেলায়॥
প্রভু বলে, 'নারোজী আমার কথা শুন।
আর কত কহিব তোমারে পুনঃ পুনঃ॥
কৌপীন পরিয়া কর লজ্জা-নিবারণ।
মাঙ্গিয়া যাচিয়া কর উদর-পোষণ॥
কাহার লাগিয়া অর্থ করহ সঞ্চয়।
পিতা মাতা ভাই বন্ধু কেহ কার নয়॥
এক মুষ্টি অন্নে যদি দেহরক্ষা হয়।
তবে কেন পাপে কর অর্থের সঞ্চয়॥
অঞ্জলি-পাত্রেতে পিয় ঝরণার জল।
বহু পাত্র সংগ্রহকরিয়া কিবা ফল॥
কুবের-সমান যত আছে ধনিগণ।
একদিন প্রেতপুরে করিবে গমন॥

যে পথে দরিদ্র যাবে এ দেহ ত্যজিয়া।
অবশ্য সম্রাট্ যাবে সেই পথ দিয়া॥
আমার আমার করি বৃথা কেন মর।
প্রেমভক্তিসহ ভাই হরিনাম কর'॥
এই উপদেশ শুনি নারোজী-ব্রাহ্মণ।
আমাদের সঙ্গে চাহে করিতে গমন॥
নারোজী কহিল, 'সব তীর্থ দেখাইব।
তীর্থে তীর্থে আপনার পেছনে যাইব॥
এত দিন চক্ষু অন্ধ ছিল ভ্রান্তি-ধূমে।
আজি হৈতে অস্ত্র শস্ত্র ফেলিলাম ভূমে॥
এই হস্তে কত নরহত্যা করিয়াছি।
এই মুখে কত জনে কটু বলিয়াছি॥
আর না রহিব মুহি ডাকাতের পতি।
কি পথ দেখালে মোরে অগতির গতি॥
জঙ্গলের মধ্যে থাকি সদা লুকাইয়া।
পাপ দেহ জর জর না দেখি ভাবিয়া'॥"

নারোজী চৈতন্যদেবের সহিত বরোদা-পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। সেখানে জ্বররোগে নারোজী দেহত্যাগ করিলেন।—গোঃ দাঃ কঃ—৬১ পৃঃ)—

"তিন দিন পরে এথা বিপদ ঘটিল।
জ্বর-রোগে নারোজীর মরণ ঘটিল॥
মৃত্যু-কালে সম্মুখে বসিয়া গোরা রায়।
পদ্ম-হস্ত বুলাইলা নারোজীর গায়॥
যেই কালে নারোজীর নয়ন মুদিল।
আপনি শ্রীমুখে কর্ণে কৃষ্ণনাম দিল॥

নারোজী ঠাকুর হয় বড় ভাগ্যবান্।
তার কাণে কৃষ্ণনাম দিলা ভগবান্॥
নারোজী মরণকালে যোড়হাত করি।
তাকায়ে প্রভুর দিকে বলে হরি হরি॥
নারোজীরে কোলে করি প্রভু-বিশ্বম্ভর।
তমালের তল হইতে করে স্থানান্তর॥
ভিক্ষা করি নারোজীর সমাধি হইল।
সমাধি বেড়িয়া প্রভু কীর্ত্তন করিল॥"

উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে, যে চৈতন্যদেব নারোজীকে অতিশয় পাপাত্মা জানিয়াও তাহাকে সঙ্গী করিয়াছিলেন এবং বরদাতে তাহার সাংঘাতিক ব্যাধি হইলে তাহার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন এবং তাহার মৃত্যু হইলে ভিক্ষা করিয়া তাহার সমাধির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং তাহার সমাহিত দেহের চতুর্দ্দিকে হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। নীলাচলে প্রিয়তম ভক্ত যবনহরিদাসের মৃতদেহ ক্রোড়ে করিয়া তিনি উন্মত্ত হইয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। চরিত্র বিষয়ে হরিদাস ও নারোজীর মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ ছিল। নারোজী ব্রাহ্মণ হইলেও নরঘাতক দস্যু এবং ভগবানের আন্তরিক ভক্ত হইলেও হরিদাস উচ্চজাত্যভিমানী হিন্দুর অস্পৃশ্য। এই নিমিত্তই ভগবৎপ্রতিম গৌরাঙ্গদেব উভয়কেই এত অনুগ্রহ-প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যের বেঙ্কটনগরের সন্নিহিত বগুলা-অরণ্যে তিনি পন্থনামা ভীষণ ভীল-দস্যুকে নিজ ক্রোড়ে স্থাপিত করিয়া তাহার কর্ণে হরিনাম প্রদানকরিয়াছিলেন (গোঃ দাঃ কঃ—২৯)। যে যত পাপিষ্ঠ ও অস্পৃশ্য, গৌরাঙ্গদেবের তাহার প্রতি তত স্নেহ ও মমতা আমরা দেখিতে পাইতেছি—

"লোটায়ে পড়িল ভীল প্রভুর চরণে।
কোলে করি প্রভু নাম দিলেন শ্রবণে॥
হরিনামে মত্ত হয়ে যত দস্যুগণ।
সেই বন করিলেন আনন্দ-কানন॥"

কিন্তু আমাদিগের ভিতরে কেহ কেহ মনে করেন যে আমরা যাহাদিগকে 'অস্পৃশ্য' বলি, তাহাদিগের ইষ্টদেবতার সমক্ষে যাইয়া তাঁহাকে তাহাদিগের হৃদয়ের বেদনা ও কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করিতে এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা ও মুক্তি ভিক্ষা করিতে দিলে দেবতাও কলুষিত এবং অস্পৃশ্য হইবেন এবং উচ্চজাতীয় লোকেরা পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইবেন।

আমরা চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, চৈতন্যচরিত-মহাকাব্য, গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা ও গোবিন্দদাসের করচা হইতে অনেক ছত্র উদ্ধৃত করিয়াছি। বৈষ্ণবমহোদয়গণ প্রথম পাঁচখানি গ্রন্থের প্রামাণিকতার সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ করেন না। কিন্তু গোবিন্দদাসের করচার প্রামাণিকতাবিষয়ে তাঁহাদিগের ভিতরে অনেকের মনে গভীর সন্দেহ বর্ত্তমান আছে। গোবিন্দদাসের করচা যে গৌরাঙ্গদেবের দক্ষিণভ্রমণসম্বন্ধীয় একখানি বিশ্বাস্য গ্রন্থ, তাহা রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর তাঁহার উক্ত করচার (কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় সংস্করণ) ভূমিকায় বিশদরূপে প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু দুই একটী বিষয়ে তাঁহার মতের সহিত আমাদের মতের বিভেদ হইয়াছে, ইহা পরে বলিব। সেন মহাশয় ভূমিকায় দলাদলির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার ভূমিকার তারিখ ১৯২৬। এক্ষণে ১৯৩৩ চলিতেছে। আমরা মনে করিয়াছিলাম যে এই সাত বৎসরে সম্ভবতঃ এ দলাদলির পর্য্যবসান হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হয় নাই।

একমাস পূর্ব্বে একজন বিখ্যাত বৈষ্ণব এমন কথাও বলিয়াছেন যে "অমুক লোক জয়গোপালগোস্বামীমহাশয়কে পারিশ্রমিক দিয়া এই গ্রন্থখানি রচনাকরাইয়া লইয়াছেন।' কিন্তু সাধারণতঃ শিক্ষিত বৈষ্ণবেরা বলেন যে এই গ্রন্থের অধিকাংশ বিশ্বাসযোগ্য নহে। আমরা দেখিতে পাই যে শিশির ঘোষ মহাশয়ের অমিয়নিমাইচরিতে, মুরলীঅধিকারী মহাশয়ের বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনীতে, অমূল্যধনরায়ভট্টমহাশয়ের শ্রীবৈষ্ণবচরিতাভিধানে গোবিন্দদাসকর্ম্মকার এবং তাঁহার করচা প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। ইঁহাদের ভিতর কেহ কেহ বলিয়াছেন বটে যে "পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।"

আমি চারি পাঁচজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবকে গোবিন্দদাসের করচার অপ্রামাণিকতার কারণ নির্দ্দেশ করিতে বলায়, তাঁহারা একবাক্যে বলিয়াছেন যে যে গ্রন্থে সত্যবাইনাম্নী বেশ্যাকে চৈতন্যদেবের আলিঙ্গনের কথা লিখিত আছে, সে গ্রন্থ কখনই বিশ্বাসযোগ্য নহে। পূর্ব্বেই আমরা আলিঙ্গনের বিষয় আলোচনাকরিয়াছি। চৈতন্যদেব সে সময়ে কৃষ্ণপ্রেম ও ভক্তির ভাবাবেশে উন্মত্ত, তাঁহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, তীর্থরামকে তিনি পদদলিত করিতেছিলেন, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান একেবারেই ছিল না। গোবিন্দও বোধহয় গৌরাঙ্গদেব এরূপ করিবেন ইহা বুঝিতে পারেন নাই; তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই ইহা নিবারণ করিতেন। চৈতন্যদেবের জ্ঞান থাকিলে কখনই তিনি এরূপ করিতেন না। যদিও চৈতন্যদেব স্ত্রীলোককে নিজের নিকট আসিতে দিতেন না, তত্রাচ তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতি এত অধিক হইয়াছিল, যে তিনি স্ত্রী ও পুরুষভক্তের মধ্যে বিভেদ দেখিতেন না।

আমাদের মনে হয় এই আলিঙ্গন-ব্যাপার বৈষ্ণবমহাশয়দিগের

করচার সত্যতাসম্বন্ধে সন্দেহের প্রধান কারণ নয়। এই করচাতে অপ্রাকৃত ঘটনার অভাব, বিদ্যাভিমানী তর্কপ্রয়াসী আগন্তুকদিগকে সর্ব্বদাই জয়পত্র লিখিয়া দিতে চৈতন্যদেবের সমুৎসুকতা, তাঁহার সহজ-ভাষায় উপদেশদান, তাঁহার মুরারিপল্লীতে গমন এবং তাহাদিগের উদ্ধারসাধন এবং তাঁহাকে ঈশ্বর বলিলে তাহার প্রতিবাদ, করচার অপ্রামাণিকতার অন্যান্য কারণ বলিয়া আমাদিগের মনে হয়।

একদিন একজন বলিলেন যে দামোদর পারকরিয়া বিষ্ণুপুর ইত্যাদি স্থান দিয়া চৈতন্যদেবকে লইয়া যাইয়া ঐ সকল স্থানকে পবিত্র করার অভিপ্রায়ে এই করচা প্রস্তুত করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা বলি যে যশোহর, খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলাতে কি চৈতন্যদেব গিয়াছিলেন? ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই ত চৈতন্যদেব যান নাই; সেইজন্য কি সেই সকল স্থান তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে?

মুরারিগুপ্ত, লোচনদাস, বৃন্দাবনদাস এবং কৃষ্ণদাসকবিরাজ সকলেই বলিয়াছেন যে পূর্ব্ববঙ্গে অর্থাৎ পদ্মানদীর ধারে গ্রামসকলে লক্ষ্মী-দেবীকে বিবাহ করিবার পরে সশিষ্য চৈতন্যদেব বিদ্যাবিতরণ ও হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন এবং এই স্থানে কতিপয় মাস যাপনকরিয়া 'সুবর্ণ, রজত, জলপাত্র, দিব্যাসন, সুরঙ্গকম্বল এবং বহু প্রকার বসন' লইয়া নবদ্বীপে নিজের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। পদ্মানদীর পার্শ্বে যে সকল গ্রাম অবস্থিত ছিল, তাহা ব্যতীত যে তিনি আর কোথাও যাইতে পারিয়াছিলেন তাহা মনে হয় না। মুরারিগুপ্ত চৈতন্যদেবের পদ্মানদী-সন্নিকটে হরিনাম-প্রচারের কথা কিছুই বলেন নাই, কেবল ব্রাহ্মণদিগকে পড়াইয়াছিলেন এই কথা বলিয়াছেন—'পাঠয়ন্ ব্রাহ্মণান্ সর্ব্বান্ বিদ্যারস-কুতূহলী' (১২শ-১৬)। আমাদিগের মনে হয় কেবল

বিদ্যাদান করিবার জন্য এবং সেই সঙ্গে তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে এবং লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন—ধন উপার্জ্জনকরিবার নিমিত্ত তিনি উত্তরবঙ্গে গিয়াছিলেন এবং কেবল ব্রাহ্মণদিগকে (আচণ্ডালে হরিনামবিতরণ নয়) বিদ্যাবিতরণ করিয়াছিলেন এবং বাটী আসিবার সময় অনেক টাকা ও জিনিষ লইয়া আসিয়াছিলেন। নবদ্বীপে আসিয়া সর্পদংশনে লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। ইহার পরে তিনি মাতার অনুরোধে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে বিবাহকরিয়াছিলেন। এ সময়ে সন্ন্যাসগ্রহণ ও হরিনামপ্রচার তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। তাহা হইলে লক্ষ্মীদেবী কিম্বা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে তিনি বিবাহকরিতেন না।

একজন বলিলেন যে গোবিন্দের মত একটী অপরিচিত ভৃত্যকে চৈতন্যদেব তাঁহার যুবতী স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবা করিবার জন্য নিযুক্ত করিতে পারেন না। কিন্তু গোবিন্দদাসের করচাতে (পৃঃ ৪) আছে—

চৈতন্যদেব গোবিন্দকে বলিতেছেন—

"সেবার কর্ম্মেতে তুমি নিয়ত থাকিবা।
গঙ্গাজল তুলসী আনিয়া যোগাইবা।"

গোবিন্দদাস বলিতেছেন (ঐ)—

শান্তমূর্ত্তি, শচীদেবী অতি খর্ব্বকায়।
'নিমাই, নিমাই' বলি সদা ফুকরায়॥
বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সে প্রভুর ঘরণী।
প্রভুর সেবায় ব্যস্ত দিবসরজনী॥
লজ্জাবতী, বিনয়িনী, মৃদু মৃদু ভাষ।
মুহি হইলাম গিয়া চরণের দাস॥

গোবিন্দের কার্য্য হইয়াছিল—(১) ঠাকুরসেবার জন্য গঙ্গাজল ইত্যাদি সংগ্রহকরা, (২) শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার আজ্ঞাপালন। ইহাতে কি আপত্তি থাকিতে পারে, আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

তিনি আরও বলিলেন চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের পর ঘৃতে করলা-ভাজা ইত্যাদি ভক্ষণ বিলাসিতার চিহ্ন। চৈতন্যদেবের ন্যায় ভক্তেরা ঈশ্বরকে উৎকৃষ্ট বস্তুই উপহার (ভোগ) দিতেন; চৈতন্যদেবও তাহাই করিয়াছিলেন; কিন্তু নিজে সামান্যই আহার করিয়াছিলেন—'মুষ্টিমেয় প্রসাদ পাইলা গৌরহরি' (গোঃ কঃ-পৃঃ ২৫)। অদ্বৈতাচার্য্য চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের পরে কিরূপ 'ভোগ লাগাইয়াছিলেন' চৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য-৩য় পরিচ্ছেদে) তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

করচাতে আছে যে চৈতন্যদেবের নীলাচলে গমনের পরে—(পৃঃ-২০)—

"প্রেমদাস, গোপীদাস মোহান্ত ব্রাহ্মণ।
ভাগবত-পাঠে করে অমৃত-বর্ষণ॥
রঘুনাথ দাস, আর আচার্য্যশেখর।
দামোদর, নরহরি, আর গদাধর॥
নিত্য নিত্য সবে মিলি যান শ্রীমন্দিরে।
আমার প্রভুরে সবে লয়ে যান ঘিরে॥

একজন বলিলেন যে রঘুনাথ দাস (কায়স্থ) তখন নীলাচলে যান নাই। ইহা সত্য হইতে পারে। কিন্তু একজন রঘুনাথ বৈদ্য ছিলেন (চৈঃ চঃ—আদি ১০ম-৯৮)। শিবানন্দসেন বৈদ্য ছিলেন; তাঁহার পুত্রদিগের নাম—চৈতন্যদাস, রামদাস, পরমানন্দ অথবা পুরীদাস ছিল।

অদ্বৈতশাখার (ঐ-১২শ-৬৫) আর একজন রঘুনাথ ছিলেন—'বঙ্গবাটী চৈতন্যদাস, শ্রীরঘুনাথ'। সপ্তগ্রামের রঘুনাথদাস ব্যতীত আর কোন রঘুনাথদাস থাকিতে পারেন না, ইহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না।

কেহ কেহ বলেন যে গোবিন্দদাসের করচায় (পৃঃ ৮) লিখিত আছে যে চৈতন্যদেব সন্ন্যাসের অব্যবহিত পূর্ব্বে বলিলেন—

"কলির জীবের দশা মলিন দেখিয়া।
থাকিতে পারি না আর কাঁপে মোর হিয়া॥
করঙ্গ, কৌপীন লয়ে সন্ন্যাস করিব।
রাধাকৃষ্ণ নাম দিয়া সবে উদ্ধারিব॥"

চৈতন্যদেব কেবল 'কৃষ্ণনাম' কিম্বা 'হরিনাম' না বলিয়া 'রাধাকৃষ্ণ-নাম' বলিলেন কেন? ইহার উত্তর (১) কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য চরিতামৃতে (আদি-১৭শ-২৪৪-৬) দিয়াছেন। মধুরভাবে ঈশ্বরকে উপাসনা করিতে হইলে রাধা ও কৃষ্ণ আলাহিদা করা যায় না; (২) চৈতন্যদেব (চৈঃ চঃ-মধ্য-৮ম-১৭৭) রামানন্দ রায়কে বলিতেছেন—

"শ্রীরাধাকৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেমা হয়।
যাঁহা তাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমার স্ফুরয়॥"

শ্রীরাধা গোপীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, তিনি ঈশ্বরের মূর্ত্তহ্লাদিনী শক্তি। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বিরহ একেবারেই সহ্য করিতে পারেন না। চৈতন্য-দেবের রামানন্দের সহিত কথোপকথন পাঠকরিলেই এ বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ থাকে না। (চৈঃ চঃ-মধ্য ১৫শ-৫)—

"শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গোক্তোমন্ত্রঃ—

রাধে, কৃষ্ণ; রমে, বিষ্ণো; সীতে, রাম; শিবে, শিব।

এক ভদ্রলোক আমাদিগকে বলিলেন চৈতন্যদেব গোবিন্দকে প্রত্যহ প্রসাদ দিবেন কেন? আর কি প্রসাদ খাইবার লোক ছিল না? করচায় আছে (পৃঃ ৪)—

"পেটুকের শিরোমণি মুই হই দাস।
দয়াল প্রভুর পাত্রে খাই বারমাস॥"

চৈতন্যচরিতামৃতেও (মধ্য-১২শ-১০১) আছে—

"প্রভুর অবশেষ গোবিন্দ রাখিল ধরিয়া।
সেই অন্ন কিছু হরিদাসে দিল লয়া॥
ভক্তগণ গোবিন্দপাশ প্রসাদ মাগি নিল।
পাছে সেই প্রসাদ গোবিন্দ আপনে পাইল॥"

তিনি আরও বলিলেন যে অন্যান্য পুরাতন ভৃত্য থাকিলেও গোবিন্দকে 'খড়ম' (গোঃ কঃ- পৃঃ ৮) লইয়া তিনি তাঁহার সহিত যাইতে অনুমতি দিলেন কেন? ইহার উত্তর—(১) তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করিলেও তাঁহার খড়মের আবশ্যকতা ছিল। তপ্ত বালুকার উপর দিয়া এবং কণ্টকপূর্ণ পথের উপর দিয়া যাইবার জন্য খড়মের প্রয়োজনীয়তা ছিল। যখন তিনি সন্ন্যাসী হইলেন, তাঁহার জলপাত্র ও বহির্বাসের আবশ্যকতা হইয়াছিল এবং ঐগুলি বহিবার জন্য একজন লোকও দরকার হইয়াছিল (চৈঃ চঃ-মধ্য-৭ম-৩০)। (২) পুরাতন ভৃত্যদিগকে তাঁহার মাতৃদেবী ও স্ত্রীর সেবা করিবার জন্য রাখিয়া যাওয়া কি অন্যায়? (৩) গোবিন্দ চৈতন্যদেবের কার্য্যে সর্ব্বাধিক তৎপর ও তাঁহার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত বলিয়া তাহাকে তিনি সঙ্গে লইয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন যে একজন অপরিচিত লোক আসিল, অমনি চৈতন্যদেব তাহাকে বাটীতে স্থান দিলেন, ইহা অসম্ভব। যখন আমাদিগের বাটীতে ভৃত্য না থাকে, বাসনমাজা, জলতোলা প্রভৃতি

কার্য্যের জন্য আমাদিগের কিরূপ ব্যস্ত হইতে হয়, তাহা প্রত্যেক গৃহস্থই জানেন। দ্বিতীয়তঃ চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণকরিবার সময়ে এবং পরে তাঁহার আর একজন ভৃত্য আবশ্যক হইবে ইহা বিবেচনা করিয়া এবং গোবিন্দের আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া তিনি এই কার্য্যের উপযোগী হইবেন ইহা মনে করিয়া তাঁহাকে পরিচারকরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন চৈতন্যদেব কণ্টকনগরে (কাটোয়াতে) সন্ন্যাস-গ্রহণ করিতে গিয়াছিলেন। তখন তিনি নিজভাবে বিভোর, তাঁহার কি বক্তৃতাকরা সম্ভব?—গোবিন্দ বলিতেছেন (পৃঃ ৮)—

"সন্ধ্যাকালে পৌছিনু কণ্টকনগরে।
কাংস্য-ঘণ্টা-শঙ্খ-ধ্বনি হয় ঘরে ঘরে॥

* * * *

নিশীথ সময়ে তবে হরি বলি গোরা।
নাচিতে লাগিলা প্রেমে হইয়া বিভোরা॥
লক্ষ লক্ষ লোক আসি দরশন দিল।
কৃষ্ণভক্তি দেখে সব আশ্চর্য্য হইল॥

* * * *

বহু লোক দেখি গোরা কহিতে লাগিল॥
'মোর বাক্য মন দিয়া শুন সবে ভাই।
কৃষ্ণে আর কৃষ্ণনামে কিছু ভেদ নাই॥
ভজ কৃষ্ণ, ভাব কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ-নাম।
নাম-বলে তোমরা ভাই যাবে নিত্যধাম॥
এ সকল যাহা দেখ সব মিথ্যা হয়।
প্রকৃতির ছায়ামাত্র বেদে ইহা কয়॥'

* * * *

এইরূপে শিক্ষা দেয় চৈতন্য-গোঁসাই।
বহু বহু জনতা হইল এক ঠাঁই॥'

এইরূপে রাত্রি প্রভাতহইল। তিনি স্নান করিয়া মস্তকমুণ্ডন করাইলেন। সন্ন্যাসগ্রহণের অব্যবহিত পরে কোন বক্তৃতা তিনি করেন নাই। 'হরিনামে মাতি রাত্রি করিলা যাপন............প্রেমে মত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চলে রঙ্গে.........কখন ধাবন, লম্ফ, পতন ধরায়। ধারা বহি অশ্রুবারি বহিছে নয়নে।"

যদি চৈতন্য বহুলোকের সমাবেশ দেখিয়া তাহাদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সদুপদেশ দিয়া থাকেন, তাহা কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন? কেন তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন, ইহা কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য-১ম—২৩১) আছে—

'এ সব জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার।
অতএব আমি অবশ্য সন্ন্যাস করিব॥'

গোবিন্দদাসের করচাতেও (পৃঃ ৫) আছে—

'এইরূপে অনুরাগ বাড়ে দিন দিন।
প্রেমভরে হইতে লাগিলা তনু ক্ষীণ॥
দয়াল চৈতন্য এতে তুষ্ট না হইয়া।
বলে জীবে শিক্ষা দিব সন্ন্যাস করিয়া॥
দন্তে তৃণ করিয়া ফিরিব সব গ্রাম।
সর্ব্বজীবে উদ্ধারিব দিয়া হরিনাম।
সংসার তেয়াগি যাব কাটোয়া-নগরে।
কেশবভারতী গুরু উদ্ধারিবে মোরে॥"

আমরা দেখিতেছি চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্য পাপীদিগের উদ্ধার। সেইকার্য্য তিনি সন্ন্যাসগ্রহণের অব্যবহিত পূর্ব্ব

হইতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে অসঙ্গতি কিছু নাই। কিন্তু সন্ন্যাসগ্রহণের অব্যবহিত পরে বিশুদ্ধ প্রেম, ভক্তি ও আনন্দে তাঁহার মন অভিভূত হইয়াছিল, ইহা গোবিন্দদাসও বলিয়াছেন।

করচা যদি জালহইত, তাহা হইলে জয়গোপালগোস্বামীমহাশয় তাঁহার গ্রন্থে যাহাতে এ সকল কারণ না থাকে তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতেন; কারণ তিনি নিশ্চয়ই জানিতেন যে এ সকল কারণ থাকিলে, গোঁড়া বৈষ্ণবেরা তাঁহার পুস্তকের সত্যতা-সম্বন্ধে সন্দিহান হইবেন। ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের সহিত গোবিন্দদাসের করচার তুলনা করিলেই বুঝা যায় করচার লেখক সমস্ত বিষয় নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন। তাঁহার উচ্চশিক্ষার, তীক্ষ্ণবুদ্ধির, বিভিন্ন প্রদেশের ভাষার অভিজ্ঞতার অভাবে তিনি সমস্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করিতে সক্ষম হন নাই। কিন্তু তিনি যদি এই করচা না লিখিতেন, আমরা চৈতন্য-দেবের দাক্ষিণাত্যভ্রমণ, সে প্রদেশে গৌরাঙ্গধর্ম্মপ্রচার এবং তাঁহার অলৌকিক মানবপ্রীতিসম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ থাকিতাম। তিনি নিজেই তাঁহার বিদ্যা ও বুদ্ধির ন্যূনতা স্বীকারকরিয়াছেন—(করচা—পৃঃ ৮)—

"যে সব আশ্চর্য্য লীলা পাই দেখিবারে।
করচা করিয়ারাখি শক্তিঅনুসারে ॥"

যদি অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার অভাব করচা-পরিবর্জ্জনের অন্যতম কারণ হয়, আমরা বলিব এরূপ বহু ঘটনা করচাতে বর্ণিত হইয়াছে। চৈতন্যদেবকর্ত্তৃক সিদ্ধবটেশ্বরে বেশ্যাদ্বয়সহ ধনী তীর্থরামের, বগুলা অরণ্যে সানুচর নরহন্তা পন্থভীলের, নাগরগ্রামে কটুভাষী ব্রাহ্মণের, চণ্ডপুরে অহঙ্কারী বৈদান্তিক ঈশ্বরভারতীর, জিজুরীতে মুরারিগণের, চোরানন্দীবনে রক্তপিপাসু সানুচর নারোজীর, ঘোগায় বারমুখী-

বেশ্যার, এবং রসালকুণ্ডে প্রহারোদ্যত পাপাত্মা মাডুয়াব্রাহ্মণের উদ্ধার অপেক্ষা বিস্ময়কর ঘটনা আর কি হইতে পারে আমরা জানিনা—(গোঃ কঃ—পৃঃ ৮২-৩)—

"রসালকুণ্ডের লোক বড় ভক্তিহীন।
ইহা দেখি প্রভু তথা রহে তিন দিন॥

* * * *

এইস্থানে ছিল এক মাডুয়া-ব্রাহ্মণ।
তার পুত্র প্রভু সঙ্গে করিল মিলন॥
ব্রাহ্মণের পুত্র বলে, 'মোরে দয়া কর।
পদধূলি দিয়া প্রভু মোর দুঃখ হর॥
অত্যন্ত পাষণ্ড মুহি কিছু নাহি জানি।
ভক্তি দিয়া মোরে ত্রাণ করহ আপনি॥
মোর পিতা কৃষ্ণনাম সহ্য নাহি করে।
কৃপা করি ভক্তি দেহ তাঁহার অন্তরে॥'

* * * *

শুনিয়া শিশুর পৃষ্ঠে প্রভু হাত দিলা।
অমনি তাহার চিত্তে ভক্তি উপজিলা॥
এই কথা শুনি বিপ্র ক্রোধে অন্ধ হৈয়া।
যষ্টিহাতে প্রভুর নিকটে এল ধাইয়া॥
বিপ্র বলে, 'শুন অরে ভণ্ড দুরাচার।
একমাত্র পুত্র নষ্ট করিলি আমার॥
এই যষ্টি দিয়া তোরে আঘাতকরিব।
কে তোরে করিবে রক্ষা এখনি দেখিব'॥

যোড় হস্তে কান্দি বলে ব্রাহ্মণ-কুমার।
'দয়াময়, অপরাধ ক্ষমহ পিতার'॥

*   *   *   *

বিপ্র বলে, 'মোর পুত্রে বৈষ্ণব করিয়া।
সঙ্গে করে লয়ে যাবি তুই ভুলাইয়া॥
ছেলে ভুলাইয়া তুমি যাইবে কোথায়।
এইবার দণ্ড করি বুঝিব তোমায়॥
বহুত সন্ন্যাসী মুহি দেখেছি নয়নে।
এইবার শিক্ষা তুহি পাবি মোর স্থানে'॥
হাসিয়া চৈতন্য বলে, 'শুন মোর ভাই।
আমারে মারিতে হৈলে হরিনাম চাই॥
যতবার হরিনাম মুখে উচ্চারিবে।
ততবার যষ্ট্যাঘাত করিতে পাইবে॥
ক্রোধ করি যদি মোরে মারিবারে চাহ।
তবে হরে-কৃষ্ণ নাম বদনে বলহ॥
এই দেখ পৃষ্ঠ পাতি দিলাম তোমারে।
একবার হরি বলি মারহ আমারে॥

*   *   *   *

তোমার কঠিন হিয়া মরুস্থলীপ্রায়।
রসাল হউক আজি কৃষ্ণের কৃপায়॥
মোরে মার তাহে বিপ্র কোন ক্ষতি নাই।
একবার হরে-কৃষ্ণ মুখে বল ভাই'॥

*   *   *   *

ভয়ে জড়সড় বিপ্র দেখিতে না পায়।
আনন্দে আকুল হয়ে পড়িল ধরায়॥
প্রভুর প্রভাবে বিপ্র আকুল হইয়া।
দুই হাতে দুই পদ ধরিল চাপিয়া॥
বিপ্র বলে, 'দয়াময় নিবেদি তোমারে।
নরক হইতে ত্রাণ করহ আমারে'॥

* * * *

ব্রাহ্মণের দৈন্য দেখি গোরা-বিনোদিয়া।
হরিনাম-সুধা কর্ণে দিলেন ঢালিয়া॥
কৃতার্থ হইল বিপ্র, শুদ্ধ হৈল মন।
বিদায় লইল শেষে ধরিয়া চরণ॥"

এরূপ হইতে পারে কোন কোন কীটদষ্ট কিম্বা অস্পষ্ট বাক্যের স্থলে জয়গোপালগোস্বামীমহাশয় আধুনিক বাক্য ব্যবহারকরিয়াছেন; কিন্তু তাহা বলিয়া সমগ্র গ্রন্থকে পরিবর্জ্জনকরা সুধীগণের কর্ত্তব্য নয়। সেনমহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন যে চৈতন্যচরিতামৃতের ব্রজবুলি-মিশ্রিত ভাষা এবং চৈতন্যদেবের সময়ের বাঙ্গালাভাষার মধ্যে অনেক প্রভেদ ছিল এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণ, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের ভাষার সহিত করচার ভাষার বিশেষ সাদৃশ্য আছে এবং করচাতে প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার অনেক নিদর্শন (যথা নাট = নৃত্য, নিয়ড়ে = নিকটে, ঘাড়ি = ঘাড়, আগুয়ান = অগ্রসর ইত্যাদি) পাওয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি দুই একটী বিষয়ে সেনমহাশয়ের সহিত আমাদিগের মতের পার্থক্য আছে। ভূমিকার ৫৮ পৃষ্ঠায় চৈতন্যদেবের নীলাচলে প্রত্যাগমনের তারিখ ১৫১১ খৃষ্টাব্দ না হইয়া ১৫১২ হইবে।

এ ভ্রান্তি ধর্ত্তব্য নহে, কেবল ইংরাজী বৎসর গণনার জন্য ইহা হইয়াছে। কিন্তু তিনি ভূমিকার ৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "দুই গোবিন্দ (গোবিন্দ কর্ম্মকার এবং ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য গোবিন্দ) এক ব্যক্তি, নিতান্ত বাধ্য হইয়াই (তাঁহার স্ত্রী শশিমুখী তাঁহার সংবাদ পাইয়া পাছে তাঁহাকে সংসারী করে এই ভয়ে) তাঁহার নিজেকে ঢাকা দিতে হইয়াছিল"। গোবিন্দ চৈতন্যদেবের সহিত নবদ্বীপে অন্ততঃ এক বৎসর ছিলেন[১]। নবদ্বীপের বাটীতে তাঁহার ভক্তগণ গোবিন্দকে দেখিয়াছিলেন। তিনিই ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য বলিয়া চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরই চৈতন্যদেব এবং তাঁহার ভক্তমণ্ডলীর নিকট পরিচয় দিলেন এবং তাঁহারা গোবিন্দের এই কথা সত্য বলিয়া গ্রহণকরিলেন, ইহা আমরা বিশ্বাসকরিতে সক্ষম হই না।

চৈতন্যভাগবতে (অন্ত্য-২য় অধ্যায়ে—রাধানাথকাবাসীমহাশয়ের সংস্করণ,৩০২ পৃঃ) লিখিত আছে যে গৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাসের পরে নীলাচল গমনের সময়ে নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, জগদানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ তাঁহার সঙ্গী ছিলেন; কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য-৩য় প-২০২-৭) কেবল নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর ও মুকুন্দ দত্তের নাম লিখিত আছে। কবিরাজ-মহাশয় গোবিন্দকে ইচ্ছা করিয়া বিস্মৃত হইয়াছিলেন কিনা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, কারণ ব্রহ্মানন্দ ও গদাধরের নামও তিনি লিখেন নাই। যদিও বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবতে গোবিন্দকে নীলাচলের পথে চৈতন্যদেবের সঙ্গী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্যভ্রমণের বিষয়ে কিছুই লিখেন নাই।

১। গোবিন্দ ১৪৩০ শকে কাঞ্চননগর ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া চৈতন্যদেবের ভৃত্য হইয়াছিলেন।

চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে (৬ষ্ঠ-১৪ এবং ১৫-রাঃ, বিঃ, কৃত অনুবাদ) রত্নাকর গঙ্গাদেবীকে বলিতেছেন—

"রত্নাকর। ইদানীং গৌড়াধিপতি যবন রাজার সঙ্গে প্রতাপরুদ্রের বিরোধ থাকায় কাহারও গমনাগমন হয় না, তবে কিরূপে চারিটী পরিজনের সহিত ভগবান গমন করিলেন ? ॥১৪॥

গঙ্গা। আর্য্যপুত্র ! ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যিনি অন্তর্য্যামী ও জগতের অকৃত্রিম বন্ধু এবং জগতে যাঁহার দ্বেষ্য কেহই নাই, সুতরাং তাঁহার প্রতি কে বিদ্বেষভাব প্রকাশকরিবে ? ঐ দেখ নৃপতিদিগের উভয় পক্ষীয় ভয়ঙ্কর সৈন্যগণের মধ্য দিয়া অনায়াসে পাচ ছয়জন বন্ধুগণের সহিত গমন করিলেন ॥১৫॥" ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে পাচ কিম্বা ছয়জন বন্ধু চৈতন্যদেবের সঙ্গে গিয়াছিলেন (চলিতোবন্ধুভিঃ পঞ্চষৈঃ সঃ ॥১৫॥)

সেনমহাশয় বলেন (করচা পৃঃ ১৪-১৭) যে চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে যে চৈতন্যদেবের নীলাচলে গমনের সময়ে নিত্যানন্দ প্রভৃতি সঙ্গিগণ পিছাইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই জন্য চৈতন্যচরিতামৃতে এবং চৈতন্যভাগবতে লিখিত চৈতন্যদেবের শান্তিপুর হইতে নীলাচলে প্রথম আগমনের বিবরণ এবং গোবিন্দদাসের করচায় লিখিত নীলাচলে গমনবৃত্তান্ত বিভিন্ন হইয়াছে। চৈতন্যদেব ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি ১৫১০ খৃষ্টাব্দে সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া শান্তিপুর হইতে নীলাচলে গিয়াছিলেন এবং ১৫১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকরিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস তাঁহার চৈতন্য-ভাগবত ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃত ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে রচনাকরিয়াছিলেন। গোবিন্দদাসের করচায় লিখিত বৃত্তান্ত তাঁহাদের না জানাতে কিম্বা এই করচা অপ্রামাণিক বলিয়া

ইহাকে পরিবর্জ্জনকরার জন্য তাঁহাদিগের জনশ্রুতির উপরে নির্ভর করিতে হইয়াছিল এবং সেই নিমিত্তই তাঁহারা চৈতন্যদেবকে প্রধান প্রধান তীর্থদর্শন করাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু যাহা নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন গোবিন্দদাস তাহাই তখনই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

গোবিন্দদাসের করচাতে লিখিত আছে যে চৈতন্যদেব সন্ন্যাসগ্রহণের পরে নিত্যানন্দের সহিত শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের বাটীতে আসিয়া অদ্বৈতাচার্য্য এবং অন্যান্য বৈষ্ণবগণের সহিত এবং নবদ্বীপ হইতে আগতা শচীদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, ঈশান, প্রতাপ, গঙ্গাদাস, গদাধর, বাণেশ্বর ও গোবিন্দের সমভিব্যাহারে বর্দ্ধমান [১], হাজিপুর, মেদিনীপুর, নারায়ণগড়, জলেশ্বর, হরিহরপুর, বালেশ্বর, বালেশ্বরের নিকটস্থ রেমুণা (যে স্থানে ক্ষীরচোরা গোপীনাথ আছেন), কটকের নিকটে সাক্ষিগোপালের মন্দির, নিংরাজের মন্দির (ভুবনেশ্বর), এবং আঠারনালা হইয়া নীলাচলে আসিয়াছিলেন। শান্তিপুর হইতে জলেশ্বর পর্য্যন্ত চৈতন্যভাগবতের বৃত্তান্ত হইতে গোবিন্দের বৃত্তান্তের বিভেদ আছে। চৈতন্যভাগবতে এই সকল স্থানের পরিবর্ত্তে লিখিত আছে—শান্তিপুর, আঠিসারা, ছত্রভোগ [২], প্রয়াগঘাট (উড়িষ্যার সীমা), গঙ্গাঘাট, জলেশ্বর [৩], ইত্যাদি। আর একটী বিভেদ হইতেছে সঙ্গিসকলের বিষয়ে। চৈতন্যভাগবত বলিতেছেন যে চৈতন্যদেবের সহিত নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ, জগদানন্দ এবং ব্রহ্মানন্দ ছিলেন। গদাধর ও গোবিন্দ দুই বৃত্তান্তেই আছেন। আমাদিগের মনে হয়

১। ইহার বিস্তৃত বিবরণ পরে দেওয়া হইয়াছে।

২। ২৪ পরগণা জয়নগরের নিকট।

৩। বালেশ্বর জেলায় জলেশ্বর পরগণার একটী গ্রাম।

চৈতন্যদেব গোবিন্দকে অতিশয় স্নেহ করিতেন এবং নবদ্বীপে তাহার কার্য্য দেখিয়া তাহাকে দাক্ষিণাত্যভ্রমণের সঙ্গী করিবার তাঁহার সাতিশয় অভিলাষ হইয়াছিল ; সেই জন্য তাহাকে তিনি সঙ্গে লইয়া· ছিলেন।

চৈতন্যদেবের যৌবনাবস্থা হইতেই দেখিতে পাই তাঁহার মনে কপটতার স্থান ছিল না। তিনি 'মর্কট বৈরাগ্য' একেবারেই পছন্দ করিতেন না। সেই জন্য রঘুনাথদাসকে প্রথমে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন-করিতে বলিয়াছিলেন। গোবিন্দ তাঁহাকে তাহার সংসার-পরিত্যাগের কথা নিশ্চিতই বলিয়াছিলেন। গোবিন্দের স্ত্রীর প্রতি অভিমানের জন্য এই সংসারত্যাগবাসনা হইয়াছিল না প্রকৃতই তাঁহার সংসারে বিরাগ হইয়াছিল ইহা জানা চৈতন্যদেবের অত্যাবশ্যক হইয়াছিল। এরূপ একজন ভৃত্য তাঁহার আবশ্যক ছিল যে নীলাচলে সর্ব্বদা তাঁহার নিকট অবস্থান করিবে এবং বিশেষতঃ তাঁহার দাক্ষিণাত্যভ্রমণের সঙ্গী হইবে। যখন তিনি দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিবেন, সে সময়ে তাঁহার ভৃত্য যদি বলিত, 'আমি গৃহে যাইব', তাহা হইলে চৈতন্যদেবের বিশেষ অসুবিধা হইত। এইজন্যই তিনি প্রথমে কাঞ্চননগরে গিয়াছিলেন এবং গোবিন্দের সংসারত্যাগের আন্তরিকতা বিশেষরূপে পরীক্ষাকরিয়াছিলেন।

নিত্যানন্দ প্রভৃতি পিছাইয়া পড়িয়াছিলেন (রহিলা অনেক পাছে নিত্যানন্দ-চন্দ্র—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য-২য়)। তাঁহারা অন্য পথ দিয়া (অর্থাৎ ভাগিরথীর পূর্ব্বদিক দিয়া) নীলাচলে আসিয়াছিলেন। নীলাচলে চৈতন্যদেব পৌছিবার পর নিত্যানন্দাদি ভক্তগণ সেস্থানে আসিয়াছিলেন (গোঃ কঃ—পৃঃ ২০)—

এইরূপে যতদিন যাইতে লাগিল।
ক্রমে সব ভক্তগণ আসিতে লাগিল ॥

বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী মতে বলরাম অথবা নিত্যানন্দদাস ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ চৈতন্যদেবের তিরোধানের চারি বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রেমবিলাস ইত্যাদি গ্রন্থ এবং অনেকগুলি পদও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার একটী পদে (পদকল্পতরু হইতে সংগৃহীত) চৈতন্যদেব গোবিন্দকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণভ্রমণ করিবেন, এই কথা লিখিত আছে—

*　　*　　*　　*

"নীলাচল উদ্ধারিয়া, গোবিন্দেরে সঙ্গে লইয়া,
দক্ষিণদেশেতে যাব আমি।
শ্রীগৌড়মণ্ডল ভার, করিতে নাম-প্রচার
ত্বরা নিতাই যাও তথা তুমি॥
মো হইতে না হবে যাহা, তুমি ত পারিবে তাহা,
প্রেমদাতা পরম দয়াল।
বলরাম কহে পহুঁ দোঁহার সমান দঁহু
তার মোরে আমি ত কাঙ্গাল॥"২২৬২॥

শূদ্র গোবিন্দ যে চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্যভ্রমণের সঙ্গী ছিলেন, বৈষ্ণব-গ্রন্থকারগণের ইহা সহজেই গোপন করা সম্ভব হইয়াছিল, কিন্তু দাক্ষিণাত্যহইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে এই গোবিন্দ শত শত ভক্তপরিবৃত চৈতন্যদেবের ভৃত্যরূপে সেবা করিয়াছিলেন, ইহা গোপন করা কাহারও সাধ্য হয় নাই। এই জন্য ইহা বলা হইয়াছে যে তিনি ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য বলিয়া তাঁহাকে চৈতন্যদেব ভৃত্যরূপে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্যভ্রমণের সঙ্গী গোবিন্দ কর্ম্মকার এবং ঈশ্বরপুরীর (পরে চৈতন্যদেবের) ভৃত্য গোবিন্দের মধ্যে সাদৃশ্য এত

অধিক যে তাহাদিগের একই ব্যক্তি না হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নাই। দুইজনের নামও গোবিন্দ এবং দুইজনের কার্য্যপ্রণালী সদৃশ। এই সাদৃশ্যের দুই একটী দৃষ্টান্ত আমরা এখানে দিব। গোবিন্দকর্ম্মকারের করচাতে লিখিত আছে যে চৈতন্যদেব যখন ভক্তগণের নিষেধ-সত্ত্বেও বেঙ্কটনগরের সন্নিহিত বগুলা-অরণ্যে (পৃঃ ২৮) নির্দ্দয় দস্যু-পন্থ ভীলকে উদ্ধারকরিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন গোবিন্দ দ্বিরুক্তি না করিয়া নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়াও চৈতন্যদেবের অনুগমন করিয়াছিলেন। পুনরায় (৫৬ পৃঃ) যখন গৌরাঙ্গদেব রামস্বামী প্রভৃতি ভক্তগণদ্বারা নিবারিত হইয়াও রক্ত-পিপাসু-দস্যু-অধ্যুষিত চোরানন্দী-অরণ্যে সানুচর নারোজীকে উদ্ধারকরিবার মানসে প্রবেশ করিয়াছিলেন, গোবিন্দ চৈতন্যদেবের আচরণের প্রতিবাদ না করিয়াই তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছিলেন।

আবার আমরা কৃষ্ণদাসকবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে (অন্ত্য—১০ম-২২-২৭) দেখিতে পাই যে নীলাচলে একদিন চৈতন্যদেব মহাপ্রসাদ-গ্রহণানন্তর গম্ভীরার দ্বারে শয়ন করিয়াছিলেন। গোবিন্দের নিয়ম ছিল যে চৈতন্যদেব শয়ন করিলে তিনি তাঁহার পদ-সংবাহন করিতেন এবং তিনি নিদ্রিত হইলে গোবিন্দ নিজে আহার করিতেন। চৈতন্যদেব শয়ন করিয়াছেন দেখিয়া বহির্ব্বাস দিয়া চৈতন্যদেবের দেহ আবৃত করিয়া বহির্ব্বাস লঙ্ঘনকরিয়া গোবিন্দ তাঁহার দেহ-সংবাহন করিতে লাগিলেন। চৈতন্যদেব ক্রমে ক্রমে নিদ্রাভিভূত হইলেন। যখন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন তিনি দেখিলেন যে গোবিন্দ ঘরের ভিতরে আছেন এবং তাঁহার আহার হয় নাই। সেই জন্য চৈতন্যদেব একটু বিরক্তি প্রকাশকরিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে তিনি যে প্রকারে তাঁহাকে লঙ্ঘনকরিয়া গম্ভীরার মধ্যে

প্রবেশ করিয়াছেন সেইরূপ তাঁহাকে লঙ্ঘনকরিয়া তিনি আহারের জন্যও যাইতে পারিতেন। ইহার উত্তরে গোবিন্দ চৈতন্যদেবকে কিছু না বলিয়া ইহা ভাবিয়াছিলেন—

"গোবিন্দ কহে মনে আমার সেবা সে নিয়ম।
অপরাধ হউক কিবা নরকে গমন॥
সেবা লাগি কোটি অপরাধ নাহি গণি।
স্বনিমিত্ত অপরাধাভাসে ভয় মানি॥
এত সব মনে করি গোবিন্দ রহিলা।
প্রভু যে পুছিলা তার উত্তর না দিলা॥"

গোবিন্দ চৈতন্যদেব-গত প্রাণ ছিলেন। তিনি পরিচারকের আদর্শ-স্থানীয় ছিলেন—পন্থভীলউদ্ধারের পর চৈতন্যদেবের অবস্থা গোবিন্দ বর্ণনা করিতেছেন (করচা পৃঃ—২৯-৩০)—

"কাঁটা খোঁচা নাহি মানে পড়ে আছাড়িয়া।
কি ভাবে কখন মত্ত না পাই ভাবিয়া॥
ত্রিরাত্রি চলিয়া গেল বৃক্ষের তলায়।
অনাহারে উপবাস কিছু নাহি খায়॥
বহিছে হৃদয়ে দর্ দর্ অশ্রুধারা।
শত ডাকে কথা নাহি পাগলের পারা॥
কভু গড়াগড়ি দেন উলঙ্গ হইয়া।
কোলে তুলি লহি মুহি যতন করিয়া॥"

গোবিন্দ শেষ পর্য্যন্ত চৈতন্যদেবের সহিত ছিলেন এবং স্বরূপ-দামোদরের সহিত তাঁহার কৃষ্ণবিরহজনিত উন্মাদঅবস্থায় তাঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। গোবিন্দ গম্ভীরার দ্বারে শয়ন করিতেন,

কারণ তিনি ভয় করিতেন পাছে চৈতন্যদেব বাহির হইয়া যান (চৈঃ চঃ-অন্ত্য-১৭শ-৪)। গোবিন্দের এইরূপ সেবার আরও দৃষ্টান্ত আছে (ঐ ৫ ; ১৯শ—১৮ ও ১৯)।

তৃতীয়তঃ—করচায় আছে (পৃঃ ২১) যে চৈতন্যদেব গোবিন্দ-কর্ম্মকারকে দক্ষিণ ভ্রমণের সঙ্গীকরার বিষয়ে বলিয়াছেন—

"সেই কথা শুনি সবে বলিতে লাগিল,
তব সঙ্গে তব দাস গোবিন্দ চলিল।
এত শুনি প্রভু মোর কন্ হাসি হাসি,
'গোবিন্দের সঙ্গ আমি বড় ভালবাসি।
যে যাক্ সে নাহি যাক্ গোবিন্দ যাইবে,
আমার যে কার্য্য তাহা গোবিন্দ করিবে।'
এত বলি শ্রীচৈতন্য লইয়া বিদায়,
চলিলা দক্ষিণ দিকে সব ভক্ত ধায়।"

কৃষ্ণদাস-কবিরাজও চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য হইতে নীলাচলে আগমনের পরে, গোবিন্দকে তাঁহার প্রিয় ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করার কথা বলিয়াছেন,—চৈঃ চঃ—মধ্য ১০ম-৬৬—

"তবে মহাপ্রভু তারে করি অঙ্গীকার,
আপন শ্রী-অঙ্গ সেবার দিলা অধিকার।
প্রভুর প্রিয় ভৃত্য বলি সভে করে মান,
সকল বৈষ্ণবের গোবিন্দ করে সমাধান।"

যাঁহার সংসার-বৈরাগ্যের আন্তরিকতা-পরীক্ষার জন্য চৈতন্যদেব তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া নীলাচলে যাইবার সময়ে তাঁহার বাসস্থান কাঞ্চন-নগরে গিয়াছিলেন এবং শশিমুখীর করুণ ক্রন্দন এবং চৈতন্যদেবের পুনরায় সংসারী হইবার জন্য অনুরোধ-সত্ত্বেও যিনি চৈতন্যদেবের সঙ্গ

ত্যাগ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন (গোঃ দাঃ কঃ—১৩-১৪) তিনি কি চৈতন্যদেবের নীলাচলে প্রত্যাগমনের পর তাঁহার সঙ্গ-পরিত্যাগ করিয়া নিজগৃহে অবস্থান করিতে সক্ষম হইতেন? যিনি দক্ষিণভ্রমণ হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে অদ্বৈতাচার্য্যসকাশে পত্র লইয়া যাইতে চৈতন্যদেবদ্বারা আদিষ্ট হইলে, তাঁহার আরাধ্যদেবতা হইতে বিচ্ছেদের জন্য মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, তিনি যে তাঁহাকে পরিত্যাগকরিয়া অধিক দিন অন্যস্থানে অবস্থিতি করিবেন, ইহা আমাদিগের বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না—যথা করচায় (৮৬ পৃঃ)

"একদিন প্রভু মোর মিশ্রের ভবনে।
কৃষ্ণগুণ গানকরে ভক্তগণ সনে॥
গোবিন্দ বলিয়া মোরে ডাক দিয়া পাছে।
যাইতে কহিলা মোরে আচার্য্যের কাছে॥
আজ্ঞামাত্র পত্র সহ বিদায় লইয়া।
শান্তিপুরে যাত্রা করি প্রণাম করিয়া॥
পৃষ্ঠে হাত দিয়া প্রভু আশিস্ করিল।
মোর চক্ষে শতধারা বহিতে লাগিল॥
প্রভু বলে নাহি কান্দ প্রাণের গোবিন্দ।
আচার্য্যে আনিয়া হেথা করহ আনন্দ[১]॥
এই বাক্য শুনি মোর চক্ষে বারি বহে।
প্রভুর বিরহবাণ প্রাণে নাহি সহে॥
প্রভুর বিরহবেগ সহিব কেমনে।
নিদারুণ কষ্ট আসি উপজিল মনে॥

১। অদ্বৈতাচার্য্যকে নীলাচলে লইয়া এস এবং আনন্দ উপভোগ কর। চৈতন্যদেব আচার্য্যের সহিত নীলাচলে আসিতে গোবিন্দকে বলিতেছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে চৈতন্যদেব তাঁহার নীলাচল হইতে প্রত্যাগমনের পর গোবিন্দকে একখানি পত্রের সহিত শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট প্রেরণকরিয়াছিলেন। গোবিন্দ নিশ্চয়ই শান্তিপুরহইতে তাঁহার প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া পুনরায় তাঁহার সেবাকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন।

ইহা প্রশ্ন হইতে পারে যে তাঁহার করচা এখানে শেষ হইল কেন। এমনও হইতে পারে যে করচার শেষ অংশ নষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আমাদিগের বিশ্বাস যে চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্যভ্রমণের সময়ে তাঁহার দাক্ষিণাত্যে বিশুদ্ধ ভগবৎপ্রেম এবং ভক্তিবিতরণের বৃত্তান্ত যদি গোবিন্দ লিপিবদ্ধ না করিতেন, তাহা হইলে এই ভ্রমণের প্রকৃত বিবরণ ভারতবাসীর অজ্ঞাত থাকিত, কারণ নিঃস্বার্থতার অবতার চৈতন্যদেব কিছুতেই নিজে তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিয়া রাখিতে সম্মত হইতেন না এবং চৈতন্যদেবের এ বিষয়ে অসম্মতি থাকার নিমিত্ত গোবিন্দ তাঁহার করচা অতি "সঙ্গোপনে" (করচা ৬২ পৃঃ) রাখিয়াছিলেন।

যিনি বিষয়ী লোকের সংস্পর্শে আসিলে পাছে তাঁহার বিষয়-লিপ্সা জন্মে এই ভয়ে উৎকলরাজ পরমভক্ত প্রতাপরুদ্রের সহিত মিলিত হইতে অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন, তিনি কি নিজের যশঃ স্থায়ী করিবার নিমিত্ত গ্রন্থাকারে নিজের কার্য্যাবলী লিপিবদ্ধ করিতে সম্মত হইতেন ?

চৈতন্যদেব প্রয়াগে শ্রীবাসকে বলিয়াছিলেন—

(চৈঃ চঃ-মধ্য-১৯শ-৭১)

শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেম উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধভক্তির করিয়ে লক্ষণ ॥
অন্য বাঞ্ছা, অন্য পূজা, ছাড়ি জ্ঞান ধর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন।

শুদ্ধভক্তি-প্রাপ্তির জন্য অন্য বাঞ্ছা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের পর কোন প্রকারের যশোলিপ্সা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই—

"ধন, জন নাহি মাগি কবিতা, সুন্দরী।
শুদ্ধভক্তি কৃষ্ণ মোরে দেহ কৃপা করি॥"

(চৈঃ চঃ-অন্ত্য-২০শ-১৬)

আমাদিগের মনে হয় করচা-সঙ্গোপনের ইহাই একমাত্র কারণ। করচায় লিখিত আছে—

"না পারি লোকের বুলি সমস্ত বুঝিতে।
যাহা পারি তাহা লিখি আকার-ইঙ্গিতে॥
এই দেশে তীর্থ পর্য্যটিয়া দীর্ঘকাল।
সকলের বুলি বুঝে শচীর দুলাল॥
দুই চারি বাত কভু প্রভুরে পুছিয়া।
করচাকরিয়া রাখি মনে বিচারিয়া॥
যেই লীলা দেখিলাম আপন নয়নে।
করচা করিয়া রাখি অতি সঙ্গোপনে॥
সদা উন্মত প্রভু কৃষ্ণপ্রেমাবেশে।
তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়ায় দেশে দেশে॥"

'দুই চারি বাত কভু প্রভুরে পুছিয়া'—ইহার অর্থ নয় যে গোবিন্দ চৈতন্যদেবকে বলিতেন, "আমি করচা করিয়া রাখিব; আপনি এই সকল ঘটনা বিশদ করিয়া বর্ণনা করুন।" গোবিন্দ করচা-করার বিষয় চৈতন্যদেবের নিকটে সম্পূর্ণরূপে গোপনকরিয়া মাঝে মাঝে

(incidentally) দুই একটী কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন; অধিক কথা জিজ্ঞাসা করিতেন না পাছে চৈতন্যদেবের মনে কোন সন্দেহ হয়। প্রথমে তিনি সম্ভবতঃ যাহাকে 'নোট' (note) অর্থাৎ স্মারক-বিবরণ বলে তাহাই করিতেন; পরে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করার পরে যে সময়ে তিনি অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট শান্তিপুরে প্রেরিত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে সম্ভবতঃ এই 'নোটগুলি' পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

চৈতন্যদেবের জীবদ্দশায় গোবিন্দের করচা-প্রকাশ করার সাহস ছিল না। তাঁহার তিরোধানের পরে অবশ্য গোবিন্দ ইহা প্রকাশকরিয়া-ছিলেন; কিন্তু শূদ্র বলিয়া যে গোবিন্দকে চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্যের সঙ্গী করিতে উচ্চশ্রেণীর ভক্তমণ্ডলীর আপত্তি ছিল, তাঁহারা তাঁহার চৈতন্যদেবসহ দাক্ষিণাত্যভ্রমণের করচা সাদরে গ্রহণকরিবেন, এরূপ আশা করিতে আমরা পারি না। সেইজন্য এ করচার প্রচার সীমাবদ্ধ হইয়াছিল।

সেনমহাশয় তাঁহার ভূমিকার ৭২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "আমাদের মনে হয় আবার পাছে শশিমুখীর পাল্লায় পড়েন এবং মহাপ্রভু তাহাকে গৃহে ফিরিতে বাধ্য করেন, এই ভয়ে তিনি করচাখানি সম্পূর্ণরূপে গোপন করিয়াছিলেন ('করচা করিয়া রাখি অতি সঙ্গোপনে, ৬২ পৃঃ) অর্থাৎ করচা তিনি কাহাকেও দেখিতে দেন নাই। আমেদাবাদের নিকটস্থ নন্দিনীবাগানে একজন পণ্ডিতের সহিত চৈতন্যদেবের শ্রীমদ্‌ভাগবত সম্বন্ধে কথোপকথন বর্ণনাকরিবার পরই করচা অতি সঙ্গোপনে রাখার বিষয় গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে চৈতন্যদেব এ করচার বিষয় অবগত হইলে গোবিন্দের প্রতি অসন্তুষ্ট হইতেন। কেবল সেই নিমিত্তই তিনি করচা অতি সঙ্গোপনে প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

শশিমুখী তখন কাঞ্চননগরে [১]; আমেদাবাদে অবস্থিতির সময়ে গোবিন্দের শশিমুখীকে ভয়করিবার কোন কারণ ছিল না।

চৈতন্যচরিতামৃতে (আদি-১০ম-১১১; মধ্য-৭ম-২৬) লিখিত আছে যে কুলীন ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাস "পাত্র ও বস্ত্র" লইয়া দাক্ষিণাত্যে চৈতন্যদেবের অনুগমন করিয়াছিলেন। গোবিন্দদাসের করচার ২১ পৃষ্ঠাতেও কৃষ্ণদাসের কথা লিখিত আছে—

"এত শুনি প্রভু মোর ঈষৎ হাসিয়া।
বলে মুহি একা যাব সঙ্গী না লইয়া॥
অবধৌত নিত্যানন্দ শুনিয়া বচন।
কহিতে লাগিল করি অশ্রু-বরষণ॥
'দক্ষিণযাত্রায় তুমি যাবে অতিদূর।
সঙ্গে যা'ক কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণঠাকুর॥
পবিত্র হইয়া বিপ্র তাহাই করিবে।
যখন ইহারে যাহা করিতে বলিবে॥
তোমারে ছাড়িয়া মোরা কেমনে রহিব।
তাই বলি সবে মোরা তব সঙ্গে যাব॥'
এত শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া।
বারণ করিলা সবে উপদেশ দিয়া॥
সেই কথা শুনি সবে বলিতে লাগিল।
তব সঙ্গে দাস তব গোবিন্দ চলিল॥

১। বর্দ্ধমাননগরের সন্নিকটে (a suburb of Burdwan Town—Burdwan Gazetteer)। এখানে প্রতিবৎসর একটী মেলা হয়। এই গ্রাম লোহের ছুরি, কাঁচি, পিত্তলের ও কাঁসার জিনিষের জন্য প্রসিদ্ধ।

এত শুনি প্রভু মোর কন হাসি হাসি।
'গোবিন্দের সঙ্গ আমি বড় ভালবাসি॥
যে যাক্ সে নাহি যাক্ গোবিন্দ যাইবে।
আমার যে কার্য্য তাহা গোবিন্দ করিবে॥'
এত বলি শ্রীচৈতন্য লইলা বিদায়।
চলিলা দক্ষিণদিকে, সব ভক্ত ধায়॥
ক্রমে ক্রমে আলালনাথের শ্রীমন্দিরে।
পৌঁহুছিনু মোরা সব অতি ধীরে ধীরে॥
আলালনাথেরে হেরি ভাব উথলিল।
অশ্রুজলে সে স্থানের মাটি ভিজাইল॥
নাচিতে নাচিতে প্রভু অজ্ঞান হইয়া।
পড়িলেন ভূমিতলে আছাড় খাইয়া॥
পরদিন প্রাতে সবে লইয়া বিদায়।
তিনজনে[১] বাহিরিনু দক্ষিণ যাত্রায়॥

ইহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে গোবিন্দ এবং কৃষ্ণদাস উভয়েই প্রথমে চৈতন্যদেবের দক্ষিণভ্রমণের সঙ্গী হইয়াছিলেন। তাঁহার কৃষ্ণদাসকে লইয়া যাইবার বেশি ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু নীলাচলস্থ ভক্তগণের অনুরোধে কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরে আমরা দেখাইব যে কৃষ্ণদাসের আচরণে বিরক্ত হইয়া তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগকরিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাসের বিষয় গোবিন্দের করচাতে আর না উল্লেখ করিবার কারণ বোধ হয় এই যে গোবিন্দ তাঁহাকে স্নেহের চক্ষুতে দেখিতেন এবং তাঁহার দুষ্কর্ম্মের বিষয় প্রকাশকরিতে অনিচ্ছুক ছিলেন।

১। চৈতন্যদেব, কৃষ্ণদাস ও গোবিন্দ।

যখন চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্যের মল্লার দেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ভট্টমারী-নামা এক বিপ্র চঞ্চলমতি কৃষ্ণদাসকে স্ত্রীলোকের লোভ দেখাইয়া তাঁহাকে তাঁহার বাটীতে লইয়া গিয়াছিলেন [১]। এই ঘটনা কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্যেও (১৩শ সর্গ-২৬-৩০) বর্ণিত আছে—রামনারায়ণবিদ্যারত্নের অনুবাদ—"এইরূপে চঞ্চলমতি কৃষ্ণদাস সেই সকল পাষণ্ডিকর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া মনে মনে আন্দোলন-করতঃ ক্রমশঃ বিমুগ্ধ হইয়া মহাপ্রভুর পথে গমন করিতে কিছু শৈথিল্য প্রকাশকরিতেলাগিল। কৃপাসিন্ধু গৌরচন্দ্র সেই দুরাত্মাদিগের দুশ্চেষ্টা এবং কৃষ্ণদাসের চঞ্চলতা জানিতে পারিয়া দুরাত্মাদিগের সহিত বিবাদ উপস্থিত করিয়া কহিলেন 'অহে সন্ন্যাসিগণ! একি? এ আমার দাস এই বালককে প্রলোভিত করিয়া কোথায় লইয়া যাইবে? এ ত তোমাদের ভাল কার্য্য নয় এবং ইহা সাধুচেষ্টাও নয়, অতএব ইহাকে ত্যাগ কর'।

দয়ানিধি গৌরচন্দ্র এইরূপে বিবাদকরতঃ শীঘ্রসম্পাদিত স্বীয় প্রভাব-দ্বারা পাষণ্ডিদিগকে কোন ক্রমে কথঞ্চিৎ বিমুখ করিলেন, যাহা হউক বিধি সুপ্রসন্ন হইলে এইরূপই হইয়া থাকে। মহাপ্রভু এইরূপ কুপথ-বর্ত্তিগণের কুচেষ্টা অবলোকনকরতঃ কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন এবং কৃষ্ণদাসকে কিছু না বলিয়াই একেবারে সেতুবন্ধ [২] উদ্দেশকরিয়া তথা

১। (চৈঃ-চঃ-মধ্য ৯ম-১১২)—

গোসাঞির (চৈতন্যদেবের) সঙ্গে রহে কৃষ্ণদাস-ব্রাহ্মণ।
ভট্টমারি-সহ তার হৈল দরশন ॥
স্ত্রীধন দেখাই তারে লোভ জন্মাইল।
আশ্চর্য্য সরল বিপ্রের বুদ্ধি নাশ হৈল ॥

২। ন কিঞ্চিদুচে খলু কৃষ্ণদাসং। সেতুং সমুদ্দিশ্য ততো জগাম ॥৩০।

হইতে গমন করিলেন।" ইহা হইতে বোধহয় যে কৃষ্ণদাসকে চৈতন্যদেব সে স্থানে পরিত্যাগকরিয়া সেতুবন্ধাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাহার পরে কৃষ্ণদাস সম্ভবতঃ চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্যহইতে প্রত্যাগমনের পথে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিল। তাহার পর নীলাচলে ভক্তগণের সমক্ষে তাহাকে চৈতন্যদেব ত্যাগকরিয়াছিলেন—(কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্য—১৩শ সর্গ-৫৪) রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের অনুবাদ—"অনন্তর গৌরচন্দ্র এই সমস্ত লোকের অগ্রে সাক্ষী করিয়া ক্ষেত্র-আনীত সেই চঞ্চলমতি কৃষ্ণদাসকে অতি প্রযত্নে 'তুমি যাও' এই বলিয়া ত্যাগ করিলেন।"

চৈতন্যচরিতামৃতেও (মধ্য—১০ম-৩২-৩৮) চৈতন্যদেবেব কৃষ্ণদাস-ত্যাগের বিষয় বর্ণিত আছে—

"ভট্টাচার্য্য [১] সব লোক বিদায়করিল।
তবে প্রভু কালাকৃষ্ণদাস বোলাইল॥
প্রভু কহে, 'ভট্ট শুন ইহার চরিত।
দক্ষিণ গেলেন ইহা আমার সহিত॥
ভট্টমারিহৈতে গেলা আমারে ছাড়িঞা।
ভট্টমারিহইতে ইহায় আনিল উদ্ধারিঞা [২]॥
তবে আমি ইহা আনি করিল বিদায়।
যাঁহা তাঁহা যাহ আমা-সনে নাহি দায়' ॥৩২॥
এত শুনি কৃষ্ণদাস কান্দিতে লাগিলা।
মধ্যাহ্ন করিতে মহাপ্রভু উঠি গেলা ॥৩৩॥
নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ, দামোদর।
চারিজনে যুক্তি তবে করিল অন্তর॥

১। সার্ব্বভৌম। ২। দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাগমনের সময়ে।

গৌড়দেশে পাঠাইতে চাহি একজন।
আইকে কহিব যাই প্রভুর আগমন॥
অদ্বৈত, শ্রীবাস আদি যত ভক্তগণ।
সভেই আসিব শুনি প্রভুর আগমন॥
এই কৃষ্ণদাসে দিব গৌড়ে পাঠাইয়া।
এত কহি তারে রাখিল আশ্বাসকরিঞা॥৩৪॥
আরদিন প্রভু ঠাঁই কৈল নিবেদন।
'আজ্ঞা দেহ গৌড় দেশে পাঠাই একজন॥
তোমার দক্ষিণ-গমন শুনি শচী-আই।
অদ্বৈতাদি বৈষ্ণব আছেন দুঃখ পাই॥
একজন যাই কহে শুভ সমাচার।'
প্রভু কহে, 'কর সেই যে ইচ্ছা তোমার' ॥৩৫
তবে সেই কৃষ্ণদাসে গৌড়ে পাঠাইল।
বৈষ্ণবসভারে দিতে মহাপ্রসাদ দিল॥৩৬
তবে গৌড়দেশে আইলা কালাকৃষ্ণদাস।
নবদ্বীপে গেলা তিঁহো শচী-আই-পাশ॥
মহাপ্রসাদ দিঞা তাঁরে কৈল নমস্কার।
দক্ষিণহইতে আইলা প্রভু কহে সমাচার॥৩৭
শুনি আনন্দিত হইল শচীমাতার মন।
শ্রীনিবাস আদি আর যত ভক্তগণ॥
শুনিয়া সভার হৈল পরম উল্লাস।
অদ্বৈতআচার্য্যগৃহে গেলা কৃষ্ণদাস॥

চৈতন্যদেব কৃষ্ণদাসকে লইয়া আসিয়াছিলেন।

আচার্য্যে প্রসাদ দিঞা কৈল নমস্কার।
সম্যক্ কহিল মহাপ্রভুর সমাচার॥"৩৮

কিন্তু আমরা দেখিয়াছি চৈতন্যদেব এই কার্য্যে গোবিন্দকে পাঠাইয়াছিলেন। চৈতন্যদেব যাহাকে আত্মসংযমের অভাবের জন্য ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাকে পুনরায় তাঁহার মাতৃদেবী ও অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট প্রেরণকরিবেন, ইহা সহজে আমরা বিশ্বাসকরিতে পারি না। ছোটহরিদাসসম্বন্ধে এইরূপ অনুরোধ তিনি রক্ষাকরেন নাই (চৈঃ চঃ—অন্ত্য-২য়-৫৫)। যিনি ছোট-হরিদাসকে সামান্য ইন্দ্রিয়-অসংযমের নিমিত্ত ত্যাগকরিয়াছিলেন, তিনি তাহা অপেক্ষা গুরুতর অপরাধের জন্য কৃষ্ণদাসকে ক্ষমাকরিবেন, ইহা আমরা বিশ্বাসকরিতে পারি না।

কবিকর্ণপূরের চরিতামৃতে (১৩শ সর্গে—১৩০-৩২) গোবিন্দের অনেক তীর্থপর্য্যটনের কথা এবং সেবক হওয়ার কথা বর্ণিত আছে—অনুবাদ—"অনন্তর গোবিন্দ-নামক একজন বিশুদ্ধমতি মহাত্মা ভক্তবর বহুতীর্থপরিভ্রমণহেতু সুমহান্ পুণ্যরাশি সঞ্চয়করিয়া বহির্গত হইয়াছিলেন। সেই মহাত্মা পুরুষোত্তম-ধামে উপস্থিত হইয়া কৃপানিধি গৌরাঙ্গদেবকে দর্শনকরিলেন এবং প্রভুর পাদপদ্মযুগলের পরিচর্য্যা-কার্য্যে নিরন্তর রত হইলেন। তদবধি অতি ভাগ্যবান্ গোবিন্দ সমস্ত কার্য্য-ত্যাগপূর্ব্বক প্রভুপাদপদ্মের নিকটস্থ হইয়া দিবারাত্রি কেবল মহাপ্রভুরই পরিচর্য্যা-কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন।"

চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের ৭ম অঙ্কের লিখিত আছে যে উৎকলের রাজা প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌমকে চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্যযাত্রার সঙ্গীর বিষয় জিজ্ঞাসাকরিলে এইরূপ কথোপকথন হইয়াছিল— (রা-বি-কৃত অনুবাদ)—

—"রাজা। (চৈতন্যদেব) কেন একাকী গমন করিলেন ?

ভট্টাচার্য্য। সেইরূপ ব্যক্তি কেন একাকী হইবেন ? তথাপি তাঁহার সঙ্গে কয়েকটী শিষ্য-ব্রাহ্মণ প্রেরণকরিয়াছি।

রাজা। কতদূর পর্য্যন্ত তাঁহারা সঙ্গে যাইবেন ?

ভট্টাচার্য্য। গোদাবরীপর্য্যন্ত তাঁহারা যাইবেন, কিন্তু ভগবান্ সেতুবন্ধপর্য্যন্ত গমন করিবেন ইহা অনুমান হইতেছে।

রাজা। ব্রাহ্মণদিগকে সেই পর্য্যন্ত কেন পাঠাইলেন না ?

ভট্টাচার্য্য। তাঁহার অনুমতি না থাকায় পাঠাইতে পারি নাই, রামানন্দের অনুরোধে কেবল তাঁহাদিগকে গোদাবরীপর্য্যন্ত সঙ্গে লইয়াছেন।" (রামানন্দের অনুরোধে = রামানন্দ-দর্শন নিমিত্ত)।

ইহা হইতে অনুমিত হইবে যে গোদাবরীতীর্থের পরে চৈতন্যদেবের কোন ব্রাহ্মণ-সহযাত্রী (এমন কি কৃষ্ণদাসও) ছিলেন না। অতএব কৃষ্ণদাস-প্রলোভন এবং কৃষ্ণদাসকে চৈতন্যদেবের ত্যাগ আলালনাথ হইতে রাজমহেন্দ্রীর মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু কৃষ্ণদাসকবিরাজ কৃষ্ণদাসকে সেতুবন্ধ পারকরিয়া লইয়া গিয়াছেন। চৈতন্যের বৈষ্ণব ভক্তগণের মতে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে অনেক পার্থক্য ছিল। গোবিন্দ শূদ্র বলিয়া তাঁহাকে চৈতন্যদেবের সেবক করিতেও তাঁহাদিগের আপত্তি ছিল। শূদ্রের প্রতি এইরূপ ঘৃণা চৈতন্য-চন্দ্রোদয়নাটকের অষ্টম অঙ্কে বর্ণিত আছে। রামনারায়ণবিদ্যারত্নকৃত অনুবাদ এই—

"সার্ব্বভৌম। তুমি কি তাঁহার (ঈশ্বরপুরীর) পরিচারক ?

গোবিন্দ। হাঁ!

সার্ব্বভৌম। ইনি কিরূপে ব্রাহ্মণভিন্ন অপর জাতিকে পরিচারক করিয়াছেন ?

শ্রীচৈতন্য। ভট্টাচার্য্য! এমন কথা বলিও না। স্বতন্ত্র পুরুষ সেই ভগবান্ হরির করুণা, জাতি ও কুলাদির অপেক্ষা করে না। তাহার প্রমাণ এই যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সুযোধনের অন্ন [১] পরিত্যাগকরিয়া সহর্ষে বিদুরের অন্ন ভোজন করিলেন।" আমাদের মনে হয় বৈষ্ণবগ্রন্থকারেরা প্রথমতঃ গোবিন্দ শূদ্র বলিয়া তাঁহাকে চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্যভ্রমণের একমাত্র সঙ্গী বলিয়া অস্বীকারকরিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ যখন চৈতন্যদেব নীলাচলে সেবকের কার্য্যে গোবিন্দকে নিযুক্ত করিলেন, তখন কেবল ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য বলিয়া গোবিন্দকে তিনি পরিচারকের কার্য্যে নিয়োগকরিয়াছেন এই কথা তাঁহারা রচনা করিলেন।

চৈতন্যদেব বোধহয় ব্রাহ্মণেতরজাতির অন্নগ্রহণ করিতেন, তাহা না হইলে শ্রীকৃষ্ণের বিদুরের অন্নভোজনের কথা উত্থাপন করিতেন না। নীলাচলে শিবানন্দসেনের বাসস্থানে তিনি নিমন্ত্রণ খাইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র চৈতন্যদাসের নিকটে তিনি দধি-ভাত খাইয়াছিলেন, কিন্তু এগুলি সবই জগন্নাথদেবের প্রসাদ কিনা আমরা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি না। অনেকে মহাপ্রসাদের সহিত ঘরের রান্না ভাতও মিশাইতেন (চৈঃ চঃ অন্ত্য—১০ম প-৩৯-৪৩)।

গৌরাঙ্গদেবের ভক্তগণ জানিতেন যে তিনি যাহা ন্যায়সঙ্গত বোধ করিবেন, তাহা হইতে তিনি কখনই বিচ্যুত হইবেন না। তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণ, দক্ষিণভ্রমণ, গৌড় হইয়া বৃন্দাবনযাত্রা, নীলাচলে আসিয়া পুনরায় বৃন্দাবনযাত্রা, ছোট-হরিদাসের সম্বন্ধে মত-অপরিবর্ত্তন, গোপীনাথরায়ের জন্য প্রতাপরুদ্রকে অনুরোধকরিতে অসম্মতি, প্রতাপরুদ্রকে অনেকবার প্রত্যাখ্যান দৃষ্টান্তস্বরূপ লওয়া যাইতে পারে। অবশ্য যখন

১। চৈঃ চঃ—মধ্য-১০ম-৬০ এবং ৬১।

তাঁহাকে কেহ বুঝাইতে সক্ষম হইত, যে তাঁহার কার্য্য অসমীচীন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার মত পরিবর্ত্তনকরিতেন [১]। সেই নিমিত্ত আমাদিগের বিশ্বাস যে চৈতন্যদেব তাঁহার ব্রাহ্মণভক্তগণের মতের বিরুদ্ধে গোবিন্দকে দক্ষিণভ্রমণের সঙ্গী করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে দিলেও কৃষ্ণদাসের আচরণে অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ত্যাগকরিয়া কেবল

১। একটী যুবতী ব্রাহ্মণীর পুত্রকে প্রত্যহ চৈতন্যদেবসকাশে তাঁহার আসিতে দেওয়া দামোদর অন্যায় বলিলে চৈতন্যদেব তাহাকে আসিতে বারণকরিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ-অন্ত্য-৩য় পঃ-৭-৮)। সনাতন তাঁহাকে অধিক লোক লইয়া গৌড়েশ্বরের রাজধানীর নিকট দিয়া বৃন্দাবন যাইতে বারণ করিলে চৈতন্যদেব সে পথে বৃন্দাবন যাইতে নিরস্ত হইয়াছিলেন (চৈঃ চঃ-মধ্য-১৬শ পঃ-১৩-৫)। রামচন্দ্রপুরী, ঈশ্বরপুরী ও পরমানন্দপুরী মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। চৈতন্যদেব ঈশ্বরপুরীর শিষ্য। রামচন্দ্রপুরীব্যতীত সকলেই কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। নীলাচলে রামচন্দ্রপুরী আসিয়া চৈতন্যদেবের ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন। চৈতন্যদেবের বাসস্থানে পিপীলিকা দেখিয়া বলিলেন যে ইক্ষু-গুড় খাওয়ার জন্য এত পিপীলিকা হইয়াছে—

সন্ন্যাসী হঞা ক'রে নানা মিষ্টান্ন-ভক্ষণ।
এই ভোগে হয় কৈছে ইন্দ্রিয়-বারণ ? (চৈঃ চঃ অন্ত্য-৮ম-১৯)

ইহা শ্রবণকরিয়া চৈতন্যদেব তাঁহার ভোজন সঙ্কুচিত করিলেন। এই জন্য তাঁহার ভক্তগণ রামচন্দ্রপুরীকে নিন্দাকরিতেলাগিলেন। কিন্তু চৈতন্যদেব রামচন্দ্রপুরীকে বলিলেন—

প্রভু কহে, 'অজ্ঞ বালক মুঞি শিষ্য তোমার।
মোরে শিক্ষা দেহ এই ভাগ্য সে আমার' ॥৩১

তিনি তাঁহার অনুচরদিগকে বলিলেন—

প্রভু কহে, 'সভে কেনে পুরীকে কর রোষ ?
সহজ ধর্ম্ম কহে তেঁহো তাঁর কিবা দোষ ॥
যতি হৈঞা জিহ্বা-লম্পট অত্যন্ত অন্যায়।
যতি-ধর্ম্ম প্রাণ রাখিতে অল্পমাত্র খায়' ॥৩৭

গোবিন্দকে সঙ্গে লইয়া ভট্টমারীর গ্রামহইতে সেতুবন্ধপর্য্যন্ত এবং সেতু-বন্ধহইতে দ্বারকা গিয়াছিলেন এবং দ্বারকাহইতে নীলাচলে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। অবশ্য দাক্ষিণাত্যহইতে প্রত্যাগমনের সময়ে শুভ্রামতী-নদী হইতে নীলাচলপর্য্যন্ত রামানন্দ বসু ও তাঁহার ভৃত্য গোবিন্দচরণ (গোবিন্দকর্ম্মকারব্যতীত) তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন।

নীলাচলে পৌছিয়া গোবিন্দকে একখানি পত্র দিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত-আচার্য্যের নিকটে চৈতন্যদেব পাঠাইয়াছিলেন। গোবিন্দ শান্তিপুরহইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পুনরায় চৈতন্যদেব সার্ব্বভৌমপ্রভৃতি ব্রাহ্মণভক্তগণের নিষেধসত্ত্বেও তাহাকে সেবকের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যখন ইঁহারা দেখিলেন যে চৈতন্যদেব গোবিন্দকে সেবকের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প, তখন ইঁহারা প্রচার করিলেন যে শূদ্র হইলেও ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য বলিয়া চৈতন্যদেব গোবিন্দকে সেবকের কার্য্যে নিয়োগকরিয়াছেন। আবার তাহাতেও এই আপত্তি হইতে পারে যে পূজ্যব্যক্তির (গুরু-ঈশ্বরপুরীর) পরি-চারককে চৈতন্যদেব কি করিয়া নিজের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ইহার উত্তরে কবিকর্ণপূর (চৈঃ চঃ নাঃ—৮ম-১৯) চৈতন্যদেবকে দিয়া বলাইতেছেন—

"ভবতু পূজ্যানাং পরিচারকেন স্বপরিচর্য্যা কারয়িতুং ন যুজ্যতে তথাপি তদাজ্ঞয়া তথৈব কর্ত্তব্যমিতি তমনুগৃহ্ণাতি।"

(অহো! পূজ্যগণের পরিচারক-দ্বারা নিজের পরিচর্য্যা করান যদ্যপি অনুচিত, তথাপি তাঁহার আজ্ঞানুসারে তাহাই করিব। এই বলিয়া তাঁহাকে অনুগ্রহকরিলেন) অর্থাৎ গোবিন্দকে সেবকের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

চৈতন্যচরিতমহাকাব্যে (১৯শ-২-৬) বর্ণিত আছে যে দক্ষিণভ্রমণ

হইতে নীলাচলে আগমনের পরে যখন চৈতন্যদেব জননী এবং ভাগীরথীকে দেখিয়া মথুরা এবং বৃন্দাবনযাত্রার অভিলাষ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে গোবিন্দ, জগদানন্দ, দামোদরপণ্ডিত এবং পরমানন্দপুরী ইঁহারা সকলেই তাঁহার সহিত গমন করিয়াছিলেন।

অপ্রাকৃত ঘটনার যুগ অতীত হইয়াছে। চৈতন্যদেবের সময়ে এবং তাহার পূর্ব্বেও অপ্রাকৃত ঘটনার অবতারণার দ্বারা জনসাধারণের মনে অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস উৎপাদনকরিবার অনেক চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু এরূপ বিশ্বাস যে অধিক দিন স্থায়ী হইত তাহা বলা যায় না—কারণ বর্ত্তমান যুগের তুলনায় সে সময়ে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বিচারশক্তি-সম্পন্ন লোক অল্প হইলেও দার্শনিক এবং বুদ্ধিমান্ লোকের অভাব ছিল না। গোবিন্দদাসের করচায় আমরা দেখিতে পাই যে চৈতন্যদেব বরাহ (চৈঃ চঃ আদি—১৭শ পঃ-১৭), নরসিংহ (চৈঃ চঃ আদি—১৭শ পঃ-৭৬), চতুর্ভুজ (চৈঃ চঃ মধ্য—৬ষ্ঠ পঃ-১৪৪) ও ষড়্ভুজমূর্ত্তি (চৈঃ চঃ আদি —১৭শ-১০ ; চৈঃ ভাঃ-অন্ত্য-৩য় পঃ) গ্রহণ না করিয়াও এবং পাণ্ডিত্য-পূর্ণ অনেকের দুর্ব্বোধ্য ভাষা ব্যবহার না করিয়াও সহজ ভাষায় বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি এবং প্রেম জনসাধারণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সহজ ভাষায় উপদেশ দানের দৃষ্টান্ত (যেমন নারোজীর প্রতি উপদেশ) আমরা এই করচা হইতে কিয়ৎপরিমাণে উদ্ধৃত করিয়াছি। ইহার সহিত তাঁহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য এবং ভাবাবেশ তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারে সাহায্য করিয়াছিল। গোবিন্দদাসের করচায় বর্ণিত আছে যে এইরূপে কণ্টকনগরে (কাটোয়া) সন্ন্যাসগ্রহণের সময় হইতে তাঁহার দক্ষিণভ্রমণানন্তর নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত গৌড়প্রদেশের অংশবিশেষ এবং দাক্ষিণাত্য তিনি কৃষ্ণভক্তি ও প্রেমদ্বারা প্লাবিত করিয়াছিলেন।

নৃসিংহ অথবা নরসিংহ-মূর্ত্তিধারণের বিষয় কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচরিত

কাব্যেও (৭ম-৮০-৮২) আছে—তাহার রামনারায়ণ-বিদ্যারত্নকৃত অনুবাদ (২৫৯ পৃঃ)—

"সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ ভগবান্ গৌরাঙ্গদেব নিজগৃহহইতে নৃসিংহদেবের নাম শ্রবণকরতঃ অতিশয় তেজঃ প্রকাশপূর্ব্বক নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণকরিয়া শ্রীবাসের গৃহে গমন করিলেন ॥৮০॥

তৎকালে মহাপ্রভু দুই হস্তে গদাধারণকরতঃ দুঃসহ তেজঃ গ্রহণ করিয়া পাদপদ্মের সুবৃহৎ বিক্ষেপদ্বারা ভূমিতলকে বিদলিত করিয়া ধাবিত হইলেন ॥৮১॥

অনন্তর পথমধ্যে ধাবনহেতু যাঁহার বেগ অত্যন্ত প্রদীপ্ত সেই নরসিংহরূপী গৌরহরিকে অবলোকন করিয়া জনসকল অত্যন্ত ভীত হইয়া, বেগে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল ॥৮২॥"

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে নিত্যানন্দরূপী বলরামের সহিত নন্দীগ্রামে ব্যাসদেবের ইষ্টগোষ্ঠীর কথা বর্ণিত আছে (চৈঃ ভাঃ—আদি-৮ম)।

লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের শেষখণ্ডে প্রতাপরুদ্রকে চৈতন্যদেবের ষড়্ভুজমূর্ত্তি-প্রদর্শনের কথা এবং চৈতন্যদেবের ইচ্ছায় একটী দরিদ্র দ্রাবিড়দেশের ব্রাহ্মণকে অর্থসাহায্য করিবার জন্য বিভীষণের লঙ্কা হইতে আগমনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে বিভীষণের দ্রাবিড়-ব্রাহ্মণের সহিত নীলাচলে চৈতন্যদেবের সকাশে আগমনপ্রভৃতি অদ্ভুত ঘটনার সমাবেশ থাকিলেও পদকর্ত্তা হিসাবে তাঁহার স্থান যে অতিশয় উচ্চে তাহা নিম্নলিখিত চৈতন্যদেব-বিরহে তাঁহার সাধ্বী সহধর্ম্মিণী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তাহার মর্ম্মস্পর্শিণী বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হইবে—

"ফাল্গুনে গৌরাঙ্গচাঁদ পূর্ণিমাদিবসে।
উদ্বর্ত্তন [১]-তৈলে স্নান করাব হরিষে ॥
পিষ্টক পায়স আর ধূপ-দীপ-গন্ধে।
সঙ্কীর্ত্তন করাইব পরম আনন্দে ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে! তোমার জন্মতিথি-পূজা।
আনন্দিত নবদ্বীপ-বালবৃদ্ধযুবা ॥১৭৭৮

চৈত্রে চাতক-পক্ষী পিউ পিউ ডাকে।
তাহা শুনি প্রাণ কান্দে কি কহিব কাকে?
বসন্তে কোকিল সব ডাকে কুহু কুহু,
তাহা শুনি আমি মূর্চ্ছা পাই মুহুর্মুহুঃ ॥
পুষ্প-মধু খাই মত্ত ভ্রমরীর বোলে।
তুমি দূর দেশে আমি গোঙাইব কার কোলে ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে! আমি কি বলিতে জানি?
বিঁধাইল শরে যেন ব্যাকুল হরিণী ॥১৭৭৯॥

বৈশাখে চম্পকলতা নৌতুন গামছা,
দিব্যধৌত কৃষ্ণকেলি বসনের কোঁচা,
কুঙ্কুম চন্দন অঙ্গে সরু পৈতা কান্ধে,
সেরূপ না দেখি মুঞি জীব কোন ছান্দে ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে! বিষম বৈশাখের রৌদ্র।
তোমা না দেখিয়া মোর বিরহ-সমুদ্র ॥১৭৮০॥

১। চন্দনাদিদ্বারা গাত্র-মল-শোধন ও ঘর্ষণ।

জ্যৈষ্ঠে প্রচণ্ড তাপ তপত সিকতা [১],
কেমনে বঞ্চিবে প্রভু পদাম্বুজ-রতা ?
সোঙরি সোঙরি প্রাণ কান্দে নিশিদিন,
ছট্‌ফট্‌ করে যেন জল বিনু মীন ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে ! তোমার নিদারুণ হিয়া :
অনলে প্রবেশ করি মরিবে বিষ্ণুপ্রিয়া ॥১৭৮১

* আষাঢ়ে নৌতুন মেঘ দাদুরীর [২] নাদে,
দারুণ বিধাতা মোরে লাগিবেক বাদে ॥
* শুনিয়া মেঘের নাদ ময়ূরীর নাট [৩],
কেমনে যাইব আমি নদীয়ার বাট ?
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে ! মোরে সঙ্গে লইয়া যাও,
যথা রাম তথা সীতা মনে চিন্তি চাও ॥১৭৮২

শ্রাবণে গলিত ধারা ঘন-বিদ্যুল্লতা।
কেমনে বঞ্চিব প্রভু কারে কব কথা ?
লক্ষ্মীর বিলাস-ঘরে পালঙ্কে শয়ন,
সে সব চিন্তিয়া মোর না রহে জীবন ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে ! তুমি বড় দয়াবান্,
বিষ্ণুপ্রিয়াপ্রতি কিছু কর অবধান ॥১৭৮৩

১। বালি।
২। ভেকের।
৩। নৃত্য।

ভাদ্রে ভাস্বত-তাপ সহনে না যায়,
কাদম্বিনী-নাদে নিদ্রা মদন জাগায় ;
যার প্রাণনাথ প্রভু না থাকে মন্দিরে,
হৃদয়ে দারুণ শেল বজ্রাঘাত শিরে ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে ! বিষম ভাদ্রের খরা [১],
জীয়ন্তে মরিল প্রাণনাথ নাহি যারা ॥১৭৮৪

আশ্বিনে অম্বিকা-পূজা-দুর্গা-মহোৎসবে,
কান্ত বিনে যে দুঃখ তা কার প্রাণে সবে ? *
শরত-সময়ে নাথ যার নাহি ঘরে,
হৃদয়ে দারুণ শেল অন্তর বিদরে ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে ! মোরে কর উপদেশ ;
জীবনে মরণে মোর করিহ উদ্দেশ ॥১৭৮৫

কাত্তিকে হিমের জন্ম হিমালয়ের বা,
কেমনে কৌপীন বস্ত্র আচ্ছাদিবে গা ?
কত ভাগ্য করিয়া তোমার হৈয়াছিলাম দাসী,
এবে অভাগিনী মুঞি হেন পাপ-রাশি ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে ! অন্তর-যামিনী ।
তোমার চরণে আমি কি বলিতে জানি ॥১৭৮৬

অগ্রাণে নৌতুন ধান্য জগতে বিলাসে ।
সর্ব্ব সুখ ঘরে প্রভু কি কায সন্ন্যাসে ?

* ———

১। রৌদ্র।

পাট, নেত, ভোটে [১] প্রভু শয়ন কম্বলে,
সুখে নিদ্রা যাও তুমি, আমি পদতলে ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে! তোমার সর্ব্বজীবে দয়া,
বিষ্ণুপ্রিয়া মাগে রাঙ্গা চরণের ছায়া ॥১৭৮৭

পৌষে প্রবল শীত জ্বলন্ত পাবকে,
কান্ত-আলিঙ্গনে দুঃখ তিলেক না থাকে ॥
নবদ্বীপ ছাড়ি প্রভু গেলা দূর দেশে,
বিরহ-অনলে বিষ্ণুপ্রিয়া পরবেশে ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে! পরবাস নাহি সহে।
সঙ্কীর্ত্তন অধিক সন্ন্যাস ধর্ম্ম নহে ॥১৭৮৮

মাঘে দ্বিগুণ শীত কত নিবারিব।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে নারিব ॥
এই ত দারুণ শেল রহল সম্প্রতি,
পৃথিবীতে না রহল তোমার সন্ততি ॥
ও গৌরাঙ্গ প্রভু হে! মোরে লেহ নিজ পাশ।
বিরহ-সাগরে ডুবে এ লোচন দাস ॥১৭৮৯॥

অদ্ভুত কাল্পনিক সৃষ্টির বিষয় পূর্ব্বে (পৃঃ ৩৪৫) আমরা কিছু আলোচনাকরিয়াছি। আমাদিগের মনে হয় এ বিষয়ে অনেক বৈষ্ণব-গ্রন্থকার মুরারিগুপ্তের করচার নিকট ঋণী। তাঁহার দ্বিতীয় প্রক্রমের

[১] পট্টবস্ত্র, নেতধটি (উৎকৃষ্ট পট্টবস্ত্র), ভোট-কম্বল

দ্বিতীয় সর্গে চৈতন্যদেবের বরাহমূর্ত্তিপরিগ্রহের কথা বর্ণিত আছে। বিভীষণের সহিত চৈতন্যদেবের নীলাচলে সাক্ষাতের বিষয় তাঁহার চতুর্থ প্রক্রমের একবিংশতি সর্গে আছে, তাহা (অমৃতবাজারপত্রিকাসংস্করণ) হইতে কতকগুলি ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

"দ্রাবিড়স্থো দ্বিজঃ কশ্চিদ্দরিদ্রো বুদ্ধিসত্তমঃ।
আজগাম ধনার্থং চ জগন্নাথদিদৃক্ষয়া ॥১০॥
নিবেদ্য স্বপ্রয়োজনং জগন্নাথস্য সন্নিধৌ।
স্থিতঃ সপ্তদিনান্যেব প্রত্যাদেশং বিচিন্তয়ন্ ॥১৪॥
অপ্রাপ্য বাঞ্ছিতং দুঃখাৎ সমুদ্রতীরমাগতঃ।
তত্রৈব হ্যাগতং দৈবাদ্বিভীষণমদর্শয়ৎ ॥১৫॥
পপ্রচ্ছ কো ভবান্ কুত্র যাহি স ত্বং বদস্ব ভো।
সপ্তাহং শ্রীজগন্নাথদর্শনার্থমাগতোহপ্যহম্ ॥১৬॥
বিভীষণোনাম মহ্যমিত্যুক্ত্বা প্রযযৌ স চ।
বিপ্রোহপি তেন সার্দ্ধঞ্চ যযৌ সৌভাগ্যপর্ব্বতং ॥১৭॥
আগতো গৌরচন্দ্রস্য সমীপং শ্রীবিভীষণঃ।
দৃষ্ট্বা শ্রীচরণদ্বন্দ্বং তস্য দণ্ডনতির্ভুবি ॥১৮॥
বিপ্রোহপি স চমৎকারং পশ্যন্ প্রেমপরিপ্লুতঃ।
দারিদ্রং শ্লাঘয়ন্ দুঃখং ননর্ত্ত জাতকৌতুকঃ ॥১৯॥
বিভীষণঞ্চ ভগবান্ বাঞ্ছাকল্পতরুঃ প্রভুঃ।
প্রাহ ব্রাহ্মণবর্য্যায় ধনং দত্ত্বা ভবান্ খলু ॥২০॥
পূর্ণয়িষ্যতি যেনাসৌ দুঃখরোগাদ্বিমুচ্যতে।
কৃতাঞ্জলিপুটঃ সোহপি জগ্রাহ শিরসি বচঃ ॥২১॥
শ্রুত্বা দ্বিজবরঃ প্রাহ মা মাং সংত্যক্তুমর্হসি।
যথা তে বচনপ্রাপ্তিস্তথা কুরু জগদ্গুরো ॥২২॥

জগন্নাথ হৃষীকেশঃ সংসারার্ণবতারকঃ।
পতিতপ্রেমদঃ কৃষ্ণস্ত্বমেব মাং সমুদ্ধর ॥২৩॥
তং প্রাহ করুণাসিন্ধুর্যাহি ত্বং নিজমন্দিরম্।
ভুক্ত্বা ভোগান্ সমুৎসৃজ্য শ্রীকৃষ্ণচরণং সদা ॥২৪॥
ভজনাল্লভতে ভক্তিং যথা স্যাৎ প্রেমসম্পদঃ।
এবং শ্রুত্বা প্রণম্যাসৌ যযৌ নিজগৃহং দ্বিজঃ ॥২৫॥
বিভীষণশ্চ সংস্নাত্বা প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ।
জগাম স্বগৃহং রম্যং ধ্যায়ন্ তচ্চরণাম্বুজম্ ॥

জগন্নাথ দেখিবার জন্য এবং ধনসংগ্রহ করিবার নিমিত্ত এক দরিদ্র বুদ্ধিমান্ দ্রাবিড়বাসী ব্রাহ্মণ নীলাচলে আসিয়াছিলেন। জগন্নাথদেবের নিকটে তাঁহার প্রয়োজন নিবেদনকরিয়া প্রত্যাদেশের নিমিত্ত সাতদিন নীলাচলে তিনি অপেক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার অভীষ্ট না পাইয়া দুঃখিতচিত্তে তিনি সমুদ্রতীরে আসিয়াছিলেন। দৈবাৎ তথায় বিভীষণ আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে, কোথায় যাইবেন, আমাকে বলুন।" ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন যে তাঁহার নাম বিভীষণ এবং তিনিও এক সপ্তাহ নীলাচলে অবস্থিতি করিয়া জগন্নাথ-দেবকে দেখিবেন। এই কথা বলিয়া বিভীষণ নীলাচলাভিমুখে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণও বিভীষণের সহিত নীলাচলে গমন করিলেন। বিভীষণ চৈতন্যদেবের নিকটে আসিলেন এবং তাঁহার পাদযুগলে প্রণাম করিলেন। বিপ্রও প্রেমপরিপ্লুত হইয়া এই আশ্চর্য্যজনক দৃশ্য দেখিয়া নিজের দুঃখ এবং দারিদ্র্য প্রশংসাকরিয়া আনন্দসহকারে নৃত্য করিতে লাগিলেন। বাঞ্ছাকল্পতরু চৈতন্যদেব বিভীষণকে বলিলেন, "আপনি এই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে ধন দিয়া সন্তুষ্ট করিবেন এবং দেখিবেন যেন তিনি

দুঃখরোগ হইতে বিমুক্ত হন।” বিভীষণ কৃতাঞ্জলিপুটে চৈতন্যদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন। দ্বিজশ্রেষ্ঠ বিভীষণের প্রতি চৈতন্যদেবের বাক্য শুনিয়া বলিলেন, “আমাকে আপনার ত্যাগ করা উচিত নয়; হে জগদ্‌গুরো, আপনার বাক্যানুসারে কার্য্য করুন। জগন্নাথদেব, হৃষীকেশ, সংসার-অর্ণব-তারক, পতিতদিগের প্রতি প্রেমযুক্ত, শ্রীকৃষ্ণ, আপনি, আমাকে উদ্ধার করুন।” করুণাসিন্ধু চৈতন্যদেব তাহাকে বলিলেন, “তুমি নিজগৃহে যাও, তুমি বিষয়ভোগ করিয়া সমস্ত শ্রীকৃষ্ণ-চরণে সর্ব্বদা নিবেদনকরিবে; ঈশ্বরআরাধনা হইতে ভক্তি জন্মায় এবং ইহা হইতে প্রেমধন প্রাপ্ত হওয়া যায়।” সেই ব্রাহ্মণ ইহা শুনিয়া চৈতন্যদেবকে প্রণামকরিয়া নিজ গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। বিভীষণও সমুদ্রে স্নান করিয়া চৈতন্যদেবকে বারংবার প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার রমণীয় চরণাম্বুজ ধ্যান করিতে করিতে নিজের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন [১]।

১। বিভীষণ অন্ততঃ খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে হইয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে যে বিভীষণ এবং চৈতন্যদেবের মধ্যে প্রায় তিন সহস্র বৎসরের ব্যবধান আছে। আমরা ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে সিংহলে গিয়াছিলাম। অনেক শিক্ষিত সিংহল-অধিবাসীর সহিত রামায়ণের কথা চর্চ্চা-করিয়াছিলাম। ঐতিহাসিক যুগে বিভীষণের দর্শন যে কেহ পাইয়াছেন তাহা আমাদিগকে তাঁহারা কেহ বলিতে পারিলেন না। ঐতিহাসিক যুগে সিংহলেরও বিশেষ কোন ভৌগলিক পরিবর্ত্তন হয় নাই। আমাদিগের দেশে একটী কিংবদন্তী আছে যে বিভীষণ এবং হনুমান্ অমর। এমন হইতে পারে যে বিভীষণ মাঝে মাঝে দর্শন দেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ চিনিয়া উঠিতে পারেন না। মুরারিগুপ্তমহাশয়ের কথা স্বতন্ত্র। তিনি শ্রীরাম-চন্দ্রের উপাসক ছিলেন (করচার অমৃতবাজার সংস্করণের ভূমিকা পৃঃ ১৯) এবং তিনি হনুমানের অবতার (ঐ)। হনুমান্ সংস্কৃতে অভিজ্ঞ ছিলেন (আমার Stray Thoughts, part III, pp. 261-62 দেখুন); গুপ্তমহাশয়ের সংস্কৃত-অভিজ্ঞতার করচাই প্রমাণ। হনুমান্

মৃণালকান্তিঘোষমহাশয় তাঁহার মুরারিগুপ্তের করচার ভূমিকায় প্রমাণ করিয়াছেন যে লোচনদাস তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলে, কৃষ্ণদাসকবিরাজ তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃতে, কবিকর্ণপূর তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃত-মহা-কাব্যে এবং বৃন্দাবনদাস তাঁহার চৈতন্যভাগবতে মুরারিগুপ্তের করচা হইতে অনেক তথ্য সংগ্রহকরিয়াছেন। এই ভূমিকাহইতে কতকগুলি ছত্র উদ্ধৃত করিলাম—(পৃঃ ৮-১০)—

"এবার মুরারিগুপ্ত দেখেন যে, সেই পাঁচ বৎসরের দিগম্বর শিশু নিমাই, তাঁহার (মুরারির) হাবভাব, অঙ্গভঙ্গী ও কথা অবিকল অনুকরণকরিতে করিতে আসিতেছে, আর তাই দেখিয়া অপর শিশুগুলি আনন্দে উচ্চহাস্য করিতেছে। ইহা দেখিয়া মুরারির ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল, তিনি বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিলেন—"জগন্নাথ মিশ্রের (চৈতন্যদেবের পিতার) একটা অকালকুষ্মাণ্ড (চৈতন্যদেব) জন্মিয়াছে। ইহারই এত সুখ্যাতি !"

এই কথা শুনিয়া নিমাই ভ্রূকুটি করিয়া বলিল—"আচ্ছা এখন যাও, ভাল শিক্ষা দিব তোমার ভোজনের কালে।" পাঁচ বৎসরের শিশুর মুখে এই কথা শুনিয়া মুরারি বিস্মিত হইলেন, কিন্তু নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ইহা একেবারে ভুলিয়া গেলেন। ক্রমে মধ্যাহ্নভোজনের সময় উপস্থিত হইল, মুরারি ভোজনে বসিলেন।

* * * *

মদনমোহন সাজে শ্রীনিমাইচাঁদ মুরারিগুপ্তের গৃহে আসিয়া জলদ-

ঔষধি আনিয়া লক্ষ্মণকে নিরাময় করিয়াছিলেন (Stray Thoughts pp. 63,172) ; গুপ্ত মহাশয়ও চিকিৎসক ছিলেন। হনুমান যে বিভীষণকে দেখিলে সহজেই চিনিতে পারিবেন, ইহা কোন মতে বিস্ময়ের বিষয় নয়, কারণ রাম-রাবণ যুদ্ধের সময়ে দুই জনে অনেকদিন

গম্ভীরনাদে "মুরারি" বলিয়া ডাকিলেন। গলার স্বর শুনিয়াই মুরারি বুঝিতে পারিলেন কে ডাকিতেছে। অমনি মুরারির সকালবেলার সেই কথা স্মরণ হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ নিমাইচাঁদ মুরারির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত।

একে হেমগৌরকান্তি কলেবর, তারপর ভুবনভুলান সাজ, দেখিয়া মুরারি ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। শচীর দুলাল মৃদুমধুর হাসিয়া বলিলেন—

'তরস্ত না হয়ো তুমি এইখানে আছি আমি
ধীরে সুস্থে করহ আহার।"

মুরারির মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, কিন্তু তাঁহার মনের মধ্যে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইল, তিনি অন্যমনস্ক ভাবে তাড়াতাড়ি আহার করিতে লাগিলেন। এদিকে নিমাইচাঁদ—

মধ্য-ভোজন বেলা ধীরে ধীরে নিয়ড়ে গেলা
থাল ভরিএ মূত মূতিল !!

মুরারির যেন চমক ভাঙ্গিল, তিনি 'ছি! ছি!' করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি কোন কথা বলিবার আগেই নিমাই ক্রোধ-ভরে কহিলেন—

"হাত মুখ মাথা নাড়া ছাড়হ মুরারি।
শুষ্ক জ্ঞানচর্চ্চা ছাড় ভজহ শ্রীহরি ॥
জীব আর ভগবানে ভিন্ন যে না করে।
প্রস্রাব করি যে তার থালার উপরে ॥"

এই কথা বলিয়াই শ্রীনিমাই চকিতের মত কোথায় চলিয়া গেলেন, মুরারি আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না! কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তখন তাঁহার মনের মধ্যে ক্রোধের কণামাত্র রহিল না, এক

অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল, সমস্ত দেহদিয়া একটা আনন্দের ঢেউ বহিয়া গেল। কারণ তাঁহার

মনে মনে অনুমান এহ কভু নহে আন
সত্য পঁহু শচীর তনয়।

অনুমান কেন, সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল—ইনি স্বয়ং শ্রীভগবান্।" চৈতন্যদেব মুরারির মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময়ে তাঁহার অন্ন-পাত্রে মূত্র-ত্যাগ ব্যতীত আর কোন উপায়ে নিজের ঈশ্বরত্ব প্রমাণ-করিতে কি পারিতেন না? নরসিংহমূর্ত্তি প্রভৃতি পরিগ্রহকরিলে মুরারির মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যাঘাত হইত না এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি চৈতন্যদেবের ঈশ্বরত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতেন।

পুনরায়—(পৃঃ ১৯-২১)—

"পূর্ব্বে বলিয়াছি শ্রীমুরারিগুপ্ত ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক। সেই জন্য তাঁহাকে শ্রীহনুমন্তের অবতার বলা হইত। যথা বৈষ্ণব-বন্দনা—

বন্দিব মুরারিগুপ্ত ভক্তিশক্তিমন্ত।
পূর্ব্ব অবতারে যাঁর নাম হনূমন্ত॥

মুরারির দেহে হনূমানের আবেশ প্রায় হইত এবং তখন তাঁহার শরীরে অসুরের ন্যায় বল হইত। জগাই, মাধাই যে সময় নবদ্বীপের একরূপ সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন, তখন তাহাদের মনে এই গর্ব্ব ছিল যে নবদ্বীপে তাহাদের ন্যায় বলবান্ আর কেহই নাই। কিন্তু যেদিন শ্রীগৌরাঙ্গ তাহাদিগকে উদ্ধারকরিলেন, সেইদিন শ্রীপ্রভুর আদেশে মুরারি এই ভ্রাতৃদ্বয়কে দুই কোলে করিয়া অবলীলাক্রমে প্রভুর প্রাঙ্গণে আনিয়া হাজির করিলেন।

মুরারির দেহে গরুড়ের আবেশও কখনও কখনও হইত। একদিন

মহাপ্রভু শ্রীবাসের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া বিষ্ণুর আবেশে "গরুড়" "গরুড়" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। মুরারি তখন নিজের বাড়ীতে ছিলেন। প্রভুর আহ্বানে তাঁহার গরুড়-আবেশ হইল। তিনি "এই যে আমি" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে শ্রীবাসের গৃহপানে ছুটিলেন। পথের লোক তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইল; ভাবিল নিশ্চয় তাঁহার মাথা খারাপ হইয়াছে। কিন্তু মুরারি তখন একরূপ বাহ্যজ্ঞান-শূন্য, কে কি বলিতেছে না বলিতেছে, সেদিকে তাঁহার আদপে লক্ষ্য নাই; শ্রীবাসের আঙ্গিনায় উপস্থিত হইয়াই তিনি প্রভুকে বলিলেন, "কেন দাসকে স্মরণ করেছেন? কোথায় লয়ে যেতে হবে, আজ্ঞা করুন।" ইহাই বলিয়া সেই চারিহস্ত-পরিমিত প্রকাণ্ড পুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গকে অক্লেশে স্কন্ধে করিয়া শ্রীবাসের আঙ্গিনায় দৌড়িয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

* * * *

একদিন শ্রীবাসের বাড়ীতে বরাহ-অবতারের একটী শ্লোক শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ গর্জ্জন করিতে করিতে দ্রুতপদে মুরারির বাড়ী গমন করিলেন। মুরারি তখন বাড়ী ছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে লক্ষ্য না করিয়া শ্রীপ্রভু একেবারে ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া মুরারি দেবগৃহের দ্বারদেশে যাইয়া দাঁড়াইলেন। শ্রীনিমাই ঘর হইতে বলিতে লাগিলেন, 'ইনি কে? এ যে প্রকাণ্ড বরাহ। ইনি যে বড় বলবান্ দেখ্‌ছি। ইনি যে বিশাল দন্তদ্বারা আমাকে মর্ম্মস্পর্শিণী বেদনা দিতেছেন।' ইহাই বলিয়া তিনি পশ্চাতে হটিতে লাগিলেন। মুরারি দেখিলেন হঠাৎ প্রভু বরাহভাব অঙ্গীকারকরিয়া, ভূমিতে হস্ত ও জানু পাতিয়া, লোচনযুগল ঘুরাইয়া ইতি উতি চাহিতে-ছেন। তৎপর সম্মুখস্থ পিত্তলের জলপাত্র দন্তের দ্বারা তুলিয়া দূরে নিক্ষেপ

করিলেন। মুরারি দেখিতেছেন ঠিক যেন নরবরাহ। তিনি মুরারিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'আমার স্বাভাবিক রূপ বর্ণনাকর।' মুরারি ভয়ে জড়বৎ হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং বারংবার দণ্ডবৎ করিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, 'আমি ক্ষুদ্র জীব, তোমার স্বরূপ-বর্ণন করিবার সামর্থ্য আমার নাই।' ইহা বলিয়া তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন নর-বরাহ বলিলেন, 'এখন আমি যাই।' ইহা বলিয়া শ্রীপ্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মুরারির সন্তর্পণে তিনি চেতনা পাইলেন। তাহার পর বলিলেন, 'আমি শ্রীবাসের গৃহে শ্রীবরাহঅবতারের স্তব শুনিতেছিলাম, এখানে কি করিয়া আসিলাম?' মুরারি আর কি উত্তর দিবেন, চুপ করিয়া রহিলেন।"

যাঁহারা দর্শনশাস্ত্রের সামান্য চর্চ্চাও করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে ঈশ্বর, জীব ও প্রকৃতির অস্তিত্ব, তাহাদিগের স্বরূপ,তাহাদিগের পরস্পরের সম্বন্ধ ইত্যাদিবিষয়ক প্রকৃত তথ্য নির্দ্ধারণকরিতে অনেক তর্কপ্রয়াসী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক চেষ্টাকরিয়াছেন। প্রত্যেকেই মনে করিয়াছেন যে তাঁহার মত অভ্রান্ত। এই নিমিত্তই প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য প্রদেশে এত বিভিন্ন প্রকারের দর্শনশাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে। সার্ব্বভৌম অদ্বৈতবাদ পরিত্যাগকরিয়া গৌরাঙ্গভক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিতেছেন—চৈঃ চঃ নাঃ ৬ম-৬৬—

"সার্ব্ব। অঞ্জলিং বদ্ধা, ভগবন্।

শাস্ত্রং নানামতমপি তথা কল্পিতং স্বস্বরুচ্যা
নো চেত্তেষাং কথমিব মিথঃ খণ্ডনে পণ্ডিতত্বং।
তত্রোদ্দেশ্যং কিমপি পরমং ভক্তিযোগোমুরারৌ
নিষ্কামো যঃ স হি ভগবতোঽনুগ্রহেণৈব লভ্যঃ॥"৬৬

(সার্ব্ব। কৃতাঞ্জলি হইয়া, বলিলেন ভগবন্! পূর্ব্বতন মুনিগণ স্বীয়

রুচিভেদে শাস্ত্রের বিবিধ মত কল্পনাকরিয়াছেন, ফলতঃ তাহা না হইলে তাঁহাদিগের পরস্পরের মত-খণ্ডনে পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায় না। বস্তুতঃ মুরবৈরী সেই শ্রীহরিতে নিষ্কাম ভক্তিযোগই সমস্ত শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, কিন্তু তাহা ভগবৎ-কৃপা ব্যতিরেকে কেহ কখনই লাভ করিতে পারে না ॥৬৬॥)

সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের অস্তিত্ব এবং তাঁহার ঐশ্বর্য্যজ্ঞান আন্তরিক অনুভূতিসাপেক্ষ। এ বিষয়ে দর্শনশাস্ত্র অল্পপরিমাণেই আমাদিগকে সাহায্যকরিতেপারে। গোবিন্দদাসের করচাতে দৃষ্ট হইবে যে চৈতন্যদেব সহজ ভাষার আশ্রয় লইয়া এবং তাঁহার আদর্শচরিত্র ও অলৌকিক ভাবাবেশদ্বারা জনসাধারণের হৃদয়ে শাশ্বত সত্যের জ্ঞান এবং ভগবৎপ্রেম ও ভক্তি সঞ্চারিত কবিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পাণ্ডিত্যপূর্ণ দার্শনিক তথ্য মুষ্টিমেয় পণ্ডিতকে সন্তুষ্ট করিতে পারে বটে, কিন্তু জনসাধারণের চিত্তকে স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় না।

যদি আমরা চৈতন্যদেবকে ঈশ্বর না ভাবিয়া আদর্শ মানব বলিয়া মনে করি তাহা হইলে আমরা বিশ্বাস করি যে তিনি আমাদিগের উপরে অধিকতররূপে তাঁহার প্রভাব প্রকাশকরিতে সক্ষম হইবেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবদেবীর পৌরাণিক বৃত্তান্তহইতে আমাদের মনে হয় যে তাঁহাদের আংশিক অনুকরণও আমাদিগের পক্ষে অসাধ্য। মনুষ্যের অনুকরণপ্রিয়তার উপরে তাহাদিগের শিক্ষা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। আমরা চৈতন্যদেব কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কোন সময়ে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন এবং কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন, বিবিধ গ্রন্থ হইতে অবগত হই। কিন্তু এই সকল গ্রন্থের অনেকগুলিতেই তাঁহার জীবনের প্রাকৃত ঘটনার সহিত কল্পনা-সম্ভূত অদ্ভুত ঘটনাবলী বিমিশ্রিত হওয়ায় এই আদর্শ-মানবের জীবনীবিষয়ে

সুধীগণের মনে স্বতঃই সন্দেহের উদয় হয়। সেইজন্য এ মহাপুরুষের জীবনবৃত্তান্ত জনসাধারণের হৃদয়ের উপরে আশানুরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয় না। যদি চৈতন্যদেবের প্রকৃত স্বরূপ আমরা জানিতে চাই, তাহা হইলে গোবিন্দদাসের করচা অপ্রমাণিক বলিয়া পরিবর্জ্জন করা আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে। এই গ্রন্থে গৌরাঙ্গদেবের অলৌকিক বৈরাগ্য, অসাধারণ বিনয়, অসামান্যা মানবপ্রীতি এবং অনির্ব্বচনীয় ভাবাবেশ বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু গৌরাঙ্গদেবের অসাধারণ মাতৃ-ভক্তি, অসামান্য কর্ত্তব্যপরায়ণতা, অসীম ভক্তবৎসলতা এবং অলৌকিক ভগবদ্‌ভক্তি ও প্রেম অবগত হইতে হইলে কৃষ্ণদাসকবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত পাঠকরা নিতান্ত আবশ্যক। এই অতুলনীয় গ্রন্থের অন্ত্য-খণ্ডের চতুর্দ্দশ হইতে বিংশ পরিচ্ছেদ যিনি বারংবার পাঠ করিয়াছেন তিনিই কেবল এই ঈশ্বরপ্রতিম মানবের বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি ও প্রেম অনুমানকরিতে সমর্থ হইয়াছেন।

চৈতন্যদেবের ভক্তবৎসলতার গভীরতা তাঁহার নীলাচলাগত ভক্তগণের প্রতি ব্যবহার হইতে আমরা কিয়ৎপরিমাণে অনুমানকরিতে পারি। গৌড়ীয় ভক্তগণ প্রতি বৎসর জগন্নাথদেবের রথযাত্রা[১]-উপলক্ষে এবং কখনও কখনও স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা-উপলক্ষে জগন্নাথদেব এবং

১। "জগন্নাথদেবের রথ আষাঢ়ের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়াহইতে দশমীতিথিপর্য্যন্ত হয়। দ্বিতীয়াতে জগন্নাথদেব রথ আরোহণকরিয়া গুণ্ডিচা-বাড়ী গমনকরেন। সেদিন ও রাত্রি রথের উপরে অতিবাহিত করিয়া পরের দিন অর্থাৎ তৃতীয়া তিথিতে গুণ্ডিচা-বাড়ীর ভিতর তিনি প্রবেশ করেন। দশমীতিথিতে তাঁহার রথ মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করে। তাহা হইলে গুণ্ডিচা-বাড়ীর ভিতরে জগন্নাথদেব সাত রাত্রি যাপনকরেন। রথের গমনাগমন ধরিলে সর্ব্বশুদ্ধ নয় দিন হয়। গুণ্ডিচা-বাড়ী মন্দির হইতে উত্তরপূর্ব্বে কিছু কম দুই মাইল দূরে অবস্থিত

—উষাপ্রকাশ সরকার এম্‌-এ।

বিশেষতঃ চৈতন্যদেবসন্দর্শনজন্য অনেক কষ্ট স্বীকারকরিয়া নীলাচলে আসিতেন। সে সময়ে নবদ্বীপহইতে পুরীর পথ নানাবিধ অসুবিধা-পূর্ণ এবং বিপদ্‌সঙ্কুল ছিল। মাঝে মাঝে উৎকলরাজ এবং গৌড়ীয় মুসলমান-নৃপতির বিবাদের জন্য পথ দুর্গম হইত। ইহা ব্যতীত প্রত্যেক পার-ঘাটে অতিরিক্ত শুল্ক আদায়করিবার জন্য ঘট্টপালেরা যাত্রীদিগের প্রতি অত্যাচার করিত। যান-বাহন এবং উপযুক্ত বাসস্থানের অভাবে যাত্রীরা সমধিক কষ্ট অনুভবকরিতেন। ইহা ব্যতীত বন্য পশুর এবং দস্যুদিগের উপদ্রব ছিল, ইহা বলা বাহুল্যমাত্র। চৈতন্যদেব তাঁহার দর্শনজন্য ভক্তগণের এত কষ্ট-স্বীকার সম্যক্‌রূপে অবগত ছিলেন; এবং এই নিমিত্ত তাঁহাদিগের প্রতি তাঁহার কৃতজ্ঞতার এবং সহানুভূতির অবধি ছিল না। নীলাচল-ত্যাগোন্মুখ ভক্তদিগের প্রতি চৈতন্যদেবের নিম্নলিখিত বাক্য (চৈঃ চঃ অন্ত্য—১২-২৪-২৬) পাঠকরিয়া কেহ অশ্রু-সংবরণ করিতে পারেন না—

"প্রতি বৎসরে সভে আইস আমারে দেখিতে।
আসিতে যাইতে দুঃখ পাও ভাল মতে॥
তোমা-সভার দুঃখ জানি নারি নিষেধিতে।
তোমা-সভার সঙ্গ-সুখে লোভ বাড়ে চিত্তে॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল গৌড়ে রহিতে।
আজ্ঞা লঙ্ঘি আইসেন তাঁরে কি পারি বলিতে॥
আচার্য্য-গোসাঞি আইসেন মোরে কৃপাকরি।
প্রেমঋণে বদ্ধ আমি শোধিতে না পারি॥
মোর লাগি স্ত্রীপুত্র গৃহাদি ছাড়িয়া।
নানা দুর্গ [১] পথ লঙ্ঘি আইসে ধাইয়া॥

১। দুর্গম।

আমি নীলাচলে মাত্র রহি যে বসিঞা।
পরিশ্রম নাহি তোমা সভার লাগিঞা॥
সন্ন্যাসী মানুষ মোর নাহি কোন ধন।
কি দিয়া তোমা-সভার ঋণ করিব শোধন?
দেহমাত্র ধন মোর কৈল্ সমর্পণ।
তাহাই বিকাও যাহা বেচিতে তোমার মন॥
প্রভুর বচনে সভার আর্দ্র হইল মন।
অঝর নয়নে সভে করেন ক্রন্দন॥
প্রভু সভার গলা ধরি করেন রোদন।
কান্দিতে কান্দিতে কৈল সভারে আলিঙ্গন॥

সুধীগণ জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি মোক্ষ-প্রাপ্তির প্রধান উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ এই তিনটীর মধ্যে কোনও একটীকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ভগবদ্গীতায় এই তিনটীর সমন্বয়ের বিশেষরূপে চেষ্টা হইয়াছে। আমাদিগের বিবেচনায় দুইটী উপায়কে সম্পূর্ণরূপে অবহেলাকরিয়া কেবল তৃতীয়টীর অনুসরণ করিলে মানব-জীবন অসম্পূর্ণ থাকিবে এবং মোক্ষলাভের পথও সম্ভবতঃ সুগম হইবে না।

আমরা চৈতন্যদেবকে আদর্শমানব বলিয়া বর্ণনাকরিয়াছি। তিনি একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তাঁহার জন্মের ও দেহত্যাগের তারিখ, তাঁহার জন্মস্থান, তাঁহার পিতা, তাঁহার মাতা, তাঁহার পত্নীদ্বয়, তাঁহার সহচরবৃন্দ, তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণ, তাঁহার তীর্থদর্শন, তাঁহার দাক্ষিণাত্যে ভ্রাতৃঅন্বেষণ এবং ধর্ম্মপ্রচার, তাঁহার জগন্নাথদেবঅধিষ্ঠিত নীলাচলে ভক্তগণ সহ হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন এবং রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণকে আত্মসমর্পণ আমরা

সমস্তই অবগত আছি। তাঁহার বিবিধ জীবনীতে সামান্য অতিরঞ্জন থাকিলেও, তাঁহার জীবনের প্রকৃত তথ্য আমরা চেষ্টা করিলে সহজেই অবগত হইতে পারি।

চৈতন্যদেব ভক্তি-মার্গকে শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া নির্দ্দেশকরিয়াছিলেন, স্বীকার করি; কিন্তু তিনি কি জ্ঞান-মার্গকে একেবারেই পরিহার করিয়াছিলেন? তবে তিনি কি জন্য বিবিধ সদ্গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ভক্ত কিম্বা বিদ্যাভিমানী ব্যক্তির ভ্রম-নিরসনে অথবা শিক্ষা-বিধানে চেষ্টা করিতেন? তাঁহার অলৌকিক তীক্ষবুদ্ধি, অসাধারণ স্মৃতিশক্তি এবং অসামান্য শাস্ত্রাভিজ্ঞতা তাঁহার এই কার্য্যে যে তাঁহার প্রধান সহায় হইয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতে সকলেই বাধ্য হইবেন।

চৈতন্যদেব কি কর্ম্মমার্গ পরিহার করিয়াছিলেন? তিনি একজন অসাধারণ কর্ম্মী ছিলেন। কোনও কার্য্য সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে, মানবচরিত্রাভিজ্ঞতা এবং প্রকৃষ্ট উপায়নির্দ্ধারণ বিশেষরূপে প্রয়োজনীয়। এই দুই কার্য্যে তিনি অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শনকরিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে ভক্তিধর্ম্মপ্রচারের জন্য নিত্যানন্দকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্য ছিলেন বটে, কিন্তু তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল এবং অস্পৃশ্য-উদ্ধারকার্য্যে তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিতে বোধহয় সক্ষম হইতেন না। এইজন্য চৈতন্যদেব পরমভাগবত নিত্যানন্দকে গৌড়দেশ হইতে নীলাচলে যাতায়াতে সময় অপব্যয় না করিয়া বঙ্গদেশে অবস্থানপূর্ব্বক ভক্তিধর্ম্মপ্রচারজন্য অনুজ্ঞাকরিয়াছিলেন—

নিত্যানন্দ প্রভুরে পাঠাইল গৌড়দেশে।
তিঁহো গৌড়দেশ ভাসাইল প্রেমরসে॥

সহজেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণপ্রেমোদ্দাম।
প্রভু-আজ্ঞায় প্রেম কৈল যাহা তাহা দান॥
(চৈঃ চঃ-মধ্য-১ম—২১)

প্রতাপরুদ্র প্রভৃতি বিষয়িলোকের সহিত 'মেলামেশা' করিলে পাছে অদ্বৈতাচার্য্যের প্রভাব তাঁহার ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, এইজন্য চৈতন্যদেব তাঁহাকে দুইবার সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন।

উত্তর ভারতে রাধাকৃষ্ণআরাধনার ভিত্তিস্বরূপ বৃন্দাবন এবং মথুরার লুপ্ততীর্থ-উদ্ধারের, রাধাকৃষ্ণ-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মন্দিরাদি-সংস্থাপনের, ভক্তিধর্ম্মবিষয়ক সংস্কৃতগ্রন্থপ্রণয়নের এবং ঐ প্রদেশে ভক্তিধর্ম্মপ্রচারের নিমিত্ত রূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট প্রভৃতিকে তিনি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এই কার্য্যের উপযোগী করিবার জন্য আদর্শ-ভক্ত রঘুনাথ দাসকে স্বরূপ-দামোদরের হস্তে অর্পণকরিয়াছিলেন। যখন সনাতন (চৈঃ চঃ-অন্ত্য-৪র্থ—১৮) তাঁহার দেহ কণ্ডুক্লিষ্ট (কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ?) হওয়ার নিমিত্ত আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, চৈতন্যদেব তাঁহাকে নীলাচলে হরিদাসের আবাসে বলিয়াছিলেন—

"সনাতন! দেহত্যাগে কৃষ্ণ যদি পাইয়ে।
কোটি দেহ ক্ষণেকেতে ছাড়িতে পারিয়ে॥
দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই পাইয়ে ভজনে।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি উপায় কোন নাহি ভক্তি-বিনে"॥

* * * *

প্রভু কহে, "তোমার দেহ আমার হয় ধন।
তুমি আমারে করিয়াছ আত্ম-সমর্পণ॥

তোমার শরীর আমার প্রধান সাধন।
এ শরীরে করিব আমি বহু প্রয়োজন॥
ভক্ত, ভক্তি, কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্বের নির্দ্ধার।
বৈষ্ণবের কৃত্য, আর বৈষ্ণব-আচার॥
কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম, সেবা-প্রবর্ত্তন।
লুপ্ত-তীর্থ-উদ্ধার, আর বৈরাগ্য-শিক্ষণ॥
নিজ প্রিয় স্থান মোর মথুরা-বৃন্দাবন।
তাঁহা এত ধর্ম্ম চাহি করিতে প্রচারণ॥
মাতার আজ্ঞায় আমি বসি নীলাচলে।
তাঁহা রহি ধর্ম্ম শিক্ষাইতে নাহি নিজ বলে॥
এত সব কর্ম্ম আমি যে দেহে[১] করিব।
তাহা ছাড়িবারে চাহ কেমতে সহিব ?"

চৈতন্যদেব নিজে তাঁহার পরমভক্ত প্রবল পরাক্রান্ত স্বাধীন হিন্দু উৎকলরাজের[২] সন্নিকটে এবং বৈষ্ণবধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল জগন্নাথদেব-

১। সনাতনের দেহ-দ্বারা। ২। প্রতাপরুদ্র (১৫০৪-১৫৩২—Rice's Mysore Vol. I, p-318) কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। "His name occurs in many local traditions in the east of Mysore. We also find that his son Virbhadra was invested with the government of Male Bennur (Davangere Taluq) by Krishna Rāya of Vijayanagar." The Puri Gazetteer says that Pratāparudra of the Solar Dynasty ascended the throne in 1497 A. D. and marched against Hossein Shah of Bengal and twelve years later repelled the invasion of Hossein Shah's general. But he was not successful in his war with the second Vijayanagar Dynasty. "The reign of Pratāparudradeva, the last of the Solar Line, though disastrous to the temporal fortunes of the kingdom, was one of great religious activity, owing to the spread of Vishnuite doctrines. In 1510 Chaitanya, the Great Apostle of Vaishnavism, visited Orissa and there devoted the rest of his days to the propagation of the faith. He is said to have converted

অধ্যুষিত নীলাচলে থাকিয়া সার্ব্বভৌম, স্বরূপদামোদর, রামানন্দরায় প্রভৃতি বিদ্বান্ বৈষ্ণবগণকর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া শ্লোক, কৃষ্ণকীর্ত্তন এবং অপূর্ব্বভাবাবেশদ্বারা ভক্তিধর্ম্ম প্রচারকরিয়াছিলেন এবং এইস্থানে অবস্থিতি করিয়া গৌড়ের, উত্তর ভারতের এবং দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব-দিগের সহিত ভাব-বিনিময় করিয়াছিলেন।

দক্ষিণভারতে ভক্তিধর্ম্মপ্রচারের জন্য চৈতন্যদেব, কেবল গোবিন্দ কর্ম্মকারকে কেন সঙ্গে লইয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণসঙ্গিসকল লইবার জন্য সার্ব্বভৌমপ্রভৃতির অনুরোধ কেন প্রত্যাখ্যানকরিয়াছিলেন? ইহার কারণ—তিনি মনে করিয়াছিলেন যে তাঁহার দাক্ষিণাত্যে ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে ইঁহারা সহায়ক না হইয়া অন্তরায় হইবেন। তিনি আদর্শসন্ন্যাসীর ন্যায় দক্ষিণাপথভ্রমণের অভিলাষ করিয়াছিলেন। তাঁহার নীলাচলে অব-স্থিতির সময়ে তাঁহার ভক্তগণের আগ্রহাতিশয্যের জন্য ভোজনাদি-সম্বন্ধে সন্ন্যাসধর্ম্মের কঠিন নিয়ম মধ্যে মধ্যে তাঁহার লঙ্ঘনকরিতে হইয়াছিল। এইজন্য তিনি রামচন্দ্রপুরীর নিকটে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। যদি তিনি ভক্তগণের অনুরোধ মাঝে মাঝে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে জগদানন্দের ন্যায় তাঁহারা সাতিশয় অসন্তুষ্ট এবং দুঃখিত হইতেন। কিন্তু যদি তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মপ্রচারকের এবং সমাজসংস্কারকের সামান্য কিছু ত্রুটী হইত, তাহা হইলে তাঁহার দাক্ষিণাত্যে ধর্ম্মপ্রচার এত ফলবান্ হইত না। মহিসুরেও চৈতন্যদেবের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের অনেক ভক্ত

the king and several of his officers, but his preaching was not confined to the court, while the purity of his life and doctrines made a lasting impression on the people generally" (Puri Gazetteer p. 31). কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকের প্রারম্ভে লিখিত আছে যে প্রতাপরুদ্রের অনুরোধে চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পরে তিনি এই নাটক রচনাকরিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের তিরোভাবের বৎসর খৃঃ১৫৩৩। বৈষ্ণবদিগদর্শনী বলেন যে প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর তারিখ খৃঃ ১৫৪০।

বাস করেন। রাইস সাহেব (Mysore Vol. I, pp. 243, 477-8) বলেন, "The Gosāyis are followers of Chaitanya.....They never marry, but the order is recruited from all the four principal castes, specially the two highest and those who join are cut off for ever from their own tribes. Such as lead a strictly ascetic life are called Avadhuta, while those who engage in commerce are called Dandi..... The caste-system and supremacy of the Brāhmans had been rejected by Bāsava and the Lingayits for the Śaivas. A similar movement was later inaugurated for the Vaishnavas, giving rise in the north to widely popular sects and in the South to Sātānis.....The Sātānis derive their name either direct from Chaitanya or from Sātānana, one of his chief disciples. The whole religious and moral code of the sect is comprised in one word—bhakti—a term that signifies a union of implicit faith with incessant devotion and which consists in the momentary repetition of any name of Krishna (nāma-kirtana) under a firm belief that such a practice is sufficient for salvation. The principle of devotion is exemplified and illustrated by the mutual love of Rādhā and Krishna."

দাক্ষিণাত্যের ধর্ম্মপ্রচার কিরূপ ফলবান্ হইয়াছিল, তাহা

কৃষ্ণদাসকবিরাজ বর্ণনা করিয়াছেন। চৈঃ চঃ—মধ্য-৭ম-৬৯-৭৩)—

"কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হে,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হে,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, রক্ষ মাম।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, পাহি মাম্।
রাম রাঘব, রাম রাঘব, রাম রাঘব, রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, পাহি মাম্॥
এই শ্লোক পড়ি পথে চলে গৌরহরি।
লোক দেখি পথে কহে, 'বল হরি হরি'॥
সেই লোক প্রেমে মত্ত বলে 'হরি, কৃষ্ণ'।
প্রভুর পাছে সঙ্গে যায় দর্শনে সতৃষ্ণ॥
কতদূরে রহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া।
বিদায় করেন তারে শক্তি সঞ্চারিয়া॥
সেইজন নিজগ্রামে করিয়া গমন।
'কৃষ্ণ' বলে হাসে কান্দে নাচে অনুক্ষণ॥
যারে দেখে তারে কহে, 'কহ কৃষ্ণনাম'।
এইমত বৈষ্ণব কৈল সব নিজগ্রাম॥
গ্রামান্তর হৈতে আইসে দেবে যত জন।
তাঁহার দর্শনে কৃপায় হয় তার সম॥

* * * *

সেই যাই আর গ্রামে করে উপদেশ।
এইমত বৈষ্ণব হৈল সব দক্ষিণ দেশ॥

* চৈতন্যদেব আন্তরিকতাকে অতিশয় মূল্যবান্ জ্ঞানকরিতেন।

তাঁহার মত এই যে যদি কেহ সন্ন্যাসগ্রহণ করেন, তাঁহার সন্ন্যাসীর সমস্ত নিয়ম পালনকরা কর্ত্তব্য এবং তাঁহার যদি সংসারে আসক্তি থাকে, তাহা হইলে তাঁহার গৃহী হইয়াই থাকা উচিত। এইজন্য, তিনি প্রথমে রঘুনাথের বৈরাগ্যকে 'মর্কটবৈরাগ্য' বলিয়া অভিহিত করিয়া তাঁহাকে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে আদেশকরিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের মতে যাহারা গৃহী, তাহাদিগের গৃহীর নিয়ম মানিয়া চলা অত্যাবশ্যক। এইজন্য তিনি পরম ভাগবত বাসুদেবদত্তকে বলিয়াছিলেন যে, তাহার আয় অপেক্ষা ব্যয় করা অনুচিত, এবং শিবানন্দসেনকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, যে তিনি যেন বাসুদেবদত্তের আয়-ব্যয়ের তত্ত্বাবধায়ক হ'ন। এই নিমিত্তই তিনি গোপীনাথের আয় অপেক্ষা অযথা ব্যয় করার জন্য উৎকলরাজ যখন তাঁহাকে শাস্তিদিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন তিনি গোপীনাথের আচরণের নিমিত্ত তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। পরে গোপীনাথ যখন রাজকার্য্য পরিত্যাগকরিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন চৈতন্যদেব তাহাতে সম্মতি দেন নাই; কারণ ভবানন্দরায়ের বৃহৎ পরিবারবর্গের ভরণপোষণ তখন গোপীনাথের উপর নিভর করিতেছিল। ভবানন্দের জ্যেষ্ঠপুত্র রামানন্দরায় রাজা প্রতাপরুদ্রের গোদাবরীজেলার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতি দেখিয়া চৈতন্যদেব মুগ্ধ হইয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ হওয়ার কিছুদিন পরেই তিনি তাঁহার উচ্চ পদ-ত্যাগকরিয়াছিলেন। ইহার পর যদি গোপীনাথ রাজকার্য্য ত্যাগকরিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সংসার অচল হইত। দ্বারকার নিকটে ভর্গদেবের অসুস্থতা (সম্ভবতঃ জ্বর) দেখিয়া, তাঁহাকে নিম্বরস খাওয়াইয়া নীরোগ করিয়াছিলেন (গোঃ কঃ পৃঃ ৬৯)। আমরা জানি যে নিম্বরস শ্লেষ্মাধিক্য, পিত্তাধিক্য, হৃদয়দাহ, জ্বর, ব্রণ ও ক্রিমিনাশক।

অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে চৈতন্যদেব কেবল আদর্শ ভক্ত ছিলেন না, তিনি আদর্শ জ্ঞানী ও কর্ম্মীও ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে একটী প্রশ্ন আমাদিগের মনে স্বতঃই উদিত হয়—চৈতন্যদেব অন্য ধর্ম্মের প্রতি কিরূপ ভাব পোষণ করিতেন? তাঁহার ধর্ম্মমত সঙ্কীর্ণ ছিল, না উদার ছিল? মহাত্মা গান্ধীর ধর্ম্মমত আমরা উদার বলিয়া বিবেচনা করি। উঁহার ধর্ম্মবিষয়ে গোঁড়ামি (bigotry) নাই বলিয়া আমাদের মনে হয়। উনি সম্ভবতঃ বিশ্বাস করেন না যে কেবল উঁহারই মুক্তি হইবে কিম্বা উঁহার ন্যায় ঈশ্বরকে যাঁহারা উপাসনাকরেন, তাঁহারাই উদ্ধার পাইবেন, এবং অন্য কেহ পাইবেন না। কিন্তু ধর্ম্মমত উদার হইলেও উনি সম্ভবতঃ বিশ্বাস করেন যে উনি ঈশ্বরকে যে ভাবে উপাসনা করেন তাহাই ঈশ্বর-আরাধনার প্রকৃষ্ট প্রথা। মহাত্মা গান্ধীর ধর্ম্মমত উদার বলিয়া তিনি কখন যথেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দেন মা। তাঁহার কষ্টসহিষ্ণুতা, পুরুষকার, আত্মসংযম, সত্যনিষ্ঠা, আন্তরিকতা, মানবপ্রীতি ও ভগবানে আত্মসমর্পণ তাঁহার একুশ দিনের (৮ই হইতে ২৯শে মে, ১৯৩৩) উপবাস প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণকরিয়াছে। ভগবদ্গীতা, বাইবেল, পার্শীদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ ও কোরাণ হইতে উপদেশাবলী এবং তুকারামপ্রভৃতি ভক্তগণ রচিত ভজন-গীত শ্রবণকরিয়া তিনি উপবাস ভঙ্গকরিয়াছেন। মনে সঙ্কীর্ণতা থাকিলে পার্শী ধর্ম্মশাস্ত্র, বাইবেল ও কোরাণের সদুপদেশ তিনি শুনিতে কিছুতেই উৎসুক হইতেন না। আমরা দেখাইব যে চৈতন্যদেবও দাক্ষিণাত্যভ্রমণের সময়ে সমস্ত দেবতাকে (কেবল রাধাকৃষ্ণকে নয়) তাঁহার হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদনকরিয়াছিলেন।

আমরা মহাত্মা গান্ধীর বিষয়ে যতদূর সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছি তাহাতে মনে হয় যে তিনি উচ্ছিষ্টভোজনের, আন্তর্জাতিক ভোজনের,

আন্তর্জাতিক বিবাহের, সকলের একপ্রকার ধর্ম্মমতপোষণের পক্ষপাতী নন্। সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুর সমস্ত হিন্দু-দেবমন্দিরে প্রবেশ, সর্ব্বশ্রেণীর বালকের সমস্ত বিদ্যালয়ে পাঠ, সকলশ্রেণীর স্পৃষ্ট (হস্তদ্বারা স্পৃষ্ট নয়) জলপান, অন্যের ধর্ম্মের প্রতি অবিদ্বেষ তিনি সমর্থনকরেন। প্রাচীন-কালে বুদ্ধদেব, মধ্যযুগে চৈতন্যদেব এবং বর্ত্তমান যুগে মহাত্মা গান্ধীকে হিন্দুসমাজ ও ধর্ম্মের উচ্ছেদ-নিবারণের জন্য ভগবান্ পৃথিবীতে অবতীর্ণ করাইয়াছেন, আমরা মনে করি। যদিও মহাত্মা গান্ধী ধর্ম্মসম্বন্ধে উদার, তত্রাচ তিনি ভগবদ্গীতা পাঠ, রামনাম-জপ, এবং তুকারাম-প্রভৃতিভক্তগণের রচিত সঙ্গীতশ্রবণ ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা-করেন।

তাহার পরে ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লওয়া যাউক। উঁহারও ধর্ম্মবিষয়ে গোঁড়ামি (**bigotry**) এবং সাম্প্রদায়িকতা (**communal-ism**) নাই বলিয়া মনে হয়। কিন্তু উনিও বোধহয় বিশ্বাস করেন যে আদি-ব্রাহ্মসমাজ যেরূপ ঈশ্বর-ভজনা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে, তাহাই ভগবানের উপাসনার প্রকৃষ্ট প্রথা।

তাহার পর থিয়োসফিষ্ট-সম্প্রদায়কে লওয়া যাউক। ইঁহাদিগের ধর্ম্ম থিয়সফি (**Theosophy**) অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান। ইঁহারা ব্রাহ্মদিগের মত সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়করিবার চেষ্টা বিশেষভাবে করেন। ইঁহাদিগের **Outer Circle** অর্থাৎ বহিরঙ্গ ভক্তবৃন্দ এবং **Inner Circle** অর্থাৎ অন্তরঙ্গ ভক্তবর্গ আছেন। আমাদের একজন বন্ধু এই সম্প্রদায়ের অন্তরঙ্গ ভক্ত। ইঁহাদিগের ঈশ্বর-আরাধনার কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে। সেইগুলি কেবল অন্তরঙ্গ ভক্তেরা অবগত আছেন, সহজে ইঁহারা অন্য লোককে তাহা বলেন না; কারণ ইঁহারা মনে করেন যে তাঁহারা সম্যক্ বুঝিবার চেষ্টা ত করিবেন না, বুঝিলেও তদনুসারে কার্য্য করিতে

সক্ষম হইবেন না, উপরন্তু তাঁহারা তাহার কদর্থ করিয়া তাঁহাদিগের উপাসনাপ্রণালীকে জনসাধারণের সমক্ষে উপহাসাস্পদ করিবেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে যতই কোন সম্প্রদায় অথবা ব্যক্তি ধর্ম্মবিষয়ে উদার হউন না কেন, তাহা বা তিনি সঙ্কীর্ণতাকে একেবারে ত্যাগ করিতে অক্ষম। এরূপ মনের ভাব দোষার্হ নয়। যতদিন আমরা মানব থাকিব, ততদিন আমাদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতি হইলেও আমাদিগের কিয়ংপরিমাণে সঙ্কীর্ণতা থাকিবে। যে মহাত্মা যে উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক ঈশ্বরের ক্ষণিক সান্নিধ্যও উপলব্ধিকরিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দের অধিকারী হইয়াছেন, তিনি সেই উপায়কে প্রকৃষ্ট উপায় না বলিয়া থাকিতে পারেন না। তিনি অন্য প্রণালীকে ঘৃণা না করিতে পারেন, কিন্তু তিনি তাঁহার নিজের আরাধনাপদ্ধতিকে প্রকৃষ্ট পদ্ধতি বলিতে বাধ্য।

আমরা যতদূর চৈতন্যদেবকে বুঝিতে পারিয়াছি, তাঁহার এই প্রকার ধর্ম্মবিষয়ে উদারতা ছিল। তাঁহাকে কিন্তু কৃষ্ণদাসকবিরাজপ্রভৃতি বৈষ্ণবেরা ঘোর সাম্প্রদায়িক করিতে চেষ্টাকরিয়াছেন। আমরা দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দেখাইব যে চৈতন্যদেবদ্বারা ইঁহারা বলাইয়াছেন যে গৌড়ের রাধাকৃষ্ণ-উপাসনাপদ্ধতি শ্রীসম্প্রদায়ের লক্ষ্মীনারায়ণ-উপাসনাহইতে শ্রেয়সী, শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ অপেক্ষা উচ্চপদস্থ এবং শ্রীরাধা লক্ষ্মী অপেক্ষা উচ্চপদস্থা। আমরা ইহাও দেখাইব যে এ প্রকার কথা গোবিন্দদাসের করচায় নাই। চৈতন্যদেবের শান্তিপুরহইতে নীলাচলে এবং সেস্থান হইতে দাক্ষিণাত্যভ্রমণ পাঠকরিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার কিরূপ উদারতা ছিল।

বৃন্দাবনদাস তাঁহার চৈতন্যভাগবতে চৈতন্যদেবের শান্তিপুরহইতে নীলাচলে আগমনের সময়ে এই সকল গ্রাম উল্লিখিত করিয়াছেন—

আঠিসারা, ছত্রভোগ [১], প্রয়াগঘাট (এখানে উড়িষ্যা-প্রবেশ) ও গঙ্গাঘাট, সুবর্ণরেখা নদী, জলেশ্বর, বাঁশধা, রেমুণা। (বালেশ্বরের পশ্চিমে গোপীনাথ-দর্শন), যাজপুর (আদি-বরাহস্থান, নাভি-গয়া এবং বিরজাক্ষেত্র অর্থাৎ বৈতরণী-নদী-সন্নিহিত যাজপুরীর চতুর্দ্দিকস্থ ভূমিভাগ), কটক (সাক্ষিগোপাল-স্থান), ভুবনেশ্বর, কমলপুর, আঠারনালা, পুরী। বৃন্দাবনদাস চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্যভ্রমণ বর্ণনাকরেন নাই।

কর্ণপুরের চৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যের একাদশ সর্গে বর্ণিত আছে যে শান্তিপুরস্থ অদ্বৈতাচার্য্য গৃহহইতে যাত্রা করিয়া চৈতন্যদেব রেমুণায় গোপীনাথ, কটকদেশে সাক্ষিগোপীনাথ অর্থাৎ সাক্ষিগোপাল, একাম্রক্ষেত্রে (ভুবনেশ্বরে) স্মরদমন অর্থাৎ মহাদেব ও কমলপুরে কপালেশমহাদেব দেখিয়া তত্রত্য ভার্গীনদীতে স্নান করিয়া শ্রীক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক পরমভক্তিসহকারে জগন্নাথদেব দর্শনকরিলেন। পুরীতে অষ্টাদশ দিবস (১২শ সর্গ) যাপনকরিয়া তিনি কূর্ম্মক্ষেত্রে কূর্ম্মদেব দর্শন করিয়া বাসুদেবনামা কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্রাহ্মণকে রোগ ও মোহমুক্ত করিলেন। তাহার পরে রামানন্দরায়ের সহিত তিনি গোদাবরীতীর্থে মিলিত হইলেন। পরে দক্ষিণদেশের কোন স্থানে রাবণকর্ত্তৃক সীতাহরণজন্য আর্ত্ত ব্রাহ্মণকে 'রাবণ মায়াসীতা হরণ করিয়াছিলেন' এই কথা বলিয়া শান্ত করিলেন। তাহার পরে তিনি সাতটী তালবৃক্ষ (বোধহয় কিষ্কিন্ধ্যার সপ্ততাল) আলিঙ্গনকরিয়া তাহাদিগকে স্বর্গে পাঠাইয়াদিলেন। দাক্ষিণাত্যে পাষণ্ডমার্গারূঢ় কতকগুলি লোক তাঁহার সঙ্গী কৃষ্ণদাসকে

১। ২৪ পরগণার জয়নগর-মজিলপুরের নিকট মথুরাপুরের অনতিদূরে ছত্রভোগনামকস্থানে অতি প্রাচীনকালহইতে ত্রিপুরাসুন্দরী-দেবীমূর্ত্তি বিরাজমানা আছেন। প্রতিবৎসর স্নানযাত্রার দিন এখানে বহুলোকের সমাগম হয়। প্রবাদ ত্রিপুরাসুন্দরী শক্তি এবং অনতিদূরস্থিত বদরিকানাথ ভৈরব—গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা।

(স্ত্রীলোকদ্বারা) প্রলুব্ধ করিল। কৃষ্ণদাসকে ত্যাগকরিয়া তিনি সেতুবন্ধাভিমুখে গমন করিলেন এবং এস্থানে পৌছিয়া রামেশ্বর-দেব দর্শনকরিলেন। তাহার পরে শ্রীরঙ্গদেবকে দেখিয়া তিনি পুনরায় গোদাবরীতীর্থে আসিয়া রামানন্দসহিত মিলিত হইলেন। রামানন্দরায়ের সহিত ভক্তিতত্ত্ব-বিষয়ে তাঁহার কথা হইল। (অন্যান্য গ্রন্থে যে সময়ে দাক্ষিণাত্য-অভিমুখে গৌরাঙ্গদেব যাইতেছিলেন, তখন রামানন্দের সহিত তাঁহার এ সকল কথা হইয়াছিল বর্ণিত আছে, গোবিন্দদাসের করচায় লিখিত আছে যে দাক্ষিণাত্যহইতে চৈতন্যদেবের প্রত্যাগমনের সময়ে মধ্যপ্রদেশের রায়পুর ও সম্বলপুরের মধ্যে রামানন্দ-রায়ের পারিবারিক বাসস্থানে অর্থাৎ বিদ্যানগরে চৈতন্যদেবের সহিত রামানন্দরায়ের পুনরায় সাক্ষাৎ হইয়াছিল)। তাহার পরে গোদাবরী হইতে চৈতন্যদেব নীলাচলে প্রত্যাগমন করিলেন।

কর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে (৬ষ্ঠ অঙ্কে) বর্ণিত আছে যে শান্তিপুর হইতে রেমুণায় গোপীনাথ এবং কটকে সাক্ষিগোপাল দর্শন-করিয়া চৈতন্যদেব কমলপুরে নদীতে স্নান করিলেন। তাহার পরে পুরীতে আসিয়া গোপীনাথআচার্য্যের সাহায্যে তিনি জগন্নাথদেব দর্শন করিলেন। তাহার পরে পুরীতে কিয়দ্দিন অতিবাহিত করিয়া প্রথমে আলালনাথ এবং পরে কূর্ম্মক্ষেত্রে কূর্ম্মদেব দর্শনকরিলেন এবং এস্থানে বাসুদেবব্রাহ্মণকে কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত করিলেন। তাহার পরে নৃসিংহক্ষেত্রে গমন করিয়া তিনি নৃসিংহদেব দর্শনকরিলেন। তাহার পরে গোদাবরীতে তিনি রামানন্দরায়ের সহিত মিলিত হইলেন। রামানন্দের সহিত এইপ্রকার কথোপকথন হইল—

চৈতন্যদেব—বিদ্যা কি ?

রামানন্দ—হরিভক্তি ; বেদাদিতে পাণ্ডিত্য নয়।

চৈঃ—কীর্ত্তি কি ?

রাঃ—ভগবৎ-পরায়ণ বলিয়া খ্যাতি।

চৈঃ—শ্রী অথবা সম্পত্তি কি ?

রাঃ—কৃষ্ণপ্রেম ; ধন, জন, গ্রামাদি প্রকৃত সম্পত্তি নহে।

চৈঃ—দুঃখ কাহাকে বলে ?

রাঃ—ভগবৎপ্রিয়জন হইতে বিচ্ছেদ ; হৃদ্ ব্রণাদি-ব্যথা নহে।

চৈঃ—মুক্ত কে ?

রাঃ—হরিনাম শ্রবণে যাহাদের হৃদয় আর্দ্র হয় ; যাহারা কৃষ্ণানুরাগিজনের নিকট অবস্থিতি করে, কিন্তু অন্যের প্রতি অনুরাগী নহে ; বিশুদ্ধ প্রেম ও ভক্তিযোগে যাহাদিগের প্রীতি, কিন্তু যোগে নহে।

চৈঃ—কি গান করা উচিত ?

রাঃ—ব্রজলীলা।

চৈঃ—শ্রেয়ঃ কি ?

রাঃ—সাধুসঙ্গ।

*　　*　　*　　*

চৈঃ—ধ্যেয় কি ?

রাঃ—মুরারির চরণ।

চৈঃ—উপাস্য কি ?

রাঃ—রাধাকৃষ্ণ।

*　　*　　*　　*

চৈঃ—তাহার পর আরও বল।

রাঃ—(শ্রীরাধার কথিত বাক্য বলিতে লাগিলেন)—

সখি ন স রমণোনাহং রমণীতি ভিদাবয়োরাস্তে।
প্রেমরসেনোভয়মন ইব মদনো নিষ্পিপেষ বলাৎ॥

অহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি ন তদানীং মতিরভূ-
ন্মনোবৃত্তির্লুপ্তা ত্বমহমিতি নৌ ধীরপি হতা।

হে সখি! সে (শ্রীকৃষ্ণ) রমণ ও আমি রমণী, এই ভেদবুদ্ধি আমাদিগের ছিল না, কারণ দুরন্ত মনোভব বলপূর্ব্বক প্রেমরসে উভয়ের চিত্তকে নিষ্পেষণকরিয়াছিল; কিন্তু সেই সময়ে আমি কান্তা ও তুমি (শ্রীকৃষ্ণ) কান্ত, এরূপ বুদ্ধি ছিল না, যেহেতু তখন চিত্তবৃত্তি বিলুপ্ত হওয়াতে তুমি ও আমি, এই ভেদবুদ্ধি বিনষ্ট হইয়াছিল।

ইহার পরে চৈতন্যদেব রামানন্দকে আর কিছু বলিতে দিলেন না, রামানন্দের মুখ তাঁহার হস্তদ্বারা তিনি আবরণকরিলেন। ইহা গোবিন্দদাসের করচাতেও আছে (পৃঃ-২২)—

রামরায় আরো সার বলিবারে চায়।
অমনি বদন চাপি ধরে গোরা রায়॥
প্রভু কহে, 'দুগ্ধে ঘৃত আছে গুপ্তভাবে।
সে পাবে আস্বাদ তার যে জন মথিবে'॥

জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধুর সংযোগ ঈশ্বরোপাসনার চরম সীমা। তাহার পরে যাহা আছে অন্তরে উপলব্ধিকরিতে হইবে, বাক্যপ্রয়োগ করিলে অযথা সময় নষ্ট হইবে এবং চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইবে।

গোদাবরী ত্যাগকরিয়া চৈতন্যদেব কর্ণাট-দেশে আগমন করিলেন। এস্থানে অনেক শৈব ও পাষণ্ড (বৌদ্ধ?) ছিল। পাষণ্ডেরা চৈতন্য-দেবকে কদর্য্য অন্ন দিলে তিনি গ্রহণকরিলেন; কিন্তু একটী বৃহৎ পক্ষী আসিয়া পাত্রসহিত সেই অন্ন লইয়া উড়িয়া গেল। তাহার পরে এক-জন বিপ্রকে রামনাম ত্যাগকরাইয়া তিনি কৃষ্ণনাম জপকরাইলেন। তাহার পরে একস্থানে ভগবদ্গীতার পাঠক ব্রাহ্মণকে প্রশংসাকরিলেন। ইনি গীতা অশুদ্ধ করিয়া পাঠকরিলেও পরম কৃষ্ণভক্ত ছিলেন এবং

অর্জ্জুনের রথে গীতাপাঠের সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেন। তাহার পরে চৈতন্যদেব নীলাচলে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে চৈতন্যদেবের শান্তিপুরহইতে নীলাচল-আগমন এবং তাহার পরে দাক্ষিণাত্যভ্রমণের বিবরণ কবিকর্ণপূরের গ্রন্থদ্বয়ে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহা আছে তাহার অধিকাংশ অসংলগ্ন আকারে বিদ্যমান আছে।

কৃষ্ণদাসকবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যদেবের শান্তিপুর হইতে নীলাচলে আগমনসম্বন্ধে উল্লিখিত স্থান—শান্তিপুর, রেমুণা (গোপীনাথ-দর্শন), যাজপুর (আদিবরাহদর্শন), কটক (সাক্ষিগোপাল-দর্শন), ভুবনেশ্বর, কমলপুর ও ভার্গীনদী (ভার্গবী, ভাগী—পুরীর সন্নিকটে) আঠারনালা ও পুরী।

চৈতন্যদেব সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া নীলাচলে আসিতেছেন। বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাসকবিরাজপ্রভৃতির মতে তিনি কটকে সাক্ষিগোপাল দেখিয়া ভুবনেশ্বরে (একাম্রকাননে) ভক্তবৃন্দের সহিত শিবপূজা করিলেন। কিন্তু এইস্থানে বৃন্দাবনদাস একটী গল্পের অবতারণা করিয়া দেখাইয়াছেন যে দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সহিত শিবের যুদ্ধ হইল, শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শনচক্রের ভয়ে শিব পলায়ন করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে শিব ভিক্ষাস্বরূপ একাম্রকানন (ভুবনেশ্বর) প্রাপ্ত হইলেন। ইহাদ্বারা প্রমাণ করা হইল যে দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শিব-অপেক্ষা অনেক বড়। ভুবনেশ্বরহইতে চৈতন্যদেব নীলাচলে আসিয়া জগন্নাথদেব দর্শনকরিলেন।

নীলাচলে তিনমাস অবস্থানের পরে চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্যভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতের দাক্ষিণাত্যভ্রমণবৃত্তান্ত অনেকটা কল্পনাপ্রসূত। যথা—চৈতন্যদেব কৃষ্ণবেণ্বাতে (সংযুক্তা কৃষ্ণা

এবং বেণা-নদীতে) আসিলেন, তাহার পরে তাপ্তীতে স্নান করিয়া মাহিষ্মতীপুরে (ইন্দোরের দক্ষিণে মহেশ্বরে কিম্বা মহেশে) আসিলেন। তাহার পর নর্ম্মদা (মধ্যভারতে), তাহার পরেই একেবারে ধনুকতীর্থ [১] (ধনুষ্কোটী, দক্ষিণভারতের দক্ষিণ সীমা) দর্শনকরিয়া, তথা হইতে একেবারে উত্তরে নির্বিন্ধ্যায় (মালবপ্রদেশের নদীতে) স্নান করিলেন। তথা হইতে পুনরায় অনেক দক্ষিণে ঋষ্যমূকপর্ব্বতে (বিজয়নগরের নিকট), তথা হইতে পুনরায় উত্তরে দণ্ডকারণ্যে (বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে কৃষ্ণানদী পর্য্যন্ত ভূভাগে), তথা হইতে আবার দক্ষিণে পম্পাসরোবরে (ঋষ্যমূক ও বিজয়নগরের সন্নিকটে), তথা হইতে আবার উত্তরে নাসিক এবং পঞ্চবটীতে তিনি আগমন করিলেন। কৃষ্ণদাসকবিরাজ তাঁহার ত্রুটী স্বীকার করিয়াছেন (চৈঃ চঃ মধ্য ৯ম-৪)—

"তীর্থযাত্রার তীর্থক্রম কহিতে না পারি।
দক্ষিণ, বামে হয় তীর্থ গমন ফেরাফেরি॥
অতএব নামমাত্র করিয়ে লিখন।
কহিতে না পারি তার যথা অনুক্রম॥"

গোবিন্দদাসের করচায় চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্যভ্রমণের বৃত্তান্ত কৃষ্ণদাসকবিরাজের বিবরণ হইতে বিভিন্ন। সাদৃশ্য থাকিলেও বিভেদের পরিমাণ অধিক। কিন্তু দুইটী বর্ণনা পড়িলেই মনে হয় যে গোবিন্দদাসের বিবরণ প্রত্যক্ষ-দ্রষ্টার বর্ণনা। কৃষ্ণদাসকবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কেবল

১। পূর্ব্বে চৈতন্যদেবের একবার সেতুবন্ধ, ধনুতীর্থ ও রামেশ্বর দর্শনের কথা বর্ণিত হইয়াছে (চৈঃ চঃ-মধ্য-৯ম-১০১)।

সাম্প্রদায়িক বিতণ্ডা এবং প্রধান তীর্থগুলির নাম আছে ও সেই সঙ্গে তাঁহার অদ্ভুত কল্পনা মধ্যে মধ্যে পরিস্ফুরিত হইয়াছে।

চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে (মধ্য-৭ম) যে চৈতন্যদেব নিত্যানন্দের অনুরোধে ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে লইয়া এবং জগন্নাথদেব-দর্শন করিয়া গোপীনাথাদিভক্তগণসমভিব্যাহারে আলালনাথে (পুরীর ১৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে) আসিলেন। আলালনাথে সঙ্কীর্ত্তন করিয়া সেই রাত্রি অতিবাহিতকরিলেন। প্রাতঃকালে কেবল কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে করিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাহার পরে কূর্ম্মস্থানে [১] কূর্ম্মদেব দর্শনকরিয়া পুরোহিতের আতিথ্য স্বীকারকরিলেন এবং বাসুদেব-নামা একজন দ্বিজের কুষ্ঠরোগ আরোগ্যকরিলেন। তাহার পরে জিয়ড়-নৃসিংহক্ষেত্রে (সিংহাচলম—ভিজগপটমের সন্নিকটে—এখানে ১০৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দের একজন চোলনৃপতির লিপি উৎকীর্ণ আছে—Vizagapatam Gazetteer) নরসিংহ-মূর্ত্তি পূজাকরিলেন। পরদিন প্রভাতে গোদাবরী-তীর্থ (রাজমহেন্দ্রী) অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গোবিন্দদাসের করচাতে আলালনাথের পরে গোদাবরীতীর্থ দর্শনের কথা আছে। কূর্ম্মস্থানে কূর্ম্মদেব এবং জিয়ড়-নৃসিংহে নরসিংহমূর্ত্তি-দর্শনের কথা গোবিন্দদাসের করচাতে নাই। এমন হইতে পারে, যে চৈতন্যদেব সার্ব্বভৌমের পরামর্শানুসারে রামানন্দরায়ের সহিত মিলিত হইতে এত ব্যগ্র হইয়াছিলেন যে আলালনাথহইতে একেবারে গোদাবরীতীর্থে আসিয়াছিলেন। আলালনাথে চৈতন্যদেব যখন কৃষ্ণদাস ও গোবিন্দের

১। ভিজগপত্তনের উত্তরপূর্ব্বে চিকাকোল ; চিকাকোল হইতে ৮ মাইল পূর্ব্বে শ্রীকূর্ম্মম্ (Sarkar and Dev)। গোবিন্দ বলিয়াছেন যে রসালকুণ্ডে—চিকাকোল হইতে অনেক দূরে উত্তরপশ্চিমে চৈতন্যদেব কূর্ম্মদেব দেখিয়াছিলেন। রসালকুণ্ডে আর একটী কূর্ম্মমূর্ত্তি সম্ভবতঃ ছিল।

সহিত দাক্ষিণাত্য-যাত্রা করিতে উদ্যত হইলেন তখন সার্ব্বভৌম বলিলেন (গোঃ কঃ পৃঃ-২১)—

"এইকালে সার্ব্বভৌম বলে ধীরে ধীরে।
মিলিবে রায়ের সঙ্গে গোদাবরীতীরে॥
বসজ্ঞ ভক্তের শ্রেষ্ঠ রামানন্দরায়।
কৃষ্ণনামে সদা সিক্ত নয়নধারায়॥
বিশুদ্ধ আনন্দভোগ রামরায় করে।
হরিনামে হয় তাঁর আনন্দ অন্তরে॥
ইহা শুনি গোদাবরীতীরেতে ধাইল।
সেইস্থানে রামানন্দ আসিয়া মিলিল॥"

কৃষ্ণদাসকবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে যে গোদাবরী-তীরে রামানন্দরায়ের সহিত চৈতন্যদেবের মিলনের এবং কথোপকথন-ব্যপদেশে রাধাকৃষ্ণধর্ম্মের তথ্যনির্দ্ধারণের পরে (মধ্য-৯ম) চৈতন্যদেব গৌতমীগঙ্গায় (গোদাবরীতে—Godavari Gazetteer) স্নান করিয়া মল্লিকার্জ্জুনতীর্থে আসিলেন। ইহা কৃষ্ণানদীর দক্ষিণে; ইহাকে শ্রীপর্ব্বত, শ্রীশৈল ও পরবত্তম্‌ও বলে; ১৫৭০ ফিট পর্ব্বতের উপরে এই মন্দির অবস্থিত; এস্থান কর্ণুলের ৮২ মাইল উত্তরপূর্ব্বে—(N. L. Dey)। এখানে চৈতন্যদেব মহেশ অর্থাৎ মল্লিকার্জ্জন-শিব দেখিলেন। তাহার পরে দাসরাম-মহাদেব দেখিয়া অহোবল-নৃসিংহে তিনি আগমন করিলেন। সরকার মহাশয় বলেন, কর্ণুল জেলার সীর্ব্বেল তালুকের অন্তর্গত অহোবিলমে নরসিংহ-মূর্ত্তি আছে। অনন্তপুরজেলায় গুটী তালুকে উরবকোণ্ড এবং অনন্তপুরের মধ্যে পেন্নার (পিনাকিনী) নদী হইতে দুই মাইল দূরে, অনন্তপুরের উত্তরপশ্চিমে পেন্নাহোবিলমের উচ্চভূমির উপরেও নরসিংহের বিখ্যাত মন্দির আছে। এখানে যে

মাসে একটী বৃহৎ মেলা হয় (See Anantapur Gazetteer)। বোধহয় চৈতন্যচরিতামৃতে অহোবিলমের কথা বলা হইয়াছে। এস্থানহইতে কুদ্দাপার সন্নিহিত সিদ্ধবট্টম দক্ষিণদিকে প্রায় ৪৮ মাইল। কিন্তু পেন্নাহোবিলম হইতে সিদ্ধবট্টম পূর্ব্বদক্ষিণে প্রায় একশত মাইল।

তদনন্তর সিদ্ধবটে (সিদ্ধবট্টম কুদ্দাপার নিকট) সীতাপতি (কোদণ্ড-রামস্বামী—Sarkar), স্কন্দক্ষেত্রে (কুমারস্বামীতে ; তিরুত্তানীর [১] নিকটে ; মাদ্রাজের ৫১ মাইল উত্তর-পশ্চিমে) কার্ত্তিকেয় দেখিয়া ত্রিমল্লে (তিরুমল্ল—তিরুপতি অথবা ত্রিপতী অথবা ত্রিপদীর পশ্চিমে ; এস্থানে বালাজীর মন্দির আছে) আসিয়া চৈতন্যদেব ত্রিবিক্রম দেখিলেন। পুনরায় প্রায় ৭০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে সিদ্ধবটে আসিলেন ; এইস্থানে কৃষ্ণনাম রামনাম অপেক্ষা বড় প্রমাণ হইল। পরে তিনি বৃদ্ধকাশী [২] (পুতুবেলীগোপুরম্—মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি—Dey ; বৃদ্ধাচলম্-কুদ্দালোরের দক্ষিণ-পশ্চিমে—Sarkar) আসিলেন। তাহার নিকটে একগ্রামে (গোবিন্দদাসের করচায় গোদাবরীর সন্নিকটে ত্রিমন্দ-গ্রামে) চৈতন্যদেবের সহিত পাষণ্ডিগণের অর্থাৎ বৌদ্ধগণের সাক্ষাৎ হইল।

১। সিদ্ধবট্টম হইতে প্রায় ৯০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে তিরুত্তানী। তিরুত্তানীর প্রায় ৪৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে ত্রিপদী-ত্রিমল্ল। সিদ্ধবট্টম হইতে প্রথমে ত্রিপদী-ত্রিমল্ল, তাহার পরে তিরুত্তানী আসা উচিত ছিল। নন্দলাল দে মহাশয় বলেন যে তিরুত্তানী-ষ্টেশান হইতে একমাইল দূরে ক্রৌঞ্চপর্ব্বতের উপরে কুমারস্বামী অথবা কার্ত্তিকেয়ের মন্দির আছে।

২। পুতুবেলী-গোপুরম খুঁজিয়া পাইলাম না। বৃদ্ধাচলমে (দক্ষিণ আর্কট অন্তর্গত) বৃদ্ধ গিরীশ্বর শিবমূর্ত্তি আছেন ; কিন্তু এই স্থানকে যে বৃদ্ধকাশী বলে, ইহা South Arcot District Gazetteerএ অন্ততঃ নাই। বৃদ্ধাচলমের দশ মাইল উত্তরপশ্চিমে নল্লুরের নাম বৃদ্ধ-প্রয়াগ।

একজন বৌদ্ধ চৈতন্যদেবকে এক থালা অপবিত্র অন্ন দিয়াছিল এক মহাকায় পক্ষী সেই থালা লইয়া বৌদ্ধাচার্য্যের মাথার উপর ফেলিয়া দিয়া তাহাকে গুরুতররূপে আহত করিল [১]। তাহার শিষ্যগণ চৈতন্য-দেবকে মিনতিকরিয়া বলিলে তিনি তাহার কর্ণে তাহার শিষ্যগণ-দ্বারা কৃষ্ণনাম উচ্চারণকরাইয়া তাহাকে পুনর্জীবিত করিলেন (মধ্য-৯ম)—

"চেতন পাইল আচার্য্য উঠে হরি বলি॥
কৃষ্ণ কহি আচার্য্য প্রভুরে করয়ে বিনয়।
দেখিয়া সকল লোক পাইল বিস্ময়॥
এই মত কৌতুক করি শচীর নন্দন।
অন্তর্দ্ধান কৈল কেহো না পায় দর্শন॥৩৪

পুনরায় চৈতন্যদেব ত্রিপদী-ত্রিমল্লে আসিলেন এবং বেঙ্কটাচলে [১] চতুর্ভুজনারায়ণ দর্শনকরিলেন॥ ত্রিপদীতেরামমূর্ত্তি তিনি দর্শনকরিলেন। তাহার পরে প্রায় ২০০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে পানানরসিংহে (বেজওয়াদার ৭ মাইল দক্ষিণে মঙ্গলগিরি: এখানে গুড়ের সরবৎ ঠাকুরকে ভোগ

১। এ সকল কথা গোবিন্দদাসের করচায় নাই। করচায় আছে যে গোদাবরীর সন্নিকটে ত্রিমন্দ নগরে (পৃষ্ঠা-২৩) বৌদ্ধেরা চৈতন্যদেবের সহিত বিচার করিতে চাহিলে, ত্রিমন্দের রাজা মধ্যস্থ হইলেন। বৌদ্ধেরা পরাস্ত হইলেন এবং তাঁহাদিগের নেতা রাম-গিরিরায় চৈতন্যদেবের ভক্ত হইলেন। চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে বৌদ্ধাচার্য্যের মস্তকের উপরে থালার পতন ইত্যাদি লিখিত নাই।

১। এ 'বেঙ্কটাচল' ত্রিমল্ল-ত্রিপদীর অন্তর্গত বেঙ্কটাচল। এখানে অন্ততঃ পোনেরটী মন্দির আছে। দেবতাদিগের প্রধান—গোবিন্দরাজস্বামী, বেঙ্কটেশ্বর ও রামস্বামী। ত্রিপদীর উত্তরপূর্ব্বে এবং নেল্লোরের দক্ষিণ-পশ্চিমে আর একটী বেঙ্কটাচলম অথবা বেঙ্কটগিরি আছে।

দেওয়া হয়) আসিয়া তিনি নৃসিংহদেবকে স্তব ও প্রণাম করিলেন। তাহার পরে প্রায় ২৮০ মাইল দক্ষিণে শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী (**Conjeveram**) আসিয়া শিব এবং লক্ষ্মীনারায়ণ দর্শনকরিলেন। (তৃতীয়বার) তিনি প্রায় ১০০ মাইল উত্তরপশ্চিমে ত্রিমল্লে আসিলেন। এস্থান হইতে ২২ মাইল উত্তরপূর্ব্বে ত্রিকালহস্তীতে (**Kalahasti**) আগমন করিয়া মহাদেব দেখিলেন। তাহার পরে পক্ষিতীর্থে (চিঙ্গলিপুটের দক্ষিণ-পূর্ব্বে) শিবদর্শন করিয়া বৃদ্ধকোলে (মহাবল্লীপুরমে) শ্বেতবরাহকে নমস্কারকরিলেন। তাহার পরে মাদ্রাজের প্রায় ১১০ মাইল দক্ষিণে পীতাম্বর-শিব (চিদাম্বরমে আকাশলিঙ্গ শিব ?) দেখিয়া দশ মাইল দক্ষিণে (শিয়ালীতে) শৃগালী-ভৈরবী দর্শনকরিলেন। তদনন্তর কাবেরীতীরে আসিলেন। তাহার পরে তিনি গো-সমাজ শিব (গোঃ কঃ মতে শ্রীরঙ্গমের নিকটে), ও বেদাবনে (বেদারণ্য, **Vedāranyam** ; নিগাপটমের দক্ষিণে এবং পইন্ট্ ক্যালিমিয়ারের উত্তরে) আসিয়া মহাদেব দেখিলেন। তাহার পরে অমৃত-লিঙ্গ শিব দর্শনকরিলেন এবং সমস্ত শিবালয়ে শৈবদিগকে বৈষ্ণব করিলেন। সম্ভবতঃ ইহা কুম্ভকোণমের প্রায় ছয় মাইল দক্ষিণে কুদবাসল (**Kudavāsal**)। কুম্ভকোণমে (**Kumbakonam**) স্নানকরিবার পূর্ব্বে কুদবাসলে স্নান করা বিধেয়। গরুড় অমৃতভাণ্ড লইয়া যাইবার সময়ে অর্দ্ধেক অমৃত কুদবাসলে এবং অর্দ্ধেক কুম্ভঘোণমে ফেলিয়া দিয়াছিলেন (**Tanjore Gazetteer p. 238**)। তাহার পরে দেবস্থানে আসিয়া তিনি বিষ্ণু-দর্শন করিলেন। সম্ভবতঃ ইহা মন্নারগুড়ি (**Mannārgudi**) কুম্ভকোণমের প্রায় ২৪ মাইল দক্ষিণে। এইস্থানের রাজগোপাল-মন্দির বিখ্যাত বিষ্ণুমন্দির। ইহা রাজা প্রথম কুলোতুঙ্গ (১০৭০-১১১৮ খৃষ্টাব্দ) এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ফাল্গুনমাসে গোপালের জন্মোৎসব-রথযাত্রা হয়।

সপ্তমদিনে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক গোপীদিগের বস্ত্রহরণ অভিনীত হয়। মন্নার-গুড়িকে দক্ষিণ দ্বারকা বলে (Tanjore Gazetteer and S. I. Railway Guide)। মন্নারগুড়ির ৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে 'মহাদেবপত্তনম' অর্থাৎ 'দেবস্থান' আছে ॥ তদনন্তর কুম্ভকর্ণ-কপালের সরোবর (কুম্ভকোণম্ অথবা কুম্ভঘোণম্) দেখিয়া শিবক্ষেত্রে [১] আসিয়া শিবদর্শন করিলেন। তাহার পরে দক্ষিণপশ্চিমে পাপনাশনে [১] বিষ্ণুদর্শন করিলেন। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে (শ্রীরঙ্গমে—ত্রিচিনোপল্লীর উত্তরে) আসিয়া কাবেরীতে তিনি স্নান করিলেন এবং রঙ্গনাথ দেখিলেন এবং প্রেমাবেশে বহু স্তুতি, প্রণতি, গান ও নৃত্য করিলেন। এইস্থানে বেঙ্কটভট্টের নিমন্ত্রণ-গ্রহণপূর্ব্বক চাতুর্মাস্য-ব্রত-সম্পাদনের নিমিত্ত তাঁহার বাটীতে চারিমাস অতিবাহিত করিলেন এবং প্রমাণ করিলেন যে নারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ বড় এবং লক্ষ্মী অপেক্ষা গোপী বড় অর্থাৎ রামানুজের শ্রীসম্প্রদায়ের লক্ষ্মী-নারায়ণ অপেক্ষা গৌড়ের বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের রাধাকৃষ্ণ বড়। পরিশেষে চৈতন্যদেব ভট্টের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া 'সিদ্ধান্ত ফিরাইলেন' এবং বলিলেন যে এতক্ষণ তিনি পরিহাস করিতেছিলেন, বস্তুতঃ নারায়ণ ও কৃষ্ণেতে ভেদ নাই এবং গোপী ও লক্ষ্মীর একই রূপ ; তত্রাচ 'গোপীদ্বারে লক্ষ্মী করে কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদ' অর্থাৎ কৃষ্ণসঙ্গ আস্বাদনকরিতে লক্ষ্মী গোপীর দ্বারে আসেন, কিন্তু নারায়ণের সঙ্গ আস্বাদনকরিতে গোপী কখনও

১। তাঞ্জোরে বৃহদীশ্বর শিব—সরকার। কুম্ভকোণমের নাগরাজ শর্ম্মা (Dr. R. Nagarāja Sarmā) লিখিয়াছেন যে কুম্ভকোণমের কতিপয় মাইল দূরে পট্টীশ্বরম্-গ্রামে স্বর-গো-নায়কদেবের মন্দির আছে। ইহা একটী শিব-ক্ষেত্র।

১। আর একটী পাপনাশন তিনেভেলির পশ্চিমে আছে ; সেখানে একটী সুন্দর শিবমন্দির এবং পবিত্র মৎস্য-সরোবর (Pool of the Sacred Fish—S. I. Ry Guide) আছে।

লক্ষ্মীদ্বারে যান্ না। এ সকল কথা কিম্বা চাতুর্মাস্যব্রতের কথা গোবিন্দদাসের করচাতে নাই। কিন্তু শ্রীরঙ্গমে একটী অর্দ্ধশিক্ষিত পরমভক্ত ব্রাহ্মণের গীতাপাঠের কথা এবং অর্জ্জুনের রথে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার দর্শনের কথা, উভয় গ্রন্থেই আছে। গোবিন্দদাস ইঁহার নাম 'যুধিষ্ঠির' বলিয়াছেন। চৈতন্যদেব ইঁহার ভক্তি দর্শনকরিয়া ইঁহাকে আলিঙ্গনকরিলেন। চৈতন্যদেব ভ্রাতার অন্বেষণ, তীর্থদর্শন ও ভক্তিধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি যে একস্থানে চারি মাস অবস্থান করিবেন, ইহা বিশ্বাস হয় না। তখন বোধহয় সকল ব্রাহ্মণই এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেন। সেই জন্য ইঁহারা বলিলেন যে চৈতন্যদেবও তীর্থযাত্রার সময়ে এই ব্রত অনুষ্ঠানকরিয়াছিলেন। তাহার পরে চৈতন্যদেব ঋষভপর্ব্বতে [১] নারায়ণ দেখিয়া পরমানন্দপুরীর (গোবিন্দদাস ভুল করিয়া পরানন্দপুরী লিখিয়াছেন) সহিত মিলিত হইলেন। পরমানন্দ চৈতন্যদেবের সহিত নীলাচলে পুনর্মিলিত হইবেন, বলিলেন। তাহার পরে চৈতন্যদেব শ্রীশৈলে [২] শিবদুর্গা দর্শনকরিয়া

১। **Palni Hills about 50 miles from Madura (N. L. Dey ; Anagarh-malai, 12 miles, north of Madura (Sarkar).**

২। **নন্দলাল দে মহাশয় বলেন যে ইহা মলয়গিরির (Cardamom Mountains) একটী শৃঙ্গ। পশ্চিমঘাটপর্ব্বতশ্রেণীর দক্ষিণভাগ মলয়গিরি। মলয়গিরির অনেক শৃঙ্গ আছে। ইহা সম্ভবতঃ তোতাদ্রি (Nanguneri, 683 feet high—Tinnevelly Gazetteer), রামানুজ-বৈষ্ণবদিগের একটী বিখ্যাত কেন্দ্র। ইহা তিনেভেলির ১৬ মাইল দক্ষিণে। ইহাকে শ্রীশৈল অর্থাৎ শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীনারায়ণ-পূজক রামানুজসম্প্রদায়ের অথবা শ্রীসম্প্রদায়ের একটী বিখ্যাত কেন্দ্র বলা যাইতে পারে। এখানে বিষ্ণুমন্দির ও ক্ষীরাব্ধিনামক পুষ্করিণী আছে। ঋষভপর্ব্বতের অনেক দক্ষিণে তোতাদ্রি। কামকোষ্ঠী তোতাদ্রির উত্তরপূর্ব্বে অর্থাৎ চৈতন্যদেব দক্ষিণদিকে অনেক দূর আসিয়া পুনরায় উত্তরদিকে**

কামকোষ্ঠীতে [১] আগমন করিলেন এবং সেস্থান হইতে দক্ষিণমথুরায় (Madura) আসিয়া একজন রামদাসনামা রামভক্ত ব্রাহ্মণকে 'রাবণ মায়াসীতা হরণকরিয়াছিলেন' বলিয়া তাঁহার দুঃখ নিবারণকরিলেন। তাহার পরে কৃতমালায় (মাদুরার বৈগাই অথবা বেগবতী নদী—Dey) স্নান করিয়া দুর্ব্বশনে (দর্ভশয়ন—রামনাদরেলষ্টেশানের পাঁচ মাইল দক্ষিণে সমুদ্র-উপকূলে) রঘুনাথ (শেষশায়ী চতুর্ভুজ ভগবান্) দর্শনকরিলেন। তাহার পরে মহেন্দ্রশৈলে পরশুরাম দর্শনকরিলেন। ইহা সম্ভবতঃ কন্যাকুমারীর (Cape Comorin) প্রায় ২০ মাইল উত্তরপশ্চিমে মহেন্দ্র-গিরির সন্নিকটে। ইহার নিকটে তিরুক্কুরণকুদিতে বিষ্ণুর পঞ্চ অবতারের মূর্ত্তি আছে। মহেন্দ্রগিরি নামক দুইটী 'কাছাকাছি' শৃঙ্গ আছে। "The perfect cone of rock immediately to the south of the town marks the position of the place for

---

গিয়াছিলেন ; আবার দক্ষিণদিকে আসিয়াছিলেন। অবশ্য কৃষ্ণদাসকবিরাজলিখিত চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্যভ্রমণে এরূপ অসঙ্গতি অনেক আছে। কৃষ্ণদাসকবিরাজ বলিতেছেন যে চৈতন্যদেব সেখানে ব্রাহ্মণবেশধারী শিবদুর্গা দেখিলেন ; তাহা হইলে তোতাদ্রি শ্রীশৈল হইতে পারে না। কিন্তু নঙ্গুনেরীর সন্নিকটে এবং দক্ষিণপশ্চিমে তিরুক্কুরুণগুড়ির নিকটে মম্বিতলইবনপত্তেয়ম্ নামে মহেন্দ্রগিরির একটী শৃঙ্গের উপরে একটী শিবমন্দির আছে। এ স্থান হইতে মূর্ত্তিসকল সম্প্রতি তিরুক্কুরণগুড়িতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে (Tinnevelly Gazetteer, pp. 405-6)। মাদুরানগরের ২০ মাইল উত্তরপশ্চিমে শিরু-মলয় অর্থাৎ শ্রী-শৈল কিম্বা শ্রী-পর্ব্বত আছে। ইহার নিকট দিয়া রেল হইবার পূর্ব্বে রামেশ্বর যাইবার পথ ছিল (Madura Gazetteer, p. 297 and map)।

১। ইহা দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণাজেলায় অবস্থিত। ইহার বর্ত্তমান নাম কানপল্লী (কাবালী)। ইহা একপ্রকার অসম্ভব, কারণ তখন চৈতন্যদেব মাদুরার নিকটে। সম্ভবতঃ রামনাদের প্রায় দশ মাইল উত্তরপূর্ব্বে বৈগাইনদীতীরে 'কামনকোট্টাই'।

miles around (Tinnevelly Gazetteer pp. 403-4)। তাহার পরে সেতুবন্ধে ধনুতীর্থ ও রামেশ্বর দেখিলেন। এই স্থানে রাবণের মায়াসীতাহরণ এবং সীতার অগ্নিপরীক্ষার সময়ে মায়াসীতার পরিবর্ত্তে প্রকৃতসীতাকে অগ্নির প্রত্যর্পণবৃত্তান্ত শ্রবণকরিয়া আনন্দিত হইলেন। তাহার পরে পুনরায় মাদুরা আসিয়া রামদাসকে এই বৃত্তান্ত বলিয়া আনন্দিত করিলেন। ধনুতীর্থকে ধনুষ্‌কোটী-তীর্থও বলে। রায় বাহাদুর জলধর সেন এই তীর্থে যাইয়া জানিয়া আসিয়াছেন যে রামেশ্বর-দ্বীপের অধিবাসীরা রাবণজয়ের পরে রামচন্দ্রকে নিবেদন করিলেন যে সেতু থাকিলে রাক্ষসেরা অতিশয় অত্যাচার করিবে এবং সমুদ্রও রামচন্দ্রের নিকট বন্ধনদশা হইতে মুক্তি প্রার্থনাকরিলেন। সেইজন্য ধনুর্বাণ দিয়া রামচন্দ্র সেতু ভগ্ন করিলেন। চতুর্বেদী দ্বারকানাথ শর্ম্মা জানিয়া আসিয়াছেন যে বিভীষণ রামচন্দ্রকে নিবেদনকরিয়াছিলেন "'নাথ! আপ্‌কে বাঁধে হুএ পুলপর হোকর তো অনেক প্রতাপী রাজা সহজ মেং আকর মুঝে কষ্ট দিয়া করেং গে।" য়হ শুন শ্রীরামচন্দ্রজী নে অপনে ধনুষ্‌কী কোটীসে পুল তোড়্ দিয়া। বহী ধনুষ্‌কোটী তীর্থ হুআ'। এই দুইটী প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের ভিতর কোনটী সত্য পাঠকবর্গ নির্দ্ধারিত করিবেন। তাহার পরে চৈতন্যদেব তাম্রপর্ণীতে আসিলেন। এই নদীতে স্নান করিয়া তিনি নয়-ত্রিপদী আসিলেন। ইহাকে অল্বারতিরুনগরী, নবতিরুপতি, এবং তেনকরইও বলে। ইহা তিনেবেল্লীনগরের প্রায় ২৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং তাম্রপর্ণীনদীর দক্ষিণতটে অবস্থিত। এখানে আদিনাথস্বামী (বিষ্ণুর) মূর্ত্তি আছেন। কিন্তু নম্মাল্বার-নামা বিষ্ণুর অবতার, আদিনাথ অপেক্ষা প্রসিদ্ধ। জ্যৈষ্ঠমাসে নম্মাল্বার-দেবের সহিত সন্নিহিত নয়টী মন্দিরের দেবমূর্ত্তি মিলিত হন্ (Tinnevelly Gazetteer)। তাহার পরে চিয়ড়তলাতে

(ত্রিবন্দ্রমের নিকট সেরতল্লী ?) রাম-লক্ষ্মণ ; তিলকাঞ্চীতে [১] শিব ; গজেন্দ্রমোক্ষণে (on the Tāmraparni, 20 miles west of Tinnevelly—Dey, খুঁজিয়া পাইলাম না) বিষ্ণুমূর্ত্তি ; পানাগড়িতে [২] সীতাপতি ; চামড়ানূড়ে (Chengannur about 60 miles northwest of Trivandrum—Sarkar) রামলক্ষ্মণ ; শ্রীবৈকুণ্ঠে [৩] (16 miles S. E. of Tinnevelly) বিষ্ণু ; মলয়ে (অগস্ত্যমলয়—৬১৩২ ফিট উচ্চ—তাম্রপর্ণীনদীর উৎপত্তিস্থান) অগস্ত্যমূর্ত্তি ; [৪] ; কন্যাকুমারী ; আমলকীতলাতে (on the north bank of the Tāmraparui, called also Āmlitala—Dey ; খুঁজিয়া পাইলাম না) রামমূর্ত্তি ; মল্লারদেশে (Travancore) তমালকার্ত্তিক (তোবালা—Tobala, 44 miles

১। সম্ভবতঃ তেনকাশী (Tenkaśi, northwest of Tinnevelly. Within five minutes' drive from the station is an old Śiva-temple (begun in 1447 A. D.) dedicated to Viśvanatha-svāmi, which contains several well-sculptured figures of deities. The temple contains some exceptional stone-carvings—S. I. Railway Guide and Tinnevelly Gazetteer.

২। Panagudi or Panaikudi about 30 miles south of Tinnevelly. পানাগড়িতে রামলিঙ্গ-স্বামী-শিবের মন্দির আছে। এই শিবের মন্দিরের অভ্যন্তরে একটী ক্ষুদ্র বিষ্ণুমন্দির আছে (Tinnevelly Gazetteer।

৩। The chief temple is of Vishnu, Vaikunthapatisvāmi, a large and spacious building surmounted by a lofty Gopuram. The Mandapam situated on the right hand as the outer circuit is entered is particularly rich in sculptures (Tinnevelly Gazetteer)।

৪। আমার Stray Thoughts Part IV, p.p. 19—21। দেখুন ; তিনেবেলী জেলার অম্বাসমুদ্রম্ নগরের দক্ষিণপশ্চিমে অগস্ত্যমলয় এবং পশ্চিমে পাপনাশম। পাপনাশমে অগস্ত্যমলয়পর্ব্বতহইতে তাম্রপর্ণী নিম্নভূমিতে পতিত হইতেছে। এখানে পাপবিনাশেশ্বর-শিবের মন্দির আছে। নিকটে অগস্ত্যীশ্বরের অর্থাৎ ঋষি অগস্ত্যের মন্দির আছে। যে সময়ে কৈলাশপর্ব্বতে শিব ও পার্ব্বতীর বিবাহ হইতেছিল, অগস্ত্যের বিশেষ কার্য্যের নিমিত্ত দাক্ষিণাত্যে আসাতে তিনি এ বিবাহ দেখিতে পান নাই। সেইজন্য এখানে প্রত্যেক বৎসরে হরপার্ব্বতীবিবাহ-উপলক্ষে অগস্ত্যদেবকে তাঁহাদিগের মন্দিরে আনা হয় (Tinnevelly Gazetteer, p. 363)।

south of Tinnevelly—Sarkar); বাতাপাণীতে (Betapāni—Bhutapandi in Travancore, north of Nagarcoil—Sarkar) রঘুনাথ (এই স্থানে একটী ভট্টমারী-স্ত্রীলোক কৃষ্ণদাসকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল); পয়স্বিনীতে (the Paralayar at Tiruvāttar in Travancore) স্নান করিয়া আদি-কেশব-মন্দির (এখানে ব্রহ্মসংহিতা পাইলেন); অনন্তপদ্মনাভে [১] পদ্মনাভ; শ্রীজনার্দ্দনে (near the Varkala Station in Travancore—S. I. Ry Guide) জনার্দ্দন; পয়োষ্ণীতে শঙ্করনারায়ণ; সিংহারী মঠ—(Śringeri in Mysore—শঙ্করাচার্য্যস্থান); মৎস্যতীর্থ; মধ্বাচার্য্য-স্থানে (Udipi) উড়ুপকৃষ্ণ (দেখিয়া প্রেমাবেশে নৃত্যগীতকরণ; ভক্তিমার্গ শ্রেষ্ঠ—ইহা প্রতিপাদন); ফল্গুতীর্থ (Falguna or Anantapur?); বিশালায় ত্রিতকূপ; [২] পঞ্চাপ্সরা তীর্থ (56 miles S. E. of Bellary, অনন্তপুরের নিকট?—Dey; খুঁজিয়া পাইলাম না); গোয়ার দক্ষিণে গোকর্ণে [৩] শিব ও আর্য্যাদ্বৈপায়নী; সূর্পারকতীর্থ (বোম্বাইয়ের ২৬ মাইল উত্তরে সোপারা); কোলাপুরে (Kolhāpur) লক্ষ্মী, ক্ষীরভগবতী, নাঙ্গা গণেশ ও চোরাভগবতী; তাহার পরে পাণ্ডুপুরে (Pandharpur পূণার নিকট) বিটুলঠাকুর অথবা বিঠোবা

১। বর্ত্তমান ত্রিবন্দ্রম (Trivandrum, capital of Travancore).

২। বিশালা (উজ্জয়িনী?)। ত্রিত-কূপ—গৌতমমুনির তিন পুত্র একত, দ্বিত এবং ত্রিত। তিন জনই যজ্ঞীয় পশু-আহরণে বনে গিয়াছিলেন। একত ও দ্বিত ত্রিতকে বনে পরিত্যাগকরিয়া আসিলে ব্যাঘ্রভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করিবার সময় ত্রিত এক কূপে পতিত হন্। সেইস্থানেই সোম-যাগ করিলে দেবতারা তাঁহাকে সেই কূপ হইতে উদ্ধার করেন; 'সরস্বতী নদীতীরে ত্রিতকূপ'—কাবাসী)।

৩। 'Gendia, a town in North-Canara, between Karwar and Kumta ....It contains the temple of Mahādeva Mahābaleśvara—N. L. Dey। কবলীর দক্ষিণ-পশ্চিমে আরব সমুদ্র-উপকূলে।

(এ স্থানে মাধবপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরীর নিকট বিশ্বরূপের তিরোধান শ্রবণ এবং ভীমরথীতে অর্থাৎ 'ভীমাতে' স্নান); পুনরায় দক্ষিণে যাইয়া কৃষ্ণবেণ্বা-তীর (এখানে কৃষ্ণকর্ণামৃত নকল করা হইয়াছিল; কৃষ্ণবেণী —কৃষ্ণানদী—Dey); তাহার পরে কৃষ্ণার প্রায় ৪০০ মাইল উত্তরে তাপ্তীনদী (এখানে স্নান); তাহার পরে মাহিষ্মতীপুর (নর্ম্মদাতীরে, ইন্দোরের দক্ষিণে মহেশ[১] কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের রাজধানী); তাহার পরে পুনরায় প্রায় ১১০০ মাইল দক্ষিণে ধন্নুকতীর্থ (ধন্নুতীর্থ); তাহার পরে পুনরায় উত্তরে বিন্ধ্যপর্ব্বতের সন্নিকটে নির্ব্বিন্ধ্যা-নদী[২] আবার প্রায় ৭০০ মাইল দক্ষিণে ঋষ্যমুখ (ঋষ্যমূক-পর্ব্বত); তাহার পরে উত্তরে দণ্ডকারণ্য; পুনরায় দক্ষিণে ঋষ্যমূকের নিকট সপ্ততাল[৩] (চৈতন্যদেবের আলিঙ্গন-মাত্র সপ্ততালের বৈকুণ্ঠ-গমন এবং চৈতন্যদেব যে রামচন্দ্র ইহা প্রতিপাদন); পম্পাসরোবর; পুনরায় উত্তরে পঞ্চবটী, নাসিক; ত্র্যম্বক (নাসিকের নিকট); ব্রহ্মগিরি (ত্র্যম্বক-পর্ব্বতের নিকট—Sarkar); কুশাবর্ত্ত[৪] (গোদাবরীর উৎপত্তিস্থান); তাহার পরে একেবারে পূর্ব্ব উপকূলে সপ্ত গোদাবরী (সোলঙ্গীপুরের নিকটে এবং পিঠাপুর হইতে

১। অথবা মহেশ্বর; কিম্বা ইহার কিছু পূর্ব্বে মান্ধাতা।

২। আমার 'কালিদাস ও বিক্রমাদিত্য'—পৃঃ ১৬১ দেখুন।

৩। বাল্মীকির রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে যে বালীকে বধ করিবার অগ্রে সুগ্রীব রামচন্দ্রের ধনুর্বিদ্যা পরীক্ষার জন্য উৎসুক হইয়া তাঁহাকে একটী শালবৃক্ষ বিদ্ধ করিতে বলিয়াছিলেন। রামচন্দ্র সপ্ত শালতরু শরদ্বারা ভেদকরিয়াছিলেন। রামায়ণে তালবৃক্ষ লেখা নাই, শালবৃক্ষ লেখা আছে। দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণদাস সপ্ততালকে একটী বৃক্ষ বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। এমন হইতে পারে যে সপ্তশাল কিম্বা সপ্ততাল খুব 'কাছাকাছি' ছিল এবং একটী বৃক্ষ বলিয়া মনে হইতেছিল।

৪। নাসিক হইতে ২১ মাইল দূরে ত্র্যম্বকগিরিতে কুশাবর্ত্তনামক একটী হ্রদ আছে। ইহা হইতে গোদাবরীর উৎপত্তি হইয়াছে (N. L. Dey)।

১৬ মাইল দূরে; রাজমহেন্দ্রীর ৩৮ মাইল উত্তরে পিঠাপুর—Dey), তাহার পরে বিদ্যানগর [১] (রামানন্দের সহিত মিলন; তাঁহাকে কৃষ্ণকর্ণামৃত ও ব্রহ্মসংহিতা-প্রদান) এবং আলালনাথ (এখানে নীলাচলের ভক্তগণের সহিত মিলন) দর্শনকরিয়া নীলাচলে চৈতন্যদেব প্রত্যাগমন করিলেন।

আমরা চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত তীর্থের বিষয়ে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কৃষ্ণদাসকবিরাজ কতকগুলি তীর্থের নাম করিয়াছেন। তিনি ধারাবাহিকভাবে তাহা বর্ণনা করেন নাই। গোবিন্দদাসের করচাতে যে ভ্রান্তি একেবারেই নাই তাহা আমরা বলি না; কিন্তু ভুল অল্পই আছে এবং পড়িলে মনে হয় যে গোবিন্দদাসের বর্ণনা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। সময়াভাবে এবং শিক্ষার অভাবে তিনি সর্ব্বদা যথাযথরূপে চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্যভ্রমণ লিপিবদ্ধ করিতে পারেন নাই।

যদুনাথ সরকার মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন (in Chaitanya's Life and Teachings, p. 92) যে চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ ১৫১০ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ এবং ১৫১২ খৃষ্টাব্দের মাঘমাসের মধ্যে সম্পাদিত হইয়াছিল। তখন বিজয়নগরের রাজা-কৃষ্ণদেবরায়ের (১৫০৯-৩০) রাজত্ব ভাল করিয়া আরম্ভ হয় নাই এবং দাক্ষিণাত্যের বৃহৎ দেবমন্দির-নির্ম্মাণের কার্য্যও আরম্ভ হয় নাই। সেই জন্য দাক্ষিণাত্যের অনেক বিখ্যাত মন্দিরের বিবরণ আমরা চরিতামৃতে কিম্বা করচাতে দেখিতে পাই না।

১। নন্দলাল দে এবং যদুনাথ সরকার মহাশয় (in Chaitanya's Life and Teachings p,49) রাজমহেন্দ্রী ও বিদ্যানগর একই স্থান বলিয়াছেন। কিন্তু গোবিন্দ বলিয়াছেন যে রাজমহেন্দ্রী রামানন্দের কার্য্যস্থান এবং বিদ্যানগর (রায়পুর এবং সম্বলপুরের মধ্যে) তাঁহার বাসস্থান।

গোবিন্দদাসের করচাতে চৈতন্যদেবের কণ্টকনগরে (কাটোয়াতে) সন্ন্যাসগ্রহণের পরে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে আগমন বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার আচার্য্যগৃহে অবস্থিতির বিবরণ অতিসংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইয়াছে। যদিও ইহাতে নবদ্বীপহইতে শচীদেবীর অদ্বৈতাবাসে আগমন লিখিত হইয়াছে, তাঁহার সহিত তাঁহার সংসারত্যাগী একমাত্র আদর্শ-পুত্রের মর্ম্মন্তুদ সাক্ষাৎ ও কথোপকথন 'এবং পুত্রের অসামান্য মাতৃভক্তি এবং মাতার অসাধারণ স্বার্থত্যাগ ইহাতে বর্ণিত হয় নাই। করচায় আছে—

"কিছুকাল আচার্য্যের গৃহেতে রহিলা।
তার মধ্যে শচীমাতা আসি দেখা দিলা ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু মাতার চরণে।
প্রণাম করিয়া কথা ক'ন সন্তর্পণে ॥
দুই চারি বাত কহি মায়া কাটাইয়া।
দক্ষিণে করিলা যাত্রা সকলে ছাড়িয়া ॥"

চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে লিখিত আছে, যে চৈতন্যদেব তাঁহার মাতৃদেবীর এবং অদ্বৈতপ্রভৃতি সুহৃদ্‌গণকে বলিলেন যে তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণ করার পর স্বীয় নগরের নিকটে এবং আত্মীয়বর্গের সহিত থাকা বিধেয় নহে এবং এই নিমিত্ত দেশত্যাগবিষয়ে উঁহাদের মত ভিক্ষাকরিলেন। চৈতন্যদেবের বন্ধুবর্গ তাঁহার নবদ্বীপত্যাগে সম্মত হইলেন না, কিন্তু শচীদেবী বলিলেন, "হে মহোদয়গণ, যদি বিশ্বম্ভরের আমাদিগের নিকটে থাকিলে ধর্ম্মহানি হয়, তবে কেবল আমাদিগের সুখের জন্য তাহাতে আগ্রহ করা উচিত নয়। খল ব্যক্তিরা যাহাতে তাঁহার নিন্দা না করে, তাহাই করা উচিত। আমার যাহা অদৃষ্টে আছে, তাহাই হইবে। অতএব জগন্নাথক্ষেত্রে যদ্যপি বিশ্বম্ভর বাস করে, তাহা হইলে সর্ব্বাংশেই উত্তম হইবে,

কারণ লোক-যাতায়াতে কথন সংবাদ পাইবার আশা রহিল" (৬ম অঙ্ক, রাঃ বিঃ কৃত অনুবাদ)।

গোবিন্দদাসের করচাতে চৈতন্যদেবের শান্তিপুরহইতে নীলাচলে আগমনের সময়ে ভাগিরথীর পশ্চিমদিক দিয়া আসার কথা লিখিত হইয়াছে। তিনি প্রথমে বর্দ্ধমানে আসিয়াছিলেন। তাহার পরে বর্দ্ধমাননগরের উপকণ্ঠে কাঞ্চননগরে আসিয়া শশিমুখীর করুণ ক্রন্দন-দর্শনে গোবিন্দকে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে বলিয়াছিলেন। গোবিন্দ ইহা শ্রবণকরিয়া মর্ম্মাহত হইলে তাহাকে সঙ্গে আসিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। তাহার পরে তিনি (সম্ভবতঃ ইন্দাস ও রাওনার মধ্যবর্ত্তী স্থানে) দামোদর পারহইয়া কাশীমিত্রের অতিথি হইয়াছিলেন। এস্থানে চিকণ চাউলের নাম জগন্নাথ-ভোগ শুনিয়া, 'হে জগন্নাথ' বলিয়া তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাহার পরে হাজিপুরে (সম্ভবতঃ চন্দ্র-কোণার নিকটে) আসিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিবার সময়ে তাঁহার অপূর্ব্ব ভাবাবেশ হইল। তাহার পরে মেদিনীপুরে আসিয়া তিনি একজন ধনীকে সদুপদেশ দিলেন। তদনন্তর ২২ মাইল দক্ষিণে নারায়ণগড়ে পৌছিয়া ধলেশ্বর-শিব দর্শনকরিয়া 'হর হর' বলিয়া ধরণীর উপরে পতিত হইলেন। সেখানে বীরেশ্বরসেন এবং ভবানীশঙ্করনামা ধনবান্ ব্যক্তিদ্বয় এবং অন্যান্য লোককে কৃষ্ণতত্ত্ব শিক্ষাদিয়া ২৯ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে জলেশ্বরে আসিয়া ভক্তিসহকারে বিল্বেশ্বর-শিব দর্শনকরিলেন। জলেশ্বরের নিকটে সুবর্ণরেখা-নদীর ধার দিয়া যাইতে যাইতে রঘুনাথ-দাসের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তিনি আনন্দিত হইলেন। তাহার পরে হরিহরপুরে আসিয়া তিনি হরিনামে মত্ত হইলেন। পরদিন জলেশ্বরের ২৯মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বালেশ্বরে আসিয়া গোপাল দেখিলেন। বালেশ্বরে বাণেশ্বর-মহাদেবের প্রাচীন মন্দির এখনও আছে। প্রবাদ

যে ইহাই বাণরাজার রাজধানী ছিল এবং এস্থান হইতে কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধ উষাকে লইয়া গিয়াছিলেন। বাণেশ্বর-শিবের কথা গোবিন্দ বলেন নাই। তিনি রেমুণার গোপীনাথকে বোধহয় 'গোপাল' বলিতেছেন। রেমুণা বালেশ্বরের পাঁচমাইল পশ্চিমে। পরদিন প্রাতঃকালে নীলগড়ে (সম্ভবতঃ নীলগিরি—বালেশ্বরের ৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে) পৌছিয়া তিনি হরিনাম করিতে করিতে অজ্ঞান হইলেন। পরদিন (যাজপুরের [১] নিকটে বালেশ্বরের প্রায় ৪০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে) বৈতরণী-নদী পারহইলেন। পরদিন বৈতরণীর প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণে কটকের সন্নিকটে তিনি মহানদী পারহইলেন—

"পরদিন মহানদী পার হইয়া যাই।
পথে গোপীনাথ-দেবে দেখিবারে পাই।

* * * *

অনন্তর সাক্ষিগোপাল-দরশন লাগি।
চলিতে লাগিল সবে হয়ে অনুরাগী॥

ইহার দুই অর্থ হইতে পারে—(১) চৈতন্যদেব বৈতরণী ও মহানদীর

১। গোবিন্দ কেন যাজপুরের কথা লিখিলেন না, বলিতে পারি না। বৃন্দাবনদাস ইহা লিখিয়াছেন। চৈতন্যদেব কি নীলাচল দেখিবার জন্য এত ব্যগ্র হইয়াছিলেন যে তিনি যাজপুর দেখিলেন না? যাজপুর একটী বিখ্যাত তীর্থস্থান—ইহাকে বিরজাক্ষেত্র বলে। বিরজাদেবী সতীর (নাভির) প্রতীক। ব্রহ্মা এখানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম যাজপুর অথবা যজ্ঞপুর হইয়াছিল। গয়াসুরের মস্তক গয়াতে এবং তাঁহার নাভি যাজপুরে অবস্থিত, সেই জন্য ইহাকে নাভিগয়াও বলে। অনেক দেবদেবীর মন্দির এখানে আছে। দশম শতাব্দীপর্য্যন্ত ইহা উড়িষ্যার রাজধানী ছিল। বৈতরণীনদীর একটী দ্বীপের উপরে বরাহনাথ অর্থাৎ বিষ্ণুর বরাহাবতারের মূর্ত্তি আছে। এই মন্দিরের সংস্কার রাজা প্রতাপরুদ্র করিয়াছিলেন (Cuttack Gazetteer)

মধ্যে গোপীনাথ দেখিয়াছিলেন ; কিম্বা (২) মহানদী ও সাক্ষিগোপালের-স্থানের মধ্যে গোপীনাথ দেখিয়াছিলেন। বৈতরণী-নদীর দক্ষিণে ব্রাহ্মণী-নদী। ব্রাহ্মণীর দক্ষিণে মহানদী। বৈতরণী-নদী বঙ্গোপসাগরের প্রায় ৪০ মাইল পশ্চিমদিকে ব্রাহ্মণীর সহিত মিলিতা হইয়াছে। এই সংযুক্তা স্রোতস্বতী বঙ্গোপসাগরের প্রায় ১৬ মাইল পশ্চিমে মহানদীর সহিত মিলিতা হইয়াছে। গোবিন্দ যদি এ গোপীনাথকে রেমুণার ক্ষীরচোরা-গোপীনাথ মনে করিয়া থাকেন, তাঁহার এটী ভুল। রেমুণা বালেশ্বরের ৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে (Balasore Gazetteer)। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বালেশ্বর হইতে বৈতরণী-নদী প্রায় ৪০ মাইল এবং বৈতরণী হইতে মহানদী প্রায় ৩০ মাইল। মহানদী পারহইয়া কটকে আসিয়া তিনি সাক্ষিগোপাল দর্শনকরিলেন। বর্ত্তমান সাক্ষিগোপাল-রেলষ্টেশান কটকের ৪০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং পুরীর ১২ মাইল উত্তরে। সাক্ষিগোপাল দেখিয়া চৈতন্যদেব ভগবৎপ্রেমে বিভোর হইলেন এবং অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহার পরে নিংরাজের মন্দিরে অর্থাৎ লিঙ্গ-রাজের মন্দিরে অর্থাৎ ভুবনেশ্বরে শিবদর্শন করিয়া ভক্তির আবেগে তিনি ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। ভুবনেশ্বর বর্ত্তমান সাক্ষিগোপালস্থানের ২০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে, কটকের ১৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং পুরীর ৩৪ মাইল উত্তরে। গোবিন্দ বলিতেছেন মহানদী পারহইয়া চৈতন্যদেব গোপীনাথ দেখিয়া সাক্ষিগোপাল দর্শনকরিলেন। বৃন্দাবনদাস এবং কৃষ্ণদাসকবিরাজও বলিতেছেন চৈতন্যদেব কটকে সাক্ষিগোপাল দেখিলেন। কটক প্রতাপ-রুদ্রের রাজধানী ছিল। ইহা কাটজুড়ি ও মহানদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। কিন্তু এক্ষণে সাক্ষিগোপালস্থান কটকের ৪০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। সম্ভবতঃ চৈতন্যদেবের পরে সাক্ষিগোপালমূর্ত্তি কটকহইতে বর্ত্তমান সাক্ষিগোপাল-ষ্টেশানের নিকটে সত্যবাদীতে স্থাপিত হইয়াছিল। সাক্ষিগোপাল-

দেব যদি বর্ত্তমান স্থানে থাকিতেন, তাহা হইলে চৈতন্যদেব প্রথমে ভুবনেশ্বর দেখিয়া সাক্ষিগোপালস্থানে আসিতেন এবং তাহার পরে পুরীতে আগমন করিতেন। একজন ব্রাহ্মণ আর একজন ব্রাহ্মণকে তাঁহার কন্যার সহিত বিবাহ দিবেন বলিয়াছিলেন। যখন কন্যার পিতা বিবাহ দিতে অসম্মত হইলেন, তখন এই দেবতাকে বিবাহার্থী ব্রাহ্মণ সাক্ষী মানিয়াছিলেন। এই জন্য ইঁহার নাম সাক্ষিগোপাল হইয়াছিল। "**The image was at first at Vidyānagar (Vijayanagar). Then it was removed to and installed at Cuttack by Purushottamadeva (1471-97 A. D.). Subsequently it was removed to its present temple at Satyavādi near the Sākshigopal Station during Moghul rule" (Puri Gazetteer**)। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য-৫ম পরিচ্ছেদে লিখিত আছে যে গোপাল-মূর্ত্তি প্রথমে বৃন্দাবনে ছিলেন। তাহার পরে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত বিদ্যানগরে আসিয়াছিলেন। বিদ্যানগরের রাজা উঁহার মন্দির ঐ স্থানে নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন। পরে উৎকলরাজ পুরুষোত্তমদেব বিদ্যানগর জয়করিয়া সাক্ষিগোপালমূর্ত্তি কটকে লইয়া যাইয়া স্থাপিত করেন। পরে এই মূর্ত্তি সত্যবাদীতে (সাক্ষিগোপাল-ষ্টেশানের নিকটে) নীত হইয়াছিল। চৈতন্যদেব সাক্ষিগোপালমূর্ত্তি কটকেই দেখিয়াছিলেন। তাহার পরে আটারনালা [১] অর্থাৎ পুরীর সন্নিহিত আঠারনালাতে উপনীত হইয়া জগন্নাথ-মন্দিরের ধ্বজাদর্শনে তাঁহার ভক্তি উথলিয়া উঠিল। জগন্নাথদেবদর্শনে তাঁহার চক্ষু হইতে প্রেমধারা নির্গত হইতে

১। এই সাঁকোতে ১৮টী খিলান আছে। ইহা রক্তপ্রস্তরে বিনির্ম্মিত। পুরী-গমনাগমনের সুবিধার জন্য রাজা মৎস্যকেশরী সম্ভবতঃ ১০৪০ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মাণ-করিয়াছিলেন।

লাগিল এবং ভূমিতে পতনের জন্য তাঁহার দেহ রক্তাক্ত হইল। তাহার পরে তিনি কাশীমিশ্রের অতিথি হইলেন এবং তাঁহার গৌড়ীয় ভক্তগণের সহিত মিলিত হইলেন। একদিন জগন্নাথদেবকে দেখিয়া তাঁহার মূর্চ্ছা হইলে সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে কোলে করিয়া আপনার বাটীতে লইয়া গেলেন। সার্ব্বভৌমকে ভক্তি দানকরিয়া এবং তিন মাস পুরীতে অবস্থান করিয়া ৭ই বৈশাখ (১৫১০ খৃঃ) গোবিন্দকে সঙ্গে করিয়া এবং নিত্যানন্দের অনুরোধে কৃষ্ণদাসকেও সমভিব্যাহারে লইয়া দাক্ষিণাত্য-অভিমুখে তিনি যাত্রা করিলেন।

গোবিন্দদাসের করচামতে ঈশান, প্রতাপ, গঙ্গাদাস, গদাধর, বাণেশ্বর ও গোবিন্দসমভিব্যাহারে চৈতন্যদেব শান্তিপুর হইতে রওনা হইয়া ভাগিরথীর পশ্চিম দিক দিয়া জলেশ্বরে আগমন করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস এবং কৃষ্ণদাসকবিরাজ বলেন যে চৈতন্যদেব নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত ভাগিরথীর পূর্ব্ব উপকূল দিয়া জলেশ্বরে পৌঁছিয়া ছিলেন। বৃন্দাবনদাসের বিবরণহইতে কৃষ্ণদাসকবিরাজ তাঁহার বর্ণনা সঙ্কলিত করিয়াছিলেন। উভয়েই চৈতন্যদেবের তিরোধানের বহু দিন পরে তাঁহাদিগের গ্রন্থ প্রণয়নকরিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের পরে নীলাচল-আগমনের সহিত তাঁহারা সম্ভবতঃ তাঁহার নীলাচলহইতে নবদ্বীপ ও রামকেলি[১] আগমন এবং তথা হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন মিশ্রিত করিয়াছেন। এমনও হইতে

১। রাজসাহীজেলার ভিতরে অবস্থিত : মালদহের ১৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। এখানে রূপসাগর এবং সনাতনসাগর নামক দুইটী পুষ্করিণী আছে। প্রবাদ রূপ ও সনাতন এই দুইটী খননকরাইয়াছিলেন। তাঁহারা গৌড়ের নবাব হোসেন সাহের মন্ত্রী ছিলেন, পরে চৈতন্যদেবের অনুরক্ত ভক্ত হইয়া রাজকার্য্য ত্যাগকরিয়াছিলেন। রূপ ও সনাতনের ভক্তিধর্ম্মগ্রহণের জন্য এখানে জ্যৈষ্ঠমাসে একটী মেলা হয়—নন্দলাল দে।

পারে যে চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্যে তীর্থদর্শন, বিশ্বরূপঅন্বেষণ ও রাধাকৃষ্ণতত্ত্বপ্রচারের জন্য দাক্ষিণাত্যভ্রমণের সঙ্গী করিবার নিমিত্ত গোবিন্দকে পরীক্ষাকরা তাঁহার বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। কিন্তু এ কথা প্রকাশ করিলে ইহাতে নিত্যানন্দ প্রভৃতি সম্মতি দিবেন না ; ইহা মনেকরিয়া তিনি দ্রুতগতিতে ভাগিরথী পারহইয়া বর্দ্ধমানদিয়া নীলাচলের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাসও বলিয়াছেন "রহিলা অনেক পাছে নিত্যানন্দচন্দ্র"। চৈতন্যদেব যে দ্রুতবেগে চলিতে পারিতেন, তাহা কবিকর্ণপূর তাঁহার চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের ৫ম অঙ্কে বলিয়াছেন। যখন কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণকরিয়া বৃন্দাবনভ্রমে তিনি শান্তিপুরাভিমুখে গমন করিতেছিলেন, তখন নিত্যানন্দ তাঁহাকে অনুসরণকরিতে পারেন নাই। নিত্যানন্দ বলিলেন—অহো বলবতা বাতেন চালিতঃ কেশর-পরাগ-পুঞ্জ ইব চলত্যেষঃ। ময়াপি সত্বরেণানুগন্তুং ন শক্যতে (এ কি! প্রবলতর পবনের বেগে পরিচালিত পুন্নাগপুষ্পের পরাগপুঞ্জের ন্যায় ইনি অতি বেগে গমন করিতেছেন, আমি সত্বরগামী হইয়াও ইঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে পারিতেছি না—রাঃ বিঃ কৃত অনুবাদ)। বঙ্গদেশের মানচিত্র দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে শান্তিপুর হইতে পশ্চিমে বর্দ্ধমান আসিয়া এবং তাহার পরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে জলেশ্বরে যাওয়াতে এবং শান্তিপুর হইতে দক্ষিণদিকে জয়নগরের নিকট ছত্রভোগে আগমন করিয়া পুনরায় দক্ষিণপশ্চিমদিকে জলেশ্বরে গমন করাতে দূরত্বের অত্যল্প তারতম্য হয়।

গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন যে চৈতন্যদেব নীলাচল পরিত্যাগকরিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে আলালনাথে [১] নারায়ণমূর্ত্তি দর্শনকরিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে

১। "পুরীর প্রায় ১৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে। স্নান-যাত্রার পরে ১৫ দিন (স্নান-

করিতে ভাবাবেশে অজ্ঞান হইলেন। তাহার পরে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া সার্ব্বভৌমের অনুরোধে গোদাবরীতীর্থে (রাজমহেন্দ্রী, যে স্থানে উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রের শাসনকর্ত্তা রামানন্দরায় ছিলেন) রাধাকৃষ্ণরস তত্ত্বজ্ঞ রামানন্দরায়ের সহিত ভাব বিনিময়করিলেন। তাহার পরে—

প্রভু কহে, 'রামানন্দ! এবে আমি যাই।
নীলাচলে গিয়া তুহু থেকো মোর ঠাঁই॥
তুমি, আমি আর ভট্ট [১] থাকি নিরজনে।
আলোচিয়া কৃষ্ণতত্ত্ব জুড়াব জীবনে'॥
এত বলি প্রভু রায়ে দিলেন বিদায়।
প্রণমিয়া রামানন্দ গৃহে চলি যায়॥
প্রভুর সঙ্গেতে রায় যতেক কহিল।
তাহার শতাংশ এহি গ্রন্থে না রহিল॥

১৪৫৪ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার গজপতিবংশের অধিকারে রাজমহেন্দ্রী আসিয়াছিল। ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদিগের একজন মন্ত্রী ঐ স্থানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১৪৭০ খৃষ্টাব্দে কুলবর্গের মুসলমান-রাজার অধিকারে ইহা গিয়াছিল। সম্ভবতঃ ১৫০০ খৃষ্টাব্দে ইহা পুনরায়

যাত্রা হইতে রথযাত্রাপর্য্যন্ত) জগন্নাথদেবের দর্শন বন্ধ থাকে। এই সময় চৈতন্যদেব আলালনাথে (এখানে বিষ্ণুমূর্ত্তি আছেন) অতিবাহিত করিতেন"

—ঊষাপ্রকাশ সরকার (এম্-এ, পুরী)

তিনখানি রথ আছে—জগন্নাথদেবের, বলরামের ও সুভদ্রার। জগন্নাথদেবের বর্ত্তমান রথ ৪৫ ফিট উচ্চ, ৩৫ ফিট দীর্ঘ ও প্রস্থ, ১৬টী চক্র বিশিষ্ট, প্রত্যেক চক্রের ব্যাস (diameter) ৭ ফিট। আর দুইখানি রথ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র।

১। সার্ব্বভৌম।

উড়িষ্যার হিন্দুরাজার অধিকারে আসিয়াছিল। রামানন্দরায়কে বোধহয় সেই সময়ে প্রতাপরুদ্র ইহার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরের পরাক্রান্ত রাজা কৃষ্ণদেবরায় প্রতাপরুদ্রকে কোণ্ডাপল্লীর (মসলিপত্তনের নিকট) নিকটে পরাভূত করেন। কিন্তু রাজমহেন্দ্রী তখনও প্রতাপরুদ্রের অধিকারে ছিল। ১৫৪১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রতাপরুদ্রের বংশধরের অধিকারে ইহা ছিল। তাহার পরে গোবিন্দদেবের এবং পরে হরিচন্দনের অধিকারে ইহা গিয়াছিল। ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে গোলকণ্ডার মুসলমান রাজা ইহাকে অধিকারকরিয়াছিল (**Godāvari Gazetteer** p.p. 27-28)।

একসময়ে রাজমহেন্দ্রী এবং ইহার সন্নিহিত প্রদেশ বৌদ্ধধর্ম্মের একটী কেন্দ্র ছিল। **"Hiuen Tsiang visited this kingdom also. He described it as being 1000 miles in circuit and its capital as some seven miles round.···The once-numerous Buddhist conventes were in ruins and deserted" at the time of his visit (Godāvari Gazetteer p. 20)**। সেই নিমিত্ত রাজমহেন্দ্রীর সন্নিকটে ত্রিমন্দ-নগরে যে অনেক বৌদ্ধ বাস করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোন কারণ নাই। এই ত্রিমন্দ সম্ভবতঃ রাজমহেন্দ্রীর প্রায় ১৮ মাইল দক্ষিণে বর্ত্তমান 'মন্দপল্লী'। রাজমহেন্দ্রী অর্থাৎ গোদাবরীতীর্থ হিন্দুদিগের একটী প্রধান তীর্থ। রাজমহেন্দ্রীর উত্তরে অখণ্ড গৌতমী-গোদাবরী। রাজমহেন্দ্রীর কতিপয় মাইল দক্ষিণে গোদাবরী দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে, এক ভাগের নাম বশিষ্ঠ-গোদাবরী এবং দ্বিতীয়াংশের নাম গৌতমী-গোদাবরী। কিয়দ্দূর আসিয়া উভয় নদীই বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে।

রামানন্দকে বিদায়দিয়া চৈতন্যদেব ত্রিমন্দে আসিয়া বৌদ্ধগণকে

কৃষ্ণভক্ত করিলেন। তাহার পরে ন্যায়-সাংখ্য-বেদান্ত-অভিজ্ঞ বিদ্যাভিমানী তুঙ্গভদ্রাবাসী ঢুণ্ডিরাম-তীর্থের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাকে চৈতন্যদেব বলিলেন—

মূরখ সন্ন্যাসী মুহি কিছু নাহি জানি।
বার বার তোমার নিকটে হারি মানি॥

ঢুণ্ডি প্রভুর চরণে লোটাইয়া পড়িলেন। তিনি চৈতন্যদেবের ভক্ত হইলেন, নাম হইল হরিদাস। তাহার পরে সিদ্ধবটেশ্বরে (সিদ্ধবট্টম, কুদ্দাপার দক্ষিণপূর্ব্বে) অক্ষয়-বট দর্শন করিয়া বটেশ্বর-শিবকে ভক্তি-সহকারে প্রণামকরিলেন এবং ধনী তীর্থরাম এবং তাহার আনীত সত্যবাই ও লক্ষ্মীবাইনাম্নী বেশ্যাদ্বয়কে অদ্ভুত ভাবাবেশদ্বারা উদ্ধারকরিলেন। "Siddhavattam or Siddhout is the headquarters of the tāluk in Cuddapah District. In the fort there were three temples Siddheśvarasvāmi, Siddhavateśvarasvāmi and Ranganāthasvāmi. After Mahammadan occupation in about 1750, these temples were dismantled and the idols removed and installed in fresh temples"—Cuddapah Gazetteer। সিদ্ধবটেশ্বরে সাতদিন অতিবাহিত করিয়া নন্দীশ্বরে (সিদ্ধবট্টম অথবা সিদ্ধৌটের প্রায় ৮ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে সম্ভবতঃ নন্দলূরে) পৌছিলেন। এখানে সৌম্যনাথস্বামীর প্রাচীন মন্দির আছে। The temple of Saumyanāthasvāmi at Nandalur is of immense antiquity and was formerly held in great repute. It contains on its walls and elsewhere no less than fiftyfour inscriptions dating from the 11th century to Vijayanagar times, from which much information of

historical value has been gleaned"—Cuddapah Gazetteer.

ইহার পরে দশক্রোশব্যাপী জঙ্গল অতিক্রমকরিয়া চৈতন্যদেব মুন্নানগরে আগমন করিলেন এবং তাঁহার অপূর্ব্ব ভাবাবেশদ্বারা মুন্না-বাসীদিগকে মুগ্ধ করিলেন। তাহাদিগের নিকট হইতে অন্ন ও বস্ত্র ভিক্ষাপূর্ব্বক এক দরিদ্রা বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে তিনি দানকরিলেন। মুন্নানগর প্রাতে পরিত্যাগকরিয়া দিবা দ্বিপ্রহরে বেঙ্কটনগরে আসিলেন। 'বেঙ্কটনগর' সম্ভবতঃ 'বেঙ্কটগিরি ও নগর'। বেঙ্কটগিরি নন্দলুরের প্রায় ১৬ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে। মুন্নানগর যদি নন্দীশ্বরের দশক্রোশ দূরে হয়, তাহা হইলে মুন্নানগর বেঙ্কটগিরি হইতে ৬ ক্রোশ দূরে ছিল। ছয়ক্রোশ-পথ বেলা ১২ টার ভিতরে সহজেই অতিক্রমকরা যায়। বেঙ্কটগিরির প্রায় ১২ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে ত্রিপদী-ত্রিমল্ল। বেঙ্কট-গিরির পরে বগুলা-অরণ্য ছিল। তাহার পরে গিরীশ্বর ছিল; তাহার পর তৃপদী ও ত্রিমল্ল। বেঙ্কটনগরে চৈতন্যদেবের সহিত অদ্বৈতবাদী রামানন্দস্বামীর সাক্ষাৎ হইল। চৈতন্যদেব পরাজয় স্বীকারকরিলেও রামানন্দ ছাড়িলেন না; তর্ক-বিতর্ক হইল; রামানন্দ হরিনামে দীক্ষিত হইলেন। বেঙ্কটনগরে তিন দিন থাকিয়া ইহার সন্নিকটে বগুলা-অরণ্যে পন্থভীল-দস্যুকে হরিনাম দানকরিয়া তিনি উদ্ধারকরিলেন। ইহার পরে অদ্ভুতভাবাভিভূত হইয়া তিনদিন অনাহারে কাটাইলেন। তাহার পরে গিরীশ্বরে আসিয়া গিরীশ্বর-শিবকে বিল্বপত্র দিয়া ভক্তিসহকারে পূজাকরিলেন। সেখানে একজন মৌনী সন্ন্যাসীকে অপূর্ব্ব ভাবাবেশ-দ্বারা ভক্তিধর্ম্ম গ্রহণকরাইলেন। গিরীশ্বরে তিনদিন অতিবাহিত করিয়া তৃপদীতে (তিরুপতী, বেঙ্কটগিরির দক্ষিণপশ্চিমে) পৌছিয়া রামস্বামী-বিগ্রহকে ভক্তিসহকারে প্রণামকরিলেন এবং তার্কিক

মথুরাঠাকুরকে অদ্ভুত ভাবাবেশদ্বারা জয়করিলেন। তাহার পরে প্রায় দুই শত মাইল উত্তর-পূর্ব্বে যাইয়া পানা-নরসিংহে [১] আসিয়া নরসিংহ-দেবকে চৈতন্যদেব স্তবকরিলেন। নৃসিংহদেবের অধিকারী তাঁহাকে চিনিরপানা প্রসাদ এবং তুলসীর মালা দিলেন। তিনি স্তব করিয়া কণামাত্র প্রসাদ গ্রহণকরিলেন। তাহার পরে দুই শত আশী মাইল দক্ষিণে বিষ্ণুকাঞ্চীতে [২] (Conjeeveram) আগমন করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণকে ভবভূতিশেঠীর বাটীতে দর্শনকরিলেন। এ স্থান হইতে ছয় ক্রোশ দূরে ত্রিকালেশ্বর-শিব দর্শনকরিলেন। এই স্থান হইতে তিনি পক্ষগিরির নিম্নে পক্ষিতীর্থ বা পক্ষতীর্থে গিয়া ভঁদ্রানদীতে স্নান করিলেন। পক্ষিতীর্থ চিঙ্গলীপুটের দক্ষিণপূর্ব্বে এবং মহাবল্লী-

১। এখানে গোবিন্দ সম্ভবতঃ ভুল করিয়াছেন। গোদাবরীতীর্থের অর্থাৎ রাজ-মহেন্দ্রীর পরে পানা-নরসিংহে চৈতন্যদেব সম্ভবতঃ গমন করিয়াছিলেন। পানা-নরসিংহ অর্থাৎ মঙ্গলগিরি বেজওয়াদা হইতে ৭ মাইল দক্ষিণে। কিন্তু কৃষ্ণদেবকবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতেও ত্রিপদী হইতে পানা-নরসিংহ এবং পানা-নরসিংহ হইতে কাঞ্চীতে (Conjeeveram) আসিবার কথা লিখিত আছে। তাহা হইলে কি চৈতন্যদেব প্রথমে পানা-নরসিংহতীর্থের কথা শুনেন নাই? ত্রিপদীতে আসিয়া কি ইহা শুনিয়া-ছিলেন। রাজমহেন্দ্রীর প্রায় ৮০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বেজওয়াদা। বেজওয়াদার অন্ততঃ দুই শত মাইল দক্ষিণে তিরুপতি অথবা ত্রিপদী।

২। বিষ্ণুকাঞ্চীর পশ্চিমে শিবকাঞ্চী; এখানে একাম্রনাথ শিব ও শঙ্করাচার্য্যের সমাধি আছে; ইহা গোবিন্দ বর্ণনাকরেন নাই। বোধ হয় তিনি বিস্মৃত হইয়া-ছিলেন, কারণ চৈতন্যদেবের ধর্ম্মবিষয়ে সঙ্কীর্ণতা ছিল না। ত্রিকালেশ্বর শিব ও গৌরী শিবকাঞ্চীর একাম্রনাথ ও কামাখ্যা দেবী নয় ত? কিন্তু তাহা হইলে ছয় ক্রোশের স্থানে দেড় ক্রোশ হইবে। চিঙ্গলিপুতের শিবমূর্ত্তির কথা সম্ভবতঃ গোবিন্দ বলিতেছেন, কারণ গোবিন্দ বলিতেছেন 'সেই স্থান হতে পক্ষগিরি দেখা যায়'।

পুরমের সন্নিকটে। পক্ষিতীর্থকে তিরুক্কলিকুণ্ড্রম্‌ও বলে। নিম্নলিখিত বিবরণ জলধরসেনমহাশয়ের 'দক্ষিণাপথ' হইতে সংগৃহীত হইল—"মন্দিরের দেবীর নাম ত্রিপুরা-সুন্দরী। সেখানে পূজা দিয়ে প্রসাদ নিয়ে আমরা তাড়াতাড়ি মন্দিরের পাশেই যে স্থান একেবারে গাছপালা শূন্য, সেখানে গেলাম। পাহাড়ের একটু নীচেই কয়েকটী গাছ আছে, আর একটা চালা বাঁধা আছে।...শুন্‌লাম এগারটার পর একজন পুরোহিত উপরের মন্দিরের পূজা শেষ করে পক্ষীর জন্য খাদ্য নিয়ে আস্‌বেন। তার পর মন্ত্র পাঠকরে আহ্বান করলে পক্ষী দুইটী আস্‌বে।...পুরোহিত দাঁড়িয়ে উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ, চারিদিকে মুখ করে যোড়হস্তে পক্ষীকে আহ্বান করে পিঁড়ির উপর উপবেশন কর্‌লেন এবং জপ করতে আরম্ভ করলেন।...কিছুক্ষণ পরে দেখ্‌লাম, দূর সমুদ্রের দিক থেকে কি যেন একটা আস্‌ছে, তখনও সেটা যে পাখী, তা বুঝতে পারা গেল না। সেদিকে পাহাড় বা অরণ্য কিছুই নাই—শুধু মাঠ। একটু পরেই দেখ্‌লাম, সেই দূর-দৃষ্ট বস্তুটী একটী পাখী। পাখীটি উড়ে এসে পুরোহিতের অনতিদূরে বস্‌ল।...তখন দূর পশ্চিমদিক থেকে আর একটী পাখী আস্‌ছে দেখা গেল। সেটীও এসে পূর্ব্বটীর পার্শ্বে বস্‌ল। পুরোহিত তখন দুইটী বাটীতে খাদ্য পরিবেশন করে দিলেন। পাখী দুইটী ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে আহার কর্‌তে লাগ্‌ল। তারা একেবারে পুরোহিতের সম্মুখে এল। পুরোহিতও মধ্যে মধ্যে হাতে করে তাদের মুখে খাদ্য তুলে দিতে লাগ্‌লেন। পাখী দুইটী শ্বেতকায় শকুনি; বাচ্ছা নয়, বয়স বেশী হয়েছে। সাধারণ শকুনি হইতে আকারও বড়।...পাঁচ ছয় মিনিটের মধ্যেই আহার শেষ হয়ে গেল। পক্ষী দুইটী দূর সমুদ্রের দিকে চলে গেল। পুরোহিত বল্‌লেন যে ইঁহারা দুইজন দেবতা, অগস্ত্যমুনির

সন্তান ; একজন রামেশ্বরে থাকেন, আর একজন গঙ্গোত্রীতে থাকেন"।

পক্ষতীর্থের নিকট ভদ্রানদী (বুত্বর) হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে কালতীর্থে বরাহদেবের মূর্ত্তি দেখিয়া চৈতন্যদেব মুগ্ধ হইলেন এবং প্রেমাবেগে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে বৃদ্ধকোলে চৈতন্যদেবের বরাহমূর্ত্তিদর্শনের কথা আছে। সম্ভবতঃ ইহা সমুদ্রতীরবর্ত্তি-মহাবল্লীপুরম্। ইহাকে **Seven Pagodas** অথবা সপ্তরথ বা সপ্ত মন্দির বলে। অনেক মূর্ত্তিই পর্ব্বতগাত্রে ক্ষোদিত। মহাবল্লীপুরম্ মাদ্রাজ হইতে ৩৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ধরণীকান্তলাহিড়ীচৌধুরী মহাশয়ের ভারতভ্রমণে লিখিত আছে—"প্রত্যেক মন্দিরগাত্রেই নানাবিধ ফুল, ফল ও পৌরাণিক দৃশ্যসমুহ ভাস্করবিদ্যার অপূর্ব্ব নৈপুণ্যেব সহিত অঙ্কিত। কোন মন্দিরে অর্জ্জুন কঠোর তপস্যায় নিরত, কোনটীতে বামনভিক্ষা, কোনটীতে শেষনাগারোহণে বিষ্ণু উপবিষ্ট, কোনটীতে বা শিব ও পার্ব্বতীর বিগ্রহ, কোনটীতে বিষ্ণুর বরাহমূর্ত্তি ইত্যাদি বহুবিধ মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বরাহস্বামীর মন্দির, দুর্গার মন্দির ও বলিপীঠ প্রভৃতি দর্শনে বিস্ময়ে পুলকিত হইতে হয়"।

কালতীর্থ হইতে পঞ্চক্রোশ দূরে ভদ্রা ও নন্দার (বুত্বর এবং পালার ও চেয়ূরের মিলিত স্রোত) সঙ্গমস্থলে অর্থাৎ সন্ধিতীর্থে চৈতন্যদেব স্নান করিয়া অদ্বৈতবাদী সদানন্দপুরীকে ভক্তিরসে নিমগ্ন করিলেন। সেখান হইতে চাঁইপল্লীতীর্থে (ত্রিচিনোপল্লীর বহুদূরে এবং উত্তরপূর্ব্বে, চিদম্বরমের দক্ষিণে এবং মায়াবরমের উত্তরপূর্ব্বে—শিয়ালীর নিকটে) শতবর্ষবয়স্কা সিদ্ধেশ্বরী-নাম্নী সন্ন্যাসিনীকে দর্শনকরিয়া নদীতীরে **(the Manniyār—Tanjore Gazetteer, map p. 104)** শৃগালী-

ভৈরবীমূর্ত্তি দর্শনপূর্ব্বক দক্ষিণে কাবেরীনদীতে (সম্ভবতঃ শিয়ালীর দক্ষিণে মায়াবরমে—Ablutions in the Cavery at this place are considered to confer special benefit (S. I. Ry. Guide), কিম্বা মায়াবরমের পূর্ব্বদিকে সমুদ্র-উপকূলে কাবেরীপত্তনে স্নান করিলেন। "Kāveripatnam is a little hamlet at the mouth of the Kāveri. It is the same as the Kamara of the Periplus and the Khaberis of Ptolemy, and was once one of the chief cities of the Chola Kingdom...It is still, however, a famous bathing-place, since the sacred Kāveri reaches the sea here—Tanjore Gazetteer p.p. 256-7."

দীনেশসেন মহাশয় চাঁইপল্লীকে ত্রিচিনোপোলি বলিয়াছেন; বোধহয় নামের একটু সাদৃশ্য দেখিয়াই এরূপ অনুমান করিয়াছেন। যদি চাঁইপল্লী ত্রিচিনোপলি হয়, তাহা হইলে চৈতন্যদেব ত্রিচিনোপলির তিন মাইল উত্তরে শ্রীরঙ্গম্ দেখিলেন না কেন? গোবিন্দ-লিখিত চাঁইপল্লী শিয়ালীনগরের নিকটেই ছিল। ত্রিচিনোপোলি তামিলভাষায় তিরুচিন্নপল্লী অর্থাৎ পবিত্র ক্ষুদ্র নগর (Tiru-chinna-palli—holy little town—Trichinopoly Gazetteer, p. 2)। ত্রিচিনোপোলি জেলায় 'চিন্ন' (ক্ষুদ্র)-শব্দ-সংযুক্ত অন্যান্য নগর আছে, যথা চিন্নমুথলপত্তি (Ibid p. 298), চিন্নধারাপুরম (Ibid p. 270) ইত্যাদি। সেইরূপ শিয়ালী-নগরের নিকট সম্ভবতঃ একটী পল্লীর নাম চিন্নপল্লী অর্থাৎ ক্ষুদ্রপল্লী ছিল, গোবিন্দ ইহাকে চাঁইপল্লী করিয়াছেন। Postal Guide দেখিলে 'চিন্ন' সংযুক্ত আর দশ, এগারটী নগর দেখিতে পাওয়া যাইবে। পুদুক্কোট্টই রাজ্যের রাজধানীর উত্তরপূর্ব্বে 'চিন্নছত্রম'নামক নগর আছে।

নাগরাজ শর্ম্মা মহাশয় (Dr. Nāgarāja Śarmā of Kumbakonam) লিখিয়াছেন—"Shiyāli stands thirtytwo miles from Kumbakonam. The legend is that a demon took shape as a shefox or jackal (Śrigāli) and Bhairavi Devi killed him; the legend lacks textual testimony or independent corroboration." অর্থাৎ একটী দৈত্য শৃগালীর আকার ধারণকরিলে ভৈরবী দেবী তাহাকে বধকরিয়াছিলেন। তাঞ্জোর গেজেটীয়ারে লিখিত আছে যে তিরুজ্ঞান-সম্বরদারনামা শৈব উপাসক খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে শিয়ালীতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি শৈশবে শিয়ালীর দেবীর দুগ্ধ পানকরিয়াছিলেন।

তাহার পরে চৈতন্যদেব দক্ষিণদিকে গমন করিয়া নাগর-নগরে [১] (নিগাপটমের উত্তরে) শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের মূর্ত্তিকে প্রণাম-করিলেন এবং একজন দুরাত্মা ব্রাহ্মণকে হরিনামে মত্ত করিলেন। তাহার পরে প্রায় ৪০ মাইল পশ্চিমে তাঞ্জোরে [২] আসিয়া ধলেশ্বর-

১। নাগরের পোষ্টমাষ্টার লিখিয়াছেন 'There is no temple dedicated to Rāma and Lakshmana at present at Nagore'। চৈতন্যদেবের সময়ে সম্ভবতঃ এখানে রাম-লক্ষ্মণ মূর্ত্তি ছিল; তাহার পরে বিধর্ম্মী আক্রমণকারীরা ইহা নষ্ট করিয়াছিল। নাগর এবং ইহার দক্ষিণে Negapatam (Ptolemy's Nigamos) অথবা নাগপত্তনম্ এক নগরই বলিতে হইবে। South Indian Railway Guideএ লিখিত আছে নাগোরে এক্ষণে একটী প্রাচীন হিন্দুমন্দির (যাহার জন্য নাগোরকে পুন্নগবনম্ বলে) এবং নাগপত্তনমে একটী বিষ্ণুমন্দির আছে। নাগরাজশর্ম্মামহাশয় বলিয়াছেন যে নাগপত্তনমে (Negapatam) রামচন্দ্রের মন্দির আছে। "Not exactly in Nagore but in Negapatam in the vicinity of the former, there is a temple dedicated to Rāma and there is another dedicated to Sundararāja."

২। তাঞ্জোর হইতে নাগর পূর্ব্বদিকে ৪০ মাইলের কম হইবে না। গোবিন্দ ৭ ক্রোশ

নামা এক ব্রাহ্মণের বাটীতে রাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তি এবং পরে গোসমাজ-শিব অনুরাগসহ দর্শন করিলেন। তাঞ্জননামা অসুরকে বিষ্ণু নিধনকরিয়াছিলেন বলিয়া 'তাঞ্জোর' নাম হইয়াছে। এখানে বৃহদীশ্বর-স্বামী শিব এবং একখানি প্রস্তরে নির্ম্মিত প্রকাণ্ড নন্দী (বৃষভ) এবং সুব্রহ্মণ্য মূর্ত্তি আছে। 'তাঞ্জোরের চার ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে তিরুবাদী-নগর আছে। ইহাকে বারাণসী অপেক্ষা ১৬গুণ অধিক পবিত্র বলে। তিরুবাদীর শিবের নন্দীর (বৃষভের) নিকটস্থ তিরুমলবাদী-নগরেতে বিবাহ হইয়াছিল। এই বিবাহের স্মরণার্থে ত্রয়োদশদিনব্যাপী উৎসব প্রতিবৎসর চৈত্রমাসে অনুষ্ঠিত হয় এবং একটী 'মিছিল' (procession) সাতটী শিবমন্দির প্রদক্ষিণ করে। সাতটী শিবমূর্ত্তি সন্নিহিত গ্রামগুলিতে (সপ্তস্থলম্) আছে' (Tanjore Gazetteer)। আমাদিগের মনে হয় যে চৈতন্যদেব গোসমাজ-শিব তিরুবাদীতে দেখিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ অনুক্রম আছে—শিয়ালা-ভৈরবী, তাহার পরে কাবেরী-তীর, তাহার পরে গোসমাজ-শিব।

তিরুবাদীর প্রায় ৮ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে কোম্বকণম্ অথবা কুম্ভকর্ণ-কর্পর-সরোবর (কুম্বকোণমের মহামথম সরোবর—Mahāmakham tank at Kumbakonam) দেখিয়া চৈতন্যদেব বিস্মিত হইলেন

কুম্ভকর্ণ-কর্পরেতে সরোবর হয়।
সরসী দেখিয়া প্রভু মানিলা বিস্ময়॥

কুম্ভকোণমের ডাক্তার নাগরাজ শর্ম্মা লিখিয়াছেন—"Kumbhaghonam has absolutely nothing to do with Kumbhakarna.

কি করিয়া বলিলেন বুঝিতে পারি না। অথবা জয়গোপালগোস্বামীমহাশয় কোটছই ২৭ কিম্বা ২৭ ক্রোশের স্থানে ৭ বসাইয়াছেন কিনা বলিতে পারি না।

Kumbha means a pot; 'Ghona' (literally, nose) here indicates 'neck'. Kumbhaghona is thus the sacred spot where the nectar-pot floating in cosmic floods stood still after the subsiding of the inundation, and where it was pierced by Lord Śiva by means of an arrow". এখানে শার্ঙ্গপাণি-বিষ্ণু, কুম্ভেশ্বর-শিব, রামস্বামী-বিষ্ণু ও চক্রপাণি-বিষ্ণুর মন্দির আছে এবং এই সরোবরে ১২ বৎসর অন্তর মাঘমাসে স্নান প্রশস্ত। এই সরোবরকে মহামক্কম্ (মহামাঘম কিম্বা মহামোক্ষম) সরোবরও বলে। চৈতন্য-দেবের বিস্ময়ের কারণ বোধ হয় এই যে কুম্ভকর্ণের মাথার খুলিতে এত বড় সরোবর কি করিয়া হইল এবং সেই মাথার খুলি এতদূরে কি করিয়া আসিল। এই স্থানটীর নাম কুম্ভঘোনম্, তাহা হইতে হইল কুম্ভকোণম্, তাহা থেকে হইল কুম্ভকর্ণ। চৈতন্যচরিতামৃতেও (মধ্য-৯ম-৪২) আছে—'কুম্ভকর্ণ-কপালের দেখি সরোবর'। দাক্ষিণাত্যের লোকেরা এক্ষণে রাবণভ্রাতা কুম্ভকর্ণের সহিত যে এই সরোবরের কোন সংস্রব আছে, ইহা স্বীকার করেন না। গোবিন্দ বলিয়াছেন যে কুম্ভকোণ-মের নিকটে চণ্ডালুপর্ব্বতের গোফাতে অনেক সন্ন্যাসী বাস করিতেন। কুম্ভকোণমের নিকটে কোন পর্ব্বত নাই। ইহার প্রায় ১৬ মাইল উত্তরে জয়মকোণ্ডচোলপুরম্ (২৭২ ফিট উচ্চ) এবং পচয়মলয় পর্ব্বতশ্রেণী প্রায় ৪০ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। কুম্ভকোণমের দুই তিন মাইল পশ্চিমে স্বামিমলয় বলিয়া একটী গ্রাম আছে। 'মলয়' শব্দের অর্থ 'পর্ব্বত'। স্বামিমলয় বোধহয় উচ্চভূমি; সেইজন্য ইহা মলয়নামে অভি-হিত হইয়া থাকিবে। কুম্ভকোণমের নাগরাজশর্ম্মামহাশয় লিখিয়াছেন, "There is no hill in or near Kumbakonam. Three or four miles from Kumbakonam there is Svāmimalai dedicated

to Dandāyudhapāni (Subrahmanya) and the temple or shrine is situated at an elevation reached by means of sixty steps". সেইস্থানে ভট্টনামা এক ব্রাহ্মণকে এবং স্থরেশ্বর নামা এক সন্ন্যাসীকে চৈতন্যদেব হরিনামে মত্ত করাইলেন (গোঃ কঃ পৃঃ ৩৫)। চণ্ডালুপর্ব্বতের সন্নিহিত বন অতিক্রমকরিয়া পদ্মকোটে পৌছিয়া অষ্টভূজা ভগবতীকে প্রণামপূর্ব্বক 'বহুস্তুতি' করিলেন এবং সে স্থানে হরিনাম বিতরণকরিলেন এবং একজন অন্ধকে আলিঙ্গনকরিলেন। অন্ধ তাঁহাকে 'ঈশ্বর' বলিলে তিনি বলিলেন যে তাঁহাকে কেন তিনি অপরাধী করিতেছেন। তাহার পরে তিনি ত্রিপাত্রে গিয়া চণ্ডেশ্বর-শিবকে 'ববম্' শব্দ উচ্চারণ-পূর্ব্বক স্তবকরিলেন এবং সেস্থানে সাতদিন থাকিয়া ভর্গদেব ইত্যাদিকে হরিনামে মত্ত করাইলেন। ভর্গদেব তাঁহাকে 'ঈশ্বর' বলিলে তিনি ইহা অস্বীকারকরিলেন। তাহার পরে এক পক্ষ সময়ে পঞ্চাশ যোজন বন অতিক্রমকরিয়া ত্রিচিনোপল্লীর তিন মাইল উত্তরে শ্রীরঙ্গমে পৌছিলেন।

রাঃ বাঃ দীনেশ সেন লিখিয়াছেন, 'তাঞ্জোর হইতে ৬০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে পদ্মকোট এবং পদ্মকোট হইতে ৬০ মাইল দক্ষিণে ত্রিপাত্র এবং ত্রিপাত্র হইতে ৩০০ মাইল বন অতিক্রমকরিয়া শ্রীরঙ্গম (ত্রিপাত্রের দক্ষিণ-পশ্চিমে) পাওয়া যায়। সার্ভে-অফিসের মাদ্রাজের মানচিত্রে শ্রীরঙ্গম কিম্বা ত্রিচিনোপল্লী হইতে তাঞ্জোর ৩২।৩৩ মাইল পূর্ব্বে। আমরা সেন মহাশয়ের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত অঙ্কশাস্ত্রনিয়মানুসারে অসম্ভব (absurd) বলিয়া মনে করি। আমাদিগের মনে হয় চৈতন্যদেব তিরুবাদী (গোসমাজ শিবস্থান) হইতে প্রায় ১৬ মাইল উত্তরপূর্ব্বে কুম্ভঘোণমে পৌছিয়া এস্থান হইতে প্রায় ৫৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে পদ্মকোটে (পুতুক্কোট্টই) আসিয়া পদ্মকোটের প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে ত্রিপাত্রে (রামনাদ

জেলার অন্তর্গত তিরুপাত্তুর) পৌঁছিয়াছিলেন। ত্রিপাত্র হইতে শ্রীরঙ্গম্ প্রায় ৫২ মাইল উত্তরে। ইহা বন্য ও পার্ব্বতীয় পথে কত মাইল হইয়াছিল ঠিক বলা যায় না। গোবিন্দ ৫০ যোজন বলিতেছেন। ১৫ দিন চলিতে লাগিয়াছিল বলিয়া ৫০ যোজনের পরে, অর্থাৎ অনেক দূরে শ্রীরঙ্গম্ অবস্থিত তিনি মনে করিয়াছিলেন। পুদুক্কোট্টই নগরের উপকণ্ঠে এবং পশ্চিমে তিরুগোকর্ণম্ গ্রামে গোকর্ণেশ্বরশিবের একটী প্রাচীন মন্দির আছে। এস্থানে ভগবতী-দেবীর নাম বৃহদম্বা। পুদু-ক্কোট্টইয়ের রাজারা বৃহদম্বা-দাস বলিয়া খ্যাত। এই রাজ্যের মুদ্রার নাম অম্মনকাসু (Ammankāsu—Trichinopoly Gazetteer, p. 373) অর্থাৎ অম্বা-মুদ্রা। একটী ত্রিপাত্র (Tirupattur) ত্রিচিনোপল্লীর ১৬ মাইল উত্তরে আছে। এখানে শিব ও ভগবতীর মূর্ত্তি আছে (Trichinopoly Gazetteer, p. 290)। কিন্তু গোবিন্দ যদি ভুল না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এ ত্রিপাত্র হইতে পারে না; কারণ তিনি বলিতেছেন যে ত্রিপাত্র ও রঙ্গধামের মধ্যে ৫০ যোজন বন ছিল এবং অতিক্রমকরিতে ১৫ দিন লাগিয়াছিল। এ ত্রিপাত্রের প্রায় ১৩ মাইল দক্ষিণে শ্রীরঙ্গম্। মাদুরার ১২ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে তিরুবাদুর-নগরে একটী প্রাচীন শিবমন্দির আছে। কিন্তু চৈতন্যদেব এখানে আসিলে মাদুরা অথবা দক্ষিণমথুরা অবশ্য দেখিতেন। কৃষ্ণদাসকবিরাজ 'দক্ষিণ মথুরার কথা' বলিয়াছেন। তিরুবাদুর হইতে শ্রীরঙ্গম ৮০ মাইল উত্তরে অবস্থিত।

শ্রীযুক্ত রঙ্গনাথ এবং নারায়ণ (রামনাদ ও মাদুরার বিদ্যালয়-পরিদর্শক) লিখিয়াছেন—'There is no Śiva temple at Tiruppāttur (southwest of Pudukkota of Pudukkota State) dedicated to Chandeśvara Śiva, but there

is a very old temple at Tiruppāttur dedicated to Śiva with the name of Śridhaliśvara......There is only one place in Pudukkota State which goes by the name of Virachira and there is an eight-handed goddess called Mahishamardini......... In one of the temples of the Anjukoil Devasthānam in Tiruppāttur Tāluk, at the village of Thenakshi-amman-koil, a hamlet of Siravayal, there is an image of an eighthanded goddess called Thenakshi-amman............In the same hamlet at Siravayalpudur there is an image of an eighthanded goddess called Perianachi-amman. In the same hamlet at Nachiyapuram there is an image of an eight-handed goddess named Kattunachi-amman...A similar image of Ilaiyanachi-amman is at Kambanar......A similar image of Ponnachi-amman is at Attikaram. A similar image of Sellayiamman is at Tirukoshtiyar. A similar image of Virāmakāli is at Kunnakudi.

শ্রীরঙ্গমে নৃসিংহদেব এবং প্রহ্লাদের মূর্ত্তিদর্শনের পরে চৈতন্য-দেবের ভাবাবেশ হইল এবং যুধিষ্ঠির-নামা ভগবদ্গীতার একভক্ত-পাঠকের সহিত তিনি মিলিত হইলেন। শ্রীরঙ্গনাথ বিষ্ণুমূর্ত্তি। এখানে জম্বুকেশ্বরনামা বিখ্যাত শিবমূর্ত্তি আছে। জলধরসেন মহাশয় বলেন যে "শ্রীরঙ্গমে শিবমন্দির নেই, তা নয়; কিন্তু শ্রীরঙ্গনাথই শ্রীরঙ্গমের প্রধান উপাস্যদেবতা এবং তাঁহার নামানুসারে এস্থানের নাম

শ্রীরঙ্গম হইয়াছে। এখানে রামানুজসম্প্রদায়ের প্রভাব এক সময়ে খুব বেশী ছিল।" শ্রীরঙ্গমকে একটা দ্বীপ বলিলেও হয়; কারণ এখানে কাবেরীনদী পশ্চিমদিক্ হইতে আসিয়া দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া শ্রীরঙ্গমকে ঘিরিয়া পুনরায় সংযুক্ত হইয়া নগরের পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। ত্রিচিনোপলীর ডাকঘর হইতে শ্রীযুক্ত রাজগোপালম্ শ্রীরঙ্গমের মন্দিরের ভিতরে নৃসিংহ-মূর্ত্তির কথা লিখিয়াছেন—There is a fairly big temple inside the precincts of the Śrirangam Temple, commonly known as "Mettu Azhasingar Sannidhi" so designated in view of the high level on which the temple has been built by the Devas. This temple is dedicated to God Nrisimha and faces northwards and is adjacent to the temple of the Goddess Śriranganāyaki and is opposite to the temple of Śrivedānta Desigar and is just near the entrance of the main north gate of the temple Prākāram. There are pictures of artistic beauty, representing this dreadful Avatāra drawn on the walls in the forefront of the temple." শ্রীরঙ্গমের নৃসিংহ-মূর্ত্তির কথা কুম্ভকোণমের খ্যাতনামা নাগরাজশর্ম্মামহাশয়ও লিখিয়াছেন, "Rangadhāma is the famous South-Indian place of pilgrimage known as Śrirangam. The Deity is Vishnu. The sacred name is Ranganātha. The figure of Narasimha slaying Hiranyakaśipu with Prahlāda standing with folded hands is in a cocoanut-grove near the eastern gate of the temple."

তাহার পরে ঋষভপর্ব্বতে কৃষ্ণভক্ত পরানন্দপুরীর (পরমানন্দপুরীর [১]) সহিত চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ হইল। নন্দলাল দে মহাশয় বলেন যে ইহা মাদুরার প্রায় ৫০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে পল্‌নী-পাহাড়। বৈগাই (বৈহায়সী অথবা বেগবতী) নদী এই পর্ব্বত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। পল্‌নী-পর্ব্বতকে বরাহ-পর্ব্বতও বলে, ঋষভপর্ব্বত বলে না (**Madura Gazetteer, p. 3**)। কিন্তু পল্‌নী-নগরের নয় মাইল পশ্চিমে ১৪০২ ফিট উচ্চ ঐবরমলয়-নামক পর্ব্বত আছে। ইহাতে ষোলজন জৈন তীর্থঙ্করের প্রতিমূর্ত্তি আছে। ঋষভদেব জৈনদিগের আদি তীর্থঙ্কর অথবা আদিনাথ বলিয়া খ্যাত। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানের দ্বাবিংশতি অবতারের মধ্যে ঋষভদেব অষ্টম অবতার। ভারতবর্ষাধিপতি নাভিরাজের ঔরসে মরুদেবীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হইয়াছিল। এক সময়ে সম্ভবতঃ ঐবরমলয় জৈনদিগের একটী প্রধান তীর্থ ছিল। সেইজন্য আমরা মনে করি ঐবরমলয়ের অপর নাম ঋষভ-পর্ব্বত (**Madura Gazetteer p. 300**)। যদুনাথ সরকার মহাশয় মাদুরা-নগরের বার মাইল উত্তরে অনগঢ়-মলয়কে ঋষভ-পর্ব্বত বলিয়াছেন। অনগঢ়-মলয় বলিয়া কোনও পর্ব্বত খুঁজিয়া পাইলাম না। মাদুরার বার মাইল উত্তর-পশ্চিমে অলগরমলয় বলিয়া একটী পর্ব্বত আছে। ইহাতে অলগরস্বামিনামা বিষ্ণুমূর্ত্তি আছেন। ইহাকে যে ঋষভ-পর্ব্বত বলে **Madura Gazetteer**এ দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু মাদুরার পাঁচ মাইল উত্তরপূর্ব্বে হস্তী-আকৃতি ২৫০ ফিট উচ্চ এবং দুই মাইল দীর্ঘ অনয়মলয়নামক (**Elephant Hill**) পর্ব্বত আছে। ইহাতে জৈন তীর্থঙ্করদিগের প্রতিমূর্ত্তির অনেক ভগ্নাবশেষ আছে (**Madura Gazetteer**

১। চৈতন্যচরিতামৃতেও পরমানন্দপুরীর সহিত ঋষভপর্ব্বতে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ বর্ণিত আছে।

and S. I. Railway Guide)। ইহাও ঋষভ-পর্ব্বত হইতে পারে।

ঋষভ-পর্ব্বত হইতে দক্ষিণপূর্ব্বে সমুদ্রের দিকে যাইয়া রামনাথে (রামনাদ) রামচন্দ্রের চরণচিহ্ন দেখিয়া চৈতন্যদেবের ভাবাবেশ হইল। রামনাদ রেলষ্টেশানের সাত মাইল উত্তর-পূর্ব্বে পক-উপসাগরের (Palk Bay) উপকূলে দেবীপত্তন (Devipatnam) গ্রাম আছে। রামেশ্বরে যাইবার পূর্ব্বে এইস্থানে স্নান করিয়া নবগ্রহমূর্ত্তি (সমুদ্রতট হইতে প্রায় দুইশত হাত দূরে সমুদ্রের জলের ভিতরে সাতটী প্রস্তরস্তম্ভ) দর্শন বিধেয়। ইহার নিকট সমুদ্রজলের ভিতরে শ্রীরামচন্দ্রের চরণচিহ্ন আছে। রামনাদ রেলষ্টেশানের পাঁচমাইল দক্ষিণে তিরুপ্পুলানিনগর আছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে ইহাকে দুর্ব্বেশন বলা হইয়াছে। দুর্ব্বেশন দর্ভশয়নের অপভ্রংশ। প্রবাদ যে রামচন্দ্র দর্ভ অর্থাৎ কুশের উপর শয়ন করিয়া এখানে ত্রিরাত্র-ব্রত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইহার পরে সমুদ্রদেব তাঁহাকে বানরকটকের সহিত সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার জন্য সেতুবন্ধন করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। এখানে শেষশায়ী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি আছেন (S. I. Railway Guide এবং দ্বারকাশর্ম্মা প্রণীত হিন্দু-তীর্থ)।

তাহার পরে দক্ষিণপূর্ব্বে রামেশ্বরে যাইয়া অনুরাগের সহিত তিনি শিবদর্শন করিলেন এবং একজন তর্কপ্রয়াসী সন্ন্যাসীকে বলিলেন—

"প্রভু বলে বিচার না করিবারে চাই।
হইলাম বিচারে পরাস্ত তব ঠাঁই॥

* * * *

আতাল পাতাল দূর করি ভক্তিভরে।
কৃষ্ণগুণ গাও ভাই বিশুদ্ধ অন্তরে॥

ভজ কৃষ্ণ, কহ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম।
করিয়া কৃষ্ণের নাম যাও নিত্যধাম॥"

এই বলিয়া হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে চৈতন্যদেব মূর্চ্ছিত হইলেন।

দীনেশ সেন মহাশয় লিখিয়াছেন যে রামেশ্বর-মন্দিরে 'হরিবোলা' নামে বিগ্রহ আছে, ইহা চৈতন্যদেবের মূর্ত্তি এবং চৈতন্যদেবকে এপ্রদেশে 'ক্ষেপা হরিবোলা' বলিত (করচা-৩৯ পৃঃ)। ঠাকুরদত্তশর্ম্মা মহাশয় 'চারো ধামকা যাত্রা' পুস্তকে লিখিয়াছেন যে রামেশ্বর-মন্দিরে নন্দীকেশ্বর মূর্ত্তির নিকটে এক রাক্ষসের মূর্ত্তি আছে। তাহার নাম 'হরবোলা'। প্রথমে সে অত্যন্ত 'প্রমাদী' ছিল, পরে শিবভক্ত হইয়াছিল। শিব তখন প্রসন্ন হইয়া ইহাকে বর-প্রার্থনা করিতে বলিলেন। রাক্ষস বলিল যে সে পূর্ব্বে অত্যন্ত পাপী ছিল এবং সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ প্রত্যেক যাত্রী রামেশ্বর-শিব-দর্শন করিবার পূর্ব্বে একটী 'থপ্পড' ইহার 'শিরপর লগাবে; থপ্পড়পর থপ্পড় খাতে খাতে ইস্ বেচারেকো শিরভী পাতলা পড় গয়াহৈ"। যদি ইহা চৈতন্যদেবের মূর্ত্তিই হয়, শৈবেরা আদর্শ-বিষ্ণুভক্তকে কি করিয়াছে দেখুন। দ্বারকাশর্ম্মামহাশয় লিখিয়াছেন যে রামেশ্বর অর্থাৎ পম্বনদ্বীপ ও মণ্ডপমের মধ্যস্থিত খাড়ীকে (যাহার উপরে **S. I. Railway**র সেতু আছে) "হরবোলাকা খাড়ী" বলে। রামচন্দ্র সমুদ্রতীরে সেনা-সমাবেশপূর্ব্বক রাবণকে পরাভূত করিবার অভিপ্রায়ে শিবকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার সাহায্যলাভ করিয়াছিলেন। রাম-স্থাপিত শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান রামেশ্বর-শিব।

তাহার পরে সেতুবন্ধে আসিয়া চৈতন্যদেব তিন দিন হরিসঙ্কীর্ত্তন করিলেন। তাহার পরে পশ্চিমদিকে আসিয়া মাধ্বীবনে একজন মৌনী সন্ন্যাসীর সহিত চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ এবং সংস্কৃতে কথোপকথন হইল।

এক্ষণে মাধ্বীবন বলিয়া কোন বন এ প্রদেশে নাই। সেখানে অন্যান্য সন্ন্যাসীর সহিত সাতদিন অতিবাহিত করিয়া তত্ত্বকুণ্ডীতে [১] আসিয়া স্নান করিলেন। তাহার পরে তাম্রপর্ণী-নদীতীরে উপনীত হইয়া এক-পক্ষকাল অপেক্ষা করিয়া মাঘীপূর্ণিমাদিনে (১৪৩২ শক, ১৫১১ খৃঃ) তাম্রপর্ণীতে [২] স্নান করিলেন। তাহার পরে সমুদ্রের ধারে ধারে আসিয়া কন্যাকুমারীতে উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দ বলিতেছেন—

পর্ব্বত কানন দেশ [৩] নাহি সেই ঠাঁই।
কেবল সিন্ধুর শব্দ শুনিবারে পাই॥
বড় বড় তরঙ্গ আসিয়া সেইখানে।
ঈশ্বরের গুণগান করিছে সজ্ঞানে॥

১। বোধহয় তুতিকোরিণের প্রায় ৩০ মাইল উত্তরে তত্তনেরী-নামক হ্রদ : কিম্বা তাম্রপর্ণীর উত্তরে তুতিকোরিণও হইতে পারে। তামিলে ইহাকে (Tuticorin) তুত্তুক্-কুডী অথবা তুতুর্কুডী (যাহার জল গ্রীষ্মকালে শুষ্ক হয়) বলে। ধনবান্ লোকেরা কলম্বো হইতে ভাল পানীয় জল আনেন (Tinnevelly Gazetteer p. 355)। ওলন্দাজেরা তুত্তুক্কুডিকে Tuticorin করিয়াছিল। পোর্ত্তুগাল-অধিবাসীরা তুতীকোরীণে ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে আসে। চৈতন্যদেব এখানে ১৫১১ খৃষ্টাব্দে আসিয়াছিলেন। তখন ইহা পরবন-দিগের অধিকারে ছিল (Tinnevelly Gazetteer p. p. 440-41)। তুতীকোরীণ-নগর সমুদ্রতীরে অবস্থিত। ইহা কুমারিকা-অন্তরীপের অর্থাৎ কন্যাকুমারীর উত্তরপূর্ব্বদিকে অবস্থিত।

২। তাম্রপর্ণীনদী তুতীকোরীণের দক্ষিণে। ইহা অগস্ত্যমলয়-পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া পাপনাশম্ তীর্থ, অম্বাসমুদ্রম্ ও তিন্নেবেল্লী নগরের নিকট দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া মানার-উপসাগরে পতিত হইয়াছে।

৩। কেবল বালুকারাশি এবং মাঝে মাঝে বালুকা-স্তূপ। লেখকের মনেও ধনুষ্কোটী সন্নিধিতে এইরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল।

পর্ব্বত সমান বালি হয়ে স্তূপাকার ।
ঈশ্বরের গুণ যেন করিছে বিস্তার ॥
হুঁ হুঁ শব্দে সমুদ্র ডাকিছে নিরন্তর ।
কি কব অধিক সেথা সকলি সুন্দর ॥
দেখিবার কিছু নাই তথাপি শোভন ।
সেখানে সৌন্দর্য্য দেখে যার শুদ্ধ মন ॥

কন্যাকুমারী (Cape Comorin) নাম কেন হইল চৈতন্যচরিতামৃত কিম্বা গোবিন্দদাসের করচা হইতে অনুমানকরা যায় না। চৈতন্য-চরিতামৃতে আছে—

মলয় পর্ব্বতে (অর্থাৎ অগস্ত্যমলয়ে) কৈল অগস্ত্যবন্দন ।
কন্যাকুমারী তাঁহা কৈল দরশন ॥

গোবিন্দ কন্যাকুমারীতে সমুদ্র বর্ণনাকরিয়াছেন এবং এ স্থানে চৈতন্য-দেবের সমুদ্রস্নানের কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু গুপ্তপ্রেস-পঞ্জিকাতে লিখিত আছে, "এখানে গৌরীর কুমারীমূর্ত্তি দেখা যায়। দেখিলে উঠিতে ইচ্ছা করে না"।

কন্যাকুমারীতে চৈতন্যদেব স্নান করিলেন এবং হরি বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার হৃদয় ভগবৎপ্রেমে পরিপূর্ণ হইল এবং তাঁহার কলেবর রোমাঞ্চিত হইল। তাহার পরে একটী সন্ন্যাসীর দলের সহিত পঞ্চদশ ক্রোশ অতিক্রমকরিয়া সাঁতালপর্ব্বতে গমন করিলেন। এইস্থান হইতে সন্ন্যাসিদলের সহিত পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রমপূর্ব্বক ত্রিবঙ্কু-দেশে (Travancore) উপনীত হইলেন। গোবিন্দ বলিতেছেন—

"ত্রিবঙ্কুদেশের রাজা বড় পুণ্যবান্ ।
পালন করেন প্রজা পুত্রের সমান ॥

নগরের লোক সব অতিথিকুশল।
অতিথি লইয়া সবে করে কোলাহল॥

* • * •

এথাকার রাজা তার নাম রুদ্রপতি।
কাঙ্গালের মাতা পিতা অগতির গতি॥

এস্থানে চৈতন্যদেব একজন অদ্বৈতবাদীকে রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন এবং ত্রিবঙ্কুর রাজাকে হরিনামে মত্ত করাইলেন। যে নগরের কথা গোবিন্দ বলিতেছেন তাহা বর্ত্তমান ত্রিবন্দ্রম নয়, কারণ এখানে আসিলে অনন্তপদ্মনাভস্বামী অথবা শ্রীপদ্মনাভস্বামিমূর্ত্তি চৈতন্যদেব নিশ্চিতই দেখিতেন। চৈতন্যচরিতামৃতে 'অনন্তপদ্মনাভে' অর্থাৎ ত্রিবন্দ্রমে (Trivandrum) আসিয়া চৈতন্যদেবের 'পদ্মনাভ' দেখার কথা আছে। ত্রিবন্দ্রমের নাম 'তিরু অনন্তপুরমের' অর্থাৎ 'শ্রীঅনন্তপুরমের' ইংরাজী সংস্করণ (Anglicised form—Superintendent of Archaeology. Travancore)। তিনি আরও লিখিয়াছেন, "The present image of the God Śri Padmanābhasvāmi at Trivandrum was installed after 1510 A. D.; but the temple was in existence before. It is sacred to the Śri Vaishnavas (Rāmānuja's followers) and is referred to in their hymns. Out of the 108 temples sacred to the Vaishnavas, eleven are in Travancore, of which the Trivandrum temple is one···Trivandrum was never named Trivanku···There is, not to my knowledge, any hill called Rāmagiri near Trivandrum···No name of Rudrapati is traceable in our extant records"। গোবিন্দের করচাতে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয়, চৈতন্যদেব ত্রিবন্দ্রমে

আসেন নাই ; কিন্তু ত্রিবঙ্কুদেশে (Travancore) প্রবেশ করিয়া কোন ক্ষুদ্র রাজার (Chief) সংসর্গে আসিয়াছিলেন। রামগিরি-পর্ব্বত কোচিনের প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে রামপুরম্-সন্নিহিত ৩১৬৬ ফিট উচ্চ পর্ব্বত হইতে পারে। গোবিন্দ বলিয়াছেন যে রামগিরি-পর্ব্বতের উপরে রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত লঙ্কাবিজয়ের পরে তিনদিন বাস করিয়াছিলেন, এই প্রবাদ আছে। সাঁতালপর্ব্বত বোধহয় ত্রিবঙ্কুর (Travancore) এবং তিনেভেলির (Tinnevelly) মধ্যবর্ত্তী কার্ডামম্ অথবা মলয়-পর্ব্বত শ্রেণীর একটী পর্ব্বত। ইহা পঞ্চশৃঙ্গযুক্ত ঐস্থালইপথিগই গিরিও হইতে পারে (Tinnevelly Gazetteer p. 3 ; see also my Stray Thoughts, part IV. p.p. 19-20)। চৈতন্যদেব কার্ডামম অথবা মলয়পর্ব্বত ভেদকরিয়া ত্রিবঙ্কুদেশের (Travancore) উত্তরভাগে গিয়া পড়িয়াছিলেন। সেই জন্য গোবিন্দদাসের করচাতে তাঁহার ত্রিবন্দ্রম অর্থাৎ অনন্তপদ্মনাভে আসিয়া পদ্মনাভদেবমূর্ত্তি দর্শনকরিবার কথা নাই। তিনি কোচীনের দক্ষিণপূর্ব্বে সম্ভবতঃ উপনীত হইয়া-ছিলেন। রামগিরি (রামপুরম্ ?) দেখিয়া তিনি পয়োষ্ণীনগরে গিয়াছিলেন।

ত্রিবঙ্কুর (Travancore) পূর্ব্বে কেরল (নারিকেলের দেশ) অথবা চেরা-প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। ত্রিবঙ্কুরের সভ্যতার সহিত পরশুরামের নাম বিজড়িত। রামচন্দ্রের সহিত মিথিলার নিকটে যুদ্ধে পরাভূত হইয়া তিনি কেরলপ্রদেশের দ্রাবিড়জাতির উন্নয়নে মনোনিবেশ করিয়া-ছিলেন। শঙ্করাচার্য্য কেরলে খৃঃ অষ্টম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কেরলসমাজ সংগঠনকরিয়াছিলেন। তিনি ষোড়শবর্ষে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া বদরিকাশ্রমে বত্রিশ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। 'শ্রীবল্লুমকোডে' অথবা 'তিরুবরুমকোডে' (লক্ষ্মী-স্থান) হইতে 'থিরু-

'বনকোডে' হইয়াছিল॥ ইহা হইতে ইংরাজীতে 'Travancore' হইয়াছে। সেইরূপে 'শ্রীঅনন্তপুরম্' অথবা 'তিরুঅনন্তপুরম্' অথবা 'থিরুবনন্তপুরম্' (See Early History of Travancore by P. Menon), ইংরাজীতে Trivandrumএ পরিণত হইয়াছে। 'ত্রিবঙ্ক' বলিয়া কোন নগর ছিল না। গোবিন্দ 'ত্রিবঙ্কুদেশের নগর' স্থানে 'ত্রিবঙ্কনগর' ব্যবহারকরিয়াছেন।

চৈতন্যদেবের ত্রিবঙ্করে (Travancore) আগমনের সময়ে শ্রীবীর-এরবিবর্ম্মা (১৫০৪-১৫২৮ খৃঃ) রাজা ছিলেন (Early History of Travancore by P. Menon, p. 95)। প্রবাদ যে পাণ্ডবেরা বন-বাসের সময়ে ত্রিবন্দ্রমে আসিয়া পদ্মনাভস্বামী দর্শনকরিয়াছিলেন। এস্থানে ভগবতীমন্দির সংলগ্ন জলাশয়ের নাম 'ফলগুনন্-কূলম' (Arjuna's Tank—Early History of Travancore by Menon)। ত্রিবন্দ্রমের প্রায় ৪৮ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বস্থিত শ্রীবর্দ্ধনপুরম্ অথবা পদ্মনাভ-পুরম্ কেরল অর্থাৎ ত্রিবঙ্করের (Travancore) এক সময়ে রাজধানী ছিল।

কৃষ্ণদাসকবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে যে চৈতন্যদেব কন্যাকুমারী ও আমলকীতলাতে রাম দেখিয়া মল্লারদেশে (Travancore) আসিয়া তোবালায় তমাল-কার্ত্তিক এবং বাতাপাণীতে রঘুনাথ দেখিলেন। এই স্থানে, অথাৎ মল্লারদেশ-অন্তর্গত বাতাপাণীতে, কৃষ্ণদাসকে এক ভট্ট-মারীস্ত্রী প্রলুব্ধ করিয়াছিল (৩৩৭ পৃঃ দেখুন)। তাহার পরে তিনি পয়-স্বিনীতীরে আদিকেশব, অনন্তপদ্মনাভে (Trivandrum) পদ্মনাভ এবং শ্রীজনার্দ্দনে (Varkalā in Travancore) দেখিয়া পয়োষ্ণীনগরে আসিয়াছিলেন। বাতাপাণী (বর্ত্তমান ভূতপণ্ডী) কন্যাকুমারী (Cape Comorin) হইতে প্রায় ১৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এবং ত্রিবঙ্করের (Travancore) অন্তর্গত।

কিন্তু কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৭ম অঙ্কে) লিখিত আছে যে গোদাবরীর অর্থাৎ রাজমহেন্দ্রীর দক্ষিণে চৈতন্যদেবের কোন ব্রাহ্মণ-সহচর ছিল না। কৃষ্ণদাসের প্রলোভন সম্ভবতঃ রাজমহেন্দ্রীর উত্তরেই হইয়াছিল। কৃষ্ণদাসকবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে যে চৈতন্যদেব চুলে ধরিয়া কৃষ্ণদাসকে ভট্টমারীদিগের নিকট হইতে লইয়া আসিলেন। কর্ণপূরের চৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে (১৩শ সর্গ-৩০) লিখিত আছে যে চৈতন্যদেব 'কৃষ্ণদাসকে কিছু না বলিয়াই একেবারে সেতুবন্ধ উদ্দেশকরিয়া তথা হইতে গমন করিলেন।' ইহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে কর্ণপূরের মতে এ প্রলোভন চৈতন্যদেবের সেতুবন্ধে আসিবার আগেই ঘটিয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কৃষ্ণদাসকবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে যে মল্লারদেশে (Travancore) উপনীত হইয়া পয়স্বিনী [১]-তীরে আগমনপূর্ব্বক নদীতে স্নান করিয়া চৈতন্যদেব আদিকেশব-মন্দিরে যাইলেন। পয়স্বিনী-নদী হইতে অনন্তপদ্মনাভে অর্থাৎ ত্রিবন্দ্রমে আসিয়া দুইদিন ধরিয়া পদ্মনাভ দর্শনকরিলেন। তাহার পরে তিনি শ্রীজনার্দ্দনে [২] আসিলেন। এস্থানে জনার্দ্দন দেখিয়া এবং দুইদিন

১। পরলয়ার—The Superintendent of Archaeology, Travancore, has written that Payashvini may be the Sanskritised name of the Paralayār on which exists the Ādikeśava temple at Tiruvāttar,a place which is about 10 miles from Padmanābhapuram which is again 48 miles south-east of Trivandrum.

২। বরকলা (Varakalā) রেলষ্টেশানের নিকটে একটী উচ্চস্থানের উপরে জনার্দ্দন-স্বামীর মন্দির আছে। মন্দিরের অর্দ্ধমাইল দূরেই সমুদ্র। বরকলা ত্রিবন্দ্রমের ২৬ মাইল উত্তরপশ্চিমে (S. I. Railway Guide)।

অবস্থান করিয়া পয়োষ্ণীতে আসিয়া তিনি শঙ্করনারায়ণ দেখিলেন এবং তাহার পরে শঙ্করাচার্য্যের সিংহারিমঠে অর্থাৎ শৃঙ্গেরী-মঠে গমন করিলেন।

গোবিন্দ লিখিয়াছেন যে চৈতন্যদেব ত্রিবঙ্কুনগরের (ত্রিবঙ্কুদেশের একটা নগর ; ত্রিবন্দ্রম নয়) সন্নিকটে রামগিরিনামক পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া রাম, লক্ষ্মণ এবং সীতার বিশ্রামস্থান দর্শনপূর্ব্বক পয়োষ্ণীনগরে শিবনারায়ণ দেখিয়াছিলেন, এবং তাহার পরে শঙ্করাচার্য্য-স্থাপিত শিঙারির মঠে অর্থাৎ শৃঙ্গেরীমঠে গিয়াছিলেন। উভয় বৃত্তান্ত হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে পয়োষ্ণী ত্রিবঙ্কুর (Travancore) এবং মহি-যুরের (Mysore) অন্তর্গত শৃঙ্গেরীর মাঝে অবস্থিত ছিল। নন্দলাল দে মহাশয় পয়োষ্ণীকে নদী (the river Purti in Travancore) বলিয়াছেন। কিন্তু গোবিন্দ ইহাকে নগর বলিয়াছেন। দীনেশ সেন মহাশয় বলেন যে পয়োষ্ণীর বর্ত্তমান নাম পান্নোনী (Ponnani, S. E. of Calicut)। পোন্ননী-নগর সমুদ্রতীরে এবং পোন্ননীনদীর সমুদ্রের সহিত সংযোগস্থলে অবস্থিত। ইহার সন্নিকটে এডক্কোলমে একটা বিখ্যাত বিষ্ণুমন্দির আছে। 'Ponnani is about eight miles from the Edakkolam Station of the Jalarpet-to-Mangalore section of the South Indian Railway. Half a mile from the station is situated a famous Vishnu temple to which large numbers of pilgrims from all parts of Malabar resort—S. I. Railway Guide'.

ওট্টপলম্ (Ottapalam) পোন্ননীর ৩০ মাইল পূর্ব্বে পোন্ননী-নদী-সন্নিহিত নগর। এ স্থানের মন্দিরে শিব-নারায়ণের মূর্ত্তি আছে। "The Trikangod temple in the desam of that name near

Ottapalam is one of the most famous temples in the tāluk and is almost unique in that the Śrikovil or Holy of Holies is sacred both to Śiva and Vishnu. An inscription in an unknown tongue is engraved on a granite slab in the building. The temple is much resorted to by women afflicted with fits or possessed of devils."—Malabar Gazetteer, p. 470.

"In Ponnani there is also a well-known temple called Trikkāvu and near it there is a large tank...A story ascribes the temple to Paraśurāma"—ibid p. 456.

পয়স্বিনী অথবা চন্দ্রগিরি-নদী যে স্থানে সমুদ্রে পড়িয়াছে তাহার নিকট কশরগড় (Kasargad on the S. I. Railway between Mangalore and Cannanore on the West Coast) নগর অবস্থিত। এখানে অনেক মন্দির আছে। তাহার ভিতরে মল্লিকার্জ্জুন শিবের মন্দির বিখ্যাত। পয়োষ্ণী এ স্থানও হইতে পারে। এক্ষণে আমরা পুনরায় গোবিন্দলিখিত বিবরণ অনুসরণ করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে পয়োষ্ণীতে আসিয়া চৈতন্যদেব শিব ও নারায়ণ দেখিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাসকবিরাজের শঙ্করনারায়ণ এবং গোবিন্দের শিব-নারায়ণ কানারা-প্রদেশের বিশেষত্ব। মহিষুরে কেবল চিতলদ্রুগ জেলার অন্তর্গত চিতোলদ্রুগনগরের উত্তরপশ্চিমে তুঙ্গভদ্রানদীর সহিত হরিদ্রা-নাম্নী নদীর সংযোগস্থলে হরিহরনগরে শিব ও বিষ্ণুর সংযুক্ত মূর্ত্তি আছে। রাইস সাহেব (Mysore Vol. I p. 475) বলেন—"The form Harihar, a combination of Hari or

Vishnu and Hara or Śiva, is declared in inscriptions to have been revealed at Kudalur (apparently at Harihar) for the destruction of a giant named Guhāsura who opposed the Vedas......A similar form seems to be worshipped in Kanara under the denomination of Śankara-Nārayana. The terms are indicative of toleration or compromise......In Mysore the worship of Harihara is almost, if not entirely, confined to the town of the same name.... The existing temple was built in 1223.,'

এ স্থান হইতে শঙ্করাচার্য্যের বিখ্যাত শৃঙ্গেরীমঠে (মহিষুরের কাডুর জেলায়) চৈতন্যদেব আসিলেন। সে স্থান হইতে মৎস্যতীর্থে উপনীত হইলেন। নন্দলাল দে মহাশয় বলেন যে মৎস্যতীর্থ মহিষুর প্রদেশে তুঙ্গভদ্রার সন্নিকটে তিরুপাননকুণ্ডমের ৮।১০ মাইল পশ্চিমে একটী পর্ব্বতের উপরে একটী ক্ষুদ্র হ্রদ। ইহা মৎস্যে পরিপূর্ণ। প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে সুমধুর শব্দ এই হ্রদে শ্রুত হয়। কিন্তু এই স্থান আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। যদুনাথসরকার মহাশয় বলেন যে ইহা ফরাসী-অধিকৃত মাহে নগর। মাহে কিরূপে মৎস্যতীর্থ হইল সরকারমহাশয় এ বিষয়ে কিছু বলেন নাই। গোবিন্দের বিবরণ হইতে মনে হয় মৎস্যতীর্থ শৃঙ্গেরী ও ভদ্রার মধ্যে ছিল। মহিষুরের কাডুর জেলান্তর্গত শৃঙ্গেরীমঠে এবং তৎসন্নিহিত দেবমন্দিরসংলগ্ন জলাশয়ে এরূপ মৎস্য-সরোবরের কথা রাইসসাহেব-রচিত পুস্তকে লিখিত আছে (**Rice's Mysore Vol II p. 376)—The finest fish are**

found in the Tungā and Bhadrā rivers and in the Madag Ayyankere, and Keresante tanks. The Mahseer, probably the best freshwater fish in India, is sometimes caught in the rivers and reaches to the weight of 20 lbs. At the Śringeri Math and other sacred places on the banks of the rivers, fishes ars daily fed and are so tame that a call brings them in thousands to the surface. The Brāhmans invariably throw the remains of their rice to the fish. Some of these are even adorned with jewellery such as nose-rings or ear-rings and ornaments fastened to their tails."

এস্থান হইতে চৈতন্যদেব কাচাড়ে যাইয়া ভগবতী দর্শনকরিলেন। কাচাড়ে কৃষ্ণাপুত্রী ভদ্রানাম্নী নদীতে স্নান করিয়া রামভক্ত-অধ্যুষিত নাগপঞ্চপদীতে যাইয়া তিনরাত্রি যাপনকরিলেন এবং পরে চিতোলে যাইলেন। উত্তরে প্রবাহিতা হইয়া তুঙ্গা ও ভদ্রা মহিষুরের কুদালীতে মিলিতা হইয়া তুঙ্গভদ্রা হইয়াছে। তুঙ্গভদ্রা উত্তরপূর্ব্বে এবং পরে পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিতা হইয়া কৃষ্ণানদীর সহিত কর্ণূলের উত্তরে সংযুক্তা হইয়াছে। শৃঙ্গেরী তুঙ্গার সন্নিকটে। শৃঙ্গেরী হইতে ভদ্রা প্রায় ২৫ মাইল পূর্ব্বে। মৎস্যতীর্থ এবং কাচাড়-নগর তুঙ্গা ও ভদ্রার মধ্যে সম্ভবতঃ অবস্থিত ছিল। ভদ্রা হইতে চিতোল (সম্ভবতঃ মহিষুরের চিতোলদ্রুগ) ৮০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে। নাগপঞ্চপদী ভদ্রা এবং চিতোলের মধ্যে বোধহয় অবস্থিত ছিল। গোবিন্দবর্ণিত কাচাড় ভদ্রানদীতীরস্থ খণ্ডেয় হইতে পারে। ইহা মহিষুরের কাডুরজেলার অন্তর্গত। খণ্ডেয়-সম্বন্ধে রাইস সাহেব বলেন (Mysore, Vol II pp.

399—400). "A village in Bāle-Honnur Tāluk on the right bank of the Bhadrā···It appears to have been formerly a large place. There are some considerable old temples, the principal one being dedicated to Mārkandeśvara···The place derives its name from Mārkandeya and there are also the temples of Janārdana and Mrityunjaya (Śiva)।" কাচাড় 'কলস (Kalasa)' হইবার অধিক সম্ভাবনা। কলস-নগর ভদ্রাতীরে অবস্থিত। "A village in the Bāle-Honnur Tāluk near the right bank of the Bhadrā······ and at the southern base of Merti, the grand hill of Kalasa. It contains a large temple dedicated to Kalaseśvara.······Mounds covering ruins on all sides point to the existence of a large town in former times.···The town then extended so as to include the present villages of Melangadi, Kilangadi and Rudrapāda. Going through Melangadi and keeping on to the river, a sacred bathing-place called Ambu-tirtha is reached, where the stream rushes very deep between some water-worn rocks. At one point is a large boulder, a big square-shaped stone placed horizontally on another. On the former is an inscription in Sanskrit stating that Śri Mādhvācharya brought and placed it there with one hand."

কানানোর-নগরের পূর্ব্বে, পোন্নানির উত্তরপূর্ব্বে এবং শৃঙ্গেরীর দক্ষিণে মালাবার-জেলার মনন্তোদ্দী বলিয়া একটী নগর আছে।

সেখানে দুর্গামূর্ত্তি আছে এবং একটী মৎস্যতীর্থ আছে। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং গোবিন্দ উভয়েই বলিতেছেন যে মৎস্যতীর্থ শৃঙ্গেরী ও তুঙ্গভদ্রার নিকট। মননতোদ্দী-(Manantoddy) বিষয়ে মালাবার গেজেটীয়ার হইতে উদ্ধৃত করিলাম—About two miles from Manantoddy on the river Manantoddy is the Vallurkavu, the famous Fish-pagoda dedicated to Durgā (p. 476)।

নাগপঞ্চপদী ভদ্রানদী ও চিতোলদ্রুগের মধ্যে হইবে। এই নগর মানচিত্রে খুঁজিয়া পাইলাম না। 'নাগ'-সম্বন্ধে রাইসসাহেবের মন্তব্য দিলাম (Mysore Vol I, p. 454—Religion)—

"In India, this land of many gods, serpent-worship, specially that of the deadly-hooded cobra, is of great antiquity and survives to this day. There is scarcely a village in Mysore which has not effigies of the serpent, carved on stone, erected on a raised platform near the entrance for the adoration of the public. The living serpent is in many parts systematically worshipped and few natives will consent to kill one. The body of one that has been killed is often solemnly disposed of by cremation, while a cobra which takes up its abode, as it sometimes does, in the thatch or roof of the house, is generally not only left undisturbed, but fed with milk etc. The Nāgas who frequently occur in ancient Hindu history were no doubt a widespread race of serpent-worshippers, and there is every reason to believe that they occupied

most parts of Mysore."। মহিষুরে নাগপঞ্চপদীর স্থায় নাগখণ্ডক, নাগমঙ্গল, নাগপুরী প্রভৃতি অনেক গ্রাম আছে।

নাগপঞ্চপদীর লোক রামভক্ত বলিয়া গোবিন্দ বর্ণনাকরিয়াছেন। তাঁহারা রামানুজ (খৃঃ ১২শ শতাব্দীর প্রারম্ভে) ও রামানন্দের (খৃঃ (১৪শ শতাব্দীর শেষে) বৈষ্ণবধর্ম্মমত অনুসরণকরিতেন। রামানুজাচার্য্যের অনুচরদিগকে 'শ্রীবৈষ্ণব' বলে। ইঁহারা বিষ্ণু ও শ্রী অথবা লক্ষ্মী এবং তাঁহাদিগের বিভিন্নমূর্ত্তি নারায়ণ, রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি এবং শ্রী অথবা লক্ষ্মীর বিভিন্ন মূর্ত্তি সীতা, রুক্মিণী ইত্যাদি উপাসনাকরেন। এই ধর্ম্মের ত্রিচিনোপল্লীর উত্তরে অবস্থিত শ্রীরঙ্গম কেন্দ্রস্থল। ইঁহারা শালগ্রাম ও তুলসীর অতিশয় সমাদর করেন। ইঁহারা নিভৃতে রন্ধন ও ভোজনের কার্য্য সমাধাকরেন। পরস্পর দেখা হইলে বলেন 'দাসোঽস্মি' অথবা 'দাসোঽহং।' বিভিন্ন বৈষ্ণব-সম্প্রদায় গোপীচন্দনের বিভিন্ন প্রকার চিহ্ন শরীরে ধারণকরেন। ইঁহারা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী।

রামানন্দ রামানুজের ধর্ম্মমত অবলম্বনকরিয়াছিলেন। রামানন্দ-সম্প্রদায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। ইঁহারা বিষ্ণুর রামাবতারকে অধিক ভক্তিকরেন এবং বলেন কলিযুগে রামচন্দ্র ও সীতা প্রধান উপাস্য দেবতা। সেইজন্য তাঁহাদিগকে 'রামাবত' কিম্বা 'রামাৎ' বলে। ইঁহারাও শালগ্রামপ্রস্তর ও তুলসীবৃক্ষকে অতিশয় ভক্তিকরেন। ইঁহাদিগের স্নান, ভোজনাদিবিষয়ে রামানুজ-সম্প্রদায়ের ন্যায় 'কড়াকড়ি' নিয়ম নাই।

মধ্বাচারী-সম্প্রদায় মধ্বাচার্য্যের (দাক্ষিণাত্যে জন্ম ১১৯৯ খৃঃ) অনুচর। ইঁহারা দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন এবং উভয়ই নিত্য বিশ্বাসকরেন। বিষ্ণু ও লক্ষ্মী ইঁহাদের উপাস্য

দেবতা। মধ্বাচারীরা ঈশ্বরোপসনার নিম্নলিখিত তিনটী প্রধান উপায় নির্দ্দেশকরিয়াছেন—অঙ্কন, নামকরণ এবং ভজন। গোপীচন্দনদ্বারা একপ্রকারের তিলককাটাকে 'অঙ্কন' বলে। বিষ্ণু এবং লক্ষ্মীর বিভিন্ন নামদ্বারা পুত্রকন্যা এবং আত্মীয়বর্গের নামকরণকে "নামকরণ" বলে। কায়মনোবাক্যে ধর্ম্মাচরণকে ইহারা 'ভজন' বলেন।

মালাবার-উপকূলে মঙ্গলোরনগরের (মঙ্গলাদেবী হইতে নগরের নাম মঙ্গলোর হইয়াছে) ৩৭ মাইল উত্তরে উদিপীতে মধ্বাচার্য্যস্থাপিত বিখ্যাত কৃষ্ণমন্দির আছে। কৃষ্ণদাসকবিরাজ এই বিগ্রহকে উড়ুপকৃষ্ণ বলিয়াছেন। এই মন্দির মধ্বাচারী-সম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্থল। দুই বৎসর অন্তর এখানে মহোৎসব হয় এবং সেই সময়ে মঙ্গলোর জেলা এবং মহিষুর প্রদেশ হইতে অনেক মাধ্বব্রাহ্মণ এইস্থানে সমবেত হন।

রুদ্র অথবা বল্লভাচারী-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বল্লভাচার্য্য অথবা বল্লভভট্ট। বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনীকার বলেন যে তাঁহার জন্ম ১৪০১ শকে (খৃঃ ১৪৭৯) বারাণসীর নিকট চম্পকারণ্যে। "কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে দর্শন দিয়া বালগোপালসেবা প্রচারকরিতে আদেশ দেন। শ্রীশ্রী মাধবেন্দ্রপুরী-আবিষ্কৃত গোবর্দ্ধননাথবিগ্রহ ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে উদয়পুরে নাথদ্বারে নীত হইলে, এই বিগ্রহের নাম শ্রীনাথজীনাথ হয়। এই শ্রীবিগ্রহ ও তীর্থস্থান এই সম্প্রদায়ী-বৈষ্ণবের প্রধান তীর্থ। বল্লভাচার্য্য উত্তরভারতে বহুলোককে স্বীয়মতে দীক্ষিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।" এই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত—'পৃথিবী উপভোগের বিষয়; ধর্ম্মাচরণে শারীরিক নিগ্রহের প্রয়োজন নাই।' বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শনী বলেন বল্লভাচার্য্য শেষ জীবনে নীলাচলে চৈতন্যদেবের নিকট আসিয়া গদাধরপণ্ডিতের নিকট কিশোর-গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত হন্। যখন ১৪৩৮ শকে

(খৃঃ ১৫১৭) চৈতন্যদেব নীলাচলহইতে বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বল্লভভট্টের সহিত প্রয়াগে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহার পরে তিনি পুরীতে আসিয়াছিলেন (চরিতামৃত-অন্ত্য-৭ম)। চৈতন্য-চরিতামৃতে লেখা আছে যে তিনি তাঁহার রচিত শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকা দ্বারা শ্রীধরস্বামীর টীকা খণ্ডনকরিয়াছেন, এই নিমিত্ত অতিশয় গর্ব্ব অনুভবকরিতেন। চৈতন্যদেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—(১) যিনি স্বামীকে (শ্রীধরস্বামীকে) মানেন না, তিনি বেশ্যা, (২) গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা অন্য সকলপ্রকার আরাধনা অপেক্ষা শ্রেয়সী, (৩) বল্লভাচার্য্য চৈতন্যদেবের কৃষ্ণভক্তি এবং ভক্তিধর্ম্মপ্রচারের প্রশংসা করিলে, চৈতন্যদেব বলিলেন যে তিনি ভক্তিধর্ম্ম অদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দ, সার্ব্বভৌম, রামানন্দরায় প্রভৃতির নিকট শিক্ষা করিয়াছেন, (৪) জীব যদি ভগবান্‌কে পতিরূপে ভজন করে, তাহা হইলে কি করিয়া তাঁহার নাম লয়, এই প্রশ্ন বল্লভভট্ট জিজ্ঞাসা করিলে, চৈতন্যদেব বলিলেন যে পতির আজ্ঞা যে স্ত্রী তাঁহার নাম লইবে ; এস্থলে পত্নী পতির নাম লইতে বাধ্য।

নিমাবত-সম্প্রদায় নিম্বার্ক অথবা নিম্বাদিত্যের অনুচর। নিম্বাদিত্যের পূর্ব্বনাম ভাস্করাচার্য্য। তিনি বৃন্দাবনে বাস করিতেন। নিমাবত-সম্প্রদায় রাধাকৃষ্ণের উপাসনা করেন, শ্রীমদ্ভাগবত এবং নিম্বার্ক রচিত শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য ভক্তিসহকারে পাঠ করেন এবং তুলসীমালা কণ্ঠে ধারণকরেন। চৈতন্য-সম্প্রদায়ের সহিত নিম্বার্কসম্প্রদায়ের অনেক সাদৃশ্য আছে।

চিতোল ত্যাগকরিয়া পুনরায় পশ্চিমদিকে তুঙ্গভদ্রাতীরে আসিয়া চৈতন্যদেব এই নদীতে স্নান করিলেন। তাহার পরে 'নানা দেশ ফিরিয়া' পুনরায় দক্ষিণদিকে আসিয়া কাবেরীর জন্মস্থান কোটী-

গিরিতে [১] স্নানকরিয়া নীলরেখার ন্যায় সত্যগিরিকে বামে রাখিয়া চৈতন্যদেব চণ্ডপুরে উপনীত হইয়া একটী বটবৃক্ষতলে বসিলেন। সত্যগিরি সম্ভবতঃ সত্যমঙ্গলম্ পর্ব্বত। উতকামন্দের প্রায় ১০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে কোটগিরি অথবা কোটাগিরি। কোটগিরির প্রায় ৮ মাইল উত্তরপূর্ব্বে কোদনাদ (Kodanād) নগর। কোদনাদের প্রায় ২২ মাইল পূর্ব্বে সত্যমঙ্গলম্ পর্ব্বত। গোবিন্দ সম্ভবতঃ ইহাকেই সত্যগিরি বলিতেছেন। কোদনাদ হইতে সত্যমঙ্গল কিরূপ দেখায় এই বিষয়ে লিখিত আছে (Nilgiris Gazetteer, p.p. 332-33)—"The views from this corner of the Nilgiri Plateau across the Moyar (a tributary of the Bhavāni) and away to the Satyamangalam Hills on the east are some of the finest of the Plateau."

চৈতন্যদেব চণ্ডপুরে ঈশ্বরভারতীনামা এক অহঙ্কারী বৈদান্তিককে অপূর্ব্ব ভাবাবেশদ্বারা জয় করিলেন—(করচা পৃঃ ৪৭-৪৮)—

"প্রভু বলে বিচার না করিবারে জানি।
জানিলাম সর্ব্বতত্ত্বে তুমি হও জ্ঞানী॥

১। উতকামন্দের নিকট একটী কোটগিরি (Kotgiri) আছে। ইহা কাবেরীর করদনদী (tributary) ভবানীর উৎপত্তিস্থান। ভবানীনদী কাবেরীর প্রধান শাখার সহিত কৈম্বাটুর (Coimbatore) জেলার ভবানীনগরে মিলিতা হইয়াছে। নন্দলাল দে মহাশয় বলেন যে কূর্গের ব্রহ্মগিরি-পর্ব্বতের চন্দ্রতীর্থনির্ঝরিণী হইতে কাবেরীর প্রধান শাখার উৎপত্তি হইয়াছে। চৈতন্যদেবের পুনরায় দক্ষিণে আসিবার কারণ বোধহয় এই যে পূর্ব্বে তিনি মালাবার-উপকূল ধরিয়া শৃঙ্গেরীতে উপনীত হইয়াছিলেন, পরে তুঙ্গভদ্রাতে স্নান করিয়া পুনরায় মহিশুরের মধ্যদিয়া দক্ষিণদিকে যাইলেন।

বিচারে বড়ই তুমি পণ্ডিত গোঁসাই।
তোমার নিকটে হলো পরাস্ত নিমাই॥
চাহ যদি জয়পত্র লিখে দিতে পারি।
তোমার বিচারে আজি মানিলাম হারি॥"

* * *

প্রভু বলে, "ভক্তি কর তর্কে বহুদূর।
ভক্তিতে মিলায় কৃষ্ণ এই ত বিচার॥

* * *

বহুশাস্ত্র আলোচিয়া বল কিবা ফল।
কৃষ্ণবিনা নাহি আছে দাঁড়াবার স্থল॥"
এত বলি প্রভু মোর নয়ন মুদিল।
লোমাঞ্চিত কলেবর ভক্তি উছলিল॥
পড়িতে লাগিল অশ্রু হৃদয় বাহিয়া।
কৌপীনের গ্রন্থি ক্রমে যাইল খসিয়া॥
থর থরি হৃৎকম্প শরীর ঘামিল।
কৃষ্ণ বলি ডাক দিয়া ঢুলিতে লাগিল॥
"কৃষ্ণ হে কোথায় আছ, প্রভু দয়াময়?
ভক্তি বিতরিয়া কর বিশুদ্ধ হৃদয়॥"
এই কথা বলি প্রভু কান্দিতে লাগিল।
মনের আবেগ যেন দ্বিগুণ বাড়িল॥
ভাল মন্দ নাহি শুনে প্রভু-বিশ্বম্ভর।
ফুলে ফুলে কান্দিতে লাগিল নিরন্তর॥
তমালের বৃক্ষ এক সম্মুখে দেখিয়া।
কৃষ্ণ বলি ধেয়ে গিয়া ধরে জড়াইয়া॥

এই ভাব দেখি যোগী আপন নয়নে।
জড়াইয়া ধরে তবে প্রভুর চরণে॥
যোগী বলে, "বিচার না করিবারে মাগি।
উৎকণ্ঠা বাড়িছে মোর এবে কৃষ্ণ লাগি॥"

*   *   *

যোগী বলে, "তুমিই আমার কৃষ্ণ হবে।
পুনঃ আসি প্রভু মোরে দেখা দিবে কবে?"
প্রভু বলে, "এহ বাণী না কহিও আর।
বৃন্দাবনপতি কৃষ্ণ এই ত বিচার॥
ভক্তি বিনা কৃষ্ণ-তত্ত্ব না হয় উদয়।
ভক্তিডোরে বাঁধা কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয়॥"

*   *   *

প্রভু বলে, "কৃষ্ণে তুমি করহ বিশ্বাস।
আজি হৈতে তব নাম হইল কৃষ্ণদাস॥"

তাহার পর দুর্গম বনের ভিতর দিয়া আসিয়া গ্রামে গ্রামে হরিনাম বিতরণকরিয়া কাণ্ডারদেশের নিকট নীলগিরিতে পৌছিলেন— গোঃ কঃ পৃঃ ৪৯—

"কাণ্ডার দেশের কাছে শোভে নীলগিরি।
অপরাহ্ণে সেইখানে যাই ধীরি ধীরি॥
কিবা শোভা পায় আহা নীলগিরিরাজে।
ধ্যানে মগ্ন যেন মহাপুরুষ বিরাজে॥
কত শত গুহা তার নিম্নে শোভা পায়।
আশ্চর্য্য তাহার ভাব শোভিছে চূড়ায়॥

বড় বড় বৃক্ষ তার শিরে আরোহিয়া।
চামর ব্যজনকরে বাতাসে ছুলিয়া ॥
ঝর ঝর শব্দে পড়ে ঝরণার জল।
তাহা দেখি বাড়িল মনের কুতূহল ॥
পর্ব্বতের নিয়ড়েতে ঘুরিয়া বেড়াই।
নবীন নবীন শোভা দেখিবারে পাই ॥
কত শত লতা বৃক্ষে করিয়া বেষ্টন।
আদরেতে দেখাইছে দম্পতী-বন্ধন ॥
ময়ূর বসিয়া ডালে কেকা-রব করে।
নানাজাতি পক্ষী গায় সুমধুর স্বরে ॥
নানাবিধ ফুল ফুটে করিয়াছে আলা।
প্রকৃতির গলে যেন দুলিতেছে মালা ॥
রজনীতে কত লতা ধগধগি জ্বলে।
গাছে গাছে জোনাকী জ্বলিছে দলে দলে ॥
ক্ষুদ্র এক নদী বহে ঝুরু ঝুরু স্বরে।
তার ধারে বসি প্রভু সন্ধ্যাপূজা করে ॥

যেমন মালাবারকে মল্লার বলিত, সেইরূপ কানারাকে কাণ্ডার বলিত। পূর্ব্বে নীলগিরি-পর্ব্বতশ্রেণী কানারাপ্রদেশের অন্তর্গত ছিল। এক্ষণে নীলগিরি একটী স্বতন্ত্র জেলা হইয়াছে। ইহার প্রধান নগর মান্দ্রাজ-শাসনকর্ত্তার শৈলনিবাস-উতকামন্দ।

"The Nilgiri Hills—properly Nila-giri, the Blue-Mountain, consist of the great plateau about 35 miles long, 20 broad and some 6500 feet high on an average, upheaved at the junction of the ranges of the Eastern and

Western Ghats······The name Nilagiri, which is at least 800 years old and was bestowed by the dwellers in the plains below the plateau, was doubtless suggested by the blue haze which envelops the range in common with most distant hills of considerable size"—Nilgiri Gazetteer, p. 1.

কাণ্ডার দেশে (দক্ষিণ কানারা ?) আসিয়া চৈতন্যদেব উড়িপিতে (Udipi ; উড়ুপ) নিশ্চয় গিয়াছিলেন। যদিও গোবিন্দের করচা প্রামাণিক গ্রন্থ, তত্রাচ গোবিন্দের সময়ের অভাবে (তাঁহার এই করচা চৈতন্যদেবকে লুকাইয়া রচনা করিতে হইয়াছিল), সামান্য লেখাপড়া জানার জন্য এবং ঐ দেশীয় ভাষা-অভিজ্ঞতার অভাবে (চৈতন্যদেব সেই দেশের ভাষা না জানিলেও সংস্কৃতে কথাবার্ত্তা কহিতেন) ভ্রমণবৃত্তান্ত যথাযথ করচা করিয়া রাখিতে পারেন নাই। উড়ুপ হইতেছে মধ্বাচারী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র। চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যদেবের উড়ুপ-কৃষ্ণ দেখিবার কথা আছে। চৈতন্যদেবের মনে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি যখন অদ্বৈতবাদীদিগের কেন্দ্রস্থল শৃঙ্গেরীমঠে গমন করিয়াছিলেন, তখন যে তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মের একটী প্রধান কেন্দ্র উদিপীতে যাইয়া ঐ স্থানের বিখ্যাত কৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শনকরিবেন না, ইহা সম্ভব নয়।

কাণ্ডার-দেশে আসিয়া নীলগিরি (উতকামন্দের নিকট) দেখিয়া চৈতন্যদেব মুগ্ধ হইলেন। সেস্থান হইতে উত্তরাভিমুখে (অনেকদূর ভ্রমণ করিয়া) গুর্জ্জরীনগরে [১] আসিলেন। এখানে তিনি অগস্ত্য-কুণ্ডে

১। সেনমহাশয় বলেন হাইদারাবাদের নিকটে ; কিন্তু আমরা খুঁজিয়া পাইলাম না। গুর্জ্জরীনগর পরিত্যাগ করিয়া সাতদিন ক্রমাগত চলিয়া বিজাপুরে চৈতন্যদেব পৌঁছিয়া-

স্নান করিলেন। গুর্জ্জরীতে অর্জ্জুননামা এক পণ্ডিতকে এবং অন্যান্য লোককে অপূর্ব্ব ভাবাবেশদ্বারা হরিনামে মত্ত করাইলেন। সাতদিন অবিশ্রান্ত ভ্রমণের পরে বিজাপুরে আসিলেন। এইস্থানে পর্ব্বতের উপরে হরগৌরী দেখিয়া উত্তর-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাহার পরে নীলবর্ণ সহ্যগিরি দেখিয়া আনন্দে পুলকিত হইলেন। সহ্যগিরি দেখিয়া গোবিন্দের মনে মলয়গিরির কথা উদয় হইল—

"একেবারে দেখা গেল সহ্য-কুলাচল।
কুলাচল দেখি প্রভু আনন্দে বিহ্বল॥
মহেন্দ্র-মলয়-গিরি দেখেছি নয়নে।
সহ্যগিরি শোভা আহা না যায় কথনে॥
দূর হৈতে নীলবর্ণ রেখা দেখা যায়।
সেই স্থান দেখিবারে মোর প্রভু ধায়॥

কাবেরীনদীর উত্তরে অবস্থিত পশ্চিমঘাট-পর্ব্বতশ্রেণীর অংশকে সহ্যগিরি বা সহ্যপর্ব্বত এবং দক্ষিণাংশকে মলয়-পর্ব্বত অথবা মহেন্দ্রমলয়গিরি বলে। তিনেবেলী ও ত্রিবঙ্কুরের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণীকেও 'সহ্যাদ্রি' বলে, ত্রিবন্দ্রমের প্রত্নতত্ত্ববিভাগ লিখিয়াছেন।

তাঁহার ধূলামাখা দেহ, পরণে কৌপীন ও দীনবেশ দেখিয়া ও মুখে

ছিলেন। দুইশত হইতে দুইশত ত্রিশ মাইল গুর্জ্জরী হইতে বিজাপুর দূর হইতে পারে কারণ কখন কখন চৈতন্যদেব ত্রিশ ক্রোশ দুইদিনে গমনকরিতেন (গোঃ কঃ পৃঃ ৮০)। গুণ্টকল হইতে বেজওয়াদা আসিতে গজলপল্লী (Gazulapalli = গুর্জ্জরী পল্লী ?) এবং আর একটী গজ্জল কোণ্ড (Gajjalakonda = গুর্জ্জরী কুণ্ড ?) ষ্টেশান এবং ডাকঘর আছে। এই দুই ষ্টেশানহইতে বিজাপুরে রেলরাস্তা ধরিয়া যাইতে অনেকদূর হয়, কিন্তু সোজা-রাস্তায় ২৩০ মাইলের বেশী বোধহয় হইবে না। গুণ্টকুল হইতে গজ্জলপল্লী ৯৯ মাইল এবং গজ্জলকোণ্ড ১৭৮ মাইল।

হরিনাম শ্রবণকরিয়া অনেকে হরিনামে মত্ত হইলেন। ক্রমে তিনি পূর্ণনগরে (সম্ভবতঃ পূণা) আসিলেন। এইস্থানে আসিবার পূর্ব্বে বোধ হয় তিনি পাণ্ডুপুরে গমন করিয়াছিলেন।

আমাদিগের মনে হয় গোবিন্দদাস পাণ্ডুপুরে [১] (**Pāndupur, Pandharpur on the southern bank of the Bhimā—N. L. Dey**) লিখিতে বিস্মৃত হইয়াছেন। এইস্থানে (চৈঃ চঃ মধ্য—৯ম-১৪৩) চৈতন্যদেবের সহিত শ্রীরঙ্গপুরীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন যে তিনি মাধবেন্দ্রপুরীর (চৈতন্যদেবের গুরু ঈশ্বরপুরীর গুরুর) সহিত নবদ্বীপে আসিয়া জগন্নাথমিশ্রের (চৈতন্যদেবের পিতার) অতিথি হইয়াছিলেন এবং তাঁহার বাটীতে মোচার ঘণ্ট খাইয়াছিলেন এবং আরও বলিয়াছিলেন যে জগন্নাথের 'যোগ্য' পুত্র (বিশ্বরূপ) সন্ন্যাসী হইয়া শঙ্করারণ্য-নাম গ্রহণকরিয়াছিলেন এবং পাণ্ঢারপুরে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব এখানে বিঠ্ঠল ঠাকুর (বিঠোবা-বিষ্ণু) দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এইস্থানে তিনি না আসিয়া থাকিতে পারেন না, কারণ তাঁহার ভ্রাতার অন্বেষণ তাঁহার দাক্ষিণাত্যভ্রমণের অন্যতম কারণ। দাক্ষিণাত্যভ্রমণদ্বারা চৈতন্যদেব তিনটী উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন—(১) তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা-বিশ্বরূপের অনুসন্ধান, (২) তীর্থদর্শন এবং (৩) দাক্ষিণাত্যে হরিনামপ্রচার। পাণ্ঢারপুর বিজাপুর ও পূণার মধ্যে অবস্থিত। গোবিন্দের করচাতে বিশ্বরূপ-অন্বেষণের কথা নাই। কিন্তু সার্ব্বভৌম, নিত্যানন্দপ্রভৃতির সহিত চৈতন্যদেবের যে কথোপকথন হইত, তাহার সমস্ত ভৃত্য গোবিন্দের সমক্ষে হইত না। এইজন্য কতকগুলি বিষয় গোবিন্দের অজ্ঞাত

১। পাণ্ঢারপুর (একটী বিখ্যাত রেলওয়ে Junction) শোলাপুরের পশ্চিমে, বিজাপুরের উত্তরপশ্চিমে : পাণ্ঢারপুরের উত্তরপশ্চিমে পূণা।

থাকিত। সেইজন্য আমাদের চৈতন্যচরিতামৃতের এই বৃত্তান্ত (পৃঃ ২৩৪ দেখুন) অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। এমন হইতে পারে যে পাণ্ঢারপুরের সন্নিকটে অর্থাৎ বিজাপুরে আসিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতার দেহত্যাগ শ্রবণকরিয়া আর তিনি পাণ্ঢারপুরে আসেন নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি (পৃঃ ২৩৫) যে যখন তিনি দাক্ষিণাত্যভ্রমণে বহির্গত হইলেন, তখন তিনি বিশ্বরূপের তিরোধানের বিষয় জানিতেন না ; জানিলে তিনি 'বিশ্বরূপ উদ্দেশ্যে আমি অবশ্য যাইব' বাক্য ব্যবহার করিতেন না। বহুসদ্‌গুণবিশিষ্ট হইলেও তিনি সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন না। সর্ব্বজ্ঞ হইলে তাঁহার সন্ন্যাসের পর নিত্যানন্দ তাঁহাকে যমুনা বলিয়া ভাগিরথী দেখাইতে পারিতেন না এবং রামকেলি [১] হইয়া বৃন্দাবনগমন তিনি মনে স্থান দিতেন না। নিত্যানন্দ গঙ্গাকে যমুনা বলিলে তাঁহাকে বিশ্বাসকরিয়া চৈতন্যদেব নিম্নলিখিত যমুনা-স্তব পাঠকরিয়া ভাগিরথীতে স্নান করিলেন—

> চিদানন্দভানোঃ সদানন্দসূনোঃ
> পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী।
> অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী
> পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী ॥ (চৈঃ চঃ না-৫ম-১৩)।

(যিনি জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ সেই নন্দনন্দনের অতীব প্রণয়ের পাত্র এবং যাঁহার কলেবর দ্রবব্রহ্মময়, যিনি জীবগণের পাপসকল বিনষ্ট করিয়া পরম মঙ্গল বিধানকরেন, সেই সূর্য্যনন্দিনী-যমুনা আমাদিগকে

১। গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অবস্থিত। গৌরাঙ্গদেবের রামকেলিতে পদার্পণের স্মৃতিবার্ষিকী জ্যৈষ্ঠমাসের সংক্রান্তিতে প্রতিবৎসর অনুষ্ঠিত হয় এবং এখানে সেই সময়ে একটা মেলা বসে।

পবিত্রকরুন। রাঃ বিঃকৃত অনুবাদ)। সর্ব্বজ্ঞ হইলে রূপ ও সনাতনকে উদ্ধার করিবার জন্য রামকেলি যাইতে পারিতেন বটে ; কিন্তু গৌড় হইয়া বৃন্দাবন যাইব, একথা বলিতেন না। সর্ব্বজ্ঞ হইলে লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করিলেও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে তিনি বিবাহ করিতেন না। সর্ব্বজ্ঞ হইলে রাজমহেন্দ্রী হইতে বেজওআদার নিকট মঙ্গলগিরিতে পান্নানরসিংহ দেখিয়া সিদ্ধবটে এবং পরে ত্রিপদীতে আসিতেন এবং ত্রিপদী হইতে পুনরায় দুইশত মাইল উত্তরে পান্নানরসিংহে যাইতেন না (৪০৩ পৃঃ দেখুন)।

আমরা গোবিন্দলিখিত পূর্ণনগরের কথা আলোচনা করিতেছিলাম। গোবিন্দ বলিতেছেন যে পূর্ণনগরে অচ্ছসরোবর ছিল। পূর্ণনগর সম্ভবতঃ পূণা। গোবিন্দ ভুল করিয়া কিম্বা 'পূণা' অশুদ্ধ ভাবিয়া 'পূর্ণ' শব্দ ব্যবহারকরিয়াছিলেন। শরচ্চন্দ্রশাস্ত্রী তাঁহার 'দক্ষিণাপথভ্রমণে' লিখিয়াছেন , "পূণার পুরাতন নাম 'পুণ্যপুর'। পুণ্যসলিলা মূঁলা ও মুঠানদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত বলিয়া উহার পুণ্যপুর নাম হয়।" এখানে এখনও পর্য্যন্ত সংস্কৃত ভাষা, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতির বিশেষরূপে চর্চ্চা হইতেছে। কিন্তু গোবিন্দবর্ণিত 'অচ্ছসরোবর' খুঁজিয়া পাইলাম না। পার্ব্বতীহ্রদ, কালাহ্রদ প্রভৃতি হ্রদ এক্ষণে পূণানগরীতে দৃষ্ট হয়। তাহা আধুনিক কিম্বা প্রাচীন হ্রদের নূতন সংস্করণ ঠিক করিয়া বলা যায় না। নিজামরাজ্যে পূর্ণ বলিয়া **M. S. M. Railway**র একটী **Junction** আছে। ইহা পূণা হইতে প্রায় দেড়শত মাইল উত্তরপূর্ব্বে। বিজাপুরের পশ্চিমে, রত্নগিরির দক্ষিণে পূর্ণগড় বলিয়া একটী নগর আছে। 'পূর্ণ' পূর্ণগড়ের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হইতে পারে। পূর্ণগড় সমুদ্রের তীরে। চৈতন্যদেব পূর্ণগড়ে যাইলে সমুদ্রের কথা বলিতেন। সেইজন্য আমরা মনে করি 'পূর্ণ' পূণার গোবিন্দকৃত বিশুদ্ধ সংস্করণ। পূর্ণনগরে

অনেক চতুষ্পাঠী ছিল। এইস্থানে একজন অদ্বৈতবাদী [১] তাঁহাকে পরিহাসকরিয়া বলিয়াছিলেন যে ঐ সরোবরের জলে শ্রীকৃষ্ণ লুকাইয়া আছেন। চৈতন্যদেব তাঁহার কথা বিশ্বাসকরিয়া জলে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। তাহার পরে অনেক লোক তাঁহাকে জলহইতে তুলিয়াছিলেন এবং তাঁহারা এই ব্রহ্মবাদীকে ভর্ৎসনাকরিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব বলিলেন (গোঃ কঃ পৃঃ ৫৩)—

"প্রভু বলে, 'কেন বৃথা ভর্ৎস মহারাজে ?
জলে, স্থলে, শূন্যে কৃষ্ণ নিয়ত বিরাজে ॥
আগে কৃষ্ণ, পাশে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ জগন্ময়।
সেই দেখিবারে পায়, যেই ভক্ত হয় ॥

* * * *

মোহ-অন্ধকারে জীব আপনা পাশরি।
বদনেতে একবার নাহি বলে হরি ॥
ঐশ্বর্য্যের মিছা গর্ব্ব না করিও ভাই।
হরেকৃষ্ণ বলি কাল কাটাও সদাই ॥
এই বিশ্ব ঢাকিয়াছে পাপ-অন্ধকারে।
হরি-ভিন্ন কিছু সত্য নাহিক সংসারে ॥
পাখী দুটী দেহবৃক্ষ যে দিন ছাড়িবে।
সেই দিন জড়দেহ পড়িয়া রহিবে ॥
জাগিয়া স্বপন আর কেন দেখ ভাই ?
কেহ না বাঁচিবে চির মরিবে সবাই ॥

১। শরচ্চন্দ্রশাস্ত্রী বলেন যে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দেও পুণাতে দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদসম্বন্ধে পুণার মহাদেবশাস্ত্রীর সহিত তাঁহার তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল (পৃঃ-২০৫)।

এস ভাই সবে মিলে হরিধ্বনি করি।
নাম শুনে কৃতান্ত কাঁপিবে থরথরি' ॥"

এই বলিয়া তাঁহার ভাবাবেশ হইল।

পূর্ণনগর ত্যাগকরিয়া এবং অনেক পর্ব্বত অতিক্রমকরিয়া পূর্ব্বদিকে পাটস-গ্রামের নিকটে আসিয়া ভোলেশ্বরশিব দর্শনকরিলেন—

"ভোলেশ্বর দেখি প্রভুর প্রেম উপজিল।
যোড় হস্তে স্তব-স্তুতি বহুত করিল ॥
অজ্ঞান হইয়া গোরা পড়িয়া ধরায়।
উলটি পালটি কত গড়াগড়ি যায় ॥"

ভোলেশ্বরের নিকটে দেবলেশ্বরশিব দর্শন করিলেন। সেস্থান হইতে দক্ষিণপশ্চিমে আসিয়া জেজুরীনগরে খাণ্ডবাদেবের-দাসী অসচ্চরিত্রা মুরারিদিগকে হরিনামে মত্ত করাইলেন। এক্ষণেও জেজুরীতে খাণ্ডোবা-দেবের মন্দির আছে (**Bombay Gazetteer, Vol. XVIII, Part III, p. 133**)। সেস্থান হইতে উত্তরপশ্চিমে চোরানন্দীবনে গমন করিয়া দস্যুনারোজীকে উদ্ধারকরিলেন। তাহার পরে নারোজী ও গোবিন্দের সহিত মূলানদীতে (পূণার উত্তরদিকে) স্নান করিলেন। চৈতন্যদেব বলিলেন যে এই নদী পুণ্যতীর্থ এবং ইহাতে স্নান প্রশস্ত। পাটস পূণার ৪০ মাইল পূর্ব্বে। এখানে একটী রেল-ষ্টেশান এবং পূণার অধীনস্থ একটী ডাকঘর আছে। জেজুরী পূণা হইতে ৩২ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে। এখানে চৈতন্যদেব মুরারিগণকে উদ্ধারপূর্ব্বক চোরানন্দীবনে নারোজীকে উদ্ধারকরিলেন এবং তাহার পর খণ্ডলা যাইলেন। খণ্ডলা পূণার ৪১ মাইল উত্তরপশ্চিমে। গোবিন্দদাসের করচাতে চৈতন্যদেবের দৃষ্টস্থানের অনুক্রম—বিজাপুর, সহ্যগিরি (**Western**

Ghats), পূর্ণনগর, পাটস (ভোলেশ্বর), দেবলেশ্বর, জিজুরী অথবা জেজুরী, চোরানন্দীবন, খণ্ডুলা ও মুলানদী। পূণার উত্তর-পশ্চিমে খণ্ডুলা এবং দক্ষিণপূর্ব্বে জেজুরী। তাহা হইলে চৈতন্যদেব বিজাপুর হইতে উত্তরপশ্চিমে পূণায় গিয়াছিলেন। তাহার পরে পূর্ব্বাভিমুখে পাটসে গিয়াছিলেন। তাহার পরে পুনরায় দক্ষিণপশ্চিমে জেজুরীতে আসিয়াছিলেন এবং চোরানন্দীবন অতিক্রমকরিয়া উত্তর-পশ্চিমে খণ্ডুলায় আসিয়া ভীমার শাখা মুলানদীতে স্নান করিয়াছিলেন। জেজুরীর উত্তরপশ্চিমে খণ্ডুলা। চোরানন্দীবন জেজুরী হইতে উত্তরপশ্চিমে খণ্ডুলাপর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং পূণার পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। খণ্ডুলার অধিবাসীরা চৈতন্যদেবকে অতিথি করিবার নিমিত্ত মারামারি করিতে লাগিল। 'বহু আতিথেয় হয় যত খণ্ডুলিয়া' (পৃঃ ৬৮)। একজন ধনী চৈতন্যদেবকে একখানা কাপড় এবং কিছু টাকা দিতে চাহিলে চৈতন্যদেব বলিলেন—

'হাসিয়া কহেন প্রভু, 'শুন মহারাজ।
বিলাস বিভবে মোর নাহি কোন কায॥
পরিধানে ছিন্ন বস্ত্র বহু করি মানি।
কোন প্রয়োজন অর্থে নাহি এই জানি॥

*　　　*　　　*

মায়ার বন্ধনে থাকি কোন সুখ নাই।
প্রেমভক্তি সহ মুখে হরি বল ভাই॥'

তাহার পরে হরিনাম বলিতে বলিতে তিনি ভগবৎপ্রেমে বিভোর হইলেন।

প্রভাতে উঠিয়া চৈতন্যদেব উত্তরপূর্ব্বে নাসিকে (পঞ্চবটীতে) যাইলেন। এইস্থানে শূর্পণখার নাসিকা লক্ষ্মণ ছেদনকরিয়াছিলেন।

এখানে তিনি রামের পর্ণকুটীরের স্থান (ত্রিমুক অর্থাৎ ত্র্যম্বকপর্ব্বতের কাছে) দর্শন করিলেন।[১]

বনের ভিতরে রামের পর্ণকুটীরে রামের চরণচিহ্ন দেখিয়া ভক্তির আবেগে তাঁহার ভাবাবেশ হইল। তাহার পরে পঞ্চবটীতে একটী গুহামধ্যে লক্ষ্মণ-প্রতিষ্ঠিত গণেশ দর্শনানন্তর তিনি ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

তাহার পরে উত্তরপশ্চিমে সমুদ্রতীরে দমন[২]-নগরে পৌছিয়া সেইদিনই উত্তরদিকে সুরথের রাজধানী সুরাট[৩] -অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এইস্থানে উপনীত হইয়া তিন দিন অতিবাহিত করিলেন এবং অষ্টভুজা দুর্গা দেখিলেন। এইস্থানে এক সন্ন্যাসীর সহিত কথা কহিতে কহিতে দেখিতে পাইলেন যে একজন ব্রাহ্মণ দুর্গার সমক্ষে বলি দিবার জন্য একটী ছাগল আনয়নকরিল। ইহা দেখিয়া চৈতন্যদেব বলিলেন (গোঃ কঃ-পৃঃ ৬০)—

"প্রভু বলে, বলি দাও ভক্ষণের তরে।
নাহি জান কোথায় হইবে গতি পরে॥
পবিত্র মূরতি দেবী শাস্ত্রের বচন।
কেমনে করেন তিনি অভক্ষ্য-ভক্ষণ ?

১। গ্রন্থকারের 'Stray Thoughts' কিম্বা 'রামায়ণের প্রকৃত কথা' দেখুন।

২। দমন (Daman) পোর্ত্তুগীজদিগের অধিকারে ছিল।

৩। সুরাট তাপ্তীনদীর উপরে অবস্থিত, প্রাচীন নাম—সুরাষ্ট্র। সুরথ-রাজা যিনি দুর্গাপূজা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন তাঁহার সহিত সুরাটের সম্বন্ধ আছে ইহা প্রবাদ। বর্ত্তমান গুজরাট অথবা কাথিবাওয়ার উপদ্বীপকেও প্রাচীনকালে 'সুরাষ্ট্র' বলিত। 'Not far from the town of Surat there is a sacred village called Pulpāra on the Tāpti which is visited by pilgrims and Sannyāsis from the most remote parts of India'—N. L. Dey.

লক্ষ বলি দিয়াছিল সুরথ-ভূপতি।
প্রেত-পুরে লক্ষ অসি পড়ে তার প্রতি॥
আলোচনা নাহি কর শাস্ত্রের বচন।
পশু-হিংসা করি কর ধর্ম্ম-আচরণ॥
মাংসাশী রাক্ষসগণ খাইবার তরে।
ব্যবস্থা দিয়াছে পশুহিংসা করিবারে॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।"

* * *

আত্মারে বাহির কর শরীর হইতে।
মৃত দেহ মধ্যে আত্মা পার কি পূরিতে?
দেবীর সম্মুখে যদি কেহ ভক্তিভরে।
নরবলি-রূপে তব শিরশ্ছেদ করে॥
কেমনে তোমার চিত্ত করে বল ভাই?
পশু ছাড়ি দেহ মুহি চক্ষে দেখে যাই॥
অষ্টভুজা ভগবতী মদ্যমাংস খাবে।
একথা শুনিলে সাধু হাসিয়া উড়াবে॥
সনাতন ধর্ম্মে দেহ নিজ নিজ মন।
শাস্ত্র-অনুসারে ছাড় মন্দ আচরণ॥
পরম বৈষ্ণবী দেবী মাংস নাহি খায়।
তবে কেন বলিদানে ভুলাও তাঁহায়?
করিলে জীবের হিংসা যদি ধর্ম্ম হয়।
তবে কেন দস্যুগণে সাধু নাহি কয়?
প্রতিদিন মৎস্যজীবী বহু মৎস্য মারে।
তবে কেন ধার্ম্মিক না কহিব তাহারে?

নরহত্যা, পশুহত্যা, হয় মহা পাপ।
এই পাপ আচরিলে বাড়িবে ত্রিতাপ॥'
অষ্টভুজা ভগবতী দেখিবারে গিয়া।
এই উপদেশ দিলা শাস্ত্র বিচারিয়া॥"

চৈতন্যদেবের উপদেশ শ্রবণকরিয়া ব্রাহ্মণ ছাগল ছাড়িয়া দিলেন এবং পুষ্প ও বিল্বদলদ্বারা দেবীকে পূজা করিয়া চলিয়া গেলেন।

সুরাট হইতে উত্তরদিকে গমনপূর্ব্বক তাপ্তীনদী বলিরাজাস্থাপিত বামনমূর্ত্তি দর্শনকরিয়া ভঁরোচ[১] (Broach) নগরে নর্ম্মদাতীরে বলিরাজার যজ্ঞকুণ্ড চৈতন্যদেব দেখিলেন। তাহার পরে নর্ম্মদায় স্নান করিয়া তিনি বরোদায়[২] যাইলেন। বরোদা হইতে চৈতন্যদেব ২২ মাইল উত্তরে ডাকোরে ডাকোরজী অর্থাৎ গোমতীদ্বারকার রণ ছোড়জীর 'আসল' মূর্ত্তি দর্শনকরিয়া পুনরায় বরোদায় ফিরিয়া গেলেন। পরমভক্ত বরোদারাজ তখন 'গোবিন্দসেবায় রত' ছিলেন। গোবিন্দ-মূর্ত্তি দেখিয়া চৈতন্যদেবের ভাবাবেশ হইল। এস্থানে নারোজীর জ্বরে মৃত্যু হইলে তিনি ভিক্ষা করিয়া তাহার দেহ সমাহিত করিলেন। বরোদা হইতে উত্তরপশ্চিমদিকে গমনপূর্ব্বক মহানদী (মহী-নদী) পারহইয়া আহ-ম্মদাবাদে পৌছিলেন। এ স্থানের লোকেরা অতিথিবৎসল। এই

১। ব্রোচ সুরাটের উত্তরপূর্ব্বে ; ভৃগুক্ষেত্র ; ভরুকচ্ছ, Greek—Barygaza ; বরোচ, ব্রোচ। মেহতা মহাশয় (Mr. J. B. Mehta) ব্রোচ হইতে লিখিয়াছেন যে বামনদেবের মন্দির এক্ষণেও ব্রোচে আছে, এবং নর্ম্মদার উপরে যে বলীরাজার যজ্ঞকুণ্ড ছিল, তাহা নর্ম্মদার জলপ্লাবনে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখানে ভৃগুঋষির একটী প্রাচীন মন্দির আছে এবং চৈতন্যদেবের সমসাময়িক বল্লভাচার্য্যের একটী 'বৈঠক' (মঠ) আছে।

২। সুরাটের উত্তরপূর্ব্বে।

স্থানে নন্দিনী-বাগাননামক একটী সুন্দর উদ্যান ছিল। সেখানে চৈতন্যদেবের সহিত একজন শ্রীমদ্‌ভাগবতের ভক্ত-পাঠকের সাক্ষাৎ হইল। নগরের পশ্চিমদিকে শুভ্রামতী [১] (Sabarmati) নদীতীরে কুলীনগ্রামনিবাসী রামানন্দবসু ও তাঁহার ভৃত্য গোবিন্দচরণের সহিত চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ হইল।

আহম্মদাবাদ হইতে দক্ষিণদিকে দ্বারকাভিমুখে চারিজন যাত্রা করিলেন। শুভ্রামতীতে স্নান করিয়া ঘোগানামক [২] একটী গণ্ডগ্রামে আসিয়া দুষ্ট বালাজী ও বারমুখী-বেশ্যাকে উদ্ধার-করিলেন। সেস্থান হইতে তিনি সোমনাথ-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। জাফরাবাদে [৩] একরাত্রি তিনি অতিবাহিত করিলেন। জাফরাবাদের লোক দরিদ্র হইলেও আতিথ্য করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন। তাহার পরে সোমনাথে [৪] পৌছিয়া মুসলমানবিধ্বস্ত মন্দির দেখিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। এ স্থানে সোমনাথ-শিবের নূতন মন্দির ছিল। সোমনাথের নিকটেই বর্ত্তমান প্রভাসতীর্থ। চৈতন্যদেবের সময়ে গোপীতালাওকে 'প্রভাসতীর্থ' বলিয়া পাণ্ডারা বুঝাইয়া দিতেন। সেইজন্য সোমনাথের নিকটে চৈতন্যদেবের প্রভাসতীর্থ দেখিবার কথা নাই।

কোজেন সাহেবের নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি পড়িলে অনেকতথ্য

১। আহম্মদাবাদ শুভ্রামতী (Sabarmati) নদীর তীরে অবস্থিত। বরোদা হইতে আহম্মদাবাদে যাইতে হইলে মহী-নদী (মহানদী নয়) পার হইতে হয়। মহী-নদী মধ্য-ভারত হইতে দক্ষিণপশ্চিমদিকে প্রবাহিত হইয়া ক্যাম্বে-উপসাগরে পড়িয়াছে।

২। কাম্বে-উপসাগরের পশ্চিমে।

৩। ভাওনগর ও গোঘার (ঘোগার) দক্ষিণপশ্চিমে ও সমুদ্রতীরে।

৪। সমুদ্রতীরে ও জাফরাবাদের পশ্চিমে।

জানা যাইবে—Somnātha and other Medieval Temples in Kāthiāwād by Henry Cousens M. R. A. S. (Govt. of India)—

The whole of the southern and south-eastern districts of Gujerat or Kāthiāwād or Kāthiāwār constitute classic ground, for it was here that Krishna lived and carried out many of his exploits after his departure from Mathurā, and it was here, also, in the vicinity of the sacred city of Prabhāsa-Pattan, that he eventually met his death at the hands of a careless hunter ....In this south-eastern corner of Kāthiāwād we have the sites of the ancient towns of Valabhi, Mula Dwārakā (the ancient Dwārakā, said to have been destroyed by a tidal wave on the death of Krishna), Mādhavapur, where Krishna married Rukmini.........

Kinloch Forbes thus describes Pattan and its environments as he found them in his day : the city of Deo Pattan, or Pattan-Somnāth as it is indifferently called, is situated on the eastern extremity of a bay on the south-coast of Kāthiāwār. The western headland of the same bay is occupied by the port of Veraval., which gives to the locality its more common name of Veraval-Pattan. A large and conspi-

cuous, but the modern temple of Śiva stands on the edge of the sea intermediate between the two towns. A few hundred yards in the rear of this temple may be seen the tank called Bhat Koond (Bhalkeśvara Tālāv or Bhalka or the Tank of the Arrow), the traditional scene of the death of Śri Krishna. "It is a pool of slimy water, surrounded with rough stonesteps, which may or may not be very old......After spending most of his life in and about Máthurā, Śrikrishna was advised to go to Prabhāsa with his Jādava kinsmen. On reaching the southern shore they indulged in liquor, quarrels and fights, until at last two brothers Balarāma and Krishna were left alive. Balarāma met his fate at the hands or rather poison-fangs of the great serpent Śesha and Krishna was left alone. Meditating one day by the side of this tank, with his foot upon his knee, a hunter, Jarā by name, seeing a movement by the tangled brushwood mistook him for a deer and discharged an arrow at him and killed him. Further inland the wild hill-district called 'Gheer' begins to rise, and in the remote distance appears the form of that famous sacred mountain which the people of Kāthiāwār delight to call 'the Royal Girnar'. On the east of Pattan

itself three beautiful rivers emerging from a level plain enriched with groves of mango and other trees, meet at a Triveni, held unusually sacred as the scene of the cremation of the body of Krishna. The whole locality indeed is filled with reminiscences of Krishna. The local Brāhmans call the neighbourhood 'Vairāgya-Kshetra' or 'the field of lamentation,' because it is said that Rukmini and the other wives of Krishna became Satis there."

"The history of the great temple of Somanātha has never been satisfactorily traced through its successive stages, nor is it likely to be, unless something very exceptional, in the way of inscriptions, turns up. As early as the times of the Yādavas of Dwārakā, we are told, pilgrimages to Prabhāsa are recorded, but the Mahābhārata makes no mention of Somanātha or of any other shrine in this neighbourhood. It is possible that the temple was established before the time of the Valabhis (A. D. 480-767), and, as they were Śaivites, if may have risen to importance during their time," Mahmud of Ghazni destroyed the Somanātha-temple in 1025." ...After smashing the linga and sacking the temple, Mahmud left, placing a governor, Mithā

Khān, there in charge of a garrison, and it was he, it would seem, who completed the destruction of the temple. Bhima Deva I (A. D. 1022-1072) of Anhillavāda-Pattan, who had been hovering about on the heels of Mahmud, and who foiled all his attempts to bring him to book, very soon afterwards rebuilt the temple, probably after driving out Mahmud's governor, and possibly upon the site of the former, and there can surely be little doubt that the portion of an older basement, that we see in the heart of the present old building, is part of his temple.........................Between that time and A. D. 1169, the temple, it would seem, again came to grief, or was suffered to fall into ruin, for it is in that year that the record of its reconstruction by Kumārapāla, who succeeded Siddharāja upon the throne of Gujarāt, is dated in the inscription still extant in the little temple of Bhadrakāli at Somanātha-Pattan, which is supposed to have originally been set up in the temple of Somanātha.······The temple was not destined to remain much longer unmolested, for the second great Mahammadan invasion, under Alaf Khān, a general under the Khalji king of Delhi, in A. D. 1297, swept down upon Pattan and

Somanātha was once more laid in the dust.……Yet another rebuilding of the prāsāda of Somanātha was taken in hand and carried out, as an inscription on Girnar tells us, by the local Chudasama king Mahipāladeva (A. D. 1308-1325), but it was apparently not completed during his life, for in another inscription on the same hill, it is recorded that his son, Khangār IV (A. D. 1325-1351), established or set up Somanātha (i. e., the linga) in the temple.……

……Soon after this, in A. D. 1413, Ahmad Shāh, the grandson of Muzafar and founder of the Ahmad Shahi dynasty of Āhmadābād, led an army against the Rā of Junāgadh, and is said to have destroyed the temple of Somapur on his way back to Āhmadābād, wherein were found many valuable jewels and other property."

……Then the site was changed to where now the last and present temple stands namely that built by queen Ahalyā-Bāi of Indore.

সোমনাথ হইতে উত্তরে জুনাগড়ে [১] যাইয়া চৈতন্যদেব রণছোড়জী দর্শনকরিলেন। এক্ষণে তীর্থ-যাত্রীরা জুনাগড়ে ইন্দ্রেশ্বরশিব ও নরসীজীর মন্দির দেখেন। এই স্থানের নিকটে গৃণার [২] পর্ব্বত-অভি-

১। সোমনাথের উত্তরে।

২। জুনাগড়ের সন্নিহিত পর্ব্বত গির্ণার (Girnar Hill—3663 feet)। গির্ণার

মুখে যাইতে যাইতে পথে তাঁহার পীড়িত ভর্গদেবনামা এক সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাকে নিম্বরস খাওয়াইয়া তিনি নীরোগ করিলেন। গৃণার-পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করিবার পূর্ব্বে এইস্থানে তাঁহার পদচিহ্ন (গুরুদত্তচরণ) রাখিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া চৈতন্য-দেবের অপূর্ব্ব ভাবাবেশ হইল। তাহার পরে ভদ্রানদী [১] পারহইয়া ধম্বিধর-নামক [২] এক জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। এই বন পারহইতে সাতদিন লাগিয়াছিল (গোঃ কঃ পৃঃ-৭১)—

"ধম্বিধর-ঝারি ক্রমে দেখিবারে পাই ॥
অত্যন্ত বিস্তৃত হয় ধম্বিধর-ঝারি।
ঝারিখণ্ড দেখে ত্রাস হইল আমারি ॥
সিংহ, ব্যাঘ্র নানা জন্তু থাকে এই স্থানে।
ইহা ভাবি ভয় বড় হইল পরাণে ॥

'গিরিনগরের' অপভ্রংশ। এস্থানে জৈনদিগের মন্দির আছে। শক-নৃপতি রুদ্রদামনের শিলালিপি (১৫০ খৃঃ) এখানে আছে। এই পর্ব্বতের উপরে গুরু অথবা ঋষি-দত্তাত্রেয়ের চরণচিহ্ন এখনও আছে। চৈতন্যদেবের সময়ের পাণ্ডারা শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বের চরণ-চিহ্ন বলিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। দত্তাত্রেয় বিষ্ণুর অবতার, অত্রিমুনি ও অনসূয়ার পুত্র।

১। জুনাগড়ের উত্তরে ভদর (ভদ্রা অথবা ভদ্রাবতী) নদী পোরবন্দরের প্রায় ২০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে আরব-সমুদ্রে পড়িয়াছে।

২। জুনাগড়ের উত্তরে ভদ্রানদীহইতে বেটদ্বারকার সন্নিহিত ওখাবন্দর পর্য্যন্ত এই বন বোধহয় বিস্তৃত ছিল। এই বনের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র খাল (ধোরাজী নদী ?) ছিল। জুনাগড়ের পোষ্টমাষ্টার লিখিয়াছেন যে এক্ষণে ধম্বিধরনামক কোন অরণ্য এখানে নাই। এই স্থানকে এক্ষণে মাণ্ডোয়া (Mandwa) পার্ব্বত্য প্রদেশ বলে।

ইঙ্গিতে বুঝিয়া প্রভু মোর অভিলাষ।
হাসিয়া বলিলা, 'কেন বৃথা কর ত্রাস ?
হরিনামে যমভয় যদি দূর হয়।
তবে কেন ঝারিখণ্ড দেখে পাও ভয় ?'
দলশুদ্ধ লয়ে মোরা হই ষোল জন।
ঝারি-মধ্যে প্রবেশিলা শচীর নন্দন॥
জঙ্গলের শোভা হয় অতি মনোহর।
কি কব শোভার কথা কহিতে বিস্তর !
কত বন্য পুষ্প ফুটি গন্ধ যোগাইছে।
কত শত বৃক্ষ লতা বাতাসে দুলিছে॥
ডালে বসি নানা পক্ষী করিতেছে গান।
সে গান শুনিলে হয় আকুল পরাণ॥
মধ্যে এক পথ মাত্র দুধারে জঙ্গল।
মাঝে মাঝে দেখা যায় সন্ন্যাসীর দল॥
মাথার উপরে সূর্য্য দেখিবারে পাই।
অমনি ক্ষুধার তরে ইতি উতি চাই॥
ভিক্ষার লাগিয়া এবে কার দ্বারে যাব ?
গ্রাম্য লোক নাহি এথা ভিক্ষা কোথা পাব ?
দুইধারে নানা বৃক্ষে ধরিয়াছে ফল।
ফল দেখে আমার বাড়িল কতূহল॥
আশ্চর্য্য ফলের কথা কহিতে না পারি।
কত ফল পাকিয়া শোভিছে সারি সারি॥
কামরাঙ্গা সম হয় ফলের গঠন।
হেন ফল কভু করি নাই আস্বাদন॥

আশে পাশে পড়িয়াছে ফল রাশি রাশি।
দুই হাতে ফল খায় যতেক সন্ন্যাসী ॥

* * *

চৌশিরা শিজ সম যেই গাছ শোভে।
আশ্চর্য্য তাহার ফল খাই অতি লোভে ॥
যত খাই নানা ফল দেখিবারে পাই।
খড়িয়াতে লই আর পেট ভরে খাই ॥
মানুষের গন্ধ নাই নিবিড় জঙ্গলে।
মাঝে মাঝে হরিধ্বনি করিছে সকলে ॥
না হইতে সন্ধ্যা পথে হইল আঁধার।
এক বৃক্ষতলে বৈসে শচীর কুমার ॥
মাঝে মাঝে রাজা স্থান দিয়াছে করিয়া।
সেইস্থানে প্রভু সঙ্গে উতরাই গিয়া ॥
বন-কাষ্ঠে ঘেরা স্থান ঘরদ্বার নাই।
সন্ন্যাসীরা এই স্থানে বসিলা সবাই ॥
করতালি দিয়া প্রভু নাম আরম্ভিল।
নাম শুনি সন্ন্যাসীরা মাতিয়া উঠিল ॥"

বনহইতে নির্গত হইয়া তিনি অমরাপুরী-গোপীতলা অর্থাৎ প্রভাসতীর্থে উপস্থিত হইলেন। এখানে যদুগণ পরস্পর বিবাদ করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রভাসের দক্ষিণে শ্রীকৃষ্ণের যজ্ঞকুণ্ড দেখিলেন। ইহাকেই কাম্যবন বলিত। শ্রীকৃষ্ণ এইস্থানে সত্যভামার সহিত বিহার করিতেন। এখানে তিনদিন অতিবাহিত করিয়া ১লা আশ্বিন, (১৪৩৩ শক, ১৫১১ খৃঃ) দ্বারকাভিমুখে প্রভাস হইতে গমন করিলেন। চারিদিন পরে দড়ির সেতুর উপর দিয়া রৈবতক-গিরিতে পৌছিলেন। গোবিন্দ

গোপীতালাও অথবা অমরাপুরীগোপীতলাকে প্রভাস বলিতেছেন॥ গোমতী-দ্বারকা হইতে গোপীতলাও ১৩ মাইল পূর্ব্ব-উত্তর দিকে। গোমতীদ্বারকা (বর্ত্তমান মূলদ্বারকা-রেলষ্টেশান) হইতে ভেটদ্বারকা (চৈতন্যদেবের দ্বারকা) প্রায় ১৯ মাইল উত্তরপূর্ব্বে। গোপীতালাও হইতে ভেটদ্বারকা আসিতে চৈতন্যদেবের চারিদিন লাগিবার কথা নয়। পাণ্ডারা চৈতন্যদেবকে গোপীতালাওয়ের দক্ষিণে (দক্ষিণপূর্ব্বে, জামনগর বা নবনগরের দিকে) যদুগণের যজ্ঞকুণ্ডাদি দেখাইবার নিমিত্ত লইয়া গিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহাদের কচ্ছউপসাগরের ধার দিয়া ভেট-দ্বারকা আসিতে চারিদিন লাগিয়াছিল এবং তিনি ১লা আশ্বিন (১৫১১ খৃঃ) দ্বারকায় (ভেট-দ্বারকায়) ওখাবন্দর হইতে দড়ির সেতু-দ্বারা খাঁড়ি পারহইয়া পৌছিয়াছিলেন।

চৈতন্যদেবের সময়ে এই খাঁড়ি দড়ির সেতুদ্বারা পারহইতে হইত। তাহার পরে ডোঙ্গা করিয়া পার হইতে হইত। এক্ষণে বোধহয় গোমতী-দ্বারকা হইতে রেলগাড়ী কিম্বা ঘোড়ারগাড়ী একবারে ভেটদ্বীপে লইয়া যায়। ঠাকুরদত্ত শর্ম্মা (দধীচি) লিখিয়াছেন—"পহলে লোগ খাড়ীসে ডোংগিয়োপর বৈঠকর ভেটদ্বারকাকী যাত্রা কর্তে থে, পরন্তু অব তো ধামসে (গোমতীদ্বারকাসে) হী সীধে ঠিকানেতক আরামসে পহুংচ জাতে হৈ। গাড়ীকা প্রবন্ধ হো গয়া হৈ।"

দ্বারকানগরীতে (বর্ত্তমান ভেটদ্বারকাতে) উপস্থিত হইয়া চৈতন্য-দেব বলিলেন (গোঃ কঃ-পৃঃ ৭৪)—

"সব অঙ্গে মাখ রজঃ অতি ভক্তি করি।
দেখিলে পুণ্যের ফলে দ্বারকা-নগরী॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব জনমের সুকৃতির বলে।
দ্বারকা-নগরী আজি দেখিলা সকলে॥"

এত শুনি সবে মিলি প্রণাম করিল।
গোরার আনন্দকূপ উথলি উঠিল॥
‘হরিবোল, হরিবোল’ বলিতে বলিতে।
ক্রমে উত্তরিয়া প্রভু হেলিতে দুলিতে॥
ভাবসিন্ধু উথলিল মর্য্যাদা লঙ্ঘিয়া।
কার সাধ্য রাখে আর প্রভুরে ধরিয়া॥
উলটি পালটি পড়ে পৃথিবীউপরে।
ক্রমে ক্রমে প্রবেশিল পুরীর ভিতরে॥
লোমাঞ্চিত কলেবর কাঁপিতে লাগিল।
নয়ন ফাটিয়া যেন অশ্রু বাহিরিল॥
‘কোথা হে দ্বারকাধীশ’ এই কথা বলি।
অশ্রুজলে ভাসাইলা দ্বারাবতী-স্থলী॥
সব এলোথেলো জটা খসিয়া পড়িল।
অতি উচ্চরবে গোরা কাঁদিয়া উঠিল॥
কি কব ভাবের কথা কহনে না যায়।
বার বার কৃষ্ণ বলি প্রভু ফুকরায়॥
দ্বারকাধীশের বাড়ী যবে প্রবেশিলা।
অমনি দ্বিগুণ ভাবে আনন্দে মাতিলা॥
কদম্বের ন্যায় শিহরিল কলেবর।
উলটি পালটি পড়ি ধূলায় ধূসর॥
ভাবে মাতোয়ারা প্রভু ঢুলু ঢুলু চায়।
দ্বারকাধীশের আগে ধরণী লোটায়॥
চারিদিকে পড়ে যেন ভক্তি উছলিয়া।
ফুলে ফুলে কান্দে মোর গোরা বিনোদিয়া॥

নয়ন মুদিয়া কভু অন্তরেতে চায়।
অন্তরের মধ্যে যেন কি দেখিতে পায়॥
কখন বা উৰ্দ্ধমুখে তাকাইয়া রহে।
নয়ন হইতে অশ্রু দর দর বহে॥
কৃষ্ণেরে দেখিয়া তনু পুলকে পূরিল।
এক দৃষ্টে তাঁর প্রতি চাহিয়া রহিল॥
শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করে তিনবার।
নম্র হয়ে প্রতিবার করে নমস্কার॥"

জুনাগড়ের নিকট গির্ণারপর্ব্বত, প্রভাস এবং গোপীতলাবিষয়ে চৈতন্যদেবের সময়ের পাণ্ডাদিগের বিবরণ এবং বর্ত্তমান সময়ের পাণ্ডাদিগের বিবরণ বিভিন্ন। গির্ণারপর্ব্বতের উপরের চরণচিহ্ন, গোবিন্দ বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বের চরণ-চিহ্ন এবং ইহার নাম গুরুদত্তচরণ—"এই কথা বলি পাণ্ডা বুঝাইয়া দিল।" কিন্তু ইহাকে এক্ষণে গুরুদত্তাত্রেয়-চরণ-চিহ্ন বলে। দত্তাত্রেয়-ঋষি অত্রিমুনির পুত্র, বিষ্ণুর অংশ এবং প্রহ্লাদের গুরু ছিলেন।

গোবিন্দ অমরাপুরী-গোপীতলাকে প্রভাসতীর্থ বলিতেছেন—

"নিকটে অমরাপুরী-গোপীতলা-নাম।
সেইখানে যাই সবে আনন্দের ধাম॥
ইহাকে প্রভাস-তীর্থ বলে সর্ব্বজনে।
প্রভাস দেখিয়া বহু প্রীতি পাই মনে॥
যদুগণ যেখানে ত্যজিল কলেবর।
সেইখানে প্রভু গিয়া কান্দিলা বিস্তর॥
মধুপানে মত্ত হয়ে যত যদুবীর।
পরস্পর যুদ্ধ করি ত্যজিল শরীব॥"

গুজরাট অথবা কাথিয়া-ওয়াড় উপদ্বীপের :উত্তরপশ্চিমে সমুদ্র-উপকূলে জামনগর কিম্বা নবনগর অবস্থিত। মূল অথবা গোমতী-দ্বারকা জামনগর হইতে রেলে সমুদ্রের উত্তর-পশ্চিমকূলে ৮৭ মাইল দূরে অবস্থিত। গোমতী-দ্বারকার উত্তরদিকে সমুদ্রউপকূলে প্রায় ১৮ মাইল দূরে ওখা-বন্দর। ওখা-বন্দরের সন্নিকটে ভেট অথবা বেট নামক ক্ষুদ্র দ্বীপ। ইহা কচ্ছ-উপসাগরে অবস্থিত। ভেটদ্বীপ এবং ওখা-বন্দরের মধ্যে একটী নাতিদীর্ঘ কচ্ছ-উপসাগরের খাঁড়ি আছে। ভেট-দ্বীপকে ভেট-দ্বারকা বলে। চৈতন্যদেবের সময়ে এই ভেট-দ্বারকাকে সম্ভবতঃ দ্বারকানগরী বলিত। এই দ্বীপটী দক্ষিণপশ্চিম হইতে উত্তরপূর্ব্ব সীমাপর্য্যন্ত সাত মাইল দীর্ঘ হইবে। এই দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমভাগের অর্দ্ধেক অংশ প্রায় ৪০ হাত উচ্চ একটী পর্ব্বত (পথরীলা)। ইহাকে সম্ভবতঃ রৈবতকপর্ব্বত বলিত। ভেটদ্বারকার লোকেরা ইহাকে শ্রীকৃষ্ণের বিহারস্থল বলেন। ওখাবন্দর এবং ভেটদ্বারকার মধ্যবর্ত্তী খাঁড়ি চৈতন্যদেব দড়ীর সেতুদ্বারা পারহইয়াছিলেন। ভেটদ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ প্রদ্যুম্ন, রণছোড়জী [১] ও ত্রিবিক্রমজীর মন্দিরআছে। মূল-দ্বারকা অথবা গোমতীদ্বারকার দক্ষিণপশ্চিমদিকে একটী খাল আছে। এই খালের নাম গোমতী। সমুদ্রে জোয়ার হইলে এই খাল জলে পূরিয়া যায়। এইজন্য ইহাকে গোমতীদ্বারকাও বলে। গোমতীর উত্তরতটে নয়টী ঘাট আছে। গোমতীদ্বারকায় রণছোডজীর মন্দির প্রসিদ্ধ।

১। কালযবন কিম্বা জরাসন্ধের ভয়ে রণ ত্যাগকরিয়া মথুরাহইতে দ্বারকায় আসিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের 'রণছোড়জী' নাম হইয়াছে। এ স্থানে প্রবাদ আছে যে আসল দ্বারকা সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত। এক্ষণে সেই দ্বারকার 'আশ-পাশ' অর্থাৎ সন্নিহিত স্থানকে দ্বারকা বলে।

গোমতীদ্বারকার প্রায় ১৬০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে সমুদ্র-উপকূলে ভেরাবল এবং পাটন অর্থাৎ প্রভাসপত্তন এবং সোমনাথ-নগর অবস্থিত। ভেরাবল জুনাগড়হইতে ৫০ মাইল দক্ষিণে। গোমতীদ্বারকাহইতে ১৩ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অর্থাৎ জামনগরের দিকে গোপীতলা অথবা গোপীতালাওনামক পুষ্করিণী অবস্থিত। গোবিন্দ বলিতেছেন যে ইহাই প্রভাসতীর্থ কিন্তু আধুনিক পাণ্ডাগণ এবং পোরবন্দরের পোষ্ট-মাষ্টারমহাশয়ের মতে গোপীতলার অন্ততঃ ১০০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে সমুদ্র-উপকূলে ভেরাবলের নিকট প্রভাসতীর্থ অবস্থিত। গোপীতলার দক্ষিণে (দক্ষিণপূর্ব্বে) কাম্যবনে ((গোবিন্দ বলিয়াছেন) সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণ সহ বিহার করিতেন। গোবিন্দ বলিতেছেন যে এই স্থানে দশজন পাণ্ডা আসিয়া চৈতন্যদেবকে "একে একে সব স্থান দেখাতে লাগিল"। গোপীসরোবরের পীত মৃত্তিকা অথবা গোপীচন্দনদ্বারা বৈষ্ণবেরা তিলকচিহ্ন রচনা করেন। গোপীতালাও বলিয়া কেন নাম হইল এই বিষয়ে ঠাকুরদত্তশর্ম্মামহাশয় বলেন যে শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের পর গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুনের শৌর্য্যবীর্য্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল এবং তিনি গোপী-দিগকে (মতান্তরে যাদবীদিগকে) দস্যুহস্ত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হন্ নাই। এই ঘটনা গোপীতালাও অথবা গোপী-সরোবরের নিকট ঘটিয়াছিল—ইহা প্রবাদ। কেহ কেহ বলেন যে প্রভাসে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ শ্রবণকরিয়া গোপীগণ গোপীসরোবরে তাঁহাদের জীবন বিসর্জ্জনদিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সোমনাথ, বেরাবল এবং প্রভাসপত্তন 'কাছাকাছি' তিনটী স্থান। আমরা সকলেই জানি হিন্দুবিদ্বেষী গাজনীর মামুদ ১০২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে সোমনাথের শিবমন্দির বিধ্বস্ত করিয়া অনেক ধনরত্ন অপহরণকরিয়াছিলেন। সেই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও আছে।

এক্ষণে একটী নূতন সোমনাথের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে (কোজেন্‌স্ সাহেবের বিবরণ দেখুন)। প্রভাসতীর্থে পাঁচটী ক্ষুদ্র নদী আছে। তাহাদিগের ভিতর সরস্বতী একটী। সরস্বতীনদীতীরে যাদবেরা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া নিহত হইয়াছিলেন। ইহার নিকটে ঋণমুক্তেশ্বরে বাণেশ্বর-মহাদেবের মন্দির আছে। প্রবাদ এই স্থানে একটী "পিপল" গাছের নিকট ব্যাধের শরে আহত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করিয়াছিলেন এবং হিরণ্যা, সরস্বতী ইত্যাদি নদী যেস্থানে সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে, সেইস্থানে শ্রীকৃষ্ণের দেহের অগ্নিসংস্কার হইয়াছিল। অতএব এই প্রভাসতীর্থেই শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্ন থাকিবার কথা। ভবনগরের পোষ্টমাষ্টারও আমাদিগকে এই কথা লিখিয়াছেন।

দ্বারকাতে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিয়া চৈতন্যদেব যেরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন ইহা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে প্রগাঢ়তর ভক্তি আমরা কল্পনা করিতে পারি না। চৈতন্যদেব তুইজন শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন না; শ্রীকৃষ্ণ একই; প্রথম ব্রজেন্দ্রনন্দন এবং গোপীবল্লভ এবং পরে দ্বারকাধীশ মথুরেশ, কুরুক্ষেত্র-সমরনিয়ন্তা এবং ভবদ্গীতাস্রষ্টা। কিন্তু তিনি মনে করিতেন যে দ্বারকাধীশের তিনি অনুগতদাস এবং বৃন্দাবনের গোপীবল্লভ-ব্রজনন্দন তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়তম।

চৈতন্যদেব দ্বারকায় একপক্ষ থাকিয়া অধিবাসীদিগকে হরিনামে মত্ত করিয়া পূর্ব্বদিকে নীলাচল-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। খাঁড়ি পুনরায় দড়ির সেতুদ্বারা একে একে পার হইয়া গুজরাট-উপদ্বীপে উপনীত হইলেন। পূর্ব্বাভিমুখে আসিয়া আশ্বিনের শেষদিনে (১৫১১ খৃঃ) বরোদায় পুনরায় পৌছিলেন। ষোল দিন পরে নর্ম্মদা-তীরে আগমন করিলেন। এস্থান হইতে ভর্গদেব দক্ষিণদিকে চলিয়া যাইলেন। নর্ম্মদাতীরে একদিন যাপন করিয়া পরদিন নর্ম্মদার ধার

দিয়া দোহদনগরে [১] আসিলেন। পরদিন কুক্ষীনগরে [২] আসিয়া অনেক বৈষ্ণবের সহিত সম্মিলিত হইলেন এবং এক ব্রাহ্মণের গৃহে লক্ষ্মী-জনার্দ্দন দেখিলেন। তাহার পরে দুইদিন বনের ভিতর দিয়া যাইয়া আমঝোরা (আমঝোরা) [৩] নগরে উপনীত হইলেন। এইস্থানে গোবিন্দ দুই সের আটা ভিক্ষাকরিয়া আনিলে, চৈতন্যদেব ১৬ খানা রুটী প্রস্তুত করিলেন। এ সময়ে একজন ভিখারিণী আসিলে চৈতন্যদেব তাহাকে নিজের খাদ্যের অংশ দিয়া অনাহারে রহিলেন। রাত্রিতে তিনি কিছু ফল ভক্ষণকরিলেন। পরদিন এইস্থানের লক্ষ্মণকুণ্ডে তিনি স্নান করিলেন। পরদিন বিন্ধ্যগিরির উপরে মন্দুরানগরীতে[৪] যাইলেন। সেস্থানে গলিত-কাঞ্চনবর্ণ অস্থিচর্ম্মসার নিশ্চল উলঙ্গ এক সাধুর সহিত কিছুক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠী করিলেন। তাহার পরে পর্ব্বতের নিম্নে মণ্ডল-নগরে আসিলেন।

তাহার পরে বামে বিন্ধ্যগিরি এবং ডাহিনে নর্ম্মদা রাখিয়া দেবঘরে উপস্থিত হইয়া একজন কুষ্ঠরোগীর রোগের উপশম

১। বরোদার উত্তরপূর্ব্বে এবং ইন্দোরের পশ্চিমে।

২। ইন্দোরের অধীনস্থ ধরনগরের নিকটে (Kukshi-Dhar-Indore—Postal Guide)। দোহদের দক্ষিণ-পূর্ব্বে ধর; ধরের দক্ষিণপশ্চিমে আমঝোরা; আমঝোরার দক্ষিণপূর্ব্বে মন্দুরা (মাণ্ডোগড়) এবং মণ্ডলনগর (মণ্ডলেশ্বর); মন্দুরার দক্ষিণপূর্ব্বে দেবঘর (দেওগড়); দেওগড়ের উত্তরপূর্ব্বে শিবানী (শিওনী)।

৩। ইন্দোরের দক্ষিণপশ্চিমে।

৪। মন্দুরানগরী সম্ভবতঃ আমঝোরার সন্নিকটে ও দক্ষিণপূর্ব্বে এবং মাউয়ের (Mhow) দক্ষিণপশ্চিমে মাণ্ডোগড়। মাণ্ডোগড়ের সন্নিকটে ও দক্ষিণপূর্ব্বে এবং মাউয়ের সামান্য দক্ষিণপশ্চিমে এবং নর্ম্মদাতীরে মণ্ডলেশ্বর (গোবিন্দের মণ্ডল-নগর)। মাণ্ডোগড় এবং মণ্ডলেশ্বর-উভয়ই—শিওনীর উত্তর-পূর্ব্বে এবং জব্বলপুরের দক্ষিণপূর্ব্বে মান্দল

করিলেন। এই কুষ্ঠরোগীর নাম আদি-নারায়ণ। ধনবান্ বণিক হইলেও তিনি এই ব্যাধির নিমিত্ত সর্ব্বদা বিষণ্ণ থাকিতেন। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। চৈতন্যদেবের ভাবাবেশের পরে আদি-নারায়ণ তাঁহাকে নিস্তারকরিতে চৈতন্যদেবকে মিনতি করিয়া বলিলেন। চৈতন্যদেবের প্রসাদ ভক্ষণকরিলে আদিনারায়ণ রোগমুক্ত হইলেন। আদিনারায়ণকে চৈতন্যদেব বলিলেন যে তিনি 'কৃষ্ণের কৃপায়' রোগমুক্ত হইয়াছেন। আদিনারায়ণ চৈতন্যদেবের পরামর্শানুসারে সমস্ত বিষয় পরিত্যাগকরিয়া একটী তুলসীকানন প্রস্তুত করিলেন এবং কৃষ্ণনাম জপকরিয়া সময় যাপনকরিতে লাগিলেন। অনেক রোগী সেস্থানে সমবেত হওয়াতে চৈতন্যদেব তখনই দেবঘর ত্যাগকরিলেন। কর্ণপূরের চৈতন্যচরিতমহাকাব্যে ও চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে এবং কৃষ্ণদাসকবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে কূর্ম্মক্ষেত্রে বাসুদেব-নামাব্রাহ্মণের চৈতন্যদেবদ্বারা কুষ্ঠরোগআরোগ্যের কথা বর্ণিত আছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে চৈতন্যদেবকে আমরা ভগবান্ বলিনা, কারণ তিনি নিজেই তাঁহার ঈশ্বরত্ব অস্বীকারকরিতেন এবং কেহ তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলে তিনি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইতেন। কিন্তু

(Mandla) হইতে বিভিন্ন। মাণ্ডোগড় ও মণ্ডলেশ্বর হইতে দেওগড (গোবিন্দের দেবঘর) প্রায় ২৪০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এতদূর পথ চৈতন্যদেবের তিনদিনে অতিক্রম করা সম্ভব হইতে পারে না, কিন্তু তিনি মণ্ডলেশ্বর হইতে বিন্ধ্যগিরি 'বামে' এবং নর্ম্মদা-নদীকে 'ডাহিনে' রাখিয়া—'বামে শোভে বিন্ধ্যগিরি নর্ম্মদা ডাহিনে'—সম্ভবতঃ হোসেঙ্গাবাদের নিকট আসিয়া নর্ম্মদা পারহইয়া, নর্ম্মদাহইতে তিনদিনে দেবঘর (দেওগড়ে) আসিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কারণ হোসেঙ্গাবাদ হইতে দেওগড় দক্ষিণপূর্ব্বে প্রায় ৮০ মাইল। দেওগড় হইতে শিবানী (শিওনী) প্রায় ত্রিশক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত।

তাঁহার যে কতকগুলি অসাধারণ শক্তি ছিল, ইহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে। যখন কেহ পবিত্রভাবে জীবন যাপনকরেন এবং ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করেন, তখন তাঁহার দেহে ও মনে কতকগুলি অসামান্য শক্তির বিকাশ হয়। সেইজন্য সাধ্বী সীতাদেবীর অক্ষত-শরীরে অগ্নি-পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হওয়া আমরা বিশ্বাস করি (আমাদের **Stray Thoughts Part IV, p. p. 42-43**) দেখুন। আমরা সেখানে দেখাইয়াছি যে এখনও দাক্ষিণাত্যে অনেক দেবমন্দিরে প্রতিবৎসর উৎসবের সময়ে অগ্নির উপর দিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা নগ্নপদে ও অক্ষতদেহে বিচরণ করে।

চৈতন্যদেবের ভাবাবেশের সময়ে তাঁহার শরীরহইতে জ্যোতিঃ ও পদ্মগন্ধ-নির্গমন, তাঁহার পিচকারীর ন্যায় অশ্রুবিসর্জ্জন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহার ভগবানের দর্শন আমরা বিশ্বাস করি। দুরারোগ্য ব্যাধি স্পর্শদ্বারা কিম্বা তাঁহার ভুক্ত অন্নদ্বারা দূরকরা চৈতন্যদেবের ন্যায় পবিত্র ভগবদ্ভক্তের ক্ষুদ্র কার্য্য। এ কার্য্যে রোগীর আন্তরিক বিশ্বাস ও ভক্তি চাই—

'পরম বৈষ্ণব হয় আদিনারায়ণ।
তাহারে করিতে দিলা প্রসাদ-ভক্ষণ ॥
ভক্তিসহ প্রসাদ করিয়া উপভোগ।
তখনই তাহার দূর হৈল কুষ্ঠরোগ ॥'

(গোঃ কঃ পৃঃ ৮০)।

কিন্তু ইহাতে আধ্যাত্মিক শক্তির অপচয় হয়, এইজন্য দেবঘরে অনেক রোগী আসিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। ভর্গদেবকে কেবল নিম্বরস খাওয়াইয়া চৈতন্যদেব আরোগ্যকরিয়াছিলেন। ভর্গদেবকে আরোগ্যকরিতে তাঁহার অলৌকিক শক্তি প্রয়োগ করেন নাই (গোঃ কঃ

পৃঃ ৬৯)। অনেক হঠযোগী এ কার্য্যে পারদর্শী ইহা আমরা শুনিয়াছি। বশীকরণ অথবা সম্মোহনবিদ্যা (Hypnotism)-নিপুণ ইংরাজী-শিক্ষিত সদৃশ-দৃষ্টান্ত (Analogy)[১]-কুশল বিরক্ত-বিলাসী আধুনিক-গুরু-কর্ত্তৃক শিষ্যের শারীরিক ও মানসিক রোগের প্রতিকারের কথা আমরা শুনিয়াছি। প্রধান মানসিক ব্যাধি হইতেছে বিষয়াসক্তি; শিষ্যেরা গুরুর আদেশে তাঁহাদিগের সমস্ত ধন, ব্যবসা এবং অন্যান্য মূল্যবান্ সম্পত্তিও এই সকল আধুনিক গুরুর চরণে অর্পণকরিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন ইহা দেখিয়াছি। উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্র চৈতন্যদেবকর্ত্তৃক কুষ্ঠরোগ-নিরাময়ের কথা সার্ব্বভৌমের নিকট শুনিয়া বলিয়াছেন, "তিনি কুষ্ঠরোগ নষ্ট করিয়াছেন ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যেহেতু যোগিগণও ইহা পারেন"—চৈঃ চঃ নাঃ-৭ম-১০-রাঃ বিঃ কৃত অনুবাদ। এই সম্বন্ধে অমৃতবাজার-পত্রিকা (২০শে জুন, ১৯৩৩) হইতে নিম্নলিখিত ছত্রগুলি উদ্ধৃত করিলাম— "London (by Airmail)"

A remarkable story of how an Anglican Bishop "laid hands" on a dangerously ill invalid, whereafter symptoms

১। একটী Analogyর দৃষ্টান্ত দিলাম—

'বিষয়' ও 'বিষ' এই দুই শব্দের কত সাদৃশ্য? 'বিষ' শব্দে কেবল 'য়' যোগকরিয়া 'বিষয়' হইয়াছে। বিষয় আধ্যাত্মিকউন্নতিঅভিলাষীর পক্ষে বিষতুল্য। ইহাকে পরিহার-করা আবশ্যক। কিন্তু যিনি শিব তিনি এ বিষ নিজের কণ্ঠে রাখিয়াছেন। কেন? জীবের উপকারের জন্য। Arsenic (শেঁকো), Nuxvomica (কুচিলা), অহিফেন (Opium) এমন কি সর্পের বিষও (সূচিকাভরণনামক ঔষধে) মানবের উপকারে লাগে; কিন্তু ইহা সুচিকিৎসকের নিকট থাকে এবং চিকিৎসকদ্বারা ব্যবহৃত হয়। গুরু চিকিৎসক এবং নীলকণ্ঠন্যায়। অতএব শিষ্যের সমস্ত বিষয় অর্থাৎ যাহাতে শিষ্যের আসক্তি আছে, সমস্তই গুরুর নিকটে ন্যস্ত করা আবশ্যক।

considered grave by doctors disappeared, was related by the Bishop of Bristol at the Upper House Convocation in Canterbury. The occasion was a discussion on the healing of the sick to which a general approval was given despite the opposition of two Bishops.

The Bishop of Bristol declared when someone "very dear" to him lay ill last year, he asked another Bishop to help him with the laying of hands' with the result that the patient made a complete faith-cure............But while the Bishops were arguing at the Convocation, 800 Roman Catholic pilgrims returned to London from Lourdes. One Yorkshire girl, Miss Margaret Heeley, who was carried on a stretcher to the train on the 23rd May, this time stepped out unaided into the taxi and told the astonishing "miracle" story. She said she had been in bed four and a half years with gastric and chest troubles and thus decided to stake everything on her Lourdes pilgrimage. Miss Heeley said she ate no solid food for the first three days at Lourdes and then attended the famous "blessing of the sick', ceremony, whereafter she has enjoyed big meals and is able to walk unaided.

দেবঘর ত্যাগকরিয়া চৈতন্যদেব ত্রিশক্রোশ দুইদিনে অতিক্রমকরিয়া শিবানীনগরে[১] যাইলেন। শিবানীর পূর্ব্বদিকে

১। সম্ভবতঃ শিওনী। শিওনীর প্রায় ৫০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে দেওগড় অবস্থিত।

মলয়পর্ব্বত[১] দেখিয়া চণ্ডীপুরে আসিয়া চণ্ডী দর্শনকরিলেন। তাহার পরে রায়পুরে হরিনাম বিতরণকরিয়া রামানন্দরায়ের সহিত বিদ্যানগরে[২] মিলিত হইলেন। রামানন্দ বলিলেন যে কিছু দিন পরে তিনি নীলাচলে যাইয়া চৈতন্যদেবের সহিত সম্মিলিত হইবেন। তাহার পরে উত্তরাভিমুখে যাইয়া ছয় দিনে রত্নপুর পৌছিয়াছিলেন। তিনি রত্নপুরের দক্ষিণে মহানদী দেখিতে পাইলেন, এবং ইহার ধারে ধারে পূর্ব্বাভিমুখে

১। শিওনীর প্রায় ৯০ মাইল পূর্ব্বে উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত মাইকাল-পর্ব্বতশ্রেণী। ইহা হইতে শোণ ও নর্ম্মদানদীর উৎপত্তি হইয়াছে।

২। রায়পুর হইতে সম্বলপুর রেলযোগে প্রায় দেড়শত মাইল। চৈতন্যদেব প্রধান নগরসকলে হরিনাম বিতরণকরিবার জন্য কিম্বা ভালরাস্তার অভাবে ঠিক সোজা পথে সকল সময়ে আসিতে পারেন নাই। রত্নপুর রায়পুরের উত্তরপূর্ব্বে এবং বিলাসপুরের উত্তরে। রত্নপুরের দক্ষিণপূর্ব্বে স্বর্ণগড় (শারণগড়)। শারণগড়ের পূর্ব্বদিকে সম্বলপুর। রত্নপুর রায়পুরের প্রায় ৯০ মাইল উত্তরে (সামান্য পূর্ব্বে)। চৈতন্যদেব রায়পুর হইতে বিদ্যানগরে আসিয়াছিলেন। সেখান হইতে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিয়া ছয়দিনে রত্নপুরে পৌছিয়াছিলেন। পথ ভাল নয় বলিয়া বোধহয় এত দিন লাগিয়াছিল। বিদ্যানগর সম্ভবতঃ রায়পুরের উপকণ্ঠে ছিল। বিখ্যাত ভবানন্দরায়পরিবারের জন্য কিম্বা তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের জন্য এই নগরের নাম বোধহয় 'রায়পুর' হইয়াছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাখালদাসবন্দোপাধ্যায়মহাশয় বলিয়াছেন এবং আমার কৃষ্ণনগর কলেজের বিশিষ্ট ছাত্র নিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী (M. A. Calcutta and Phd. Cambridge, Archaeologist, Utakamand) বলেন যে বর্ত্তমান ভিজিয়ানাগ্রাম রামানন্দের বিদ্যানগর। Vizianagram (বিজয়নগরম) Vizagapatam (বিশাখপত্তনম) এর উত্তরপশ্চিমে। রাজমহেন্দ্রি হইতে বিজয়নগরম্ ১৬৩ মাইল উত্তরপূর্ব্বে। বিজয়নগরম্ গঞ্জামের দক্ষিণপশ্চিমে। Vizianagram, Vizia-nagaram অর্থাৎ বিজয়নগরের অপভ্রংশ আমরা স্বীকার করি। বেল্লারীজেলার 'বিজয়নগর', 'বিদ্যানগর' অথবা 'বিজ্ঞানগরের' অপভ্রংশ বলিয়া, সমস্ত স্থানবাচক বিদ্যা-পূর্ব্ব শব্দ কি বিজয়-পূর্ব্ব শব্দে পরিণত হইয়াছে?

যাইয়া স্বর্ণগড়ে [১] উপনীত হইলেন। স্বর্ণগড়ের রাজা অনেক মিনতি করিয়া চৈতন্যদেবকে ভিক্ষা দিলেন। এখানে এক রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রাতে তিনি যাত্রা করিলেন এবং পর্ব্বতবেষ্টিত সম্বলপুরে সন্ধ্যাকালে পৌঁছিলেন। শারণগড় হইতে সম্বলপুর পূর্ব্বদিকে অন্ততঃ ৫০ মাইল হইবে। এক দিনে চৈতন্যদেব এত দূর কি করিয়া যাইলেন বলিতে পারিনা। এইস্থানে রাত্রি কাটাইয়া দশক্রোশদূরে বহুবৈষ্ণব-অধ্যুষিতা ভ্রমরানগরীতে গমন করিয়া চারি দিন বাস করিলেন এবং বিষ্ণুরুদ্রনামা একজন ভক্ত ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ভ্রমরা-নগরী সম্ভবতঃ সম্বলপুরের ২০ মাইল দক্ষিণে কিম্বা দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। তাহার পরে তিনি প্রতাপনগরে গমন করিলেন। এস্থানে হরিনাম বিতরণ করিয়া দাসপালে যাইয়া ঐরূপ করিয়া পর দিন রসাল-

---

Postal Guide দেখিলে নিম্নলিখিত বিদ্যাপূর্ব্বক স্থানবাচক শব্দ পাওয়া যায়— বিদ্যাভবন-নারায়ণপুর (বালিয়াজেলায়), বিদ্যানগর (কৃষ্ণাজেলায়), বিদ্যাগঞ্জ (ই বি রেলওয়ের ষ্টেশান), বিদ্যাকোট (ত্রিপুরা), বিদ্যানগর B. N. W. (মতীগঞ্জের প্রাচীন নাম), বিদ্যানন্দকাটী (যশোহর)। অতএব বিদ্যা-পুর্ব্ব স্থানবাচক নাম হইলেই যে বিজয়-পুর্ব্ব স্থানবাচক-নামে পরিণত হইয়াছে কিম্বা হইবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

ডাক্তার চক্রবর্ত্তী আরও লিখিয়াছেন যে হরিরায়ব্রহ্মদেবের (অথবা সংক্ষেপে ব্রহ্মদেবের) ১৪৫৮ সংবতে (খৃঃ ১৪০২) উৎকীর্ণ লিপিতে (Indian Antiquary, Vol. XXII, p. 83 and Cunningham's Archaeological Survey Report, Vol. XXII, p. 79) 'রায়পুর' নাম আছে। তাহা হইলে ভবানন্দরায়ের পুর্ব্বপুরুষের কিম্বা হরিরায়ব্রহ্মদেবের নামানুসারেও রায়পুর নামকরণ হইয়া থাকিতে পারে।

১। রত্নপুরের প্রায় ৮০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে শারণগড়। রত্নপুর হইতে শারণগড়ে আসিতে হইলে মহানদী পারহইতে হইবে।

কুণ্ডে উপনীত হইলেন। এস্থানে কূর্ম্মদেব ভক্তিসহকারে দর্শনকরিয়া এক দুরাত্মা মাড়ুয়া-ব্রাহ্মণকে উদ্ধারকরিলেন। খুরদার উত্তরপশ্চিমে দাসপাল্লা। ইহা উড়িষ্যার একটী করদ রাজ্য। সম্বলপুরের অন্ততঃ ১০০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে দাসপাল্লা। দাসপাল্লার প্রায় ৪০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে রসালকুণ্ড। এখানে একটী ডাকঘর আছে। সম্বলপুর ও দাসপাল্লার মাঝে ভ্রমরানগরী এবং প্রতাপনগর ছিল। ঋষিকূল্যানদী রসালকুণ্ড ও রসালকুণ্ডের দক্ষিণপূর্ব্বে গঞ্জামনগরের নিকটে প্রবাহিতা হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। কূর্ম্মদেবের বিখ্যাত মন্দির চিকাকোলের সন্নিকটে শ্রীকূর্ম্মমে আছে। রসালকুণ্ড (Russelkonda) গঞ্জামজেলার একটী নগব। রসালকুণ্ডের প্রায় ১০০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে শ্রীকূর্ম্মম। শ্রীকূর্ম্মমে একটী ডাকঘর আছে। ইহাও গঞ্জাম-জেলার অন্তর্গত। রসালকুণ্ডেও কূর্ম্মদেবের একটী মূর্ত্তি সম্ভবতঃ ছিল। কিন্তু এক্ষণে সে স্থানে কোন কূর্ম্মদেবমূর্ত্তি নাই। রসালকুণ্ডের সন্নিহিত আস্কার (Aska) পোষ্টমাষ্টার মহাশয় লিখিয়াছেন যে রসালকুণ্ডে কিম্বা তাহার নিকটে কোথায়ও এক্ষণে কূর্ম্মদেবের মন্দির নাই। "I belong to these parts and I have never heard of any temple of Kurmadeva in Aska and Russelkonda Tāluks," Inscriptions at Śrikurmam range from Śaka 1252 to 1272 (R. D. Banerji's History of Orissa Vol. I. p. 281)। তাহা হইলে সাক্ষিগোপালের মূর্ত্তির বিদ্যানগর (দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগর [১]) হইতে কটক, কটক হইতে সত্যবাদীতে স্থাপনের ন্যায়, কূর্ম্মদেবের মূর্ত্তি চৈতন্যদেবের সময়ের পরে রসালকুণ্ড হইতে শ্রীকূর্ম্মমে অপসারণের কথা উঠিতে পারে না। ঋষিকূল্যানদীতীরে অনেক সন্ন্যাসীর সঙ্গে তিন রাত্রি অতিবাহিত

১। R. D. Banerji's History of Orissa, Vol. I. p. 316.

করিয়া রসালকুণ্ডের প্রায় ৬০ মাইল পূর্ব্বে আলালনাথে আসিয়া তাঁহার নীলাচলের ভক্তগণের সহিত তিনি পুনর্মিলিত হইলেন। ৩রা মাঘ (শক ১৪৩৩, খৃঃ ১৫১২) তিনি নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

আলালনাথ পুরী হইতে প্রায় ১৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এইস্থানে আলালনাথ-নামা শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি আছেন। কৃষ্ণদাসকবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য-১ম)আছে—

"পুনঃ নীলাচলে প্রভু গমন করিল।
ভক্তগণে মিলি স্নানযাত্রা দেখিল॥
অনবসরে জগন্নাথের না পাঞা দর্শন।
বিরহে আলালনাথ করিলা গমন॥"

অনবসরের সময়ে চৈতন্যদেবের আলালনাথ-গমন মধ্য, একাদশ পরিচ্ছেদেও লিখিত আছে। স্নানযাত্রার পরে নবযৌবনদর্শনের পূর্ব্বদিনপর্য্যন্ত পনর দিন জগন্নাথদেবের দর্শন হয় না, এই সময়কে 'অনবসর' বলে।

আমরা দেখিয়াছি যে কৃষ্ণদাসকবিরাজলিখিত চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্যভ্রমণবৃত্তান্ত এবং গোবিন্দলিখিত ভ্রমণবিবরণ বিভিন্ন হইলেও চৈতন্যদেবদৃষ্ট কতকগুলি স্থান উভয় বৃত্তান্তেই আছে। প্রধান বিভেদ— (১) শান্তিপুর হইতে নীলাচল-আগমনের বিষয়ে বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাসকবিরাজ বলিয়াছেন যে চৈতন্যদেব ভাগিরথীর পূর্ব্ব উপকূল দিয়া আঠিসারা, ছত্রভোগ, জলেশ্বর ইত্যাদি গ্রাম হইয়া নীলাচলে আসিয়াছিলেন। গোবিন্দ লিখিয়াছেন যে তিনি পশ্চিম উপকূল দিয়া বর্দ্ধমান, কাঞ্চননগর, হাজিপুর, নারায়ণগড় (ধলেশ্বর-শিবদর্শন) জলেশ্বর (বিল্বেশ্বর-শিবদর্শন), হরিহরপুর, বালেশ্বর ইত্যাদি নগর দিয়া পুরী আসিয়াছিলেন। (২) কৃষ্ণদাসকবিরাজ আলালনাথ হইতে

পূণার নিকট পাণ্ডুপুর (Pandharpur) পর্য্যন্ত কতকটা ধারাবাহিকভাবে ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহার পরেই কেবল কল্পনার আশ্রয় গ্রহণকরিয়াছেন। গোবিন্দের বিবরণে সামান্য ভুল থাকিলেও মনে হয় যে ইহা প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা। তিনি আলালনাথ হইতে কন্যাকুমারী, কন্যাকুমারী হইতে পূণা, পূণা হইতে দ্বারকা এবং দ্বারকা হইতে মধ্য-প্রদেশের ভিতরদিয়া চৈতন্যদেবের নীলাচলে প্রত্যাগমন ঠিক পর পর বর্ণনাকরিয়াছেন। গোবিন্দের বিবরণ চৈতন্যদেবের নীলাচলে প্রত্যাগমনের পরেই শেষ হইয়াছে। কিন্তু তাহার পরে চৈতন্যদেবের নীলাচলহইতে ভদ্রক, তথা হইতে নৌকাকরিয়া মন্ত্রেশ্বর-নদ (উড়িষ্যার সীমা) এবং পিচ্ছলদা, তথা হইতে নৌকাযোগে পাণিহাটী, হালিসহর, কাঁচরাপাড়া, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, কুলীয়া[১] এবং রামকেলিগমন এবং পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন, নীলাচল হইতে কাশী, প্রয়াগ দিয়া মথুরা এবং বৃন্দাবন গমন এবং তথা হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমন চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক প্রভৃতিতে বর্ণিত হইয়াছে।

বৃন্দাবনদাসের মতে (চৈ-ভা-অন্ত্য-২য়) যখন চৈতন্যদেব প্রথম শান্তিপুর হইতে নীলাচলে আসেন, তখন আঠিসারায় সাধু অনন্তপণ্ডিতের আতিথ্য-গ্রহণ করিয়া আঠিসারাহইতে ছত্রভোগে আসিয়া ভাগিরথী পারহইয়াছিলেন। সারদাচরণমিত্র মহাশয় তাঁহার 'উৎকলে শ্রীচৈতন্য' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বর্ত্তমান থানা মথুরাপুরের এলাকাধীন ও মথুরাপুরগ্রামের নিকটস্থ ছত্রভোগ এককালে গণ্ডগ্রাম ছিল।......তথায় অদ্যাপি ত্রিপুরাসুন্দরী-ঠাকুরাণীর মঠ

১। কাঁচরাপাড়ার নিকটস্থ কুলীয়া নয়। নবদ্বীপের অপরপার্শ্বস্থিত কুলীয়াগ্রাম—তরণিবর্ত্মনা নবদ্বীপস্য পারে কুলীয়ানামগ্রামে মাধবদাসবাট্যামুত্তীর্ণবান্ (চৈঃ চঃ না-৯ম-৩৩)।

অবস্থিত।……নিকটেই এবং জয়নগর-মজিলপুর হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে, খাড়ী-জমিদারীর অন্তর্গত ছত্রভোগহইতে একপোয়া দূরে বদরিকানাথ-মহাদেবের প্রসিদ্ধ মন্দির। মহাদেব অনাদি-লিঙ্গ।…… এখানে এক্ষণে নিম্নভূমিমাত্র ভাগিরথীর অস্তিত্বের চিহ্ন বর্ত্তমান, কিন্তু ভাগিরথীর গর্ভ এথনও চক্রতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ।……ভাগিরথী এখন মজিয়া গিয়াছে। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে ভাগিরথী তথায় প্রবল নদী।"

বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন ছত্রভোগের নিকট ভাগিরথীর অপর পারেই ওড্র অথবা উড়িষ্যাদেশ। চৈতন্যদেব ছত্রভোগে অম্বুলিঙ্গঘাটে অম্বুলিঙ্গ-শিব দর্শন করিলেন।—

"এইমত প্রভু জাহ্নবীর কূলে কূলে।
আইলেন ছত্রভোগে মহা কুতূহলে॥
সেই ছত্রভোগে গঙ্গা হই শতমুখী।
বহিতে আছেন সর্ব্বলোকে করি সুখী॥
জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেই স্থানে।
'অম্বুলিঙ্গ ঘাট' করি বলে সর্ব্বজনে॥

*　　　*　　　*

আনন্দে-আবেশে প্রভু সর্ব্ব গণ লৈয়া।
সেই ঘাটে স্নান করিলেন সুখী হৈয়া॥"

ছত্রভোগের জমিদার এবং গৌড়ের নবাবের অধীনস্থ কর্ম্মচারী রামচন্দ্র খাঁ চৈতন্যদেবকে ভিক্ষাদিলেন এবং রাত্রিকালে গোপনে নৌকাযোগে সানুচর চৈতন্যদেবকে গঙ্গাপার করাইয়া দিলেন, কারণ সে সময়ে উৎকলরাজ ও গৌড়ের নবাবের মধ্যে যুদ্ধের জন্য উড়িষ্যা হইতে বঙ্গে কিম্বা বঙ্গ হইতে উড়িষ্যায় গমনাগমন নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

গঙ্গা পারহইয়া চৈতন্যদেব উৎকলদেশের প্রয়াগঘাটে নৌকা হইতে

অবতরণ করিলেন। প্রয়াগঘাটের নিকটে গঙ্গাঘাটে তিনি স্নান করিয়া যুধিষ্ঠির-স্থাপিত মহেশকে প্রণাম করিলেন। তাহার পরদিন প্রত্যূষে গঙ্গাঘাট ত্যাগকরিয়া নীলাচল-অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিলে তাঁহাদিগের দানীর (Toll-Keeper) সহিত সাক্ষাৎ হইল। দানী শুল্ক চাহিল। ভক্ত সন্ন্যাসী দেখিয়া দান না গ্রহণকরিয়া তিনি সানুচর চৈতন্যদেবকে অগ্রসর হইতে অনুমতি দিলেন। ইহার পরে তাঁহারা সুবর্ণরেখানদীর নিকটে উপনীত হইলেন।

সারদাচরণ মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন যে এক্ষণে ছত্রভোগের নিকটে নদীগর্ভে জল নাই, নিম্নভূমিতে ধান্যক্ষেত্র এবং নিকটেই কুল্পী যাইবার রাজপথ। কুল্পী ডায়মণ্ডহারবারের প্রায় দশ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে। কুল্পীর অনতিদূরে দক্ষিণদিকে সাগর সঙ্গম। এই সাগর-সঙ্গমের নিকটেই বর্ত্তমান সাগর-দ্বীপ। মিত্রমহাশয় বলিয়াছেন, "ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে বর্ত্তমান ২৪ পরগণার কতক অংশ এবং মেদিনী-পুরের দক্ষিণাংশ উৎকল বা ওড্রদেশ বলিয়া কথিত হইত।" আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি (পৃঃ ৩৯৭) যে চৈতন্যদেবের প্রথম নীলাচল-আগমন গোবিন্দদাসের করচায় বর্ণিত হইয়াছে। যখন রামকেলি হইতে শান্তিপুর, কুমারহট্ট, পাণিহাটী, বরাহনগর হইয়া চৈতন্যদেব জননী ও জাহ্নবী দেখিয়া নীলাচলে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, সে সময়ে তিনি সম্ভবতঃ আঠিসারা হইয়া ভাগিরথীর পূর্ব্ব উপকুল দিয়া ছত্রভোগ আসিয়া গঙ্গা পারহইয়া ওড্রদেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাসকবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য-১৬শ) বর্ণিত আছে যে চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্যভ্রমণ হইতে প্রত্যাগমনের দুই বৎসর পরে বিজয়াদশমীতে (১৫১৪ খৃষ্টাব্দে; ২৭৩ পৃষ্ঠা দেখুন) মাতৃদেবী ও ভাগিরথী দেখিবার অভিপ্রায়ে নীলাচল ত্যাগকরিয়াছিলেন। তিনি

একাদশীতে ভুবনেশ্বরে পৌঁছিয়াছিলেন। তাহার পরে কটকে আসিয়া সাক্ষিগোপাল দর্শনকরিয়াছিলেন। রামানন্দরায় কটকে প্রতাপরুদ্রের সহিত চৈতন্যদেবের দ্বিতীয়বার মিলন সংঘটনকরিয়াছিলেন। রাজার আদেশে চৈতন্যদেবের গন্তব্য পথে যাহাতে তাঁহার কোন কষ্ট না হয়, তাহার ব্যবস্থা হইয়াছিল। গদাধরপণ্ডিত কটকপর্য্যন্ত চৈতন্য-দেবের সহিত আসিয়াছিলেন। কটকে পৌঁছিয়া তিনি গদাধরকে বুঝাইয়া তাঁহাকে সার্ব্বভৌমের সহিত নীলাচলে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। নৌকাযোগে তিনি কটকের নিকটে চিত্রোৎপলা-নদী পারহইয়াছিলেন। জ্যোৎস্নাবতী রজনীতে চলিয়া 'চতুর্দ্বারে' আসিয়াছিলেন। এস্থানে রাজার লোকেরা জগন্নাথের প্রসাদ তাঁহার জন্য আনাইয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের সঙ্গে দুইজন রাজপাত্র—মঙ্গরাজ ও হরিচন্দন—যাইতেছিলেন; তাঁহাদিগকে তিনি যাজপুরে বিদায় দিয়াছিলেন। বালেশ্বরের সন্নিকটে রেমুণায় পৌঁছিয়া তিনি দুঃখার্ত্ত রামানন্দরায়কে বিদায় দিয়াছিলেন। তাহার পরে তিনি ওড্রদেশ সীমায় পৌঁছিলে প্রতাপরুদ্রের সীমাধিকারী তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। (চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকের নবম অঙ্কে রামানন্দের ভদ্রকপর্য্যন্ত আগমনের কথা বর্ণিত আছে। বালেশ্বর ভদ্রকের প্রায় ৩৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে)। তাহার পরে চৈতন্যদেবের নিরাপদে গৌড়ে যাইবার নিমিত্ত বঙ্গের মুসলমান রাজার সীমাধিকারীর সহিত প্রতাপ-রুদ্রের সীমাধিকারী সন্ধি (truce) করিয়াছিলেন। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে এবং চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে যে যবনসীমাধিকারী হরিনামে মত্ত হইয়াছিলেন। ইহা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সন্ধি করা হইলে মুসলমান সীমাধিকারী চৈতন্যদেবকে মন্ত্রেশ্বরনদ নৌকাযোগে পারকরাইয়া পিচ্ছলদা পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। চৈতন্যচন্দ্রোদয়

নাটকে লিখিত আছে যে সে সময়ে গৌড়ীয় মুসলমান রাজার সহিত প্রতাপরুদ্রের যুদ্ধের জন্য দুইটী স্থল-পথ বন্ধ ছিল। একটী জলপথ মুক্ত থাকিলেও এই জলপথ দিয়া আগমন প্রতাপরুদ্রের ও বঙ্গের মুসলমান রাজার সীমাধিকারীদ্বয়ের অনুমতি সাপেক্ষ ছিল। চৈতন্যদেব এই জলপথে পাণিহাটীতে আসিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাসকবিরাজ মন্ত্রেশ্বরকে 'দুষ্টনদ' বলিয়াছেন ; যবন-অধিকৃত বলিয়া কিম্বা দস্যু-পরিপূর্ণ [১] বলিয়া কিম্বা পারহওয়া কষ্টসাধ্য বলিয়া মন্ত্রেশ্বরনদকে এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে যে পিচ্ছলদা পর্য্যন্ত যবন সীমাধিকারীর অধিকার ছিল অর্থাৎ মন্ত্রেশ্বরনদ তাহার অধিকারে ছিল এবং পিচ্ছলদা গ্রাম পর্য্যন্ত তাহার অধিকারে ছিল। আমাদের মনে হয় যে যবনসীমাধিকারীর নৌকাতেই তিনি মন্ত্রেশ্বরনদ পার হইয়া পিচ্ছলদার নিকট দিয়া ছত্রভোগ প্রভৃতি গ্রাম পার্শ্বে রাখিয়া ভাগিরথী দিয়া পাণিহাটী পেঁৗছিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন যে ছত্রভোগের নিকট ভাগীরথীর অপর পারে ওড্রদেশ। ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে ছত্রভোগের সন্নিকটেই পিচ্ছলদা তাহার পরেই মন্ত্রেশ্বর-নদ। ভাগিরথী বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া বঙ্গোপসাগরে সাগরদ্বীপের নিকট পতিত হইয়াছে। মন্ত্রেশ্বরনদ সম্ভবতঃ এইরূপ একটী শাখার নাম ছিল।

চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ওড্রদেশ হইতে গৌড়ে আসিতে দুইটী স্থলপথের ও একটি জলপথের কথা বলা হইয়াছে। জলপথ হইতেছে—মন্ত্রেশ্বর নদ এবং পিচ্ছলদাও ছত্রভোগের নিকট দিয়া ভাগীরথী। একটী স্থলপথ (গোবিন্দ-বর্ণিত) শান্তিপুর, বর্দ্ধমান, দামোদরনদী পার

১। 'জলচরদস্যুভয়নিবারণায়' তুরুষ্কঃ 'স্বয়মগ্রেসরো ভূত্বা মন্ত্রেশ্বরমুত্তীর্য্য পিচ্ছলদা-গ্রামপর্য্যন্তমাগতবান্'।

হওয়া, হাজিপুর, মেদিনীপুর, নারায়ণগড়, ইত্যাদি (৩৯৩ পৃঃ দেখুন)। মেদিনীপুরের ইতিহাসপ্রণেতা যোগেশচন্দ্রবসু মহাশয় বলেন যে গোবিন্দের হাজিপুর বর্ত্তমান ডায়ামণ্ডহারবার। ডায়ামণ্ডহারবারের প্রাচীন নাম হাজিপুর ইহা সত্য। কিন্তু চৈতন্যদেব বর্দ্ধমান হইতে মেদিনীপুরে আসিতেছিলেন। বর্দ্ধমানের প্রায় ৬২ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে মেদিনীপুর। বর্দ্ধমানের প্রায় ৭০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে ডায়ামণ্ড-হারবার। ডায়ামণ্ডহারবারের প্রায় ৫৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে মেদিনীপুর। যদি হাজিপুর ডায়ামণ্ডহারবার হয়, তাহা হইলে চৈতন্যদেব বর্দ্ধমান হইতে ৬২ মাইল দূরে দক্ষিণপশ্চিমে মেদিনীপুরে না আসিয়া, ৭০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে ভাগিরথী পারহইয়া (করচাতে দামোদর পার হওয়ার কথা আছে ; ভাগিরথী পারহওয়ার কথা নাই) ডায়ামণ্ডহারবারে আসিয়া, পুনরায় ভাগিরথী পারহইয়া ৫৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে মেদিনী-পুরে কি গিয়াছিলেন ? বসুমহাশয় যদি বলেন যে ডায়ামণ্ডহারবার দিয়া ভাল পথ ছিল, আমরা বলি চৈতন্যদেব বনের ভিতর দিয়াও চলিতে ভয় করিতেন না ; তিনি বগুলা-অরণ্য, চোরানন্দীবন, ধন্বিধরঝারি প্রভৃতি অরণ্যের ভিতর দিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে গমন করিয়াছিলেন। কখন কখন অবশ্য এরূপ হইয়াছে যে তিনি ঠিক সোজা পথে গমন করেন নাই। কিন্তু অকারণে এরূপ বক্র পথে কেন গমন করিবেন, ইহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিনা। আমাদের মনে হয় গোবিন্দবর্ণিত হাজিপুর দামোদরনদীর দক্ষিণপারে বর্দ্ধমানহইতে মেদিনীপুর যাইবার পথের সন্নিকটে কোন গ্রাম। (গোয়াড়ী) কৃষ্ণনগর এবং (খানাকুল) কৃষ্ণনগর দুইয়ের নামই কৃষ্ণনগর। এইরূপ হাজিপুর-নামে সে সময়ে আরও অনেক গ্রাম ছিল। Postal Guide এই হাজিপুর-নামে চারিটী নগর আছে ;

সেখানে ডাকঘর আছে। গোবিন্দবর্ণিত হাজিপুরে এমন কোন বিখ্যাত তীর্থস্থান ছিলনা যে সেইজন্য চৈতন্যদেব এতদূর ঘুরিয়া উহা দেখিতে যাইবেন। মেদিনীপুরের পরে নারায়ণগড়, জলেশ্বর, হরিহরপুর, বালেশ্বরপ্রভৃতি সমস্তই সোজা রাস্তার উপরে অবস্থিত। সেইজন্য আমাদিগের মনে হয় যে চৈতন্যদেব বর্দ্ধমান হইতে ডায়ামণ্ডহারবার ঘুরিয়া মেদিনীপুরে আসেন নাই এবং গোবিন্দবর্ণিত হাজিপুর বর্দ্ধমানহইতে মেদিনীপুরের সোজা রাস্তার নিকটে ছিল। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, হুগলীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, লিখিয়াছেন, যে হুগলী জেলাতেই চারিটী হাজিপুর নামক গ্রাম আছে: একটী ধনিয়াখালি থানাতে, একটী পাণ্ডুয়া থানাতে, একটী জঙ্গীপাড়া থানাতে, কৃষ্ণনগর গ্রামের নিকট এবং আর একটী আরামবাগ মহকুমার গোঘাট থানায়। এই চতুর্থ হাজিপুর গোবিন্দের হাজিপুর। ইহা বর্দ্ধমানের প্রায় ২৪ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে এবং দামোদরের অপর পারে এবং মেদিনীপুর-নগরের প্রায় ৩৮ মাইল উত্তরপূর্ব্বে (**Hoogly Gazetteer**এর **Map** দেখুন)।

শান্তিপুরহইতে নীলাচলে যাইবার একটী স্থলপথ গোবিন্দবর্ণিত স্থলপথ। আর একটী স্থলপথ কোথায় ছিল নির্ণয়করা কঠিন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল এক্ষণে আমাদের নিকটে নাই। যোগেশচন্দ্র বসু মহাশয় লিখিয়াছেন, "চৈতন্যমঙ্গল হইতে জানা যায় চৈতন্যদেব দেবনদ (দামোদর) পারহইয়া সেঁয়াখালা দিয়া তমলুকে আসিয়াছিলেন। পরে দাঁতন হইয়া জলেশ্বরে গমন করেন।" এইটী দ্বিতীয় স্থলপথ হইতে পারে।

শান্তিপুরহইতে নীলাচল এবং নীলাচলহইতে দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্ব, দক্ষিণ এবং পশ্চিম সমুদ্র-উপকূল দিয়া দ্বারকায় আগমন এবং তথা হইতে

পূর্ব্বাভিমুখে মধ্যপ্রদেশের ভিতর দিয়া নীলাচলে চৈতন্যদেবের প্রত্যা-বর্ত্তন এবং এই ভ্রমণসংস্পৃষ্ট ঘটনাবলী যাহা গোবিন্দদাসের করচায় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে চৈতন্যদেব শিব, দুর্গা, নারায়ণ, লক্ষ্মী, রাম, সীতা, নৃসিংহ, বরাহ, কূর্ম্ম, কৃষ্ণ ইত্যাদি ভগবানের বিভিন্ন মূর্ত্তিকে সমধিক ভক্তি প্রদর্শনকরিয়াছিলেন ; এমন কি কোনও দেবতার অকপট ভক্তকে সেই দেবতাহইতে অভিন্ন ভাবিয়া সাতিশয় শ্রদ্ধা প্রদর্শনকরিয়াছিলেন।[১] ভেটদ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি-দর্শনে তাঁহার ভক্তি চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল (পৃঃ ৪৫৬)। যদিও ভগবানের বিভিন্ন মূর্ত্তিকে ভক্তিসহকারে তিনি পূজাকরিতেন, তত্রাচ তিনি বিবে-চনা করিতেন যে রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা সর্ব্বপ্রকার আরাধনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কারণ এই উপাসনাতে বিশুদ্ধ প্রেম ও ভক্তি জীবকে ভগবানের সহিত প্রগাঢ়ভাবে সম্মিলিত করে। আমরা তাঁহার ঈশ্বর-আরাধনায় কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা দেখিতে পাইনা (৩৭২ পৃঃ দেখুন)।

একথা বলা যাইতে পারে যে চৈতন্যদেব সমস্ত ধর্ম্মসমন্বয়—অর্থাৎ

১। তৃপদীনগরে (গোঃ কঃ-পৃঃ-৩১) চৈতন্যদেব মথুরাঠাকুর নামে এক রামাত পণ্ডিতকে বলিলেন—

শ্রীরামের ভক্ত তুমি বৈষ্ণব গোঁসাই।
তোমারে ভজিলে কত তত্ত্বকথা পাই॥

ত্রিপাত্র নগরে (ঐ-পৃঃ ৩৭) শৈব ভর্গদেবকে তিনি বলিলেন—

ঈশ্বরের অবতার না বলিও কভু।
সাক্ষাৎ শঙ্কর তুমি জগতের প্রভু॥

শ্রীরঙ্গে যুধিষ্ঠিরনামা বিষ্ণুভক্ত সাধুকে তিনি বলিলেন—

তোমার সমান সাধু কভু দেখি নাই।
তোমারে ভজিলে কৃষ্ণ দেখিবারে পাই॥

বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান (তখন দাক্ষিণাত্যের কোন কোন প্রদেশে খৃষ্টানধর্ম্ম প্রবেশ করিয়াছিল) এবং হিন্দু ধর্ম্ম সমন্বয়করিবার চেষ্টা করেন নাই। ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে এরূপ সমন্বয়ের জন্য মানবজাতি তখন প্রস্তুত হয় নাই। এক্ষণেও প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে মুষ্টিমেয় সুধী এবং সাধুব্যক্তি সমগ্র মানবজাতির রাজনীতি এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মহামিলনের চেষ্টা করিতেছেন। রাজনীতিক্ষেত্রে ইউরোপে জাতিসঙ্ঘ (League of Nations) তর্কবিতর্কদ্বারা এবং আমাদের দেশে ধর্ম্মবিষয়ে ব্রহ্মজ্ঞানসমিতি (Theosophical Society) সাপ্তাহিক আলোচনা এবং নূতন ব্রহ্মবিদ্যা-পত্রিকা-দ্বারা, 'কালাত্মার বাণী' (the message of the time-spirit) সফল করিবার প্রয়াস করিতেছেন [১]। জাতিসঙ্ঘ যদি প্রথমে সভ্যজাতির সমর-লিপ্সা এবং ব্রহ্মজ্ঞানসমিতি যদি ভারতবর্ষে প্রথমে 'সনাতন' ও 'হরিজন'-বিবাদ এবং হিন্দু-মুসলমান বিরোধনিরসনে কৃতকার্য্য হন, তাঁহারা সকলেরই ধন্যবাদার্হ হইবেন, সন্দেহ নাই।

সারদাচরণ মিত্র মহাশয় তাঁহার 'উৎকলে শ্রীচৈতন্যনামক' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"সমগ্র উৎকলে সহস্রাধিক মন্দিরে বিষ্ণুমূর্ত্তির সহিত বিষ্ণুর অবতারস্বরূপ চৈতন্যদেবের দারুবিগ্রহ প্রত্যহ পূজিত হইতেছে। ব্রাহ্মণেতর উড়িষ্যাবাসীরা প্রায়ই মহাপ্রভুর সাম্প্রদায়িক-গণের শিষ্য ও সেবক।......উড়িষ্যার ভাষা বঙ্গভাষাহইতে অনেকাংশে বিভিন্ন হইলেও চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃতপ্রভৃতি, বঙ্গীয় গ্রন্থ উড়িষ্যায় সর্ব্বত্র আদৃত ও সর্ব্বদাই পঠিত হয়।"

কেহ কেহ বলেন চৈতন্যদেবের ধর্ম্ম হিন্দুজাতিকে নির্বীর্য্য করিয়াছে এবং হিন্দু স্বাধীনতার অন্তরায় হইয়াছে। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যো-

১। ব্রহ্মবিদ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০ (সাল) পৃঃ ৫৩।

পাধ্যায় তাঁহার উড়িষ্যার ইতিহাসে চৈতন্যদেব, তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্ম, রাজা প্রতাপরুদ্র এবং রামানন্দরায় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন (Vol 1. Chap. XXI)—

"The decline in the power of Orissa and the breakup of its empire practically begins with the accession of Pratāparudra. At the time of his accession he ruled over an empire extending from the Hugly and Medinipur Districts of Bengal to the Guntur district of Madras......The date of his accession must be 1497 A. D.. The earlier period of the long reign Pratāparudra (1497 to 1540) was very favourable to the expansion of Orissa, as the imbecile Mahmud was on the throne of Bidar and the five great Mussalman monarchies of the Deccan were already founded. ......From 1497 to 1511 Pratāparudra could easily have conquered the Tamil districts, of the coast-land, if he had only exerted himself [1]. But Orissa was fast approaching a state of political stagnation to which the great religious reformer Chaitanya of Bengal gave permanency between 1510 to 1533......When Krishnadevarāya suceeded his brother, the Emperor of Vijayanagar, in

1. Why did he not exert himself? There was then no Chaitanyadeva to mislead him. Chaitanyadeva settled at Nilāchala in 1512 A. D..

December, 1509, or January, 1510, Pratāparudra's chance of extension came to an end, because the greatest emperor of Vijayanagar[1] had two ambitions, the conquest of the eastern coast from Orissa and the humbling of the power of the Mussalmans. The first years of the reign of Krishnadevarāya were spent in suppressing rebellions, but he very wisely[2] invaded the southern provinces of the empire of Orissa before tackling the Adilshāhi Sultan of Bijapur...... Krishnadevarāya's campaign against Orissa began early in 1512, and Udayagiri fell in 1513, Kondavidu in 1515 and Kondapalle in 1517.

According to Mādāla Panji, Ismail Ghāzi of of Bengal commanded the Mussalman expedition into Orissa during the reign of Pratāparudra. In A. D. 1509 Ismail Ghazi, a general of the

---

1. Mr. Banerjee probably would not suggest that Chaitanyadeva had something to do with Krishnadevarāya's accession.

2. We should say 'very foolishly', because had he been far-sighted enough, he would not have spent his energy in humiliating an independent and distant Hindu King who was fighting with the Mussalman King of Bengal for his country and his religion. The neighbouring Mussalman Kings, whom Krishnadevarāya did not molest, overthrew the Vijayanagar Empire at Talikota a few years after his death, that is in 1565, 'and reduced the splendid city of Vijayanagar to ruins, amid scenes of savage massacre and horrors beggaring description' (Bellary District Gazetteer p. 264).

Bengal Nawab, made a dash into Orissa, ravaged the country, sacked Puri town and destroyed a number of Hindu temples. Pratāparudra hurried from the south and the Mahammadan General retreated. He was closely pursued and defeated on the bank of the Ganges. The General took refuge in Fort-Māndāran (in the Jāhānābād Subdivision of the Hugly District) and was besieged. But one of the Rājā's high officers, Govinda Vidyādhara, went over to the enemy's side and so the Rājā had to raise the siege and retire to Orissa. A reference to the war with the Mussalmans of Bengal is to be found in the Kavali plates of Pratāparudra of the Śaka year 1432—1510-11 A. D.. We learn from this inscription that Pratāparudra recovered his kingdom from the king of Gauda, who was defeated by him...

Suddenly from the beginning of the 16th century a decline set in the power and prestige of Orissa with a corresponding decline in the military spirit of the people. This decline is intimately connected with the long residence of the Bengalee Vaishnava saint Chaitanya in the country. If we accept only one-tenth of what the Sanskrit and Bengali biographies of the saint

state about his influence over Pratāparudra and the people of the country, even then, we must admit that Chaitanya was one of the principal causes of the political decline of the empire and the people of Orissa. Not only that ; the acceptance of Vaishnavism or rather Neo-Vaishnavism was the real cause of the Mussalman conquest of Orissa twenty-eight years after the death of Pratāparudra.

Considered as a religion, Indian Bhakti-mārga is sublime, but its effect on the political status of the country or the nation which accepts it, is terrible. The religion of equality and love preached by Chaitanya brought in its train a false faith in men and thereby destroyed the structure of society and government in Bengal and Orissa, because, in reality, no two men are born equal and government depended upon brute force specially in a country like India in the 14th, 15th, and 16th centuries A. D. . A wave of religious fervour passed over the country, [1] and during this

1. A wave of religious fervour passed over the British Isles in the 17th century. But the intensely religious Puritans became invincible in fight during the Commonwealth. The only book they valued was the Bible. The religion of Christ as embodied in the New Testament inculcates like that of Chaitanya charity (universal love), brotherhood or equality, humility, suffering, purity and faith in God or Bhakti.

reformation Orissa not only lost her empire, but also her political prestige. The effect of Vaishnavism on the society and government of Orissa was far more destructive than in Bengal, because in the latter country militant Ṣaktism[1] was not destroyed totally and the effect of Neo-Vaishnavism was beneficent to the extent of bringing within the pale of society a number of decadent Buddhists who had been outcasted by orthodox Brāhmanism. In Orissa, on account of its acceptance by royalty, Neo-Vaishnavism became fashionable, and powerful officers of Pratāparudra, like Rāmānanda Rāya[2] the Governor of Rājmahendri before its final loss, and Gopinātha Barajenā, that of the Mālajāthyā Dandapātha or Medinipur, were the most notable converts after the king himself. The result was corrosive, though Tārānātha, the Buddhist historiographer, has recorded that some form of Buddhism lingered in Orissa till the

1. But this militant Śaktism had not prevented Bengal from being conquered by the Mussalmans several centuries earlier than Orissa.

2. Whence did Mr. Banerjee gather the information that they were able executive officers? The Chaitanya-Charitāmrita, which he regards as reliable (History of Orissa, Vol. 1. p. 316), says that they were regular embezzlers of the King's revenue and Gopinātha had very loose morals in addition (See p. 251 of this book).

end of the 16th century, gradually stamping out all other sects of Hinduism from the country.......According to Mr. T. C. Rath Rāmānanda Rāya belonged to the Karna family and was an Oriyā by birth. He was the eldest son of Bhavānanda Pattanāyaka who resided both at Puri and Katak. Rāmānanda rose to be the Prime-minister of Pratāparudra and governed the southern Viceroyalty from Vidyānagara[1] near Rājmahendri. It appears that this Vidyānagara may be Vizianagrām. In 1510 Rāmānanda met Chaitanya on the banks of the Godāvari and, being struck by his appearance, became one of his earliest disciples Chaitanya had heard of Rāmānanda from one of his notable disciples, the logician Vāsudeva Sārvabhauma Bhattāchāryya, and is said to have been attracted towards Rāmānanda on account of his piety and learning. The romantic story of the meeting between Chaitanya and Rāmānanda is cited with reverence by all Neo-Vaishnavas ; but its result was disastrous to the empire of Orissa. After meeting Chaitanya, Rāmānanda Rāya resigned his post and retired to Puri.

1. Govinda says that Vidyānagar was near Raipur (C. P.). See also footnote, page 467 of this book.

It is said that Pratāparudra had already become possessed of a religious and spiritual turn of mind [1] and Rāmānanda became the cause of their meeting. Their subsequent meeting and the great hold Chaitanyadeva came to possess over this king are now well-known. [2]

At a time when the Oriya nation needed the services of every honest and capable [3] man for the defence of her political prestige and empire, Rāmānanda Rāya betrayed his trust to his own people by retiring from his position on the weakest frontier of the country, and one may ascribe the fall of Kondavidu, Kondapalle and Rājmahendri to their being left in charge of young and inexperienced officers like the

1. But Chaitanyadeva was not responsible for this.

2. This is pure imagination. Chaitanyadeva very reluctantly permitted the King to approach him once or twice. It is said by some that Pratāparudra clasped Chaitanyadeva's feet, while the latter was almost unconscious. Chaitanyadeva always avoided Vishayi, that is, men possessed of wealth and power. It is true that Pratāparudra entertained for Chaitanyadeva the deepest reverence, but Chaitanyadeva always fought shy of the King and even taunted Advaitāchāryya twice for his association with him.

3. Rāmānanda-rāya was at least not honest, if he repeatedly misappropriated Pratāparudra's money and was not able if he himself being honest (which he probably was) allowed his subordinates to misappropriate the King's revenue, because this bespoke lax supervision and bad administration.

prince Virabhadra on the retirement of Rāmānanda. After Chaitanya's death in 1533 he spent the remainder of his life in devotion. He wrote a Sanskrit drama called Śri-Jagannāthavallabhanātaka and several other minor works.

Neo-Vaishnava effect on Pratāparudra and his policy is only too apparent even in the literature of that sect in Bengal. In Jayānanda's Chaitanyamangala,[1] it is stated that Pratāparudra had consulted Chaitanya about invading Bengal, but that saint had dissuaded him, pointing out that the war would have a disastrous effect on his own country. It is stated in the Chaitanya-charitāmrita that Rāmānanda's brother Gopinātha Barajenā, who was the Governor of Māljyātha or Medinipur, had fallen in arrears to the extent of two laks of kāhans of cowries and was ordered to be put to death by Pratāparudra, but he was saved and reinstated at the intercession

1. Krishnadāsa Kavirāja's Chaitanya-charitāmrita does not mention it. Jayānanda's testimony is not always reliable (See p. 267 of this book and also below). Only two meetings of Pratāparudra with Çhaitanyadeva are recorded. A king like Pratāparudra must be credited with so much commonsense as would make him think twice before approaching Jesus Christ or Chaitanyadeva, the Exponent of truth, universal love, piety and ahimsā and asking his advice regarding war and bloodshed.

of Chaitanya's disciples.[1] The Chaitanya-bhāgavat amentions Pratāparuda's wars with the independent Sultāns of Bengal and describes the devastation of the country and the destruction of images ; yet the advice of Chaitanya was sufficient to cause this cowardly and religiously-minded king to desist from a proper defence of his own territories......The decline in the power and prestige of Orissa is solely due to the national adoption of the sublime Bhaktimārga of Chaitanya.

বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্ এবং ঐতিহাসিক হইতে পারেন, কিন্তু উপরিলিখিত বিবরণ দেখিয়া মনে হয় যে চৈতন্যদেব ও তাঁহার ধর্ম্মের বিরুদ্ধে তিনি গভীর বিদ্বেষ পোষণকরিতেন। প্রথমতঃ চৈতন্যদেব নীলাচলে ১৫১০ খৃঃ মাঘমাসে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি তখন, কাহারও মতে ১৮ দিন, কাহারও মতে তিন মাস, অবস্থান-করিয়া দাক্ষিণাত্যভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। দুই বৎসর পরে ১৫১২ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যহইতে তিনি নীলাচলে প্রত্যাগমন করিয়া-ছিলেন। তিনি সাক্ষাৎপ্রার্থী প্রতাপরুদ্রকে অনেকদিন প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। শেষে তিনি সার্ব্বভৌম ও রামানন্দরায়দ্বারা বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া প্রতাপরুদ্রকে আসিতে অনুমতি দিয়াছিলেন।

1. **This is certainly misleading. Chaitanyadeva firmly declined to interfere, though he was requested by his most beloved disciples to do so. (See p. 251 of this book).**

কেহ কেহ বলেন যে চৈতন্যদেব যখন ভাবাবেশে প্রায় অজ্ঞান হইয়াছিলেন, সেই সময়ে প্রতাপরুদ্র তাঁহার রাজবেশ পরিত্যাগকরিয়া তাঁহার পদযুগল জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। কিন্তু বিজয়নগররাজ কৃষ্ণদেবরায়ের সহিত প্রতাপরুদ্রের যুদ্ধ ১৫১২ হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। আবার সেই সময়েই কিম্বা তাহার কিছু পূর্ব্বেই তাঁহার বঙ্গের মুশলমান-রাজার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে হইয়াছিল। তত্রাচ তিনি বঙ্গের মুশলমান-নৃপতিকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই দুই যুদ্ধের আরম্ভ-সময়ে চৈতন্যদেবের সহিত প্রতাপরুদ্রের সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত হয় নাই। প্রথম সাক্ষাতের পরে প্রতাপরুদ্রের সহিত চৈতন্যদেবের আর একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল মনে হয়।

চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকের ৮ম অঙ্কে প্রথম সাক্ষাৎ বর্ণিত হইয়াছে। ৯ম অঙ্কের ১৮ শ্লোকে সম্ভবতঃ দ্বিতীয় সাক্ষাতের কথা লিখিত হইয়াছে। নীলাচল হইতে নবদ্বীপ যাইবার সময়ে কটকে এই দ্বিতীয় সাক্ষাৎও রামানন্দরায় করাইয়াছিলেন (চৈঃ চঃ মধ্য-১৬শ-৪৩-৪৪)। তাহার পরে আর সাক্ষাৎ সম্ভবতঃ হয় নাই। কারণ চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের ১০ম অঙ্কের ৩১ শ্লোকে প্রতাপরুদ্র বলিতেছেন "পুরোহিত! এই বৎসর আমি এখানে থাকিয়াই স্নানোৎসব দর্শন করিব, নতুবা তথায় যাইলে ভগবান্ গৌরাঙ্গদেবের আনন্দোল্লাস সঙ্কুচিত হইবে"। পুনরায় এই অঙ্কের ৫৫ শ্লোকে প্রতাপরুদ্র বলিতেছেন, "হায় তাঁহার (চৈতন্যদেবের) সমীপে গমন আমার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব......" (রাঃ বিঃ কৃত অনুবাদ)।

বৃন্দাবনদাস (চৈতন্যভাগবত-অন্ত্য-৫ম) লিখিয়াছেন যে চৈতন্যদেবের সহিত প্রতাপরুদ্রের প্রথম সাক্ষাৎ তাঁহার রামকেলি হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমনের পরে হইয়াছিল—

"গৌড়দেশে পুনর্ব্বার প্রভুর বিহার।
ইহা যে শুনয় তার দুঃখ নহে আর॥
সর্ব্ব নীলাচল-দেশে উপজিল ধ্বনি।
পুন আইলেন প্রভু ন্যাসিচূড়ামণি॥

* * *

নিরন্তর নৃত্যগীত আনন্দ-আবেশ।
প্রকাশেন গৌরচন্দ্র—দেখে সর্ব্বদেশ॥
কথনো নাচেন জগন্নাথের সম্মুখে।
তিলার্দ্ধেকো বাহ্য নাহি নিজানন্দ-সুখে॥
কখনো নাচেন কাশীমিশ্রের মন্দিরে।
কখনো নাচেন মহাপ্রভু সিন্ধু-তীরে॥

* * *

যে দিগে চৈতন্য-মহাপ্রভু চলি যায়।
সেই দিগে সর্ব্ব-লোক 'হরি হরি' গায়॥
প্রতাপরুদ্রের স্থানে হইল গোচর।
'নীলাচলে আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর'॥
সেইক্ষণে শুনি মাত্র নৃপতি-প্রতাপ।
কটক ছাড়িয়া আইলেন জগন্নাথ॥
প্রভুরে দেখিতে সে রাজার বড় প্রীত।
প্রভু সে না দেন দরশন কদাচিত॥
সার্ব্বভৌম আদি সবা স্থানে রাজা কহে।
তথাপি প্রভুরে কেহো না জানায় ভয়ে॥
রাজা বলে, "তুমি সব যদি কর ভয়।
অগোচরে আমারে দেখাহ মহাশয়॥"

দেখিয়া রাজার আর্ত্তি সর্ব্ব ভক্তগণে।
সবে মেলি এই যুক্তি করিলেন মনে॥
যে সময়ে প্রভু নৃত্য করেন কীর্ত্তনে।
বাহ্য-জ্ঞান দৈবে নাহি থাকয়ে তখনে॥
রাজাও পরম ভক্ত সেই অবসরে।
দেখিবেন প্রভুরে থাকিয়া অগোচরে॥

*　　　*　　　*

দৈবে একদিন প্রভু পুষ্পের উদ্যানে।
বসিয়া আছেন কত পারিষদ সনে॥
একাকী প্রতাপরুদ্র গিয়া সেইস্থানে।
দীর্ঘ হই পড়িলেন প্রভুর চরণে॥"

যদি বৃন্দাবনদাসের কথা সত্য হয়, তাহা হইলে প্রতাপরুদ্রের সহিত চৈতন্যদেবের প্রথম সাক্ষাৎ ১৪৩৬ শকের (১৫১৫ খৃঃ) চৈত্র মাসের পরে হইয়াছিল; কারণ চৈতন্যদেব ঐ সময়ে গৌড় হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন (বৈষ্ণবদিগ্দর্শনী-৬২ পৃঃ দেখুন)।

কবিকর্ণপূর কিম্বা বৃন্দাবনদাস কেহই বলিতেছেন না যে প্রতাপরুদ্রের সহিত চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ তাঁহার দাক্ষিণাত্যভ্রমণের পূর্ব্বে হইয়াছিল। তিনি ১৪৩৩ শক, ৩রা মাঘে (খৃঃ ১৫১২) দাক্ষিণাত্য হইতে নীলাচলে প্রত্যাগমন করেন। তাহার পরে অনেক দিন তিনি প্রতাপরুদ্রকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। কিন্তু গৌড়ের মুশলমান রাজার পরাজয় ১৫১১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই হইয়াছে (পৃঃ ৪৮২ দেখুন)। ১৫১২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই (early in 1512. পৃঃ ৪৮১ দেখুন) বিজয়নগরের কৃষ্ণদেবরায় উৎকলরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে চৈতন্যদেবের সহিত প্রতাপরুদ্রের

সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বেই কৃষ্ণদেবরায় প্রতাপরুদ্রের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রতাপরুদ্র এ যুদ্ধ আরম্ভ করেন নাই।

বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয় জয়ানন্দের কথা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন (নিম্নে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের বিস্তৃত আলোচনা দেখুন)। জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে প্রতাপরুদ্র চৈতন্যদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি গৌড় আক্রমণকরিবেন কিনা। ইহার উত্তরে চৈতন্যদেব বলিলেন যে গৌড় আক্রমণ না করিয়া তিনি যেন বিজয়নগর আক্রমণকরেন এবং চৈতন্যদেবের পরামর্শমতে প্রতাপরুদ্র বিজয়নগর আক্রমণকরিলেন। আমাদিগের এ বিষয়ে বক্তব্য এই—প্রথমতঃ প্রতাপরুদ্র নিজের ইচ্ছায় কৃষ্ণদেবরায়ের সহিত যুদ্ধ করেন নাই (৪৮১ পৃঃ দেখুন)। দ্বিতীয়তঃ যে সময়ে কৃষ্ণদেবরায়ের সহিত প্রতাপরুদ্রের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, সে সময়ে চৈতন্যদেবের সহিত প্রতাপরুদ্রের সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত হয় নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বাসুদেবসার্ব্বভৌম ও রামানন্দরায়ের বিশেষ অনুরোধে তিনি প্রথম সাক্ষাতে সম্মত হইয়াছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য 'বিষয়ী' প্রতাপরুদ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন বলিয়া চৈতন্যদেব বিশেষরূপে অসন্তুষ্ট হইতেন। গোপীনাথরায়ের মুক্তির জন্য বারংবার অনুরুদ্ধ হইয়াও প্রতাপরুদ্রকে অনুরোধকরিতে চৈতন্যদেব সম্মত হন্ নাই। যিনি বিষের ন্যায় বিষয়ীকে পরিহারকরিতেন, তিনি যে প্রতাপরুদ্রকে রাজনীতি-সংক্রান্ত পরামর্শ দিবেন, আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয় বলিয়াছেন যে জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলে লিখিয়াছেন যে চৈতন্যদেবের উপদেশমত প্রতাপরুদ্র গৌড়ের মুশলমান-রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে বিরত হইয়াছিলেন। প্রতাপরুদ্র

এত কাণ্ডজ্ঞানশূন্য রাজা ছিলেন না যে তিনি যুদ্ধবিষয়ে অহিংসার মূর্ত্তপ্রতীক চৈতন্যদেবকে পরামর্শ জিজ্ঞাসাকরিবেন। যীশুখৃষ্টকে যদি তাঁহার সময়ের কোন রাজা 'যুদ্ধ করিব কিনা' জিজ্ঞাসাকরিতেন, তাঁহার নিকটে কি উত্তর তিনি আশা করিতেন? আমরা চৈতন্য-দেবের উত্তর সহজেই অনুমান করিতে পারি। যখন রাজস্ব-অপহরণ এবং রাজপুত্রকে অপমানকরার জন্য গোপীনাথরায়কে [১] রাজার লোক চাঙে চড়াইয়াছিল এবং চৈতন্যদেবের নিকটে গোপীনাথরায়ের লোক বারংবার আসিয়া গোপীনাথের মুক্তির জন্য প্রতাপরুদ্রকে অনুরোধ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অনুনয়করিতেছিল, তখন তিনি তাহাদিগকে জগন্নাথদেবের শরণ লইতে বলিয়াছিলেন। প্রতাপরুদ্র 'যুদ্ধ করিব কিনা' জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহাকে জগন্নাথদেবের নিকট ইহা নিবেদন করিতে বলিতেন এবং তিনি বিশ্বাস করিতেন যে জগন্নাথদেব কি করা বিধেয় তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন—

'তবে রক্ষা করিতে যদি হয় সভার মনে।
সবে মিলি যাহ জগন্নাথের চরণে॥
ঈশ্বর জগন্নাথ যার হাতে সর্ব্ব অর্থ।
কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা করিতে সমর্থ॥'

—চৈঃ চঃ-অন্ত্য-৯ম-১৬।

প্রতাপরুদ্র যদি চৈতন্যদেবের এত ভক্তই হইবেন, তাহা হইলে চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাতের পরে তিনি বৈরাগ্যব্রত অবলম্বনকরেন

১। গোপীনাথ মালজাঠ্যাদণ্ডপাঠের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। "বর্ত্তমান কাঁথি (Contai) মহকুমার অধিকাংশই মালজাঠ্যাদণ্ডপাঠের অন্তর্ভুক্ত ছিল"—মেদিনীপুরের ইতিহাস, যোগেশচন্দ্র বসু প্রণীত, পৃঃ ৭।

নাই কেন? চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাতের পরেও [১] তিনি পুনরায় দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধকরিতে গিয়াছিলেন এবং ইত্যবসরে তাঁহার নিযুক্ত রেমুণার ঘট্টপাল চৈতন্যদেবের অনুচরদিগের অর্থাৎ শিবানন্দসেন এবং গৌড়ীয় ভক্তগণের উপর অত্যাচার করিয়াছিল; তাহার বর্ণনা চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে (১০ম অঙ্ক-৫) আছে। জয়ানন্দের বর্ণনার সত্যতাসম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি (পৃঃ ২৬৭ দেখুন) এবং পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয় বলিয়াছেন যে রামানন্দরায় চৈতন্যদেবের পরামর্শে রাজমহেন্দ্রীর শাসনকার্য্য ত্যাগকরিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্যদেব তাঁহাকে রাধাকৃষ্ণধর্ম্মে দীক্ষিত করেন নাই; তিনিই অনেক ভক্তিধর্ম্মতত্ত্ব চৈতন্যদেবকে অবগত করাইয়াছিলেন। রামানন্দরায় ও গোপীনাথরায়ের সম্বন্ধে যে প্রতাপরুদ্রের ভাল ধারণা ছিল ইহা বোধ হয় না। তাঁহারা রাজার সমস্ত প্রাপ্য অর্থ রাজকোষাগারে দিতেন না (চৈঃচঃ-অন্ত্য-৯ম-৩৯)। এইজন্য প্রতাপরুদ্র নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।[২] রামানন্দ রাজকার্য্য অপেক্ষা ধর্ম্মচর্চ্চাতে বোধ হয় অধিকতর মন দিতেন। সার্ব্বভৌম চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্যগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহাকে রামানন্দসম্বন্ধে বলিতেছেন—

১। চৈতন্যদেবের সহিত প্রতাপরুদ্রের সাক্ষাৎ চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকের ৮ম অঙ্কে বর্ণিত হইয়াছে। যুদ্ধ করিতে পুনরায় দাক্ষিণাত্যে প্রতাপরুদ্রের গমনের কথা ১০ম অঙ্কে লিখিত আছে।

২। গোপীনাথ অন্য বিষয়েও অসচ্চরিত্র লোক ছিলেন। চৈতন্যদেব বলিতেছেন—

"বিলাত সাধিয়া খায় নাঞি রাজভয়।
দারী নাটুয়াকে দিঞা করে নানা ব্যয়॥"

অর্থাৎ গোপীনাথ প্রজার নিকট হইতে রাজার প্রাপ্য অর্থ আদায় করিয়া বেশ্যা ও নর্ত্তকীতে অপব্যয় করিত।

"তোমার সঙ্গের ভক্ত তিহোঁ একজন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তার সম॥
পাণ্ডিত্য ভক্তিরস দুয়ের তিহোঁ সীমা।
সম্ভাষিলে জানিবে তাঁহার মহিমা॥"

—(চৈঃ চঃ-মধ্য-৭ম-৪৬)।

বোধ হয় এইজন্যই তিনি রাজকার্য্যে তত মনোনিবেশ করিতে পারিতেন না এবং অন্যান্য কর্ম্মচারী রাজ-অর্থ অপহরণ করিত। এ ক্ষেত্রে শাসনকার্য্য অন্য উপযুক্ত লোকের হাতে দিয়া তাঁহার চলিয়া আসা সমীচীন হইয়াছিল। বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয় নিজেই বলিয়াছেন যে চৈতন্যদেবের ধর্ম্ম মানুষকে নির্ব্বীর্য্য করিয়া দেয়। চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বহইতেই রামানন্দ রাধাকৃষ্ণভক্তিধর্ম্ম চর্চ্চা করিতেছিলেন। এরূপ লোকের রাজমহেন্দ্রীর শাসনকার্য্য ত্যাগ করা বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয়ের নিয়মানুসারে ত ভালই হইয়াছিল। যিনি গোপীনাথ রাজকার্য্য ত্যাগকরিতে চাহিলেও তাঁহাকে রাজকার্য্য ত্যাগকরিতে নিষেধকরিয়াছিলেন, তিনি যে রামানন্দকে জোর করিয়া রাজকার্য্য ত্যাগকরাইয়াছিলেন, ইহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। রামানন্দের সম্ভবতঃ রাজকার্য্য ভাল লাগিত না কিম্বা তিনি ইহা উত্তমরূপে সম্পন্ন করিতে পারিতেন না। সেইজন্য চৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন, যে যদি তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগকরেন, তাহা হইলে তিনি যেন নীলাচলে আসিয়া তাঁহার নিকটে অবস্থান করেন। বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয় কি মনে করেন যে কোন লোকের কোন সময়েও বিষয়-ভোগে বিরাগ হওয়া উচিত নয়?

বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয় বলেন যে চৈতন্যদেবের ধর্ম্ম 'sublime'। এ ইংরাজী কথার অর্থ আমরা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। কোন

ধর্ম্মের কি 'vulgar or low' হওয়া উচিত? ধর্ম্মে উচ্চ আদর্শ থাকিবে না ইহাই কি বাঞ্ছনীয়? চৈতন্যদেবের ধর্ম্ম equality and love— সাম্য এবং মৈত্রী—শিক্ষাদিয়া সমাজ নষ্ট করিয়াছিল এবং উড়িষ্যার স্বাধীনতা ধ্বংসকরিয়াছিল এ কথা তিনি বলিয়াছেন। মুশলমান-ধর্ম্ম ও খৃষ্টান-ধর্ম্ম মুশলমানদিগকে এবং খৃষ্টানদিগকে সাম্য এবং মৈত্রী শিক্ষা দেয়। কিন্তু সেইজন্য মুশলমানদিগের কিম্বা খৃষ্টানদিগের রাজ্যশাসন-শক্তি কি হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল না বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল? বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয় বলেন যে চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে brute force অর্থাৎ পশুবলের আবশ্যকতা ছিল; কিন্তু চৈতন্যদেবের ধর্ম্ম 'পশুবল' সমর্থন করে নাই বলিয়া উড়িষ্যার অধঃপতন হইয়াছিল। তবে বঙ্গদেশ চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়ের বহুপূর্ব্বে মুশলমান-দিগের করায়ত্ত হইয়াছিল কেন? আমরা জানি চৈতন্যদেব গৃহীকে গৃহীর নিয়ম পালনকরিতে বলিতেন, তাহাকে বৈরাগ্যব্রত অবলম্বন করিতে কখনও বলিতেন না; পূর্ব্বেই ইহা আমরা দেখাইয়াছি। 'Brute force' অর্থাৎ পশুবল-দ্বারা রাজ্যজয় করা সম্ভব হইলেও, ইহা দ্বারা রাজ্যশাসন স্থায়ী হয় না। কিন্তু উড়িষ্যার অধঃপতনের প্রধান কারণ কি? বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয়ের বিবরণ হইতে সকলেই ইহা সহজেই অনুমান করিতে সক্ষম—

(১) বিজয়নগররাজ কৃষ্ণদেবরায়ের এবং গৌড়ের মুশলমান নৃপতির প্রায় একসময়ে উৎকল-আক্রমণ। গৌড়ের সহিত প্রতাপরুদ্রের যুদ্ধ ১৫১১ খৃষ্টাব্দে শেষ হইয়াছিল। কৃষ্ণদেবরায় ১৫১২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে উৎকলরাজ্য আক্রমণকরিয়াছিলেন।

(২) রাজ্যশাসন ও যুদ্ধবিষয়ে প্রতাপরুদ্র অপেক্ষা কৃষ্ণদেবরায়ের অধিকতর দক্ষতা। কৃষ্ণদেবরায় বিজয়নগরের নৃপতিদিগের অলঙ্কার-

স্বরূপ ছিলেন। কৃষ্ণদেবরায় দাক্ষিণাত্যের মুশলমান-রাজাদিগকে জয় না করিয়া একজন স্বাধীন হিন্দু-নৃপতিকে প্রথমে আক্রমণকরিয়া ভারতবর্ষের হিন্দু-শক্তি এবং সভ্যতানাশে সাহায্য করিয়াছিলেন, ইহা আমরা বলিতে বাধ্য। তাঁহার উচিত ছিল প্রতাপরুদ্রের সহিত সম্মিলিত হইয়া অন্ততঃ বঙ্গ হইতে কুমারিকাপর্য্যন্ত একটী বিস্তৃত হিন্দু-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করা। কৃষ্ণদেবরায় প্রতিবাসী শত্রুভাবাপন্ন মুশলমান-ভূপালদিগের ক্ষমতা খর্ব্ব না করিয়া প্রতাপরুদ্রের ন্যায় একটী হিন্দুধর্ম্ম ও সভ্যতারক্ষণে প্রয়াসী স্বাধীন নৃপতির সহিত যুদ্ধদ্বারা প্রতাপরুদ্রের ও তাঁহার নিজের শক্তির অপচয় করিয়াছিলেন এবং সমগ্র হিন্দুভারতবর্ষের এবং বিশেষতঃ উৎকলের এবং বিজয়নগরের সর্ব্বনাশ-সাধন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদেবরায়ের মৃত্যুর কতিপয় বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে তালিকোটার যুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবেশী মুশলমান নৃপতিগণকর্ত্তৃক অমানুষিক অত্যাচারের সহিত বিজয়নগর-ধ্বংসদ্বারা ইহা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছিল [১]। কৃষ্ণদেবরায়ের জানা উচিত ছিল যে উড়িষ্যাতে গৌড়ের মুশলমান রাজা যাহা করিয়াছিল, তাহা সুবিধা পাইলে তাঁহার প্রতিবেশী মুশলমান নৃপতিরা বিজয়নগরেও করিবে। উড়িষ্যায় কিরূপ গৌড়ের মুশলমান রাজা অত্যাচার করিয়া-ছিল, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে (অন্ত্য খণ্ড-৪র্থ) বর্ণিত হইয়াছে—

"যে হুসেন সাহা সর্ব্ব উড়িয়ার দেশে।
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে॥

* * *

স্বভাবেই রাজা মহা-কাল-যবন।
মহা-তমো-গুণ-বুদ্ধি হয় ঘনে ঘন॥

১। আমার Stray Thoughts, Part IV, P. 30 দেখুন।

ওড্রদেশে কোটি কোটি প্রতিমা প্রাসাদ।
ভাঙ্গিলেক কত কত করিল প্রমাদ ॥"

(৩) প্রতাপরুদ্রের সেনাপতিদিগের বিশ্বাসঘাতকতা। সেনাপতি গোবিন্দ-বিদ্যাধর বিশ্বাসঘাতকতা না করিলে প্রতাপরুদ্র বঙ্গদেশ জয়করিতে বোধহয় সক্ষম হইতেন, বন্দ্যোপাধ্যায়মহাশয়ই বলিয়াছেন। তাহা হইলে বঙ্গদেশ উড়িষ্যার হিন্দু-নৃপতির অধীনে থাকিত এবং গৌড়ের মুশলমানরাজাদ্বারা উড়িষ্যা-আক্রমণের সম্ভাবনা থাকিতনা। এই গোবিন্দবিদ্যাধরই প্রতাপরুদ্রের পুত্রগণকে হত্যাকরিয়া ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে (প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর দুই বৎসর পরে) উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিরূঢ় হন্ (শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসুর মেদিনীপুরের ইতিহাস)।

চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে 'সনাতন' হিন্দুধর্ম্মের এবং মুশলমান-রাজার উৎপীড়নের নিমিত্ত বঙ্গের হিন্দুজাতি ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছিল। চৈতন্যদেব এবং নিত্যানন্দ ইহা নিবারণকরিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। রূপ এবং সনাতন ব্রাহ্মণ হইলেও মুশলমান-নৃপতির অধীনে চাকরী করিতেন বলিয়া 'সনাতনী'-হিন্দু তাঁহাদিগকে অস্পৃশ্য করাইয়াছিলেন। সুবর্ণবণিক প্রভৃতি বৈশ্যজাতিরাও চৈতন্য-দেব এবং নিত্যানন্দের সাহায্য না পাইলে অস্পৃশ্যই থাকিয়া যাইতেন এবং উচ্চজাতিদ্বারা নিষ্পিষ্ট হইয়া তাঁহাদিগের ভিতর অনেকে মুশলমানধর্ম্ম গ্রহণকরিতেন। পরমভাগবত রঘুনাথদাস কায়স্থ ছিলেন, কিন্তু চৌধুরী বলপূর্ব্বক তাঁহার মুখে যদি একটু গোমাংস স্পর্শকরাইত, তাহা হইলে তিনি ও তাঁহার আত্মীয়েরা অস্পৃশ্য হইতেন (পৃঃ ২২৪ দেখুন)। পরম-বৈষ্ণব হরিদাস ব্রাহ্মণ হইলেও যবনদ্বারা প্রতিপালিত বলিয়া যে অস্পৃশ্য হইবেন, তাহার ত কথাই নাই। পরমভক্ত ঝড়ু ভূঁইমালীরও অবস্থা তাদৃশ ছিল। রাজা

প্রতাপরুদ্র বলিয়াছিলেন যে সে সময়ে অনেক লোক অদর্শনীয়ও ছিল (পৃঃ ২৫৭)। মুশলমানেরা বলপ্রয়োগপূর্ব্বক অনেক হিন্দুকে মুশলমান করিয়াছিল। অনেকস্থলে বলপ্রয়োগের আবশ্যকতা হয় নাই। বঙ্গের মুশলমান-আধিপত্যের সময়ে অনেক হিন্দু মুশলমান-নৃপতির এবং তাঁহার নিযুক্ত প্রাদেশিক মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইঁহাদের অনেককেই 'সনাতনী' হিন্দুরা মুশলমান কিম্বা অস্পৃশ্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। 'সনাতনী' হিন্দুরা তাঁহাদিগকে হিন্দুসমাজে পুনরায় আনয়নকরিবার কোন ব্যবস্থা করেন নাই। ইহার ফল বঙ্গের বর্ত্তমান হিন্দুরা বিশেষরূপে ভোগ করিতেছে।

চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকের ও চৈতন্যভাগবতের অতিরঞ্জন বাদ দিলেও চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সময়ে ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বঙ্গের এবং নবদ্বীপের অবস্থা কথঞ্চিৎ পরিমাণে আমরা অবগত হইতে পারি। চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক (২য় অঙ্ক—অনুবাদ)—

(বিরাগ বলিতেছেন) "ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞসূত্রমাত্রচিহ্ন ধারণকরিয়া যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও দান পরিত্যাগকরিয়া কেবল ষষ্ঠকর্ম্মে অর্থাৎ প্রতিগ্রহে (দানগ্রহণে) ব্যাপৃত আছেন।............

আহা! সন্মুখে এই একটী উৎকৃষ্ট জনপদে তেজস্বী বিদ্বন্মণ্ডলী রহিয়াছিলেন। ইঁহারা তার্কিক, জন্মাবধি ইঁহারা কেবল 'জাতি, অনুমিতি, ব্যাপ্তি' প্রভৃতি শব্দের অর্থনিরূপণে সময় অতিবাহিত করিতেছেন। ভগবানের বিষয় আলোচনা ইঁহাদের সুদূরপরাহত। ইঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা কল্পনাকুশল তাঁহারাই বিদ্বান্ ও শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধ।"

(কিয়দ্দূর গমন করিয়া), "সম্মুখে মায়াবাদী এবং অদ্বৈতবাদী

পণ্ডিত রহিয়াছেন। ইঁহারা 'ব্রহ্মৈবাস্মি' অর্থাৎ 'আমিই ব্রহ্ম' বলিতেছেন। ইঁহাদের ভগবদ্বিগ্রহে বিশ্বাস নাই"..............

(পুনরায় কিয়দ্দূর গমন করিয়া), "আবার এখানে পণ্ডিতেরা কপিল, কণাদ, পতঞ্জলি ও জৈমিনির মতসম্বন্ধে পরস্পর বিবাদ করিতেছেন; কিন্তু ইঁহাদিগের কেহই ভগবানের তত্ত্ব জানেন না।"

(পুনরায় কিয়দ্দূর গমন করিয়া), "আমি দক্ষিণদিকে (গোদাবরীর নিকটে) আসিয়া পড়িয়াছি। এখানে আর্হত (জৈন), সৌগত (বৌদ্ধ) এবং কাপালিক (নরকপালধারী শৈব) 'পাষণ্ডগণ' অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধ আচারবান্ ব্যক্তিসকল রহিয়াছে।"

(সেইস্থান হইতে ভয়ে আর একস্থানে আসিয়া)—"এই ব্যক্তি সাধু হইবেন। ইনি নদীতীরে শিলার উপরে উপবেশন করিয়া পরাৎপর পরমেশ্বরকে ধ্যান করিতেছেন এবং জিহ্বার অগ্রভাগদ্বারা ললাটস্থ চন্দ্রের অমৃতক্ষরণের পথ রুদ্ধ করিয়া যোগাসনে বসিয়া আছেন। (সবিস্ময়ে) একি! জল-আনয়নকারিণী তরুণীর শঙ্খধ্বনিতে ইঁহার সমাধি ভগ্ন হইল দেখিতেছি। তবে ইঁহার ধ্যানাদি উদরভরণাদিনিমিত্ত কেবল নাট্যমাত্র!"

চৈতন্যভাগবত—আদিখণ্ড-২য় অধ্যায়—

'দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥

*　*　*　*

বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে॥

মধ্যখণ্ড (১৩শ অধ্যায়ে)—

একদিন পথে দেখে দুই মাতোয়াল।
মহাদস্যুপ্রায় দুই মদ্যপ বিশাল॥
সে দুই জনার কথা কহিতে অপার।
তারা নাহি করে হেন পাপ নাহি আর॥
ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য-গোমাংস-ভক্ষণ।
ডাকা, চুরি, পরগৃহ-দাহে সর্ব্বক্ষণ॥

* * * *

ঐ (২৩ অধ্যায়ে)—

প্রতিদিন, নগরিয়াগণ কৃষ্ণ গায়।
একদিন দৈবে কাজি সেই পথে যায়॥

* * * *

হরিনাম-কোলাহল চতুর্দ্দিকে মাত্র।
শুনিয়া স্মঙরে কাজি আপনার শাস্ত্র॥
কাজি বলে "ধর ধর আজি করোঁ কার্য্য।
আজি বা কি করে তোর নিমাই আচার্য্য"॥
আথে ব্যথে পলাইল নাগরিকগণ।
মহাত্রাসে কেশ কেহো না করে বন্ধন॥
যাহারে পাইল কাজি মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ, অনাচার কৈল দ্বারে॥
কাজি বলে, 'হিন্দুয়ানি হইল নদীয়া।
করিব ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়া॥
ক্ষমা করি যাঙ আজি, দৈবে হইল রাত্রি।
আর দিন নাগালি পাইলে লইব জাতি'॥

এই মত প্রতিদিন দুষ্টগণ লৈয়া।
নগর ভ্রময়ে কাজি কীর্ত্তন চাহিয়া॥

* * * *

প্রভু বলে, "নিত্যানন্দ হও সাবধান।
এই ক্ষণে চল সব বৈষ্ণবের স্থান॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে আজি করিমু কীর্ত্তন।
দেখি মোরে কোন্ কর্ম্ম করে কোন জন"॥

উপরে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সময়ে হিন্দুদিগের কিরূপ নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক অবনতি হইয়াছিল এবং কিরূপে তাহারা মুসলমান শাসন-কর্ত্তাদিগের দ্বারা নির্য্যাতিত হইত। চৈতন্যদেব এক ঈশ্বরে (শ্রীকৃষ্ণে) বিশুদ্ধ প্রেম ও ভক্তি, আত্মসংযম এবং মানবপ্রীতি শিক্ষা দিয়া হিন্দু-জাতিকে সর্ব্বনাশ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং মুশলমান শাসনকর্ত্তার পশুবলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া হিন্দুদিগের মনে তিনি সাহস সঞ্চারকরিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের **'brute force'** অর্থাৎ পশুবল ছিল না বটে; কিন্তু যাহাকে পুরুষকার, নৈতিক সাহস (**strong will, moral strength**) বলে তাহা তাহার অধিক পরিমাণে ছিল। কাজির অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, আত্মসংযম-বিষয়ে কঠিন নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া, পরাক্রান্ত উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রকে অনেকবার প্রত্যাখ্যানকরিয়া, রাজস্বাপহারক গোপী-নাথের জন্য প্রতাপরুদ্রকে অনুরোধ করিতে অস্বীকার করিয়া, অনুচর-দিগের পরামর্শের বিরুদ্ধে পন্থভীল, মুরারিগণ এবং নারোজীকে উদ্ধারকরিয়া, নিজের ক্রটি স্বীকারকরিয়া এবং সংশোধনকরিয়া এবং সনাতন-পন্থী হিন্দুদিগের বাধাদানসত্ত্বেও পতিত ও অদর্শনীয় শ্রেণীর

লোকদিগকে অর্থাৎ আচণ্ডালে ভগদ্ভক্তি বিতরণকরিয়া নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বলের পরাকাষ্ঠা তিনি প্রদর্শনকরিয়াছিলেন।

চৈতন্যদেব এই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হিন্দুসমাজকে বঙ্গে এবং উৎকলে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। চৈতন্যদেব সন্ন্যাসগ্রহণের পর ২৪ বৎসর এই কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার দেহত্যাগের পরে তাঁহার অনুচরেরা তাঁহাকে ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন করিয়া, তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী অতিরঞ্জিত করিয়া, তাঁহার উপদেশের বিকৃত অর্থ করিয়া, গোবিন্দের করচার ন্যায় গ্রন্থকে অপ্রামাণিক বলিয়া তাহার প্রচার বন্ধ করিয়া, বিস্তৃত অবতারবাদ সৃষ্টি করিয়া এবং 'তিনি ঈশ্বর' ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার ন্যায় আদর্শ মাতৃভক্তকে তাঁহার মাতৃদেবীর মস্তকে চরণস্থাপন পর্য্যন্ত করাইয়া, [১] তাঁহার সার্ব্বজনীন বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্ম উপহাসাস্পদ করিয়াছিলেন এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি কূটতর্কদক্ষ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের নব্যস্মৃতির সাহায্য পাইয়া 'সনাতন' ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষকেরা বঙ্গের হিন্দুজাতির অধিকতররূপে বিশ্লেষণ, বিভাগ ও বিভেদ করিয়া নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগকে অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করাইয়া কিম্বা তাহাদিগকে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদিগের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন করাইয়া বর্ত্তমান 'সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা' এবং ইহা 'নাকচ' করিবার জন্য দেশে-বিদেশে নিরর্থক বাগ্বিতণ্ডা-রূপ অদ্ভুত বৃক্ষদ্বয়ের বীজ রোপণকরিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মকে বিশুদ্ধ করা এবং হিন্দুসমাজকে ছিন্নভিন্ন হইতে না দেওয়া (মহাত্মা গান্ধীও এইরূপ চেষ্টা করার জন্য অনেকের চক্ষুঃশূল হইয়াছেন)

১। রামচন্দ্রকে ঈশ্বর প্রমাণকরিবার জন্য বাল্মীকি রামচন্দ্রের কৌশল্যার মস্তকের উপরে পদস্থাপনের কথা বলেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর মাথার উপরে পা রাখিয়াছিলেন, এরূপ কথাও ত শুনি নাই।

যদি দোষার্হ হয়, তাহা হইলে চৈতন্যদেব বিষম অপরাধী সন্দেহ নাই।

আমাদিগের মনে হয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় চৈতন্যদেবের ধর্ম্মের সহিত 'নেড়ানেড়ির' ধর্ম্ম বিমিশ্রিত করিয়াছেন। চৈতন্যদেব আত্ম-সংযম, আন্তরিকতা, মানবপ্রীতি ও ভগভক্তি শিক্ষাদিয়াছিলেন। তিনি কোন গৃহীকে সন্ন্যাসী হইতে বলেন নাই। অদ্বৈতাচার্য্য, রামানন্দ, শিবানন্দ, বাসুদেব প্রভৃতি ভক্তগণ সকলেই গৃহী ছিলেন। নিত্যানন্দ প্রথমে সন্ন্যাসগ্রহণ করিলেও পরে গৃহী হইয়াছিলেন। চৈতন্যদেব প্রতাপরুদ্রকে রাজ্যত্যাগ করিতে বলেন নাই। রাজার সমস্ত প্রাপ্য অর্থ গোপীনাথের নিকট হইতে রাজা আদায়করেন, চৈতন্যদেবের ইহা আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। গোপীনাথ রাজকার্য্য ত্যাগ করিতে চাহিলেও তিনি ইহাতে সম্মতি দেন নাই। অবশ্য মুমুক্ষুদিগকে চৈতন্যদেব মোক্ষলাভের প্রকৃষ্ট পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন। যীশুখৃষ্ট কিম্বা চৈতন্যদেবের উপদেশ-অনুসারে কয়জন লোক তাহাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছে? এই মহাত্মাদিগের বাণীর বিকৃত অর্থ করিয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা অনেকেই করিয়াছে এবং তাহার ফলভোগও তাহারা করিয়াছে। উহার জন্য যীশুখৃষ্ট কিম্বা চৈতন্যদেবকে দায়ী করা অন্যায়।

আমরা জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের কথা দুইবার অবতারণাকরিয়াছি—প্রথম চৈতন্যদেবের তিরোধানের বিষয়ে (পৃঃ ২৬৫ দেখুন); পরে চৈতন্য-দেবের পরামর্শানুসারে উৎকলরাজের গৌড়-অভিযানবিষয়ে (পৃঃ ৪১২)। নগেন্দ্রনাথ বসু ও কালিদাস নাথ মহাশয়দ্বারা সম্পাদিত জয়ানন্দরচিত চৈতন্যমঙ্গল পাঠ করিয়া মনে হইল যে ইহা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অসংলগ্ন এবং কাল্পনিক কথায় পরিপূর্ণ। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের

অধিকাংশ বৃত্তান্তের সত্যতা নিম্নলিখিত অংশগুলি হইতে জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে—

(১) পৃঃ ২১—চৈতন্যদেব একটী কুকুরের মুখে হরিনাম প্রকাশ করিলেন—

"আর একদিনে নবদ্বীপের ভিতর।
শিশুগণ সঙ্গে গৌর খেলে ঘরে ঘর॥
অনেক বালক সংখ্যা করিতে না পারি।
কুক্কুরের ছা এক রড় দিঞা ধরি॥
আলিঙ্গন দিঞা তারে বলে দয়ানিধি।
'এতদিনে তোমারে প্রসন্ন হইল বিধি'॥
গঙ্গাদাস বলি তার নাম থুইল।
শিকলে বান্ধিয়া তারে ঘৃতান্নে পুষিল॥
যথা প্রভু থাকে, তথা কুক্কুর গঙ্গাদাস।
তার মুখে হরিনাম করিল প্রকাশ॥"

* * * *

(২) পৃঃ ৫৫—চৈতন্যদেব নিত্যানন্দের সম্মুখে ষড়্‌ভুজ হইলেন—

"তবে গৌরচন্দ্র প্রভু ষড়্‌ভুজ হইল।
দেখি নিত্যানন্দ গোসাঞি চিত্রার্পিত হৈল॥"

* * * *

(৩) পৃঃ ৯৯-১০০—চৈতন্যদেব এবং জগন্নাথ অভিন্ন, উভয়েই স্বীকার করিলেন। নীলাচলাগত চৈতন্যদেবের বিদেশে (নীলাচলে) খাওয়া, থাকা সম্বন্ধে কোনরূপ কষ্ট না হয় তাহার সমস্ত ব্যবস্থা জগন্নাথ-দেব নিজেই করিলেন। তাঁহার মন্দিরের এক অংশে চৈতন্যদেবের 'বাসা' নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে আরও ভাল হইত, কারণ ইহাতে ইষ্ট-

গোষ্ঠীর সুবিধা হইত। নীলাচলে যখন জগন্নাথদেবকে চৈতন্যদেব দেখিলেন, তখন—

"স্বর্গে দুন্দুভি বাজে জয় জয়কার।
পুষ্পবৃষ্টি নীলাচলে গন্ধের উভার॥
সর্ব্বলোকে নীলাচলে নীরব হইল।
জগন্নাথের করে শঙ্খ, চক্র তুলি দিল॥
জগন্নাথের আজ্ঞা, 'দিব্য মালা শত শতে।
চৈতন্যদেবেরে দেহ পার্ষদ সহিতে॥
সমুদ্র নিকটে বাড়ী দক্ষিণ পারশ্বে।
কোঠা নির্ম্মাণ কর কেহো না পরশে॥
আমি কৃষ্ণ-চৈতন্য দেখিব রাত্রি দিনে।
আমারে দেখিবেন চৈতন্য সিংহাসনে॥
আমি সেবক সেব্য সে সেবক সেব্য আমি।
সংসার লইয়া কর্ত্তা হর্ত্তা জগৎস্বামী॥'
এ সব রহস্য নিজ সেবকে কহিল।
কোঠা যাইতে চৈতন্যদেবে আদেশিল॥

* * * *

এমন আশ্চর্য্য কোথা দেখি নাহি শুনি।
সচল জগন্নাথ হৈল ন্যাসিচূড়ামণি॥
জগন্নাথের আজ্ঞা হৈল সিচে মন গন্ধে।
'এক শত মালা দেহ চৈতন্য নিত্যানন্দে॥
সিন্ধুতটে চৈতন্য বিশ্রাম-স্থান টোটা।
তাঁহারে পাঠাও ভোগ, অন্ন, ব্যঞ্জন, পিঠা॥

সিন্ধুতটে রহু যত মোহান্ত বৈষ্ণব।
নীলাচলে দেখে যত মোর মহোৎসব ॥
আমি কৃষ্ণ-চৈতন্য অভেদ করি জান।
সচল-জগন্নাথ এই ব্রহ্ম করি মান' ॥
এই আজ্ঞা পাইঞা পড়িছা সব ধাএ।
টোটারে চৈতন্য-গোসাঞি সংহতি যাএ ॥
গদাধর-পণ্ডিত-গোসাঞি দেখিয়া সম্মুখে।
জগন্নাথের আজ্ঞা যত কহি একে একে ॥
পণ্ডিত-গোসাঞি বলে, 'প্রভু মোরে ভাণ্ড কেনি ?
তুমি তাঁরে জান, তোমারে জানেন তিনি ॥'
পণ্ডিতের কথা শুনি মহাপ্রভু হাসে।
যে যাহার সে তাহার মহিমা প্রকাশে ॥"

(৪) পৃঃ ১০৩—(জয়ানন্দের মতে) চৈতন্যদেবের নীলাচলে গমনের অব্যবহিত পরেই প্রতাপরুদ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। রাজার পাট-হস্তী চৈতন্যদেবকে প্রণাম করিল। রাজা লাফ দিয়া চৈতন্যদেবের নিকটে আসিলেন। পাটরাণী চন্দ্রকলা হীরা, মুক্তা ও স্থবর্ণ দিয়া চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দকে পূজাকরিলেন। গৌরচন্দ্র নিজে চন্দ্র-কলাকে নিজের গলার মালা দিলেন। কিন্তু আমরা জানি চৈতন্যদেব বিষয়ী ও স্ত্রীর সংস্পর্শে আসিতে অতিশয় কুণ্ঠিত হইতেন—

"বুদ্ধে বৃহস্পতি রাজা গাম্ভীর্য্যে সমুদ্র ॥
গৌরবর্ণ প্রচণ্ড দোর্দ্দণ্ড দীর্ঘতনু।
আরক্ত নয়ন যেন বড় ফুলধনু ॥
দেখিঞা চৈতন্য-গোসাঞি পথমধ্যে রহি।
পাটহস্তী মাথা নোঙাএ কড়পাতে মহী ॥

দেখিয়া রাজার বড় বিস্ময় জন্মিল।
হস্তী হইতে লাফ দিয়া ভূমিতে পড়িল॥
রাজা বলে, 'গোসাঞি আমি রাজ্যমদে মত্ত।
আমা নিস্তারিলে তোমার অনেক মহত্ত্ব'॥
গোসাঞি বলেন, 'প্রতাপরুদ্র সূর্য্যবংশে রাজা'।
'তোমার প্রসাদে মোর সুখময় প্রজা'॥

*   *   *   *

চন্দ্রকলা পাটরাণী শিখরের কন্যা।
সতী সাধ্বী পতিব্রতা সর্ব্বলোকে ধন্যা॥
নিত্যানন্দ চৈতন্য পার্ষদ শতে শতে।
চন্দ্রকলা স্তুতি প্রদক্ষিণ দণ্ডবতে॥
ষড়ঙ্গে পূজিল গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দে।
হীরা, মুক্তা, সুবর্ণ নির্ম্মাঞ্ছিল পদারবিন্দে॥
রাজার শতেক স্ত্রী, প্রধান চন্দ্রকলা।
গৌরচন্দ্র দিলা তাঁরে গলায় দিব্য মালা॥"

(৫) পৃঃ ১০৩—চৈতন্যদেব জগন্নাথদেবের নিকট হইতে সেতুবন্ধ যাইবার আজ্ঞা পাইয়া দাক্ষিণাত্যে যাইলেন। জয়ানন্দের ভারতবর্ষের মানচিত্রজ্ঞান অদ্ভুত ছিল [১]। নীলাচল ত্যাগকরিয়া একেবারে অনেক-দূর দক্ষিণপশ্চিমে বেল্লারী জেলার বিজয়নগরে [২] যাইলেন। তাহার

১। 'উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য গ্রন্থে' সারদাচরণ মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন (পৃঃ ৫৭)—'জয়ানন্দ মিশ্র ও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের ভুবনেশ্বরে যাওয়ার কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ভুগোলবর্ণনায় অনেক দোষ আছে। বোধহয় তিনি নিজে উৎকলে যান নাই"।

২। জয়ানন্দের বিজয়নগর অথবা বিজয়ানগর সম্ভবতঃ বিজয়নগরম (Vizianagram or Vizianagaram, north of Vizagapatam) নয়, কারণ পরে তিনি বলিয়াছেন

পরেই পুনরায় নীলাচলের দক্ষিণপশ্চিমে জিয়ড়নৃসিংহে আসিলেন। তাহার পরেই একেবারে পশ্চিমে নাসিকে (পঞ্চবটীতে) যাইলেন। পুনরায় দক্ষিণে যাইয়া কাবেরীতে স্নান করিলেন। পুনরায় উত্তরে ত্রিপদী-ত্রিমল্লে আসিলেন। আবার একেবারে দক্ষিণে সেতুবন্ধে যাইলেন—

"মাহেন্দ্র ক্ষেণে যাত্রা করি, নীলাচল পরিহরি
উত্তরিল মহা নৈ পারো
কাটাতিপাড়া বামেথুঞা বিজয়ানগর দিয়া
প্রবেশিলা পর্ব্বত জিয়ড়ে।
গৌরাঙ্গ চলিলা সেতুবন্ধে।
যথা পুরী গোসাঞি আর রায় রামানন্দে॥

জিয়ড়ে নৃসিংহ দেখি তবে গেলা পঞ্চনখী
গোদাবরী-নদী পার হৈঞা।
পঞ্চবটী রম্যস্থান, দেখি গৌর ভগবান্
তেলেঙ্গা-ব্রাহ্মণ ঘরে রৈঞা॥
কাবেরী-নদীর জলে স্নান করি কুতূহলে
ত্রিমল্লনাথে বেঙ্কট-পর্ব্বতে।
গিরি-কন্দর ঘোর ঝাঙকার প্রমদানদীর পার
সপ্তবারি অরণ্যপথে।

(নিম্নে দেখুন) যে উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্র বিজয়ানগরে যুদ্ধ করিতে যাইলেন। এ বিজয়-নগর বেল্লারী-জেলান্তর্গত বিজয়নগর-সাম্রাজ্যের প্রধান নগর। দ্বিতীয়তঃ (৪৬৭ পৃষ্ঠার footnote দেখুন) যদি Vizianagram রামানন্দের 'বিদ্যানগর' হয়, একই সময়ে একস্থান 'বিজয়নগর এবং 'বিদ্যানগর' হইতে পারে না।

বাণ-রাজার দেশে, প্রবেশিলা মহাক্লেশে
সেতুবন্ধ দেখিলা সম্মুখে।

* * * *

(৬) পৃঃ ১৩৬-১৩৭—মথুরা, বৃন্দাবন হইতে পুনরায় তিনি একেবারে সেতুবন্ধে যাইলেন, মধ্যে শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী দেখিলেন। সেতুবন্ধহইতে সম্ভবতঃ তিনি নীলাচলে ফিরিলেন। আবার নীলাচল ত্যাগকরিয়া পশ্চিমে পঞ্চবটী ও গোদাবরী আসিলেন। সেখান হইতে উত্তরে নর্ম্মদায় আসিলেন। পুনরায় নর্ম্মদা হইতে দক্ষিণপূর্ব্বে গৌতমীগঙ্গা অর্থাৎ গোদাবরীতে আসিলেন। গোদাবরী হইতে দক্ষিণপশ্চিমে তুঙ্গভদ্রা-দেশে (কিষ্কিন্ধ্যার নিকটে) যাইলেন। তাহার পরে আবার সেতুবন্ধ, সেতুবন্ধের পরেই আবার উত্তরপশ্চিমে কিষ্কিন্ধ্যা, পুনরায় অনেকদূর পূর্ব্বে কাঞ্চীতে, পুনরায় কিষ্কিন্ধ্যার নিকট বিজয়নগরে ; বিজয়নগরের পরেই উড়িষ্যার মহানদী পারহইয়া পুনরায় তিনি নীলাচলে আসিলেন—

"মথুরা দেখিয়া তবে গেলা সেতুবন্ধ ॥
শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী মধ্যে মহারণ্যে।
দ্রাবিড় ডাহিনে থুঞা চলিলা চৈতন্যে।

* * * *

শুভক্ষণে যাত্রা করি, নীলাচল পরিহরি,
পঞ্চবটী গোদাবরী পাশ।
পঞ্চতীর্থ মহা বাসুদেব সুপ্রকাশ ॥
নর্ম্মদা, গৌতমী-গঙ্গা, তুঙ্গভদ্রা-দেশ।
তুলমন্দা গিরিবর্গে করিল প্রবেশ ॥

কল্পঋষি মুখ দেখি সুরঙ্গ পইটন।
সেতুবন্ধ, কিষ্কিন্ধা শতেক যোজন॥
শিবকাঞ্চী বিষ্ণুকাঞ্চী মাঝে মাঝে দিঞা।
বিজয়নগরে প্রভু উত্তরিলা গিঞা॥
মহানদী পার হঞা গেলা নীলাচল।"

*　　*　　*　　*

(৭) পৃঃ ১৫১—চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। প্রথমতঃ নিত্যানন্দ দুইটী বিবাহ করিলেন, দ্বিতীয়তঃ মুরারি-চৈতন্য ব্যাঘ্র ধরিয়া আনিলেন এবং সর্পের উপরে শয়ন করিতে লাগিলেন। তৃতীয়তঃ সুন্দরানন্দ এবং পরে কালা কৃষ্ণদাস কুম্ভীর ধরিয়া আনিলেন। চতুর্থতঃ গৌরীদাস সাতদিন গঙ্গায় নিমগ্ন হইয়া রহিলেন। পঞ্চমতঃ কাজির সহিত বিবাদ করিয়া গঙ্গাধর দাস অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন; বোধহয় তাহার পর অক্ষতদেহে বাহির হইয়া আসিলেন। ষষ্ঠতঃ পুরুষোত্তম দাস 'সাউর' বিষ জীর্ণ করিলেন। সপ্তমতঃ ধনঞ্জয় পণ্ডিত নাচিতে নাচিতে মুখ হইতে সাপ বাহিরকরিলেন। কিন্তু শেষে মুরারিগুপ্তের সৌভাগ্য উচ্চতমশিখরে আরোহণ করিল—

"ভাবাবেশে মুরারিগুপ্ত হৈলা হনূমান্।
লেঙ্গুড় বারি হৈল হস্ত দ্বাদশ প্রমাণ॥
গদাধর-পণ্ডিত কাছে নড়ে চড়ে।
বাণীনাথ সেহ ত গাছের তলে পড়ে॥"

আমরা গদাধরপণ্ডিত ও বাণীনাথকে কোন দোষ দিই না; কারণ হঠাৎ এরূপ নড়ন-চড়ন-শীল বার হাত লেজ বহির্গত হইতে দেখিলেই অনেকেরই 'গাছের তলে' পড়িবার সম্ভাবনা। উঁহারা বোধহয় বালি-

রাজার লেজ রাবণকে যাহা করিয়াছিল, তাহা ভাবিয়া ভয়ে অভিভূত হইয়াছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ বসু ও কালিদাস নাথ মহাশয় জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের মুখবন্ধে (পৃঃ ।৶০) বলিয়াছেন যে নিম্নলিখিত ছত্রগুলি (পদ্য) চৈতন্য-মঙ্গলের বিজয়খণ্ডে আছে। কিন্তু সূচীপত্রে লিখিত আছে যে বিজয়-খণ্ডে 'বিষ্ণুদূত ও যমদূত' সংবাদ আছে। যাহা হউক মুখবন্ধের ছত্রগুলি (পদ্য) এবং তাহার উপর সম্পাদকদ্বয়ের মন্তব্য দিলাম—

"জয়ানন্দ লিখিয়াছেন, যে সময় নীলাচলে মহাপ্রভু অবস্থান করিতে-ছিলেন, সে সময় একবার উৎকলাধিপ-প্রতাপরুদ্রের বঙ্গজয়ের ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু চৈতন্যদেব গৌড়াধিপের প্রভূত পরাক্রমের পরিচয় দিয়া তাঁহাকে নিবারণকরেন। কোন সময়ে এ প্রসঙ্গ ঐতিহাসিকগণের সামান্য কাযে আসিতে পারে ভাবিয়া জয়ানন্দের কথাগুলি তুলিয়া দিলাম—

"এই মতে আছেন (চৈতন্য) বৎসর দুই চারি।
গৌড়ে উৎকলে পড়ি গেল সাঢ়ী॥
প্রতাপরুদ্র গৌড় জিনিতে করে আশ।
শুনিয়া গৌড়েন্দ্র তারে করেন উপহাস॥
চৈতন্যদেবে রাজা আজ্ঞা মাগিল।
প্রভু বলেন, 'প্রতাপরুদ্রে কুবুদ্ধি লাগিল॥
কাল-যবন রাজা পঞ্চ গৌড়েশ্বর।
সিংহ, শার্দ্দূল দেখ কতেক অন্তর॥
ওড্রদেশ উচ্ছন্ন করিবেক যবনে।
জগন্নাথ নীলাচল ছাড়িব এতদিনে॥

লজ্জা পাবে, প্রতাপরুদ্র ! আমার বাক্য ধর।
গৌড়মুখে শয়ন, ভোজন পাছে কর॥
কাঞ্চীদেশ জিনি কর নানা রাজ্য।
গৌড় জিনিবে হেন না দেখি সে কার্য্য॥
গৌড়েশ্বর অবশ্য আসিব নীলাচলে।
তুমি ছাড়িবে, প্রলয় হইব উৎকলে॥'
প্রভু নিবারিল ; সে শুনিয়া প্রতাপরুদ্র।
বিজয়ানগরে গেলা করিবারে যুদ্ধ॥"

জয়ানন্দ বলিতেছেন যে চৈতন্যদেবের নীলাচলে দুই চারি বৎসর অবস্থানের সময়ে প্রতাপরুদ্র গৌড় জয়করিবার ইচ্ছা প্রকাশকরিলে, চৈতন্যদেব তাঁহাকে উপহাসকরিলেন এবং বলিলেন "প্রতাপরুদ্র! তোমার কুবুদ্ধি হইয়াছে। কালযবন গৌড়েশ্বর সিংহ-তুল্য ; আর তুমি শার্দ্দুলের সমান ; তোমা অপেক্ষা গৌড়েশ্বর অধিকতর পরাক্রান্ত। তুমি গৌড় আক্রমণকরিলে যবনরাজ উৎকল-দেশ উচ্ছন্ন করিবে এবং জগন্নাথদেবকে নীলাচল ছাড়িতে হইবে। গৌড় আক্রমণকরিলে তুমিও লজ্জা পাইবে। এক্ষণে গৌড়আক্রমণের অভিলাষ ত্যাগকর। তুমি বিজয়নগররাজ্যান্তর্গত কাঞ্চীদেশ জয়করিবার চেষ্টা কর। গৌড় জয়করিবার সামর্থ্য তোমার নাই। গৌড় আক্রমণকরিলে গৌড়েশ্বর উৎকলে আসিয়া নীলাচল অধিকারকরিবেন। তুমি উৎকল রক্ষাকরিতে পারিবে না"। চৈতন্যদেব এইরূপে প্রতাপরুদ্রকে গৌড় আক্রমণবিষয়ে নিষেধ করিলে, প্রতাপরুদ্র বিজয়ানগরের রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে যাইলেন।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের সম্পাদকদ্বয় জয়ানন্দের এই প্রলাপ ঐতি-হাসিকের উপকারে লাগিতে পারে কেন বলিলেন আমরা বুঝিতে

পারিলাম না। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাখালদাসবন্দ্যোপাধ্যায় জয়ানন্দের এইরূপ উক্তির উপর নির্ভর করিয়া চৈতন্যদেব ও তাঁহার ধর্ম্মকে দোষী সাব্যস্ত কি করিয়া করিলেন, তাহাও আমরা বুঝিতে সক্ষম হই না।

ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জয়ানন্দের কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন পূর্ব্বেই বলিয়াছি (পৃঃ ৪৯২)। জয়ানন্দ চৈতন্য-দেব ও জগন্নাথদেব অভিন্ন বলিয়াছেন। যদি জয়ানন্দের কথা সত্য হয়, তাহা হইলে চৈতন্যদেবের কি অভিপ্রায় ছিল যে প্রতাপরুদ্র 'জব্দ' হন্? কারণ জয়ানন্দের মতে চৈতন্যদেব ভগবান্ এবং সেইজন্য তিনি 'সর্ব্বজ্ঞ' না হইয়া থাকিতে পারেন না। বিজয়নগরের রাজার সহিত যুদ্ধে কাঞ্চী (মাদ্রাজের দক্ষিণপশ্চিমে) জয় করা ত দূরের কথা, প্রতাপরুদ্র কেবল পরাজিত হন্ নাই, তাঁহার এক স্ত্রী, দুই পুত্র এবং সাতজন সর্দ্দার বন্দী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার এক কন্যাকে বিজয়নগররাজের সহিত বিবাহ দিতে তিনি বাধ্য হইয়াছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উড়িষ্যার ইতিহাস (পৃঃ ৩২৪-২৬) হইতে আমরা অবগত হই যে ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে কোণ্ডবিড়ু-অধিকারের সময়ে কৃষ্ণদেবরায় প্রতাপরুদ্রের পুত্র বীরভদ্রকে ধৃত করেন, তাহার পরে প্রতাপরুদ্রের আর এক পুত্র, এক রাণী এবং সাতজন সর্দ্দারকে ধৃত করেন এবং প্রতাপরুদ্রের জগন্মোহিনী (অথবা টুক্কা)-নাম্নী কন্যাকে তাঁহার সহিত বিবাহ দিতে প্রতাপরুদ্রকে বাধ্য করেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ই বলিয়াছেন যে প্রতাপরুদ্রের বিজয়নগররাজের সহিত যুদ্ধ করা ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না, কারণ কৃষ্ণদেবরায় বিজয়নগর-সিংহাসন অধি-রোহণকরার কিছু পরেই উৎকলরাজ্যের দক্ষিণাংশ আক্রমণকরিয়া-ছিলেন (পৃঃ ৪৮১)।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে চৈতন্যধর্ম্মসম্বন্ধীয় একখানি পুস্তক 'The Chaitanya Movement by M. T. Kennedy M. A.' প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার চৈতন্যদেবের ধর্ম্মকে খৃষ্টানধর্ম্মের সহিত তুলনা করিয়া মানবের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিবিষয়ে খৃষ্টানধর্ম্ম চৈতন্যদেবের ধর্ম্ম-অপেক্ষা শ্রেয়স্কর বলিয়াছেন—

(১) ৬১ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে গৌড়ে নিত্যানন্দের আচণ্ডালে ভক্তিবিতরণ চৈতন্যদেব পছন্দ করিতেন না। 'বাউলকে' ইত্যাদি (আমাদের পুস্তকের পৃঃ ২৩ দেখুন) হেঁয়ালীর নানাপ্রকার অর্থ হইতে পারে। কেনেডীসাহেব তাহার একটী কল্পিত অর্থ গ্রহণ করিয়া উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কেনেডীসাহেব এই সম্বন্ধে দীনেশসেনমহাশয়ের উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন (p.p. 56-58) "In his latest book Chaitanya and His Age" Dr. Sen argues eloquently for the view that Chaitanya himself was the guiding-spirit in all the social measures undertaken by Nityānanda in Bengal. "Nityānanda was appointed by him to stay in Bengal with the sole charge of social reformation. Chaitanya had found the caste-system eating into the vitals of the social fabric and he and his followers were determined to root out the evil from the land." কেনেডীসাহেব বলেন, "It is hardly accurate to write of Chaitanya in terms of social reform or to credit him with revolutionary social vision.······*It seems perfectly clear that Chaitanya was not concerned with social reform.* ·······...His sole interest was religion and it is only as his

religious experience and that engendered by him among others, came into conflict with the Hindu social system that he can be called a social reformer. His social reform was only a by-product of his bhakti.......Many sayings are attributed to Chaitanya which seem to transcend the caste-system altogether, *although the authenticity of all such teaching is not certain by any means*...The full consequences of Chaitanya's teaching form part of the history of the sect. It is probable that *Chaitanya neither foresaw them nor was in full sympathy with the steps taken by some of his followers in carrying out the logical implications of his own teaching*' (The italics are ours)। অর্থাৎ চৈতন্যদেবের সমাজসংস্কার করিবার ইচ্ছা ছিল না, ধর্ম্মসংস্কার করিতে যাইয়া তিনি বাধ্য হইয়া সমাজসংস্কার করিয়াছিলেন। আমরা ইহার উত্তরে বলি যে হিন্দুরা ধর্ম্মসংস্কার হইতে সমাজসংস্কার বিভিন্ন করিতে পারে না। হিন্দুধর্ম্মসংস্কার করিলেই হিন্দুসমাজ-সংস্কার হইতেই হইবে এবং হিন্দুসমাজ-সংস্কার হইলেই হিন্দুধর্ম্ম-সংস্কার অবশ্যই হইবে। হরিদাস যবন, জাতিভ্রষ্ট রূপ ও সনাতন, ভূঁইমালীর উচ্ছিষ্টভোজী কালিদাস প্রভৃতিকে সমাদরকরিয়া, বৈদ্য শিবানন্দসেন, গোবিন্দ কর্ম্মকার প্রভৃতি-স্পৃষ্ট খাদ্য খাইয়া, শূদ্র রামানন্দ, জাতিভ্রষ্ট রূপ ও সনাতনপ্রভৃতির নিকটে ধর্ম্মশিক্ষা করিয়া, আচণ্ডালে ভক্তিবিতরণ করিয়া উচ্চজাত্যাভিমানের মূলে চৈতন্যদেব কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। তিনি সত্য ও আন্তরিকতার অবতার ছিলেন। তাঁহার নৈতিক সাহস অতুলনীয় ছিল। তিনি যখন গৌড়ে আচণ্ডালে ভক্তিধর্ম্ম প্রচারকরিবার জন্য

নিত্যানন্দকে আদেশ করিয়াছিলেন এবং বৃথা সময় নষ্ট হইবে এই আশঙ্কায় তাঁহাকে গৌড় ত্যাগকরিয়া নীলাচলে আসিতে বারণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি বেশ জানিতেন যে নিত্যানন্দকর্ত্তৃক আচণ্ডালে ভক্তিধর্ম্মপ্রচারের দ্বারা উচ্চজাতির অভিমানের এবং নিম্ন-জাতির প্রতি উচ্চজাতির নির্দ্দয় ব্যবহারের অবসান হইবে। চৈতন্যদেব মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় জাতিভেদপ্রথা তুলিয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি মহাত্মা গান্ধীর ন্যায়—প্রত্যেক আদর্শ হিন্দুর ন্যায়—জানিতেন যে জাতিভেদ-প্রথা একেবারে তুলিয়া দিলে হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বনাশসাধন হইবে। কিন্তু প্রথমতঃ মন্দিরে সমস্ত হিন্দুজাতির এমনকি বৈষ্ণব হরিদাস-যবনের প্রবেশের অধিকার আছে, তিনি মনে করিতেন। দ্বিতীয়তঃ ধার্ম্মিকও জ্ঞানী হইলে তিনি যে জাতি হউন না কেন তাঁহার নিকট হইতে ধর্ম্মসম্বন্ধে ব্রাহ্মণও উপদেশ লইতে পারেন, চৈতন্যদেব বিবেচনা করিতেন। তৃতীয়তঃ গোবিন্দ শূদ্র বলিয়া অস্পৃশ্য এবং সেইজন্য তিনি ব্রাহ্মণের ভৃত্যও হইতে পারেন না, ইহা তিনি স্বীকার করিতেন না। চতুর্থতঃ হরিদাসঠাকুর যবন হইলেও এবং রূপ ও সনাতন জাতিভ্রষ্ট হইলেও পরম বৈষ্ণব বলিয়া ব্রাহ্মণেরও আলিঙ্গন ও সম্মানযোগ্য তিনি বিবেচনা করিতেন। পঞ্চমতঃ সর্ব্বজাতির লোকই ইচ্ছা করিলে ভক্তিধর্ম্ম গ্রহণকরিতে পারেন ইহা তিনি মনে করিতেন। খৃষ্টানমহাশয়েরা হিন্দুদিগের জাতিভেদের নিন্দা করেন। তাঁহাদের সমাজের ভিতরে উচ্চবংশ (nobility) এবং নীচবংশ (commonalty) এবং ধনী ও দরিদ্ররূপ বিষম জাতিভেদ কি বর্ত্তমান নাই? আমরা যখন কৃষ্ণনগরে ছিলাম, তখন—বিশ্বাস প্রভৃতি খৃষ্টানগণ (যাঁহারা পূর্ব্বে মুসলমান কিম্বা হিন্দু ছিলেন) আমাদিগকে বলিতেন 'অমুক পাদরী সাহেব নিজে সুসজ্জিত ঘরের ভিতর আহার করেন

এবং আমাদিগকে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক অস্পৃশ্য জ্ঞানকরিয়া গাছতলায় পাতা বিছাইয়া আহার করিতে বলেন, কখনও আমাদিগকে, নিজেদের সন্নিকটে এবং এক টেবিলে আহার করিতে দেন না।'

কেনেডীসাহেব বোধহয় সংস্কৃত ও বাঙ্গালাভাষার সম্যক্ অভিজ্ঞতার অভাবে কিম্বা সময়ের অভাবে original (মূল) পুস্তকগুলি পাঠকরিতে পারেন নাই। কেবল যাহাকে বলে 'পরের মুখে ঝাল খাওয়া' তাহাই তিনি করিয়াছেন। অদ্বৈতাচার্য্যের হেঁয়ালীর একটী বিকৃত অর্থ শুনিয়া তিনি লিখিয়াছেন যে চৈতন্যদেব গৌড়ে নিত্যানন্দের কার্য্যাবলী সমর্থনকরিতেন না। যদুনাথসরকার মহাশয় গোবিন্দদাসের করচার নাম করেন নাই বলিয়া এবং কতিপয় বৈষ্ণব গোবিন্দদাসের করচাসম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত প্রকাশকরিয়াছেন বলিয়া তিনি গোবিন্দদাসের করচা অবিশ্বাস্য বলিয়াছেন। কেনেডীসাহেব যদি নিজে গোবিন্দদাসের করচা পড়িতেন এবং কৃষ্ণদাসকবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতের দাক্ষিণাত্যভ্রমণের বর্ণনার সহিত গোবিন্দদাসের বর্ণনা তুলনা করিতেন এবং যদি দীনেশসেনমহাশয়ের ভূমিকাও পাঠ করিতেন তাহা হইলে আমরা বিশ্বাস করি তিনি বিভিন্ন মত পোষণ-করিতে বাধ্য হইতেন। চৈতন্যদেবের অনুচরেরা তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কুলীন ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে দিয়া এবং গোবিন্দের নাম পর্য্যন্ত গোপন করিয়া এবং ধর্ম্মবিষয়েও তাঁহাকে সাম্প্রদায়িক করিয়া তাঁহার চরিত্র দুই একস্থলে অসঙ্গত করিয়াছেন স্বীকার করি। কিন্তু মনোযোগ দিয়া চৈতন্যদেবসম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলি পাঠ করিলেই প্রকৃত তথ্য সহজেই অবগত হইতে পারা যায় এবং চৈতন্যদেবের কার্য্যাবলীর সঙ্গতি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না।

(২.) গ্রন্থকার বলিতেছেন (পৃঃ ৮৮) "Chaitanya was not

primarily a thinker......The increasing strain of an impossible emotionalism upon a highly-wrought nervous system made serious intellectual effort quite out of the question। আমরা জিজ্ঞাসাকরি যীশুখৃষ্ট কি 'thinker' অথবা 'philosopher' ছিলেন ? চৈতন্যদেব অনেক গ্রন্থ, অনেক দর্শনশাস্ত্র পড়িয়াছিলেন, অনেকগ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন, সন্ন্যাসের পূর্ব্বে অনেক thinking and discussion (তর্কবিতর্ক) করিয়াছিলেন ; কিন্তু শেষে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ভগবান্‌কে তর্কে পাওয়া যায় না, কেবল ভক্তিতেই পাওয়া যায়। সেইজন্য তিনি সহজে তর্ক করিতে সম্মত হইতেন না। তাহার মুখে যে দার্শনিক বক্তৃতা চৈতন্যচরিতামৃতপ্রভৃতিতে দেওয়া হইয়াছে তাহার অধিকাংশ পরবর্ত্তী কালে রচিত, আমরা স্বীকার করি। তিনি প্রকৃত বৈষ্ণবের ন্যায় বিদ্যাবত্তা প্রদর্শন করিতে সর্ব্বদাই কুণ্ঠিত ছিলেন।

(৩) গ্রন্থকার বলেন (পৃঃ ১০৮) কৃষ্ণদাস কবিরাজ "পরকীয়াবাদী" ছিলেন ; তিনি সেইজন্য চৈতন্যদেবকেও পরকীয়াবাদী করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণ-ভক্তিধর্ম্মের কদর্থ করার জন্য চৈতন্যদেব দায়ী নন্। তিনি রাধাভাবে কৃষ্ণকে উপাসনা করিতেন, কারণ রাধা শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত পতি, পুত্র, সুহৃৎ ও সহোদররূপ সমস্ত বিষয়াসক্তি ত্যাগকরিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব আত্মসংযমের মূর্ত্ত প্রতীক ছিলেন। তিনি স্বকীয়াবাদ অথবা পরকীয়াবাদের ধার ধারিতেন না। তাঁহার বিশুদ্ধ ভক্তি ও প্রেমের বিকৃত অর্থ করিয়া, তাঁহার পবিত্র ভক্তি-ধর্ম্মের ভিতর স্বকীয়াবাদ ও পরকীয়াবাদ প্রবেশকরাইয়া, কোন কোন বৈষ্ণব পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছে, এমন কি পবিত্র গুরু-শিষ্যা-সম্বন্ধ পর্য্যন্ত কলুষিত করিয়াছে, আমরা স্বীকার করি। Chaucer, Scott প্রভৃতি-বর্ণিত খৃষ্টান-ধর্ম্মযাজকের কদাচারের,

মধ্যযুগের খৃষ্টানমঠের অনেক সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর অনাচারের এবং বর্ত্তমান ইউরোপের ও য়্যামেরিকার খৃষ্টান জাতিদিগের উৎকট সমর-লিপ্সা, স্বার্থপরতা ও অর্থগৃধ্নুতার জন্য যীশুখৃষ্টকে দায়ী করা যেরূপ অসমীচীন, সেইরূপ তথাকথিত (so-called) বৈষ্ণবদিগের কদাচারের জন্য চৈতন্যদেব এবং তাঁহার বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মকে দায়ী করা অন্যায়। চৈতন্যদেব কাশীমিশ্রের গৃহের নিভৃত কক্ষে রামানন্দ ও স্বরূপদামোদর এই দুইজনকে লইয়া রাধাভাবে ঈশ্বরোপাসনা করিতেন। ইহার অর্থ এই যে মধুর ভাবে ঈশ্বরোপাসনা শ্রেষ্ঠ হইলেও আত্মসংযমের পরাকাষ্ঠা না হইলে মানব এইরূপে ভগবদুপাসনার যোগ্য হয় না। সাধারণ মানবের পক্ষে দাস্যভাবে ঈশ্বরোপাসনাই শ্রেয়ঃ। আমরা স্বীকার করি যে সলোমনের গীতে (Song of Solomon—the Bible ; Old Testament), বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব প্রভৃতির রচনাতে, এমন কি চৈতন্যচরিতামৃতেও রামানন্দ-দেবদাসী প্রসঙ্গে (আমাদের পুস্তক পৃঃ ৩০৩ দেখুন) এরূপ বাক্য প্রয়োগকরা হইয়াছে, যে তাহা সাধারণ মানবের মনে কামভাব উদ্দীপনা না করিয়া থাকিতে পারে না।

(৪) গোবিন্দদাসের করচার অপ্রামাণিকতার (পৃঃ-১২৯) অন্যতম কারণ, কেনেডীসাহেব বলিয়াছেন, চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্যভ্রমণের সময়ে তাঁহার জটারাখার বর্ণনা। চৈতন্যদেব চিমটাধারী সাধারণ 'সাধু'দিগের ন্যায় লোককে দেখাইবার জন্য জটা প্রস্তুত করেন নাই। দাক্ষিণাত্যভ্রমণের সময়ে গোদাবরীর পরে গোবিন্দই কেবল তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। চৈতন্যদেব নিজে শরীরের কোন যত্ন করিতেন না; সেইজন্য তাঁহার চুল লম্বা হইয়াছিল ও চুলে জটা হইয়াছিল। গোবিন্দের সাহস ছিল না যে তাঁহাকে তিনি কোন আদেশ করেন। নীলাচলে ভক্তদিগের অনুরোধে খাওয়া দাওয়ার বিষয়ে তাঁহার সন্ন্যাস-

ধর্ম্মের নিয়মের মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম করিতে হইত। চৈতন্যদেব 'সন্ন্যাসের' অর্থ 'বৈরাগ্য' বুঝিতেন, কিন্তু কখনই তিনি ইহার 'খুটীনাটী' নিয়ম মানিতেন না। অনুরক্ত ভক্ত পাছে ক্ষুণ্ণ হন, সেইজন্য তাঁহাদিগের কথানুসারে মাঝে মাঝে সন্ন্যাসধর্ম্মের একটু আধটু ব্যতিক্রম করিতেন। কিন্তু যাহা তিনি বিবেক-সঙ্গত বলিয়া মনে করিতেন না, তাহা শত অনুরোধেও তিনি করিতে সম্মত হইতেন না। করচার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে (পৃঃ ৩১০ হইতে ৩৪৫) বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। এ বিষয়ে কাঁথি-নিবাসী, মেদিনীপুরের ইতিহাস-প্রণেতা যোগেশচন্দ্রবসুমহাশয় আমাদিগকে লিখিয়াছেন, "চৈতন্যদেবের শান্তিপুর হইতে নীলাচলভ্রমণের বর্ণনায় চৈতন্যভাগবতের ও চৈতন্যমঙ্গলের উক্তিগুলির প্রায় মিল আছে, কিন্তু গোবিন্দের করচার সহিত উহাদের পার্থক্য বড় বেশী রকমের। এ ক্ষেত্রে করচার প্রামাণিকতা অধিকতর বলিয়া মনে হয়। ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে চৈতন্যদেবের অপূর্ব্ব লীলার অবসান হয়। বৃন্দাবনদাস উহার দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৮ বৎসর বয়সে অর্থাৎ চৈতন্যদেবের তিরোধানের প্রায় ৪০ বৎসর পরে চৈতন্যভাগবত রচনাকরেন। জয়ানন্দমিশ্র চৈতন্যদেবের জীবিতকালে জন্মগ্রহণ করিলেও, তিনি তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন না। তাঁহার পিতা সুবুদ্ধি মিশ্র চৈতন্যদেবের শিষ্য ছিলেন।······চৈতন্যদেবের পরলোকগমনের বহুবৎসর পরে চৈতন্যমঙ্গল রচিত হইয়াছিল। গোবিন্দদাস চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। যে দুই বৎসরের বৃত্তান্ত লইয়া তিনি করচা লিখিয়াছিলেন সে দুই বৎসর তিনি দিবারাত্র মহাপ্রভুর পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন, কখন সঙ্গবিচ্যুত হন্ নাই। তিনি চৈতন্যদেবের ভ্রমণসম্বন্ধে যে সকল নোট রাখিয়াছিলেন, তাহাই

সাবেকী বাঙ্গালায় করচা নামে পরিচিত। উঁহার লেখার এমন একটু সারল্যমাখা সত্যপ্রিয়তা আছে যাহাতে করচাখানাই বিশুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। চৈতন্যদেবের রূপ ও গুণাবলী বর্ণনকরিতে গিয়া তিনি যে স্থানে স্থানে কল্পনার আশ্রয়গ্রহণ করেন নাই, এমন নহে—বরং ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু দৈনন্দিন বিশেষ বিশেষ ঘটনা তিনি অতিরঞ্জন করেন নাই ; অপ্রিয় সত্যকে বর্জ্জনও করেন নাই, করিলে ভক্তির ও সত্যের অবতার চৈতন্যদেবের অনুচরের পক্ষে তাহা অনুপযুক্ত হইত। তাঁহার করচাতে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মেদিনীপুরনিবাসী কেশবসামন্ত চৈতন্যদেবকে প্রলুব্ধ করিতে সমর্থ না হইয়া তাঁহাকে কটূক্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মহাপ্রভু অন্যান্য স্থানের ন্যায় কেশবকে ভক্তি দিতে পারেন নাই। তাঁহার চেষ্টা সে স্থলে বিফল হইয়াছিল। গোবিন্দ তাহা ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়াছেন। কেশবের ব্যবহার দেখিয়া চৈতন্যদেব বলিতেছেন—

‘নারায়ণগড় পানে চল মোরা যাই।
সেইখানে গেলে যদি কোন সুখ পাই ॥’

এইরূপ গ্রন্থের উক্তি অন্য কোন গ্রন্থে দেখি নাই। মনে হয় এই অপ্রিয় সত্যের উল্লেখ করিতে হইবে বলিয়াই জয়ানন্দ বা বৃন্দাবন দাস তাঁহাদের গ্রন্থে হাজিপুর, মেদিনীপুর ও নারায়ণগড়ের উল্লেখ করেন নাই। পক্ষান্তরে যে সকল স্থানে বিশেষ কিছু ঘটনা ঘটে নাই, গোবিন্দদাস তাঁহার করচায় সে সকল স্থানের কোন ‘নোট’ রাখেন নাই”।

(৫) বাসুদেবদত্ত সমস্ত মানবের পাপ নিজের স্কন্ধে লইতে চাহিয়াছিলেন (পৃঃ ২২০)। চৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ

বাসুদেবের ন্যায় ভক্তকে কেন শাস্তি দিবেন? আরও তিনি বলিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা করিলে শাস্তি না দিয়াই পাপীদিগকে উদ্ধার করিতে পারেন। কেনেডীসাহেব বলেন যে ইহা হইলে নীতি (morality, moral responsibility) বলিয়া কোন জিনিষ থাকে না। যীশুখৃষ্ট কি মানবজাতির পাপের ভার নিজের স্কন্ধে লন্ নাই? Adam এবং Eve এর পাপের জন্য সমস্ত মানবজাতির পাপভোগ কোন্ নীতি সঙ্গত?

(৬) ২২৯ পৃষ্ঠায় কেনেডীসাহেব অবতারবাদের কথা উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন 'In the Chaitanya sect, the incarnation idea, is not a clear and simple principle of thought'। আমরা অবতারবাদের, এক অবতারই হউক কিম্বা বহু অবতারই হউক, একেবারে পক্ষপাতী নহি। চৈতন্যদেব কখন বলেন নাই যে তিনি ঈশ্বরের অবতার। যীশুখৃষ্টকেও ঈশ্বরের অবতার কিম্বা পুত্র বলিতে আমরা রাজি নই। তিনি চৈতন্যদেবের ন্যায় আদর্শ মানব। তাঁহাকে মানবজাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির অর্থাৎ মুক্তির পথ-প্রদর্শক বলিয়া আমরা মনে করি। খৃষ্টানেরা 'God'কে idealised করিয়াছেন, চৈতন্যদেবপ্রভৃতি বৈষ্ণবেরা শ্রীকৃষ্ণকে 'idealised' করিয়াছেন। 'Old Testamentএর ভগবানের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ও যথেচ্ছাচারের সহিত New Testamentএর দয়া ও প্রেম মিশ্রিত করিয়া খৃষ্টানেরা ঈশ্বরকে অনেকপরিমাণে উন্নত করিয়াছেন। কেনেডীসাহেবের গ্রন্থের ২৩১ পৃষ্ঠায় নিত্যানন্দপ্রভৃতির অবতারত্বের কথা বলা হইয়াছে। চৈতন্যদেব যখন নিজের অবতারত্ব স্বীকার করিতেন না, তখন নিত্যানন্দ প্রভৃতির অবতারত্ব নিশ্চয়ই তিনি অবিশ্বাসকরিতেন। বৈষ্ণবদিগের বিস্তৃত অবতারবাদের সহিত খৃষ্টানদিগের বিস্তৃত saintবাদ আমরা

তুলনা করিতে পারি! যীশুখৃষ্ট নিজেকে অবতার অর্থাৎ ঈশ্বর-পুত্র (Son of God) অনেক স্থলেই বলিয়াছেন (St. Matthew-X-32, XI-27 ; St. John-III-35 and 36, XIV-20, 21)।

(৭) ২৩১ পৃষ্ঠায় কেনেডীসাহেব লিখিয়াছেন—

"A third essential difference in the Christian and Vaishnava conceptions is the utter lack of historical basis in the Vaishnava doctrine. It is to be remembered that Krishna who is the Avatāra of the Chaitanyas' devotion is the product of pastoral folkfore etc"। কেনেডীসাহেবের উচিত খৃষ্টান God এর সহিত শ্রীকৃষ্ণের তুলনা করা এবং চৈতন্যদেবের সহিত যীশুখৃষ্টের তূলনা করা। কেনেডীসাহেব কি বলিতে চান যে Old Testament এর God এবং New Testament এর God একই? ঈশ্বরত্বের ভাব (conception of Godhead) কি ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইতেছে না? কিরূপ ভাল পশু বলিদিতে হইবে, কিরূপে ইহাকে কাটিয়া 'roasted' করিয়া ঈশ্বরকে ভোগ দিতে হইবে, কিরূপ উৎকৃষ্ট ময়দার (fine flour) রুটী ঈশ্বরকে ভোগ দিতে হইবে Old Testamentএর ঈশ্বর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মোসেসকে (Moses) বলিয়াছেন (Leviticus—1, II)। Old Testamentএর নিম্নলিখিত অধ্যায়ে (Leviticus-VI-6 ; XVI—10, 11, 21 ; XXV—44, 45, 46 ; XXVI—29 ; XXVII—3, 4 ; Deuteronomy—XXII—28, 29 etc.) ঈশ্বরের নামে মোসেস্ কিরূপ নীতিশিক্ষাদান করিয়াছেন, পাঠকবর্গ বোধহয় অবগত আছেন। Old Testamentএর এই ঈশ্বর কি 'utterly mythical' নয়? তত্রাচ কেনেডীসাহেব বলিয়াছেন "But the fact that Krishna is utterly mythical makes

no difference to the devotee, in fact the distinction does not exist for him, since an uncritical acceptance of mythology as history still characterises much of popular Hinduism." যীশুখৃষ্ট 'ঈশ্বরের পুত্র' তাঁহার কুমারী মেরীর গর্ভে জন্ম, তাঁহার মৃত ব্যক্তিকে পুনর্জীবনদান, তাঁহার শয়তানের সহিত সাক্ষাৎ প্রভৃতি কি 'utterly mythical' নয়? চৈতন্যদেব নিজেকে কখনও ভগবান্ বলিয়া পরিচয় দেন নাই। তিনি ঈশ্বরের সেবক বলিয়া সাধারণতঃ পরিচয় দিয়াছেন। চৈতন্যদেবের জীবনের ঘটনাবলীর ঐতিহাসিকতা আমরা সহজেই অবগত হইতে পারি। কিন্তু যীশুখৃষ্টের জীবনের প্রকৃত ঘটনা আমাদের অনুমানকরা বিশেষ কষ্টসাধ্য।

(৮) ২৪৫ পৃষ্ঠায় কেনেডীসাহেব লিখিয়াছেন চৈতন্যদেবের ভক্তিপ্রবণতা তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তিকে দুর্ব্বল করিয়াছিল। যে প্রগাঢ় আত্মহারা ভক্তির জন্য চৈতন্যদেব মধ্যে মধ্যে ভগবানের সাক্ষাৎ পাইতেন, সেরূপ ভক্তির পরিবর্ত্তে—subtle theological disquisition and pedantry অর্থাৎ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বৃথা জটিল তর্কদ্বারা বিদ্যাবত্তাপ্রদর্শননিমিত্ত কূটবুদ্ধি মানুষকে ঈশ্বরসন্নিধানে লইয়া যাইতে পারে কিনা, তাহা সন্দেহের বিষয়।

(৯) কেনেডীসাহেবের পুস্তকের ২৪৬ পৃষ্ঠায় আছে—"Bhakti is by its very nature selfcentred"। কিন্তু চৈতন্যদেবের ভক্তিসন্দর্শনে তাঁহার শিষ্যেরা ভগবদ্ভক্তিদ্বারা অনুপ্রাণিত হইতেন। সঙ্কীর্ত্তন এই ভক্তিকে চতুর্দ্দিকে বিকীরণ করিত। কেনেডীসাহেব বলিয়াছেন যে ভক্তি প্রবল হইলে নৈতিক দুর্ব্বলতা আনয়ন করে। কিন্তু চৈতন্যদেব ভগবদ্ভক্তি ও প্রেমের সহিত আত্মসংযম ও পুরুষকার

সংযুক্ত করিয়াছিলেন।

(১০) কেনেডীসাহেব ইহার পরে (পৃঃ ২৪৭) চৈতন্যদেবের জগন্নাথমূর্ত্তির পূজা নিন্দাকরিয়াছেন। যীশুর মাতা, যীশু এবং ক্রুশের ছবির খৃষ্টানেরা যে আদর করেন, সে বিষয়ে কেনেডীসাহেব কি বলেন ? কেনেডীসাহেব কি বলিতে চান্ সর্ব্বপ্রকার form-বিহীন উপাসনা

কেনেডীসাহেবের এই প্রকার যুক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমাদের গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধিকরিবনা। কেনেডীসাহেব মাঝে মাঝে বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে প্রশংসা করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমরা বিবেচনা করি যে এই প্রশংসা **'damning with faint praise'** ব্যতীত আর কিছুই নয়।

আমরা চৈতন্যদেবের উপদেশের সারাংশ নিম্নে দিলাম। আমরা এ বিষয়ে কৃষ্ণদাসকবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত চৈতন্যদেবের উক্তির উপর বেশী নির্ভর করিয়াছি, কারণ আর কোন গ্রন্থে এরূপ বিশদভাবে চৈতন্যদেবের উপদেশ বিবৃত হয় নাই। কৃষ্ণদাসকবিরাজ তাঁহার গ্রন্থ ১৫৩৭ শকে (১৬১৫ খৃঃ) অর্থাৎ চৈতন্যদেবের দেহত্যাগের ৮২ বৎসর পরে সমাপ্তিকরিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থের অন্ত্যখণ্ডের বিংশ পরিচ্ছেদের শেষে এই শ্লোকটী আছে—

শাকে সিন্ধ্বগ্নি-বাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যাহ্ন্যসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥

সিন্ধু[১] = ৭ ; অগ্নি[২] = ৩ ; বাণ[৩] = ৫ ; ইন্দু = ১ ; অর্থাৎ ১৫৩৭ শকে—

১। সাগর সাতটী—লবণ, ইক্ষু, সুধা, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, ও জল।

২। অগ্নি তিনটী— (১) ভৌমাগ্নি (কাষ্ঠাদি পার্থিব পদার্থ-সম্ভূত (২) দিব্যাগ্নি (বজ্র, বিদ্যুৎ), এবং (৩) জঠরাগ্নি।

৩। কন্দর্পের পঞ্চবাণ—সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন।

জ্যৈষ্ঠমাসে, বৃন্দাবনে, রবিবারে, কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমীতে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছিল। ১৯৩৩, ২৫শে জুনের অমৃতবাজারপত্রিকাতে অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ নাথ লিখিয়াছেন যে জ্যোতিষের গণনায় এই বার, তিথি, মাস ইত্যাদি ঠিক মিলিয়া যায় ; কিন্তু প্রেমবিলাসে উল্লিখিত চৈতন্য-চরিতামৃত সম্পূর্ণ হওয়ার তারিখ, শক ১৫০৩, জ্যৈষ্ঠ, শুক্লা (অথবা কৃষ্ণা) পঞ্চমী, রবিবার—জ্যোতিষগণনার সহিত মিলে না।

চৈতন্যদেবকে আমরা আদর্শমানব বলিয়াছি ; ভগবান্ বলি নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে তিনি নিজেই তাঁহার ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করিয়াছেন (২২৬ হইতে ২৪৪ পৃষ্ঠা দেখুন)। চৈতন্যদেব কাটোয়ায় সন্ন্যাসগ্রহণের অব্যবহিত পরেই ভগবানের শ্রীচরণসেবা তাঁহার জীবনের ব্রত বলিয়া নির্দ্ধারণকরিয়া শ্রীমদ্ভাগবত (১১-২৩ ২৭) হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক আবৃত্তিপূর্ব্বক ভাবাবেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন (চৈঃ চঃ-মধ্য-৩য় প্রারম্ভ)—

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমোমুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব॥

অর্থাৎ প্রাচীন সাধুব্যক্তিদিগের অনুসৃত পরাত্মনিষ্ঠা (শুদ্ধ জীবের প্রকৃত স্বভাব) সম্যক্ অবলম্বনপূর্ব্বক মুকুন্দ-চরণ (মুক্তিদাতা বিষ্ণু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পদাম্বুজ) সেবাদ্বারা দুরন্তপার (যাহা পার হওয়া বিশেষ কষ্টসাধ্য) তমঃ (অন্ধকারাবৃত সংসারসাগর) পার হইব'।

তাঁহার বাল্যকালের এবং কৈশোরের জীবনী এত অতিরঞ্জিত যে প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করা কষ্টকর। বাল্যকালের চপলতা এবং যৌবনের বিদ্যাভিমান এবং তর্কস্পৃহা তাঁহার ছিল বলিয়া আমাদিগের মনে হয়। কিন্তু ভগবদ্ভক্তি ও প্রেমের উন্মেষ তাঁহার পাঠ্যাবস্থাতেই হইয়াছিল আমরা জানি। গয়াতে ঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্রগ্রহণের পর তাঁহার

সমধিক আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। শ্রীবাস, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্য এই আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন-বিষয়ে তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন। তাহার পর কাটোয়াতে কেশবভারতীকর্ত্তৃক সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার পরে তিনি আদর্শ-মানব-পদবীতে উপনীত হইয়াছিলেন। তাহার পর হইতে তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতি উচ্চ এবং উচ্চতর সোপান অতিক্রম করিয়া ভগবানের সন্নিধিতে অগ্রসর হইয়াছিল। এ উন্নতির ইয়ত্তা করা আমাদিগের ন্যায় মানবের পক্ষে দুঃসাধ্য।

আমরা তাঁহার উপদেশাবলীর সারাংশ যাহা আমরা আমাদিগের ক্ষুদ্রবুদ্ধিদ্বারা অধিগত হইতে পারিয়াছি, নিম্নে দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

চৈতন্যদেবের কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করিলে আমরা মোক্ষলাভের নিম্নলিখিত প্রকৃষ্ট উপায়গুলি অবগত হইতে পারি। এ বিষয়ে পূর্ব্বেও আমরা বলিয়াছি (পৃঃ ৩৬২)—

(১) আত্মসংযম—তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও সাধারণতঃ কাহাকেও বৈরাগ্যব্রত অবলম্বনকরিতে বলিতেন না। অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস, চন্দ্রশেখর, রামানন্দরায়, সার্ব্বভৌম, শিবানন্দ, বাসুদেবদত্ত প্রভৃতি সকলেই গৃহী ছিলেন। বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শনীতে (পৃঃ ৬৯-৭০) লিখিত আছে যে ৪৬ বৎসর বয়সে ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে চৈতন্যদেবের আদেশে নিত্যানন্দ সন্ন্যাসধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কালনানিবাসী ব্রাহ্মণ সূর্য্যদাসের কন্যা বসুধাদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং দুই বৎসর পরে নিজের ইচ্ছায় সূর্য্যদাসের কনিষ্ঠা কন্যা জাহ্নবাকে বিবাহকরিয়াছিলেন। কিন্তু আত্মসংযমের অভাব হইলে (যেমন ছোট হরিদাস এবং কুলীন ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাসের বিষয়ে) তিনি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইতেন এবং তাহা-দিগের সহিত সমস্ত সংশ্রব ত্যাগকরিতেন।

(২) সদ্‌গ্রন্থপাঠ—ধর্ম্মবিষয়ক অনেক গ্রন্থ চৈতন্যদেবের কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রায়ই শ্লোক উদ্ধৃত করিতেন। শ্রীমদ্ভাগবতের পরেই শ্রীভগবদ্গীতা, বিষ্ণুপুরাণ এবং রূপবিরচিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু তাঁহার উপদেশ-দানের প্রধান সহায় হইয়াছিল। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দ শ্রবণ করিতে তিনি ভালবাসিতেন—চৈঃ চঃ-মধ্য-১০ম-৫১—

"বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ,
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ।"

গ্রন্থ, শ্লোক এবং গীত স্বরূপদামোদর-দ্বারা পরীক্ষিত হইলে চৈতন্যদেব শ্রবণকরিতেন। যে গ্রন্থ ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ, তাহা তিনি পরিত্যাগ করিতেন। স্বরূপদামোদরের বিষয় চৈতন্যচরিতামৃত (মধ্য-১০ম-৪৭-৫০) হইতে উদ্ধৃত করিলাম—

"আর দিনে আইলা স্বরূপ-দামোদর।
প্রভুর অত্যন্ত মর্ম্ম-রসের সাগর॥
পুরুষোত্তম-আচার্য্য তাঁর নাম পূর্ব্বাশ্রমে।
নবদ্বীপে ছিলা তিঁহো প্রভুর চরণে॥৪৭॥"
প্রভুর সন্ন্যাস দেখি উন্মত্ত হইঞা।
সন্ন্যাস গ্রহণকৈল বারাণসী গিয়া॥
চৈতন্যানন্দ গুরু তার, আজ্ঞা দিল তারে :
বেদান্ত পড়িয়া পড়াও সমস্ত লোকেরে॥
পরম বিরক্ত তিঁহো পরম পণ্ডিত।
কায়মনে আশ্রিয়াছে শ্রীকৃষ্ণচরিত॥
নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজিব এইত কারণ।
উন্মাদে করিলা তিঁহো সন্ন্যাসগ্রহণ॥৪৮॥

সন্ন্যাস করিল শিখা, সূত্র-ত্যাগ রূপ।
যোগপট্ট না লইল নাম হইল স্বরূপ ॥
গুরু-ঠাঞি আজ্ঞা মাগি আইলা নীলাচলে।
রাত্রিদিন কৃষ্ণপ্রেম আনন্দবিহ্বলে ॥
পাণ্ডিত্যের অবধি কথা নাহি কার সনে।
নির্জ্জনে রহেন সব লোক নাহি জানে ॥৪৯॥
কৃষ্ণরসতত্ত্ববেত্তা দেহ প্রেমরূপ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ ॥
গ্রন্থ, শ্লোক, গীত কেহো প্রভু আগে আনে।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে পাছে প্রভু শুনে ॥
ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধে যেই আর রসাভাস।
শুনিতে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস ॥
অতএব স্বরূপ আগে করে পরীক্ষণ।
শুদ্ধ হয় যদি করায় প্রভুকে শ্রবণ ॥৫০॥

চৈতন্যদেবের গুরু কেশবভারতী চৈতন্যদেবকে নিম্নলিখিত শ্লোক কণ্ঠস্থ করিতে বলিয়াছিলেন—(চৈঃ চঃ—আদি—৫৭)—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥"

ব্যাসদেবের বেদান্তসূত্রও চৈতন্যদেব পাঠকরিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস ছিল শঙ্করাচার্য্য ইহার মুখ্যা বৃত্তি (primary meaning) ত্যাগকরিয়া গৌণী বৃত্তি (secondary meaning) গ্রহণকরিয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছেন (চৈঃ চঃ—আদি-৭ম-৮২)—

উপনিষদ সহ সূত্র কহে যেই তত্ত্ব।
মুখ্যাবৃত্তি সেই অর্থ পরমমহত্ত্ব ॥

গৌণী বৃত্তি যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য।
তাহার শ্রবণে নাশ হয় সর্ব্বকার্য্য ॥৮২॥"

উপরিউক্ত গ্রন্থাবলীব্যতীত তিনি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিতেন—মহাভারত, নারদপুরাণান্তর্গত হরিভক্তিসুখোদয়, রূপ-সংগৃহীত পদ্যাবলী, রামানন্দরায়ের জগন্নাথবল্লভ নাটক, কৃষ্ণকর্ণামৃত, মুকুন্দমালা, ব্রহ্মসংহিতা, সনাতন ও গোপালভট্টরচিত হরিভক্তিবিলাস, পদ্মপুরাণ, ভাবার্থদীপিকা, রূপ-বিরচিত ললিতমাধবনাটক, রূপ-বিরচিত লঘুভাগবতামৃত, বিশ্বপ্রকাশ-অভিধান, পাণিনীসূত্র, নৃসিংহ-পুরাণ, নামকৌমুদী ইত্যাদি।

রামানন্দরায়ের বাসস্থান-বিদ্যানগরে আসিয়া চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য হইতে আনীত দার্শনিক গ্রন্থ ব্রহ্মসংহিতা এবং বিল্বমঙ্গল-বিরচিত কৃষ্ণকর্ণামৃত তাঁহাকে উপহারদিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ—মধ্য-১৬০-১৬১)।

চৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ-সময়ে নিম্নলিখিত শ্লোক আবৃত্তি করিতেন—(চৈঃ চঃ—মধ্য-৭ম—৬৮-৭১)—

"মত্ত সিংহপ্রায় প্রভু করিলা গমন।
প্রেমাবেশে যায় করি নামসঙ্কীর্ত্তন ॥৬৮"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবাক্যম্ ॥

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হে ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, পাহি মাম্ ॥
রাম রাঘব, রাম রাঘব, রাম রাঘব, রক্ষ মাম্।
কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, কৃষ্ণ কেশব, পাহি মাম্ ॥৬৯॥

এই শ্লোক পড়ি পথে চলে গৌর-হরি।
লোক দেখি পথে কহে, 'বোল হরি হরি'॥
সেই লোক প্রেমে মত্ত বলে হরি, কৃষ্ণ।
প্রভুর পাছে সঙ্গে যায় দর্শনে সতৃষ্ণ॥
কথো দূরে রহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া।
বিদায়করেন তারে শক্তি সঞ্চারিয়া॥৭০॥
সেই জন নিজ গ্রামে করিয়া গমন।
কৃষ্ণ বলে হাসে কান্দে নাচে অনুক্ষণ॥
যারে দেখে তারে কহে, 'কহ কৃষ্ণনাম'।
এই মতে বৈষ্ণব কৈল সব নিজ গ্রাম॥"

(৩) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ;—অদ্বৈতবাদীরা এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুরই সত্তা স্বীকারকরেন না। জীব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং জগৎ মিথ্যা, তাঁহারা বলেন। অবিদ্যা, মায়া অথবা অজ্ঞতার নিমিত্ত আমরা নিজেকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এবং জগৎ সত্য, বিবেচনা করি। যেমন এক গাছা দড়িকে আমাদের কখনও কখনও সর্প বলিয়া ভ্রম হয়, তদ্রূপ মায়ার জন্য জীবকে ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন এবং জগৎকে সত্য বলিয়া আমরা জ্ঞান করি। এই ভ্রমকে বিবর্ত্ত (ভ্রান্তি)-বাদও বলে। সাধারণতঃ অদ্বৈতবাদীরা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন। তাঁহারা ব্রহ্মে কোনও গুণ আরোপকরিতে অসম্মত হন্। ব্রহ্মকে 'নেতি, নেতি' অর্থাৎ 'ইনি ইহা নন্, ইনি ইহা নন্' কেবল ইহাই উক্ত হইতে পারে, এই কথা তাঁহারা বলেন। চৈতন্যদেব বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন। তিনি নিজেকে এবং প্রত্যেক জীবকে ব্রহ্মের আণবিক অংশ জ্ঞান করিতেন। জগৎ সত্য, কিন্তু নশ্বর। প্রলয়ের সময়ে জগৎ এবং

জীব ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হইবে। এই মতকে পরিণামবাদ [১]ও বলে।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদিগের মতে ব্যাসদেব পরিণামবাদ সমর্থন করেন—ঈশ্বর নিজশক্তিদ্বারা জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন, তথাচ অবিকৃত আছেন ; জীবের আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ জীবই পরমাত্মা, এই বিশ্বাস ভ্রান্ত। জগৎ মিথ্যা নহে, কিন্তু জগৎ নশ্বর—(চৈঃ চঃ-মধ্য-৬ষ্ঠ-১১৫)—

"পরিণামবাদ ব্যাসসূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্য শক্ত্যে ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত॥
মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার॥
ব্যাস ভ্রান্ত বলি সেই সূত্রে দোষ দিঞা [২]।
বিবর্ত্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিঞা॥
জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি সেই মিথ্যা হয়।
জগৎ যে মিথ্যা নহে নশ্বরমাত্র কয়॥"

চৈতন্যদেব সনাতনকে বলিতেছেন—(চৈঃ চঃ-মধ্য-২৪শ-৪৯-৫৪ ; নগেন্দ্রনাথ রায়ের পদানুসরণ—পৃঃ ১৯২-৩)—

"ব্রহ্ম শব্দের অর্থ—
সর্ব্ব বৃহত্তম তত্ত্ব, স্বরূপ ও ঐশ্বর্য্যে যাঁহার সমান কেহ নাই।৪৯॥

১। নগেন্দ্রনাথরায়ের পদানুসরণ—চৈঃ চঃ-আদি-পৃঃ ১৪৬—এক দ্রব্যের অন্য দ্রব্য-রূপে অবস্থান্তর প্রাপ্তির নাম পরিণাম (evolution)। ঈশ্বর স্ব ইচ্ছায় জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন, ইহাই পরিণাম-বাদ।

স্বরূপতঃ অবস্থান্তর না হইয়াও অবস্থান্তরের ন্যায় প্রতীত হইলে বিবর্ত্ত (delusion) বলা যায়। রজ্জুতে সর্পের ন্যায় অবস্থান্তর ভাবকে বিবর্ত্ত বলে। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ইহাই বিবর্ত্তবাদ।

২। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি অদ্বৈতবাদীসকল।

এই বিষয়ে বিষ্ণুপুরাণে আছে—

"যিনি অতিশয় বৃহৎ এবং সকলের আশ্রয় তাঁহাকেই পরমব্রহ্ম বলে।" বিষ্ণুপুরাণ ১-১২-৫৭ ॥

সেই 'ব্রহ্ম' শব্দে স্বয়ং ভগবান্‌কে বুঝায়; অদ্বিতীয় জ্ঞান যাঁহা ব্যতীত আর নাই।

এই বিষয়ে ভাগবতে লিখিত আছে (১-২-১১)—

"তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ অদ্বয়জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলেন; জ্ঞানিগণ তাঁহাকে ব্রহ্ম, যোগিগণ পরমাত্মা এবং ভক্তগণ ভগবান্ বলিয়া থাকেন।"

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সেই অদ্বয়তত্ত্ব; যাঁহা ব্যতিরেকে কালত্রয়ে আর অন্য বস্তু নাই।

এই বিষয়ে শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

"হে ব্রহ্মন্ এই সৃষ্টির পূর্ব্বে একা আমিই ছিলাম। সেই সময়ে কি সূক্ষ্ম পদার্থ, কি স্থূল পদার্থ, কি তাহার কারণ—ভূত প্রকৃতি, এই সব কিছুই ছিল না। সেই কালে প্রকৃতি অন্তর্মুখতারূপে বিলীন ছিল। সেই সময়ে কেবল আমি ছিলাম সত্য, কিন্তু কিছুই না করিয়া নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ছিলাম। সৃষ্টির পরেও আমি রহিয়াছি। এই যে সকল জগৎ দেখিতেছ, এই সকলও আমি। অবশেষে এই বিশ্বের যাহা কিছু থাকিবে, তাহাও আমি। বাস্তবিক পক্ষে আমি অনাদি, অনন্ত ও অদ্বিতীয়, অতএব আমি পূর্ণ স্বরূপ। ৩৪॥ ভা ২-৯-৩২॥

জীব এবং ঈশ্বরের মধ্যে অনেক বিভেদ আছে (চৈঃ চঃ মধ্য-১৯শ পঃ-৬০)—

"কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতো হি চিৎকণঃ॥

(কেশাগ্রশতাংশ তার পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি ॥)

চৈতন্যদেব সার্ব্বভৌমকে বলিয়াছিলেন যে ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু; অদ্বৈত-বাদীরা তাঁহাকে নিরাকার করিয়া অন্যায় করিয়াছেন (চৈঃ চঃ মধ্য-৬ষ্ঠ-৯৮-১০৩)—

"সেই ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু ঈশ্বর-লক্ষণ ॥৯৯॥
ষড়ৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান ॥
নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
প্রাকৃত নিষেধি অপ্রাকৃত করয়ে স্থাপন ॥

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা বলেন ব্রহ্ম সাকার, সগুণ অথবা সবিশেষ। সার্ব্বভৌম চৈতন্যদেবকে বলিয়াছিলেন—চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৬।৬৭)—

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়োবলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥ ইতি ॥ ১০১ ॥

রা-বি-কৃত অনুবাদ—

"ফলতঃ যে যে শ্রুতি নিরাকার-বস্তু কহিয়াছেন, সেই সেই শ্রুতিই পুনর্ব্বার সাকার-তত্ত্ব বলিয়াছেন। কিন্তু সেই সমস্ত সাকার ও নিরা-কারত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতির মীমাংসা করিয়া দেখিলে সাকার-সাধিকা শ্রুতিই বলবতী হইয়া থাকে ॥৬৭॥

ব্রহ্মের তিন শক্তি আছে—চিৎ-শক্তি, জীব-শক্তি এবং মায়া-শক্তি। চৈতন্যদেব সার্ব্বভৌমকে বলিতেছেন—(চৈঃ চঃ-মধ্য-৬ষ্ঠ-১০৯)—

স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
নিঃশক্তি করিয়া তাঁরে করহ নিশ্চয়॥

বিষ্ণুপুরাণে (৬-৭-৬১)—

বিষ্ণুশক্তি পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥
যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলাবাপ্নোত্যনুসন্ততান্॥

(ক) বিষ্ণুশক্তিকে পরা এবং অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তিও বলে। ইহা ত্রিবিধা— (চৈঃ চঃ-মধ্য-১১২)

সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বর-স্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিনরূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ যারে জ্ঞান করি মানি॥

সৎ অথবা সন্ধিনী = নিত্যতা (**Eternal Existence**) ;
চিৎ অথবা সম্বিৎ (**Infinite Knowledge or Wisdom**);
আনন্দ অথবা হ্লাদিনী (**Infinite Happiness**).

(খ) ব্রহ্মের দ্বিতীয়া শক্তি অথবা অপরা শক্তিকে ক্ষেত্রজ্ঞা কিম্বা তটস্থা জীবশক্তিও বলে। ক্ষেত্র অথবা তট = দেহ।

(গ) ব্রহ্মের তৃতীয়া শক্তি কর্ম্মসংজ্ঞা অথবা বহিরঙ্গা অবিদ্যা অথবা মায়াশক্তি।

তটস্থা জীবশক্তি সর্ব্বগত হইলেও অবিদ্যাকর্ত্তৃক বেষ্টিত থাকাতে কর্ম্মের দ্বারা ভেদপ্রাপ্ত হইয়া অখিল সংসার-তাপ পাইয়া থাকে॥

ব্রহ্ম হইতে জন্মে বিশ্ব যেই ব্রহ্মে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয় যাই লয়॥১০২

অপাদান করণাধিকরণ কারক তিন [১]।
ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিহ্ন ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য-৬ষ্ঠ-১০২-৩)

জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। যেমন সূর্য্য ও রশ্মির এবং অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গের সম্বন্ধ, সেইরূপ পরিপূর্ণশক্তি শ্রীকৃষ্ণে ও অণুশক্তি জীবে ভেদাভেদ সম্বন্ধ আছে (চৈঃ চঃ-মধ্য-২০শ-৪৫)।

ঈশ্বর মায়ার অধীশ্বর, জীব মায়ার বশ—এমন জীবকে ঈশ্বরের সহিত অদ্বৈতবাদীরা অন্যায় করিয়া অভেদ করিয়াছেন। মধ্য-৬ষ্ঠ-১১২—

"মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীব ঈশ্বর সনে করহ অভেদ ॥"

(৪) কি উপায় অবলম্বনকরিলে মায়ার বিনাশ হইতে পারে? কি করিয়া এই মায়া হইতে জীবের উদ্ধার হইতে পারে, এই বিষয়ে চৈতন্যদেব সনাতনকে বলিতেছেন—(চৈঃ চঃ-মধ্য-২০শ-৫১-৫৪)—নগেন্দ্রকুমাররায়ের পদানুসরণ (মধ্য-পৃঃ-১২৮২৯)—

সনাতনের প্রশ্ন—ত্রিতাপ আমাকে জীর্ণ করিতেছে কেন?

১। আদি-পদানুসরণ—পৃঃ ১৪৮—শ্রুতিতে তিন কারক এই—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি ইত্যাদি অর্থাৎ যাহা হইতে এই ভূতসকল জন্মে তাহাকে অপাদান, যাহাদ্বারা জীবিত থাকে তাহাকে করণ এবং যাহাতে পুনঃ প্রবেশকরতঃ বিলীন হয়, তাহাকে অধিকরণ বলে। এ স্থলে শ্রীভগবান্ হইতে বিশ্বের এই তিন অবস্থা (সৃষ্টি, স্থিতি, ও লয়) হয় বলিয়া শ্রীভগবান্‌ই তিন কারক। যথা জন্মাদ্যস্য যতঃ ব্রহ্মসূত্রে (২) এবং শ্রীভাগবতে (১-১-১)॥

চৈতন্যদেবের উত্তর :—

"আপন প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া সেই জীব অনাদিকাল হইতে বহির্ম্মুখ আছে, সেই জন্য মায়া তাহাকে সংসার-দুঃখ দেয়। মায়া কখনো তাহাকে স্বর্গে উঠায়, কখনো বা নরকে ডুবায়, দণ্ড্য ব্যক্তিকে রাজা যেমন নদীতে চুবাইয়া থাকে তদ্রূপ।" ৫১ ॥

কবি (একজন জ্ঞানী ব্যক্তির নাম) কহিলেন, "ভগবদ্‌বিমুখ জীবের ঐশী-মায়াবশতঃ নিজ স্বরূপের অস্মৃতি এবং তন্নিবন্ধন দেহে আত্মাভিমান ঘটে ; সেই দেহাভিনিবেশহেতু তাহার ভয় জন্মে। এই নিমিত্ত জ্ঞানী ব্যক্তি পরমেশ্বরকেই সাক্ষাৎ গুরু, দেবতা এবং পরম-প্রেমের আস্পদ জ্ঞানকরিয়া ঐকান্তিকী ভক্তিসহ ভজনাকরিবেন।" ৫২ ॥ ভাঃ-১১-২-৩৫ ॥

কেমন করিয়া আমার হিত হইবে ?—প্রশ্নের উত্তর :—

শাস্ত্র ও সাধুকৃপায় শ্রীকৃষ্ণে উন্মুখ হইলে, সেই জীব নিস্তার পায় এবং মায়া তাঁহাকে ছাড়িয়া যায়। ৫৩

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—"হে অর্জ্জুন ! আমার এই গুণময়ী মায়া দৈবী ও দুস্তরণীয়া ; যাহারা কেবল আমাকেই ভজনাকরে, তাহারাই এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হয় "—ভগবদ্গীতা-৭-১৪।—

পুনরায় (চৈঃ চঃ-মধ্য-২০শ-৫৯-৬২-পদানুসরণ-পৃঃ-১২৯-৩০)—
"ধর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান ত্যাগকরিয়া ভক্তিমার্গে কৃষ্ণ-ভজনাই শাস্ত্র উপদেশ করে ; ভক্তিতে কৃষ্ণ বশীভূত হন, অতএব ভক্তিদ্বারাই তাঁহাকে ভজনা করিবে।" ৫৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "হে উদ্ধব, যোগ অথবা সাংখ্য কিম্বা স্বাধ্যায়, তপস্যা, অথবা ত্যাগধর্ম্ম আমাকে সেইরূপ বশীভূত করেনা অথবা প্রাপ্ত হয়না, যেরূপ আমার প্রতি উর্জ্জিতা (উৎকৃষ্টা) ভক্তি

আমাকে বশীভূত করে অথবা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"—ভাগবত-১১-১৪ ১৯

"সাধুদিগের প্রিয় আত্মা আমি একমাত্র শ্রদ্ধা-সহকৃত ভক্তিদ্বারাই বশীভূত হই ; আমাতে নিষ্ঠারূপ ভক্তি চণ্ডালকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করে। ৬০। ভাগবত ১১-১৪-২০।

অতএব ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়। এই ভক্তিকে অভিধেয় বলিয়া সকল শাস্ত্রে কীর্ত্তন করে। ধন পাইলে যেমন সুখভোগ-রূপ ফলপ্রাপ্তি হয় এবং সুখভোগ হইলে, দুঃখ আপনা হইতে পলাইয়া যায় ; সেইরূপ ভক্তির ফলে শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম উৎপন্ন হয় এবং প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হইলে, সংসার নষ্ট হয়। দারিদ্র-নাশ ও সংসার-ক্ষয় প্রেমের মুখ্য ফল নহে ; প্রেম-সুখভোগই মুখ্য প্রয়োজন। বেদ-শাস্ত্রে মুখ্য সম্বন্ধ কৃষ্ণ ; তাঁহার জ্ঞানে, অনুষঙ্গে মায়াবন্ধন দূর হয়।"

পুনরায়—(চৈঃ চঃ-মধ্য-২২শ-৭-৮ ; পদানুসরণ-পৃঃ ১৬০-৬১)—

"সেই বিভিন্নাংশ জীব দুই প্রকার, ১। নিত্যমুক্ত, ২। নিত্যসংসারী। তন্মধ্যে নিত্যমুক্ত জীব, নিত্য শ্রীকৃষ্ণচরণে উন্মুখ ; তাঁহার নাম কৃষ্ণ-পারিষদ, তিনি কৃষ্ণসেবাসুখ ভোগকরেন। আর নিত্যবদ্ধ, নিত্য শ্রীকৃষ্ণে বহির্ম্মুখ ; তাহাকে-নিত্য সংসারী বলে ; সে নরকাদি দুঃখ ভোগকরিয়া থাকে । ৭।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিমুখ বলিয়া মায়া পিশাচীরূপে তাহাকে দণ্ড দেয়, এবং আধ্যাত্মিক আদি তাপত্রয়ে[১] তাহাকে জারিয়া মারে। তখন সে কাম ও ক্রোধের দাস হইয়া তাহাদিগের দ্বারা নিপীড়িত

১। (ক) মানসিক দুঃখ, আধ্যাত্মিকদুঃখ (খ) দৈবজাত দুঃখ যেমন বজ্রপাত, ঝটিকাজনিত দুঃখ, আধিদৈবিক দুঃখ ; (গ) প্রাণিগণ হইতে উৎপন্ন দুঃখ, যেমন দেহের কষ্ট, ব্যাঘ্র, সর্পাদিজনিত দুঃখ, আধিভৌতিক দুঃখ।

হয়। এইরূপে সংসার-ভ্রমণ করিতে করিতে, যদি সাধুবৈদ্য পায়, তাঁহার উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়ন করে; তিনি তখন কৃষ্ণ-ভক্তি লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কাছে চলিয়া যান ।৮।

পুনরায় (ঐ-১৬-পদানুসরণ-পৃঃ ১৬২)—
শ্রীকৃষ্ণে উন্মুখ হইলে জ্ঞান-ব্যতিরেকেই সেই মুক্তি লাভ হয় ॥ ১৫ ॥

"শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—"হে অর্জ্জুন, আমার এই গুণময়ী মায়া দৈবী ও দুস্তরণীয়া, যাঁহারা কেবল আমার শরণাপন্ন হন, তাঁহারাই এই মায়া উত্তীর্ণ হন।" ১৬॥-গীতা-৭-১৪।

পুনরায়— (ঐ-২১ পদানুসরণ-পৃঃ ১৬২)—

"শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্যময় এবং মায়া অন্ধকারস্থানীয়া; যেখানে শ্রীকৃষ্ণ, সেখানে মায়ার অধিকার নাই। ২১ ॥"

পুনরায় (ঐ-২৩-২৪ ; পদানুসরণ পৃঃ ১৬২-১৬৩)—

"হে নারদ! যে মায়া ভগবানের দৃষ্টিপথে থাকিতেও লজ্জিতা হয়, দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিগণ সেই মায়ায় মোহিত হইয়া 'আমি, আমার' এইরূপ শ্লাঘা করে।" ২৩॥-ভাগবত ২-৫-১৩।

জীব যদি একবার বলে যে 'হে কৃষ্ণ, আজি হইতে আমি আপনার হইলাম,' শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত করেন। ২৪ ॥"

(৫) হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন। নাম-সঙ্কীর্ত্তন চিত্ত শুদ্ধিকরিয়া জীবকে ভগবদনুগ্রহের উপযোগী করে। তর্কের দ্বারা ঐশ্বরিক মহিমা উপলব্ধি করা দুষ্কর, কিন্তু নাম-সঙ্কীর্ত্তন সহজেই মানব হৃদয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে। বর্ত্তমান যুগে উচ্চজাত্যভিমানী হিন্দুদিগের এবং সবরমতী-আশ্রমের অধিবাসীদিগের পাপের প্রায়শ্চিত্তকল্পে মহাত্মা গান্ধী ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ৮ই হইতে ২৯শে মে পর্য্যন্ত যে উপবাসব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে হরিজনপত্রে মহাদেবদেশাইমহাশয়-

লিখিত 'যজ্ঞাগ্নির অগ্নিস্ফুলিঙ্গ'-প্রবন্ধের অনুবাদ ৩রা জুন, ১৯৩৩ তারিখের আনন্দবাজার-পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা হইতে কতিপয় ছত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—'ধীরে ধীরে গান্ধীজির মুখমণ্ডল বিশুষ্ক হইতেছিল। শ্রীদেবীদাস গান্ধী (মহাত্মা গান্ধীর পুত্র) উহা প্রত্যক্ষকরিতেছিলেন। উপবাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনি মহাত্মাজীকে কামাইবার জন্য তাঁহার নিকট প্রস্তাব করেন। তিনি ইহাই মনে করিয়াছিলেন যে তাহা হইলে হয়ত মহাত্মাজীর মুখ একটু কম রুক্ষ-শুষ্ক দেখাইবে। গান্ধীজী উত্তরে বলিলেন, "বেশ তাহাই কর। আমি সম্পূর্ণরূপে দেহের কথা বিস্মৃত হইতে চেষ্টা করিতেছি। আমি শুধু রামনাম জপ করিতেছি। ক্ষৌরকর্ম্ম করিতে চাও আপত্তি নাই।' মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় অসাধারণ জ্ঞান-ও-কর্ম্মযোগী জীবনমরণ-সন্ধিস্থলে ভগবানের নামজপ ভগবদনুগ্রহলাভের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাসকবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য-১৫শ-৩৭-৪০)আছে—

"তবে রামানন্দ আর সত্যরাজ খান।
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন॥
গৃহস্থ-বিষয়ী আমি কি মোর সাধনে।
শ্রীমুখে আজ্ঞা কর প্রভু নিবেদি চরণে। ৩৭॥
প্রভু কহে কৃষ্ণসেবা. বৈষ্ণব-সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন॥ ৩৮॥
সত্যরাজ কহে বৈষ্ণব চিনিব কেমনে।
কে বৈষ্ণব কহ, তার সামান্য লক্ষণে॥ ৩৯॥
প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সভাকার॥

এক কৃষ্ণনাম করে সর্ব্বপাপ-ক্ষয়।
নববিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয়॥
দীক্ষা পুরশ্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বা-স্পর্শে আচণ্ডালে সভারে উদ্ধারে॥
অনুষঙ্গ-ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষয়ে, করে কৃষ্ণপ্রেমোদয়॥ ৪০॥

কেবল কৃষ্ণনাম লইলেই সমধিক আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে না। অভিমান পরিত্যাগকরিয়া ঈশ্বরের নাম লইতে হইবে। নিজে উত্তম হইয়া অর্থাৎ রিপুসকল দমনকরিয়া অর্থাৎ আত্মসংযম অভ্যাসকরিয়া এবং এই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সকল প্রকার অহঙ্কার অথবা অভিমান পরিত্যাগকরিয়া ভগবানের নাম লইতে হইবে। এ বিষয়ে চৈতন্যদেব স্বরূপদামোদর ও রামানন্দরায়কে বলিয়াছিলেন— চৈঃ চঃ-অন্ত-২০শ-১১-১৩—

"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
দেশকাল নিয়ম নাহি সর্ব্ব সিদ্ধি হয়॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ॥
যেরূপে লইলে নামে প্রেম উপজয়।
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ, রামরায়॥ ১১॥
'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদাহরিঃ॥' ১২॥
উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দুই প্রকার সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ সম॥

বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাইঞা মৈলে কারে পানী না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম্ম, বৃষ্টি সহে আনের করয়ে পোষণ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান॥
এই মত হৈঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে তার প্রেম উপজয়॥" ১৩॥

চৈতন্যদেবের নীলাচলে অবস্থিতির সময়ে শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন, গীত, নৃত্য ও বাদ্যের সহিত মিলিত হইয়া জনসাধারণের চিত্তে ভক্তিরসস্রোত প্রবাহিত করিত। মুকুন্দ দত্ত, বাসুদেব দত্ত, গোবিন্দ দত্ত, ষষ্ঠীধর, 'গোবিন্দ, মাধব ও বাসুদেব ঘোষ তিনভাই', বড় হরিদাস ও ছোট হরিদাস[১]—ইঁহারা কীর্ত্তনীয়াদিগের মধ্যে প্রধান ছিলেন। বক্রেশ্বর পণ্ডিত নৃত্যে অতিশয় নিপুণ ছিলেন।

রাজা প্রতাপরুদ্র চৈতন্যদেবের ভক্তগণের কীর্ত্তন ও নৃত্য দেখিয়া সার্ব্বভৌম ও গোপীনাথআচার্য্যকে বলিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ-মধ্য-১১শ ৪৯)—

* * *

কভু নাহি শুনি এই মধুর কীর্ত্তন॥
ঐছে প্রেম, ঐছে নৃত্য, ঐছে হরিধ্বনি।
কাঁহা নাহি দেখি ঐছে কাঁহা নাহি শুনি॥"

সার্ব্বভৌম ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে চৈতন্যদেব এই নাম-

১। উভয়ে যবন হরিদাস অথবা হরিদাসঠাকুর হইতে বিভিন্ন (চৈঃ চঃ-আদি-১০ম)

সঙ্কীর্ত্তনের স্রষ্টা—

"ভট্টাচার্য্য কহে তোমার সুসত্য বচন।
চৈতন্যের সৃষ্টি এই নাম-সঙ্কীর্ত্তন।"

রথযাত্রার সময়ে যে নয়দিন জগন্নাথদেব গুণ্ডিচায় থাকিতেন, সেই কয়দিন চৈতন্যদেব গৌড়ীয় ভক্তগণ সহিত হরিসঙ্কীর্ত্তনে নিমগ্ন থাকিতেন (চৈঃ চঃ-মধ্য-১৪শ-৪২)।

চৈতন্যদেব অবসর পাইলেই হরি-নাম জপকরিতেন। নিত্যানন্দ চৈতন্যদেবের দক্ষিণদেশে যাইবার সময়ে তাঁহাকে বলিতেছেন—

"তোমার দুই হস্ত বদ্ধ নাম-গণনে।
জলপাত্র বহির্ব্বাস বহিবে কেমনে ?"—চৈঃ চঃ-মধ্য-৭ম-২৫।

চৈতন্যদেব যখন হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিতেন, তখনই তাঁহার অপূর্ব্ব ভাবাবেশ হইত এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের সান্নিধ্য তিনি উপলব্ধিকরিতেন, তাঁহার দেহ হইতে পদ্মগন্ধ নির্গত হইত, পুলকে সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইত, চক্ষুর্দ্বয় হইতে অশ্রুস্রোত বহির্গত হইত এবং তিনি ভূমিতে পতিত হইতেন। এরূপ অনির্ব্বচনীয় ভগবদ্ভক্তি ও প্রেম-সন্দর্শনে ন্যায় ও তর্কের জটিল প্রশ্ন তার্কিকের মনে স্থান পাইত না—

"ন্যায়, তর্কের, পণ্ডিতবর !
জটিল প্রশ্ন তব।
সোজা হয়ে যাবে, প্রেমের পরশে,
ধরিবে স্ফূর্ত্তি নব ॥
জ্ঞান, বিদ্যার স্তূপীভূত যত
অহমিকা রাশি-রাশি।

নিমেষে কোথায় চোখের ধারায়
কোথা চলে যাবে ভাসি ॥" শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস
(মাসিক বসুমতী, চৈত্র, ১৩৩৯)

(৬) চৈতন্যদেব সনাতনকে বলিতেছেন যে সাধুসঙ্গ আধ্যাত্মিক উন্নতির নিমিত্ত অতি প্রয়োজনীয়— (চৈঃ চঃ-মধ্য-২২শ-৩৪-৩৫ ; পদানুসরণ)—

"ভাগ্যানুক্রমে কাহারও সংসার ক্ষয়োন্মুখ (সংসারমোচনের সময় উপস্থিত) হইলে, তখন সাধুসঙ্গে তাহার শ্রীকৃষ্ণে রতি উৎপন্ন হয়। ৩৪ ॥

শ্রীমুকুন্দ কহিলেন 'হে অচ্যুত! আপনার অনুগ্রহে এই সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে যদি কাহারও সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়, তখন তাহার সাধুর সহিত মিলন হইয়া থাকে ; সৎসঙ্গম হইলে সাধুদিগের গতি, সর্ব্বফলস্বরূপ, সর্ব্বনিয়ামক সর্ব্বেশ্বর—আপনাতে—তাহার রতি উৎপন্ন হয়।' " ভাগবত-৫১-৩৫।

পুনরায় (৪৩-৪৪)—

"সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লব-মাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।"

পদানুসরণ পৃঃ—১৬৫—

"সাধুসঙ্গ কেবল সাধুসঙ্গই মূল, ইহাই সকল শাস্ত্র কীর্ত্তনকরে, কিঞ্চিন্মাত্রকালও সাধুসঙ্গ হইলে সর্ব্বসিদ্ধি হইয়া থাকে।" ৪৩ ॥

(৭) কর্ম্মফলের নাশ কি উপায় অবলম্বনকরিলে হইতে পারে ? সমস্ত জীবের পাপের ভার যাহাতে চৈতন্যদেব বাসুদেবদত্তকে দেন, এই বিষয়ে তাঁহাকে অনুনয়করিলে, চৈতন্যদেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন

যে ঈশ্বরে ভক্তি হইলে কর্ম্মফলের নাশ হয় (চৈঃ চঃ-মধ্য-১৫শ-৬২-৬৩ : পদানুসরণ পৃঃ-১০০)—

"প্রভু কহিলেন, "বাসুদেব ! কৃষ্ণ সকল জীবকে উদ্ধারকরিতে সমর্থ ; বিনা পাপ-ভোগেই সকলের উদ্ধার হইবে। কৃষ্ণ তোমাকেই বা কেন পাপফল ভোগকরাইবেন ? তুমি যার হিত বাঞ্ছাকরিতেছ, সে বৈষ্ণব হইয়াছে ; কৃষ্ণ, বৈষ্ণবের পাপ সব দূর করিয়া থাকেন।" ৬২ ॥

শ্রীব্রহ্মা কহিলেন, (ব্রহ্মসংহিতা-৫-৫৪) যিনি ইন্দ্রগোপ (অর্থাৎ সূক্ষ্ম রক্তবর্ণজীব বিশেষ) হইতে দেবেন্দ্র পর্য্যন্ত সকলকেই স্বকর্ম্মবন্ধনানুরূপ ফলপ্রদানকরেন, কিন্তু ভক্তিমান্‌দিগের কর্ম্মসকলকে নিঃশেষে বিনাশকরিয়া থাকেন, সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে ভজনাকরি।"

(৮) ভগবান্‌কে প্রথমে দাসভাবে উপাসনাকরা আবশ্যক। এইরূপে ভগবদ্ভক্তি প্রগাঢ় হইলে এবং আত্মসংযমের পরাকাষ্ঠা হইলে এবং ঈশ্বরের সামীপ্য উপলব্ধিহইলে এবং তাঁহার ক্ষণিক বিরহ ক্লেশকর হইলে, নিভৃতস্থানে ভগবান্‌কে প্রেমিকা-ভাবে উপাসনাকরা কর্ত্তব্য। ইহাকে মধুরভাবে উপাসনা বলে। এই উপাসনাতে অণুমাত্র কামভাব এবং স্বার্থপরতা থাকিবে না (চৈঃ চঃ-মধ্য-৮ম-১৪৭)—

"নিজেন্দ্রিয় সুখ হেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণসুখের তাৎপর্য্য গোপী-ভাব বর্য্য [১] ॥
নিজেন্দ্রিয় সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গে ত বিহার ॥"

এই প্রকার ভক্তি মুক্তির প্রধান উপায়। চৈতন্যদেব স্বরূপদামো-

১। বৃ (বরণ করা)—কর্ম্মণি য ; প্রধান, শ্রেষ্ঠ।

দরের সহিত নিম্নলিখিত শ্লোক (মধ্য-১৩শ-৬৫) আস্বাদনকরিতেন (শ্রীমদ্ভাগবত-১০ম স্কন্ধ-৮২-৩১)—

শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে কহিলেন—

"ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনং" ॥৩১॥

(দেখ! আমার নিকটে বা দূরে থাকার জন্য তোমাদের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। কারণ আমার প্রতি কেবল ভক্তি করিতে পারিলেই জীবের মোক্ষ-লাভ হয়, সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ বহু ভাগ্যফলেই আমার প্রতি তোমাদের যে প্রেম জন্মিয়াছে, তাহার মহিমা অতুলনীয়; সেই স্নেহের ফলে তোমরা আমার স্বরূপ সাক্ষাৎকারে সমর্থা হইবে সন্দেহ নাই॥" ৩১॥ (খগেন্দ্রশাস্ত্রীর অনুবাদ)

চৈতন্যদেব এবং সম্ভবতঃ আর দুই চারিজন মহাপুরুষ এইরূপে ভগবানের উপাসনা করিতে এবং ভগবান্‌কে দিয়া আপনাদিগকে আত্মসাৎ করাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এ ভগবদ্‌ভজনা ঈশ্বর-উপাসনার চরমসীমা। এই প্রকার আরাধনা ভগবানের সহিত জীবাত্মাকে প্রগাঢ়ভাবে সম্মিলিত করে।

চৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য-২২শ-৮৫-৮৬; নগেন্দ্রকুমাররায়রচিত পদানুসরণ-পৃঃ-১৬৮-৯) লিখিত আছে—

"শরণ লইয়া শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করা মাত্রই শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে আপনার সমান করিয়া থাকেন। ৮৫॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, "হে উদ্ধব! মনুষ্য যখন সমস্ত ত্যাগ-পূর্ব্বক সেবাভিলাষে আমাতে আত্মসমর্পণ করে, তখনই সে অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার স্বরূপ হইয়া থাকে।—ভাগবত-১১৮-২৯-৩২।

পুনরায় (চৈঃ চঃ-মধ্য-২৩-৪ এবং ১০ ; পদানুসরণ পৃষ্ঠা ১৭৪-৭৫)—

"শ্রীকৃষ্ণে রতি গাঢ় হইলে প্রেম-নামে অভিহিত হয়, কৃষ্ণভক্তিরসের তাহাই স্থায়িভাব বলিয়া কথিত। ৪॥"

চৈতন্যদেব সনাতনকে বলিলেন—(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-১-৪-১১ ; চৈঃ চঃ-মধ্য-২৩প-১০)—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদয়তি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

"সর্ব্বাগ্রে শ্রদ্ধা [১] ; ইহা হইতে সাধুসঙ্গ, ইহা হইতে ভজনক্রিয়া (শ্রবণ ও কীর্ত্তন) ; ইহা হইতে অনর্থনিবৃত্তি ; ইহা হইতে নিষ্ঠা ; ইহা হইতে রুচি ; ইহা হইতে আসক্তি, ইহা হইতে কৃষ্ণে প্রীতির অঙ্কুর এবং এই ভাব গাঢ় হইলে সর্ব্বানন্দধাম প্রেম উদয় হয় ; ইহাই সাধকদিগের প্রেমাবির্ভাবের ক্রম।" ১০৭॥

চৈতন্যদেব বল্লভভট্টকে বলিতেছেন যে মধুরভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা শ্রেষ্ঠ—(চৈঃ চঃ-অন্ত্য-৭ম-৭-১০)—

"রামানন্দরায় কৃষ্ণ-রসের বিধান।
তেঁহো জানাইল কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্॥
তাতে প্রেমভক্তি পুরুষার্থ-শিরোমণি [২]।
রাগমার্গে [৩] প্রেমভক্তি সর্ব্বাধিক জানি॥

১। শ্রদ্ধা সুদৃঢ় বিশ্বাস—(চৈঃ চঃ-মধ্য-২২শ-৪৯)। 'কোনভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়। তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়"—চৈঃ চঃ-মধ্য-২৩শ পঃ-৯।

২। 'The supreme object of ambition'—S. K. Chaudhuri.

৩। In the way of loving attachment for the Lord' (ibid).

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর রস আর।
সর্ব্বভাবে শ্রেষ্ঠ কান্তা আশ্রয় যাহার॥
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত কেবল ভাব আর।
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে নাহি পাইয়ে ব্রজেন্দ্রকুমার॥"

(নগেন্দ্ররায়ের পদানুসরণ— পৃঃ-৪৭-৪৮)—চৈতন্যদেব বল্লভভট্টকে বলিতেছেন—

"শ্রীরামানন্দরায় কৃষ্ণরসের নিধান; তিনিই জানাইয়াছেন, কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্; তাঁহাতে (শ্রীকৃষ্ণে) প্রেমভক্তিই পুরুষার্থ-শিরোমণি। ঐ প্রেমভক্তি রাগমার্গে হইলে, সকলের অধিক বলিয়া জানি। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস; ইহার মধ্যে কান্তা অর্থাৎ মধুর রস যাহার আশ্রয় তাহা সর্ব্বভাবে শ্রেষ্ঠ"। আর ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানযুক্ত কেবলভাবের দ্বারা অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা (by the knowledge of God's glories) ব্রজেন্দ্রকুমারকে পাওয়া যায় না।

চৈতন্যদেবের রাধাভাবে কিম্বা গোপীভাবে উপাসনার বিষয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতে (আদি-১৭শ-২৪৪-৬) লিখিয়াছেন—

গোপীভাব যাতে প্রভু ধরিয়াছে একান্ত।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে মানে আপনার কান্ত॥
গোপিকাভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয়।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনু অন্যত্র না হয়॥
শ্যামসুন্দর পিচ্ছচূড়া [১] গুঞ্জাবিভূষণ।
গোপবেশে ত্রিভঙ্গিম মুরলীবদন॥
ইহা বিনু কৃষ্ণ যদি হয় অন্যাকার।
গোপিকার ভাব না যায় নিকটে তাহার॥

১। ময়ূরপুচ্ছ-চূড়া।

মোহনরূপ ধারণকরিয়া ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ সুমধুর মুরলীবাদনদ্বারা—ভীতিপ্রদর্শনদ্বারা নয়—নরকাদিভয়প্রদর্শনদ্বারা নয়—পাপী, তাপী মানবকে নিয়ত নিজ সন্নিধানে আহ্বানকরিতেছেন। আদর্শমানব দয়ানিধি চৈতন্যদেব প্রায়ই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেন এবং তাঁহার বংশীধ্বনি শ্রবণকরিয়া আত্মহারা হইতেন। শেষে ক্ষণিক বিরহও তাঁহার এত ক্লেশকর হইয়াছিল যে তিনি দেহত্যাগপূর্ব্বক ভগবানের সহিত অনন্তকালের জন্য সম্মিলিত হইয়া জীবের ত্রিতাপনাশে এবং মুক্তিকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

চৈতন্যদেব তাঁহার জীবনের শেষ দ্বাদশবর্ষ স্বরূপ-দামোদর ও রামানন্দরায়ের সহিত নীলাচলে[১] এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাসকবিরাজ তাঁহার চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য-খণ্ডের দ্বিতীয় ও অন্ত্যখণ্ডের চতুর্দ্দশ হইতে বিংশ পরিচ্ছেদে ইহা বিবৃত করিয়াছেন—

(মধ্য-২য়-১-২)—

"শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ-স্ফূর্ত্তি হয় নিরন্তর॥

১। কাশীমিশ্রের আলয়ের নিভৃত কক্ষে (গম্ভীরাতে)। এই স্থান জগন্নাথদেবের সিংহদ্বারের নিকট, তথা হইতে অনায়াসে জগন্নাথদর্শন হইত (চৈঃ চঃ নাঃ-৮ম-৩)। কাশীমিশ্র জগন্নাথদেবের সমস্ত কার্য্যের অধ্যক্ষ ছিলেন—কাশীমিশ্রনামা এষ সর্ব্বাধিকারী প্রাড়্বিবাকো ভগবতঃ"।

শ্রীযুক্ত ঊষাপ্রকাশ সরকার, এম্-এ, বলেন যে বর্ত্তমান রাধাকান্তমঠ ও সিদ্ধ বকুলমঠ কাশীমিশ্রের বাটীর ও উদ্যানের অন্তর্গত ছিল। চৈতন্যদেব যবনহরিদাসের জন্য কাশী-মিশ্রের উদ্যানের একটী বকুলবৃক্ষের নিকট একটী ঘর যোগাড়করিয়া দিয়াছিলেন। এই বকুলতলায় হরিদাসঠাকুর হরিনাম জপকরিতেন এবং এইস্থানেই তিনি দেহত্যাগ করিয়া-ছেন। সেইজন্য ইহাকে 'সিদ্ধবকুল' বলে।

শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধবদর্শনে।
এই মত প্রভুর দশা হয় রাত্রিদিনে॥
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ॥
রোমকূপে রক্তোদ্গম দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে॥
গম্ভীরা-ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রা লব।
ভিতে মুখ শির ঘসে ক্ষত হয় সব॥
তিন দ্বারে কপাট প্রভু যায়েন বাহিরে।
কভু সিংহদ্বারে পড়ে, কভু সিন্ধুনীরে॥
চটকপর্ব্বত দেখি গোবর্দ্ধন ভাণে।
ধাইয়া চলে আর্ত্তনাদে করিয়া ক্রন্দনে॥
উপবনোদ্যান দেখি বৃন্দাবনজ্ঞান।
তাঁহা যাই নাচে গায় ক্ষণে মূর্চ্ছা যান॥

একদিন চৈতন্যদেব শয়ন করিয়া স্বপ্নে দেখিলেন যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা রাসলীলা করিতেছেন এবং দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণের 'ত্রিভঙ্গ সুন্দর দেহ মুরলী-বদন'; চতুর্দ্দিকে গোপীগণ নৃত্য করিতেছেন। নিদ্রা হইতে গোবিন্দ তাঁহাকে জাগ্রত করিলে তিনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন (চৈঃ চঃ-অন্ত্য-১৪শ-৮)।

একদিন রামানন্দরায় গম্ভীরাতে শ্লোক পড়িতে লাগিলেন, স্বরূপ-দামোদর কৃষ্ণলীলাগান করিতে লাগিলেন (ঐ-১৭)। চৈতন্যদেবকে ঘরের ভিতরে শয়নকরাইয়া রামানন্দরায় নিজের বাটীতে যাইলেন।

স্বরূপ ও গোবিন্দ দ্বারে শয়ন করিলেন—

"সব রাত্রি মহাপ্রভু করে জাগরণ।
উচ্চ করি করে কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন॥
শব্দ না পাইয়া স্বরূপ কবাট কৈল দূরে।
তিন দ্বার দেয়া আছে প্রভু নাই ঘরে॥

জগন্নাথদেবের সিংহদ্বারের উত্তরদিকে তিনি অজ্ঞানঅবস্থায় পড়িয়া আছেন দেখিয়া তাঁহার কাণে কৃষ্ণনাম উচ্চৈস্বরে কীর্ত্তনকরাতে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান হইল। তিনি বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যুৎপ্রায় দেখা দিয়া অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন।" আর একদিন তিনি সমুদ্রের দিকে যাইতেছিলেন (ঐ ২৭-৪১); পথে চটকপর্ব্বতকে গোবর্দ্ধন মনে করিয়া ঐ দিকে বায়ুবেগে ছুটিতে লাগিলেন। গোবিন্দ, স্বরূপ এবং অন্যান্য ভক্তগণ তাঁহাকে অনুসরণকরিলেন। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যাইলেন; প্রত্যেক রোমকূপ ব্রণের আকার ধারণকরিল, রোমকূপ হইতে রক্তোদ্গম হইতে লাগিল এবং কণ্ঠ ঘর্ঘর করিতে লাগিল; চক্ষু হইতে অবিরত অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল এবং অঙ্গসকল কাঁপিতে লাগিল। শীতলজলপ্রয়োগ, ব্যজন ও কর্ণে হরিনাম-কীর্ত্তনদ্বারা তাঁহার জ্ঞান হইলে তিনি বলিলেন, "আমি গোবর্দ্ধনে গিয়াছিলাম। শ্রীকৃষ্ণ গোধন-চারণ করিতে করিতে বেণু বাজাইলে শ্রীরাধা আসিলেন। এমন সময়ে তোমরা কোলাহল করিয়া আমাকে দুঃখ দিবার জন্য এই স্থানে লইয়া আসিয়াছ।

কেন বা আনিলে মোরে বৃথা দুঃখ দিতে।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাইনু দেখিতে॥
এত বলি মহাপ্রভু করেন ক্রন্দন।
তাঁর দশা দেখি বৈষ্ণব করেন রোদন॥ ৩৭"

এই চটকগিরিগমনলীলারূপ দিব্যোন্মাদ রঘুনাথদাস নিজে দেখিয়া তাঁহার চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে প্রকাশকরিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি ভক্ত-হৃদয়ে কিরূপ প্রভাব প্রকাশকরে কবিকর্ণপূর বলিতেছেন (আঃ বৃঃ চঃ [১]-১১শ-২৯৪)—

বংশীকলঃ কিল হরেঃ সখি বদ্ধবীর্য্যোবস্তুস্বভাবপরিবৃত্তিকরো হি মন্ত্রঃ। নিশ্চেতনত্বমুদপাদি সচেতনানাং যচ্চেতনত্বমুপপন্নমচেতনানাম্॥

কি যে মন্ত্র জানে সখি! বাঁশী শ্রীকৃষ্ণের।
শ্রবণে পশিলে গতি ফিরে স্বভাবের॥
সচেতন জীব হয় আত্মহারা শুনে।
চেতনত্ব উপপন্ন হয় অচেতনে। সঃ

একদিন চৈতন্যদেব জগন্নাথদেবের মন্দিরে গিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ-মধ্য-২য়-২১-২৮)—

যে কালে দেখে জগন্নাথ শ্রীরাম-সুভদ্রা সাথ,
তবে জানি আইলাম কুরুক্ষেত্র।
সফল হৈল জীবন, দেখিনু পদ্মলোচন,
জুড়াইল তনু মন নেত্র॥
গরুড়ের সন্নিধানে, রহি করে দরশনে,
সে আনন্দের কি কহিব বলে।
গরুড়-স্তম্ভের তলে, আছে এক নিম্ন খালে,
সেই খালে ভরে অশ্রুজলে॥
তাঁহা হৈতে ঘরে আসি, মাটির উপরে বসি,
নখে করে পৃথিবী লিখন।"

১। আনন্দবৃন্দাবনচম্পূর যে বঙ্গানুবাদ এই পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে, 'সঃ'-চিহ্নিত অনুবাদব্যতীত প্রথম হইতে নবম স্তবকের অনুবাদ শ্রীযুক্ত মধুসূদনতত্ত্ববাচস্পতিকৃত।

চৈতন্যদেব রাধাভাবে বলিতেছেন—

"হা হা কাঁহা বৃন্দাবন, কাঁহা গোপেন্দ্র-নন্দন,
কাঁহা সেই বংশীবদন ॥
কাঁহা সে ত্রিভঙ্গঠাম, কাঁহা সেই বংশীগান,
কাঁহা সেই যমুনাপুলিন।
কাঁহা রাসবিলাস, কাঁহা নৃত্য, গীত, হাস,
কাঁহা প্রভু মদনমোহন ॥
উঠিল নানা ভাবাবেগ, মনে হৈল উদ্বেগ,
ক্ষণমাত্র নারে গোঙাইতে।
প্রবল বিরহানলে, ধৈর্য্য হৈল টলমলে
নানা শ্লোক লাগিলা পড়িতে ॥

তথাহি কৃষ্ণকর্ণামৃতে, ৪১ শ্লোকে, বিল্বমঙ্গলবাক্যং যথা—

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি,
হরে ত্বদলোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো,
হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি ॥ ২১

তোমার দর্শন বিনে, অধন্য এই রাত্রি দিনে,
এই কাল না যায় কাটন।
তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু,
কৃপা করি দেহ দরশন ॥
উঠিল ভাব চাপল[১] মন হইল চঞ্চল,
ভাবের গতি বুঝন না যায়।

১। চপল।

অদর্শনে পোড়ে মন, কেমনে পাব দরশন,
কৃষ্ণ-ঠাঞি পুছেন উপায় ॥

তথাহি তত্রৈব ৩২ শ্লোকে—

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যম্।
তৎ কিঙ্করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি ॥
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাম্ ॥

(হে কৃষ্ণ! মাধুর্য্য, মাদকত্ব ও আকর্ষণ দ্বারা তোমার কৈশোর ত্রিভুবনে অদ্ভুত জানিও! আর আমার চাপল্যও ত্রিভুবনে আশ্চর্য্য। এই দুই তুমি এবং আমি বিশেষ ভাবে জানি। অতএব তোমার বিরল মুরলীবিলাসী মনোহর মুখাম্বুজ নয়ন-যুগলদ্বারা সম্যক্ দর্শন করিবার নিমিত্ত কি উপায় অবলম্বন করিব ?—(নঃ রাঃ—পদানুসরণ)

তোমার মাধুরী বল, তাতে মোর চাপল,[১]
এই দুই তুমি আমি জানি।
কাঁহা করো কাঁহা যাই, কেনোপায়ে তোমা পাই,
তাহা মোরে কহত আপনি ॥"

আর একদিন চৈতন্যদেব (চৈঃ চঃ-অন্ত্য-১৬শ-৩১-৩৬) জগন্নাথদর্শনে যাইয়া দ্বারপালকে বলিলেন, "আমার প্রাণনাথশ্রীকৃষ্ণ কোথায়? আমাকে শ্রীকৃষ্ণ দেখাও;" এই বলিয়া চৈতন্যদেব তাহার হাত ধরিলেন। দ্বারপাল বলিল—

'এই দেখ শ্রী পুরুষোত্তম
নেত্র ভরিয়া তুমি করহ দর্শন।'

১। চপলতা।

গরুড়ের পাছে রহি করেন দর্শন
দেখে, জগন্নাথ হয় মুরলীবদন।

এই সময়ে জগন্নাথের গোপালভোগ আরম্ভ হইল। ভোগ দেওয়া হইলে চৈতন্যদেবকে জগন্নাথের সেবক মালাপরাইয়া তাঁহার হাতে প্রসাদ দিলেন—

তার অল্প প্রভু জিহ্বাতে যদি দিল।
আর সব গোবিন্দের আঁচলে বান্ধিল ॥
কোটি অমৃতস্বাদ পাঞা প্রভুর চমৎকার।
সর্ব্বাঙ্গ পুলক নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥
'এই দ্রব্যে এত স্বাদু কোথা হৈতে হৈল।
কৃষ্ণের অধরামৃত ইহায় সঞ্চারিল' ॥
'সুকৃতিলভ্য ফেলালব' কহে বারবার।
ঈশ্বর-সেবক[১] পুছে কি অর্থ ইহার ॥

... ...

"কৃষ্ণের যে ভুক্ত শেষ তার ফেলা নাম।
তার এক লব পায় সেই ভাগ্যবান্ ॥
সামান্য ভাগ্য হইতে তার প্রাপ্তি নাহি হয়।
কৃষ্ণের যাতে পূর্ণ কৃপা সেই তাহা পায়।"

আর একদিন বৈশাখ পৌর্ণমাসী রাত্রিতে নীলাচলের জগন্নাথবল্লভ নামক উদ্যানে চৈতন্যদেব ভক্তগণের সহিত প্রবেশ করিলেন—(চৈঃ চঃ-অন্ত্য-১৯শ)—

প্রফুল্লিত বৃক্ষবল্লী যেন বৃন্দাবন।
শুক, শারী, পিক, ভৃঙ্গ করে আলাপন ॥

১। জগন্নাথদেবের ভৃত্য 'ফেলালব' এই কথার অর্থ কি, চৈতন্যদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

পুষ্পগন্ধ লঞা বহে মলয়-পবন।
গুরু হৈয়া তরুলতায় শিক্ষায় [১] নাচন॥
পূর্ণচন্দ্রচন্দ্রিকায় পরম উজ্জ্বল।
তরুলতাগণ জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল॥

* * *

'ললিতলবঙ্গলতা' পদ গাওয়াইয়া [২]।
নৃত্য করি বুলে প্রভু নিজগণ লঞা॥
প্রতি বৃক্ষবল্লী ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
অশোকের তলে কৃষ্ণ দেখে আচম্বিতে॥
কৃষ্ণ দেখি মহাপ্রভু ধাইয়া চলিলা।
আগে দেখে হাসি কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান কৈলা॥
আগে পাইল কৃষ্ণ তারে পুনঃ হারাইয়া।
ভূমিতে পড়িলা প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া॥
কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ-গন্ধে ভরিলা উদ্যান।
সেই গন্ধ পাঞা প্রভু হৈলা অচেতন॥

১। শিক্ষা দেয়।
২। ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে,
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে।
বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে,
নৃত্যতি যুবতী-জনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে (গীতগোবিন্দ-২৮)

(মলয়-সমীর ললিতলবঙ্গলতিকার আলিঙ্গনে কেমন কমনীয় ভাব ধারণকরিয়াছে! ভ্রমরসমূহের ঝঙ্কারে এবং কোকিলের কুহুরবে কুঞ্জকুটীর কেমন পরিপূর্ণ! হে সখি, এই বিরহিগণের পক্ষে দারুণ যন্ত্রণাময় মধুর বসন্তকালে শ্রীকৃষ্ণ যুবতী নারীগণের সহিত বিহার করিতেছেন এবং নৃত্য করিতেছেন (কালিমোহন বিদ্যারত্নের অনুবাদ)।

স্বরূপদামোদর ও রামানন্দরায় নানা উপায়ে চৈতন্যদেবের :বাহ্যজ্ঞান করাইলেন। প্রাতঃকাল হইল—

এই মত মহাপ্রভু পাইয়া চেতন।
স্নান করি কৈল জগন্নাথদরশন ॥
অলৌকিক কৃষ্ণলীলা দিব্য শক্তি তার।
তর্কের গোচর নহে চরিত্র যাহার ॥
এই প্রেমা সদা জাগে যাহার অন্তরে।
পণ্ডিতেও তার চেষ্টা বুঝিতে না পরে ॥

(চৈঃ চঃ-অন্ত্য-২০শ)—

এই মত মহাপ্রভু বৈসে নীলাচলে।
রজনী দিবসে কৃষ্ণ-বিরহ-বিহ্বলে ॥
স্বরূপ, রামানন্দ এই দুইজন সনে।
রাত্রিদিনে রস-গীত-শ্লোক-আস্বাদনে ॥৩॥
নানা ভাব উঠে প্রভুর হর্ষ, শোক, রোষ।
দৈন্য, উদ্বেগ, আর্ত্তি, উৎকণ্ঠা, সন্তোষ ॥
সেই সেই ভাবে নিজ শ্লোক পঢ়িয়া।
শ্লোক-অর্থ আস্বাদয় দুই বন্ধু লৈয়া ॥
কোন দিনে কোন ভাবে শ্লোক-পঠন।
সেই শ্লোক আস্বাদিতে রাত্রি-জাগরণ ॥৪॥

(ক) চৈতন্যচরিতামৃতের শেষ অর্থাৎ অন্ত্যখণ্ডের শেষ অর্থাৎ বিংশ পরিচ্ছেদে. শ্রীকৃষ্ণনামকীর্ত্তন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি কিরূপে হয় চৈতন্যদেব পদ্যাবলী হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছেন—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।

আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম ॥৮॥"
সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসারনাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম ॥
কৃষ্ণ প্রেমোদ্গম প্রেমামৃত-আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি-সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন ॥

(শ্রীকৃষ্ণ নামকীর্ত্তন চিত্তরূপদর্পণকে মার্জিত করে অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি করে এবং সংসাররূপ-দাবানল (দুঃখ ও দুশ্চিন্তা) নির্ব্বাপণ করে। চন্দ্রিকা (জ্যোৎস্না) যেরূপ কৈরবের (কুমুদের) বিকাশে বিশেষরূপে সাহায্য করে, সেইরূপ নাম-সঙ্কীর্ত্তন বিদ্যারূপ বধূর সৌন্দর্য্য-প্রকাশে সমধিক সাহায্য করে। ইহা আনন্দসাগর বর্দ্ধিত করে এবং প্রতিপদে (ক্রমাগত) সম্পূর্ণরূপে অমৃত আস্বাদনকরায়। ইহা সমস্ত আত্মাকে অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়কে স্নান করায় (বিশুদ্ধ করে কিম্বা ভক্তিরসে আপ্লুত করে) এবং পরম মঙ্গলযুক্ত হয়।

(খ) তাহার পরে দাসভাবে ভগবানের কিরূপ উপাসনা করিতে হয় তিনি দেখাইয়াছেন—

"অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয়[1] ॥ ১৭"

১। ইহার উপরে অমিয়নিমাইচরিত-প্রণেতার মন্তব্য এই—"জীবের এইরূপ ভজন-পথ প্রথম অবলম্বনকরিতে হয়। প্রভু ইহা কেন করিলেন? তিনি ত বিষয়ে মগ্ন নন্, কৃষ্ণকেও ভুলেন নাই। তবে কিনা আপনি আচরিয়া জীবকে শিক্ষাদিবার নিমিত্ত। আমরা মনে করি যে প্রথমতঃ তিনি যদি শ্রীকৃষ্ণ হন্, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকে ভোলার কথা অপ্রাসঙ্গিক। দ্বিতীয়তঃ—তিনি নিজেকে যদি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া জ্ঞান করিতেন, তাহা

(তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া
পড়িয়াছো ভবার্ণবে মায়াবন্ধ হৈয়া ॥
কৃপা করি কর মোরে পদধূলিসম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন ॥)

হইলে সেই সত্যের ও আন্তরিকতার অবতার এরূপ আন্তরিকতাপূর্ণ বাক্যের অপব্যবহার করিতেন না। 'প্রভু ইহা কেন করিলেন' এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলি, যে সত্য সত্যই চৈতন্যদেব তখন শ্রীকৃষ্ণের দাস বলিয়া নিজেকে মনে করিতেছিলেন। তিনি কখনও নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া পরিচয় দেন নাই। অবশ্য দাসভাবে তিনি শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা সর্ব্বদা করিতেন না, কারণ অনেক সময়ে রাধাভাবে ভজনা করিয়া তিনি তাঁহার আরাধ্যদেবতার সহিত নিবিড়তমরূপে সম্মিলিত হইতেন। তিনি বিষয়ে মগ্ন হন্ নাই, ইহা সত্য, কিন্তু যখন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দৈহিক কিম্বা মানসিক চক্ষুদ্বারা দেখিতে পাইতেন না, তখনই তিনি নিজেকে সংসারসাগরে নিমগ্ন ও মায়াভিভূত মনে করিতেন। সাধু ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নতি সমধিক হইলেও তিনি সন্তুষ্ট হন্ না। তিনি তখনও তাঁহার নানাবিষয়ে অসম্পূর্ণতা উপলব্ধিকরেন। দূরবর্ত্তী আদর্শের সন্নিকটে উপনীত হইলে আদর্শ আরও দূরে অপসৃত হয়।

বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ চৈতন্যদেবকে ঈশ্বর প্রমাণকরিবার জন্য তাঁহার পুত চরিত্রে কপটতা আরোপকরিয়া মানবজাতির কি অনিষ্ট করিয়াছেন তাহা তাঁহারা বোধহয় বুঝিতে পারেন নাই। পূর্ব্বে এ বিষয়ে আমরা আলোচনাকরিয়াছি (পৃঃ ২৩৩ দেখুন)। রূপগোস্বামীরচিত বিদগ্ধমাধবনাটকের প্রারম্ভে যে ইষ্টদেবতার বর্ণনা আছে, রামানন্দরায় গোস্বামীকে পাঠ করিতে বলিলে প্রথমে তিনি চৈতন্যদেবের মনোভাব বুঝিয়া সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন ; শেষে বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া পাঠ করিয়াছিলেন। ইহাতে চৈতন্যদেবকে ভগবানের অবতার বলিয়া বর্ণনাকরা হইয়াছে। চৈতন্যদেব ইহা শ্রবণকরিয়া বলিলেন 'ইহা অতিস্তুতি' অর্থাৎ তোষামোদ (চৈঃ চঃ-অন্ত্য-১ম-৫৬)। পুনরায় রূপবিরচিত-ললিতমাধবনাটকের দ্বিতীয় নান্দী রামানন্দের অনুরোধে গোস্বামী সঙ্কুচিত হইয়া (কারণ তিনি জানিতেন যে চৈতন্যদেব ক্রুদ্ধ হইবেন) পাঠ করিলেন। এই নান্দীতে তিনি চৈতন্যদেবকে দ্বিজকুলাধিরাজ এবং ভগবানের অবতার বলিয়া বর্ণনাকরিয়াছেন।

এইরূপ বলিতে বলিতে চৈতন্যদেবের হৃদয় দৈন্য ও উৎকণ্ঠাতে পরিপূরিত হইল এবং শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রেমপূর্ণ নামসঙ্কীর্ত্তন-শক্তি প্রার্থনাকরিয়া পদ্যাবলী হইতে এই শ্লোক উচ্চারণকরিলেন—

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈঃ নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥

(কবে বল কৃষ্ণ ! তব নাম-উচ্চারণ,
অশ্রুস্রোতে ভাসাইবে মোর দুনয়ন,
গদ্গদ বচনে রুদ্ধ করিবে বদন,
পুলকে করাবে মোর দেহ আবরণ ?—সঃ)

তাহার পরে চৈতন্যদেব ভগবৎপ্রেম শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিলেন, যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

"প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥"

এই দুই ছত্রের অধ্যাপক সঞ্জীবকুমার চৌধুরী ইংরাজীতে সুন্দর অনুবাদ

চৈতন্যদেব ইহা শুনিয়া রুষ্ট হইলেন। কৃষ্ণদাসকবিরাজ বলিতেছেন যে চৈতন্যদেব ইহা শুনিয়া রূপগোস্বামীকে বলিলেন (চৈঃ চঃ-অন্ত্য-১ম-১০১)—

শুনিয়া প্রভুর যদি অন্তরে উল্লাস।
বাহিরে কহে কিছু করি রোষাভাস॥
"কাঁহা তোমার কৃষ্ণরস কাব্য সুধাসিন্ধু ?
তার মধ্যে কেনে মিথ্যাস্তুতি ক্ষারবিন্দু ?"

কৃষ্ণদাসকবিরাজ বোধহয় মনে করিয়াছিলেন যে চৈতন্যদেবের অনিন্দনীয় চরিত্রে 'বাহিরে রোষাভাস' ও 'অন্তরে উল্লাস' অর্থাৎ কপটতা আরোপকরিলে চৈতন্যদেবের ভগবত্তার প্রমাণ সুদৃঢ় হইবে। আন্তরিকতা অথবা অকপটতা (sincerity, earnestness)

করিয়াছেন—'Give me the wealth of love, O Lord, give it to me. For without it life is all in vain. Make me Thy

---

চৈতন্যদেবের ন্যায় ঈশ্বরপ্রতিম মানবের যে বিশেষত্ব আমরা অনেকেই বিস্মৃত হই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইঁহাদের সমধিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হইলেও ইঁহারা নিজেদের অসম্পূর্ণতা অনুভব করেন—"সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ। আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ" (চৈঃ চঃ-অন্ত্য-২০শ-১১)। ইহার অর্থ এই যে চৈতন্যদেব নামগণনে ব্যাপৃত থাকিলেও তিনি মনে করিতেছেন যে প্রত্যহ যতগুলি কৃষ্ণনাম করা আবশ্যক তাহা তিনি করিতে পারিতেছেন না। সেইরূপ তিনি যখন দাসভাবে ঈশ্বরোপাসনা করিতেন, তখন নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের দাসই মনে করিতেন।

চৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্য-১৩শ-৩৭-৪১) লিখিত আছে যে নীলাচলে রথারূঢ় জগন্নাথদেবকে চৈতন্যদেব স্তবকরিয়া প্রণাম করিলেন—

দণ্ডবৎ করি প্রভু যুড়ি দুই হাত।
ঊর্দ্ধমুখে স্তুতি করে দেখি জগন্নাথ ॥

... ...

(পদ্যাবলী হইতে)

নাহং বিপ্রো, নচ নরপতি র্নাপি বৈশ্যো, ন শূদ্রো,
নাহং বর্ণী, নচ গৃহপতি র্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥

(আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ কিম্বা যতি নহি; কিন্তু প্রকৃষ্টরূপে উত্থিত নিখিল-পরমানন্দপূর্ণামৃত-সমুদ্রস্বরূপ গোপীভর্ত্তার পাদপদ্মযুগলের আমি দাসদাসানুদাস।

এত পড়ি পুনরপি করিয়া প্রণাম।
যোড়হাতে ভক্তগণ বন্দে ভগবান্ (জগন্নাথদেব) ॥"

ইহা পাঠ করিয়াও যদি আমরা বলি যে চৈতন্যদেব লীলা করিতেছেন অর্থাৎ নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ জানিয়াও লোককে শিক্ষাদিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের দাসের অংশ অভিনয়করিতেছেন, তাহা হইলে কি সত্যের বিষম অপলাপ করা হইবে না?

servant, and as wages, give me only the wealth of love for Thee.'

(গ) পুনরায় চৈতন্যদেবের মনে কৃষ্ণ-বিরহ-জনিত বিষাদের উদয় হইল এবং তিনি পদ্যাবলী হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিলেন—

"যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ॥ ২১ ॥"
উদ্বেগে দিবস না যায়, ক্ষণ যুগসম।
বর্ষামেঘ-সম অশ্রু বর্ষে দ্বিনয়ন ॥
গোবিন্দ-বিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন।

তাহার পরে প্রৌঢ়ি-ভাবে[১] (আগ্রহ-পূর্ণ প্রেমের সহিত) শ্রীমতী রাধা শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে সহচরীদিগকে যাহা বলিয়াছেন, চৈতন্যদেব সেই শ্লোক পদ্যাবলী হইতে উদ্ধৃত করিয়া পাঠ করিলেন—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথাতথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥২৪॥"[২]
আলিঙ্গন করি মোরে, চরণে ঠেলুন দূরে ;
কিম্বা মারুণ মর্ম্মহতা করি।

১। 'The Lord now recited that verse which Rādhā spoke in the zeal of love for the Lord to her female friends'—S. K. Chaudhury.

২। এইরূপ বিশুদ্ধ আরাধনাতে কোন কোন তথা-কথিত (so-called) বৈষ্ণব উপপতিজ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণোপাসনা-রূপ অতিবিকৃত অর্থ সংযুক্ত করিয়া বৈষ্ণবদিগের নৈতিক অবনতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে।

যা করু তা করু সেই, মোর মনে আর নেই,
কেবল প্রাণনাথ মোর হরি। [১]

ইহাকে বলে শ্রীকৃষ্ণে অর্থাৎ ভগবানে ভক্তের সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। গোপীগণ পতি, পুত্র, সহোদর, সুহৃৎ সমস্তই ভগবানের জন্য ত্যাগ করিয়াছিলেন (আঃ বৃঃ চঃ-১৯শ-৩৮ ; এই পুস্তকের ১৮৪ এবং ১৮৮ পৃঃ দেখুন)। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে-২০শ-২৯—

আমি কৃষ্ণপদদাসী, তেঁহো রস সুখ-রাশি
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ।
কি বা না দেন দর্শন, জরে আমার তনু মন,
তবু তেঁহো মোর প্রাণনাথ ॥
কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে,
মোর প্রাণেশ কৃষ্ণ, অন্য নয় ॥

* * * *

পুনরায় চৈতন্যদেব রাধাভাবে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার গভীর নিঃস্বার্থ প্রেম নিবেদনকরিয়া বলিলেন যে যদি কোন গোপী তাঁহার শত্রু হন্, কিন্তু তাঁহার সঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ যদি অভিলাষকরেন, শ্রীরাধা [২] (অর্থাৎ প্রকৃত ভক্ত)

১। শচীনন্দন বিদ্যানিধি—বীরভূমি-মাসিক-পত্রিকা।

২। যিনি ভগবানের জন্য সমস্ত বিষয়াসক্তি এবং পতি, পুত্র, সুহৃৎ, সহোদর প্রভৃতি আত্মীয়দিগকে ত্যাগকরিয়াছেন, যিনি নিজের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহে বঞ্চিত হইয়াও, ভগবান্‌কে এবং ভগবানের অনুগৃহীত ব্যক্তিকে অন্তরের সহিত ভালবাসেন, যিনি ভগবান্‌কে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন, তিনিই রাধা। বিশুদ্ধ ও নিষ্কাম রাধাভাবের সহিত স্বার্থপরতা কিম্বা কামের, স্বকীয়া কিম্বা পরকীয়া-ভাবের, কোন সম্বন্ধ নাই।

সানন্দে সেই গোপীর দাসী হইয়া তাঁহার সেবা করিবেন—

"যে গোপী করে মোর দ্বেষে,
কৃষ্ণের করে সন্তোষে,
কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ,
মুঞি তার ঘরে যাঞা,
তারে সেবোঁ দাসী হৈঞা,
তবে মোর সুখের উল্লাস।

* * * *

কৃষ্ণ আমার জীবন, কৃষ্ণ মোর প্রাণধন,
কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ।
হৃদয় উপরে ধরোঁ[১], সেবা করি সুখী করোঁ[২],
এই মোর সদা রহে ধ্যান॥

এইরূপে সর্ব্বজীবের মঙ্গলের নিমিত্ত তাঁহার জীবনের শেষ দ্বাদশ বৎসর রাধাভাবে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া এই ভগবৎপ্রতিম ঈশ্বরভক্ত সমগ্র ভারতবাসীকে গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া ১৪৫৫ শকে, আষাঢ়ের প্রথমভাগে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন[৩]।

১। ধরি। ২। কার।

৩। চৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা লোচনদাস এবং অদ্বৈতপ্রকাশপ্রণেতা ঈশাননাগর বলেন যে চৈতন্যদেব জগন্নাথদেবের মন্দিরে অদৃশ্য হইয়াছিলেন। জয়ানন্দ বলেন যে জগন্নাথ-দেবের রথের সম্মুখে নৃত্য করিবার সময়ে তাঁহার বামপদের অঙ্গুলিতে আঘাত লাগিয়াছিল এবং এই আঘাতই পরে তাঁহার গুণ্ডিচাগৃহে দেহত্যাগের কারণ হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে টোটা-গোপীনাথের মন্দিরের অভ্যন্তরে তিনি অদৃশ্য হইয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস-কবিরাজ-বর্ণিত চৈতন্যদেবের গভীর নিশীথে সমুদ্রপতন তাঁহার দেহত্যাগের কারণ বলিয়া

চৈতন্যদেবের তিরোধানের পরে রথযাত্রা-উপলক্ষে উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্র বলিতেছেন (চৈঃ চঃ নাঃ-১ম-৩)—

"সোঽয়ং নীলগিরীশ্বরঃ, স বিভবঃ, যাত্রা চ সা গুণ্ডিচা, তে তে দিগ্বিদিগাগতাঃ সুকৃতিনস্তাস্তা দিদৃক্ষার্ত্তয়ঃ, আরামাশ্চ তএব নন্দন-বনশ্রীণাং তিরস্কারিণঃ, সর্ব্বাণ্যেব মহাপ্রভুং বত বিনা শূন্যানি মন্যামহে।"

সেই নীলগিরীশ্বর [১], সমৈশ্বর্য্যবান্,
রথযাত্রা সেইরূপ করি অনুমান,
নানাদেশহ'তে আসে ততই সজ্জন,
দর্শন-নিমিত্ত তত ব্যগ্র ভক্তগণ,
তদ্রূপ শোভয়ে নীলাচল-উপবন,
পরাজয় করিয়াছে নন্দন-কানন,
কিন্তু এ সকল হায়! মহাপ্রভু বিনা,
শূন্য বলি সদা মোর হয় বিবেচনা। সঃ।

আমরা অনুমান করি। কি প্রকারে চৈতন্যদেব দেহত্যাগ করিয়াছিলেন ইহা গোপন-করিয়া বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণের কি লাভ হইয়াছে আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। অদ্বৈতা-চার্য্য ও নিত্যানন্দের দেহত্যাগও এইরূপ অদ্ভুতভাবে হইয়াছিল তাঁহারা বলেন। ব্যাধের শরাঘাত শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের কারণ সকল হিন্দুই জানেন। এক্ষণেও প্রভাসের (সোম-নাথের নিকটস্থ বেরাবল) পাণ্ডারা বলেন যে যে স্থানে হিরণ্যা, সরস্বতী প্রভৃতি নদী সমুদ্রের সহিত মিলিতা হইয়াছে, সেইস্থানেই শ্রীকৃষ্ণের দেহের অগ্নিসংস্কার হইয়াছিল (ঠাকুর দত্ত শর্ম্মার 'চারোধামকি যাত্রা'; দ্বারকাপ্রসাদ শর্ম্মার 'হিন্দুতীর্থদর্শন' এবং এই পুস্তকের ৪৫০, ৪৬১ পৃষ্ঠাও দেখুন)।

১। নীলাচলনাথ; জগন্নাথদেব।

"নর ! হরিনাম অন্তরে অছু [১] ভাবহ
হবে ভব-সাগর পার।
ধররে শ্রবণে নর হরিনাম সাদরে,
চিন্তামণি উহ [২] সার ॥
যদি কৃতপাপী [৩] আদরে কভু মন্ত্রক-
রাজ [৪] শ্রবণে করে পান।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলে হয় তছু [৫] দুর্গম
পাপ-তাপ-সহ ত্রাণ ॥
করহ গৌর-গুরু- বৈষ্ণব-আশ্রয়
লহ নর ! হরি-নাম-হার।
সংসারে নাম লই, সুকৃতি হইয়া তরে
আপামর, দুরাচার ॥
ইথে [৬] কৃত-বিষয়- তৃষ্ণ পঁহু-নাম-হার
যো ধারণে শ্রম-ভার।
কুতৃষ্ণ জগদা নন্দ [৭] কৃত-কল্মষ
কুমতি রহল কারাগার" ॥৫৪॥২৯৫৬॥

১। ইহা। ২। উহা। ৩। কৃত-পাপ।

৪। হরি-নাম-রূপ মন্ত্র-রাজ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মন্ত্র।

৫। তাহার।

৬। ইহাতে ; এই বিষয়ে—হরি-নাম-গ্রহণ-বিষয়ে জগদানন্দের বিষয়-তৃষ্ণা থাকার জন্য, তিনি প্রভু-নাম-হার ধারণকরিতে শ্রম অনুভবকরেন ; তিনি কুতৃষ্ণ, কৃত-কল্মষ (কৃত-পাপ অর্থাৎ পাপী) এবং কুমতি ; তিনি কারাগারে রহিলেন এবং মুক্তি পাইলেন না।

৭। সম্ভবতঃ চৈতন্যদেবের প্রিয়ভক্ত কাঁচরাপাড়া-নিবাসী জগদানন্দপণ্ডিত।

নাম ও বিষয়-সূচী

All the best passages have been quoted and their translations given.

Extracts from a few letters :—

Dr. F. J. C. Hearnshaw. M. A. LL. D., Professor of History, King's College, London—

"...Your scholarly work on Kālidāsa. I have examined it with great interest. The quotations reveal a writer of remarkable power with a striking insight into both nature and human character. Your examination of the date and circumstances of the author is a masterpiece of scholarly analysis. There can be no doubt that you fully establish your contention (p. 44) that Kālidāsa belongs to the fifth century of the Christian era. The book opens up new vistas of thought and emotion to a western reader."

Dr. L. D. Barnett, Professor of Indian History, London University—

"...Your work is very interesting."

Prof. Dr. M. Winternitz, University, Prague—

"...The book will, I trust, serve to spread and increase among your countrymen a knowledge of their greatest poet and his inmortal poetical works."

Prof. Dr. Sten Konow, Ethnographic Museum, Oslo—

"...I have already read most of your book and I have

read it with great pleasure. You show a sound criticism and an astonishing acquaintance with the learned literature on Kālidāsa, and your book has in this way become a very useful work of reference. If you had read my book on the Indian drama you would have known that I am in thorough agreement with many of your views, but I do not agree in all details...The chief thing is that your own book shows that you are spending your time of retirement in a way which is not only calculated to relieve the monotony of retirement, but also to be of profit to others."

H. J. Rapson Esq., M. A. Cambridge University—

"Mr. De shows a real appreciation of the beauty of Kālidāsa's poetry and also an intimate acquaintance with the historical evidence on the question of Vikramāditya. In my opinion, the conclusion at which he has arrived is most probably correct."

The Statesman of Calcutta, September 23rd, 1928—

...*Kalidasa* and *Vikramaditya*, By S. C. De (Calcutta, Orphan Press, Rs. 3)

"Professor S. C. De who has retired from the Indian Educational Service after over a quarter of a century's work is a wellknown scholar and his book *Kalidasa and Vikramaditya* shows it. He has dealt exhaustively with the history of the time and the writings of India's immortal poet. First of all comes the inevitable discussion on the date of Kālidāsa. Prof. De's opinion is that he lived somewhere between 400 and

473 A. D. during the reign of the Gupta kings. Antiquarians may not accept the conclusion, but they will admit that the materials available have been analysed skilfully and impartially. The chapter on "the centre of the poet's activities", and "the condition of the Hindu society in the time of Kālidās," and "the Brāhmanic revival" will be read with great interest by historians, while the critical analysis of both the *kāvays* and *nātakas* of Kālidās will give immense pleasure to those with poetic tastes. The book is a most valuable contribution to the immense literature that has grown round the work of Kālidās both in India and in other countries."

Stray Thoughts (**illustrated**) **in Five Parts: about 600 pages with indexes**—(published in April. 1931)—

Part I—Public speeches in Ancient and Medieval India.

„ II—Action in Oratory; the Sublime and the Ludicrous.

„ III—India and Ceylon; some evidence of the authenticity of the main incidents of Vālmiki's Rāmāyana; and the condition of the Indian Aryan Society in the time of the Rāmāyana.

Part IV—Bombay, Elephanta, Nāsik (Panchavati), Anegundi (Kishkindhyā), Hampi (Vijayanagar).

Part V—Why should we read the works of Kālidāsa?

Price Rupees three and annas eight only; postage

extra. To be had from the author, 11, Ray Street, Elgin Road P. O., Calcutta.

Opinions of :—

R. B. Ramsbotham, Esquire, M. A., B. LITT. (OXON.), M.B.E., I.E.S., **Principal, Chittagong College, Bengal—**

"I read your book with much pleasure. It is a most companionable book......The book should be widely read, for it is a cultured and charming piece of work."

R. Marrs Esquire, M. A. (OXON.), C. I. E., I. E. S., (Retired), **Principal, University College, Colombo, Ceylon—**

"The volume you sent me should certainly prove of real interest to the Sinhalese, particularly the portion which contains a list of words common to the Bengali and Sinhalese languages......Your book is evidence of wide scholarship and knowledge of eastern and western literatures and is thus......of first class importance in these days of estrangement, which in the Republic of Letters at least brings men of intelligence together in mutual understanding and goodwill."

FROM THE LIBERTY, the 18th Oct., 1931.

Stray Thoughts :—By S. C. De, M.A., B.L., I.E.S., (Retd.) Published by the author from 11, Ray Street, Elgin Road P. O., Calcutta. Price Rs. 3-8 as.

Mr. S. C. De, late of the Indian Educational Service, has from time to time done immense service to the scholarly world by his writings. The present volume is the fruit of the compilation of some of those writings.

Stray Thoughts—the name given has not been of a careful and judicious choice. First of all his thoughts

are not stray, for stray thoughts leave no permanent impression on the minds of the thinking public, which his book very admirably does. Secondly his book might have been more scientifically and systematically edited.

Of the different chapters in the book, the third chapter "India and Ceylon" has the claim to be ranked as a philogical research-work of the first class. This chapter is a separate volume by itself, so spendidly written, being antiquarian in value and interest.

The fourth chapter embodies the author's experience acquired by travelling in a few places in South and West India, having some archaeological ruins of bygone days.

The first two chapters of the volume deal with the art of persuasive speaking in ancient India and what are the chief elements in oratory, while the last chapter (Ch. V) is an excellent criticism on the works of Kalidas and his impartial recommendation as to what treasures that immortal poet has left for all ages.

The treatment of the book is anything but systematic. It seems that the author either has no idea that systematic arrangement of matters is one of the principal qualities that mark the modern art of bookwriting or that to his peculiar aptitude for holding to the public the charm of industry of writing bigger volumes he has lost sight of the fact that were the fourth chapter of the book—India and Ceylon—published as a separate book, it could have readily captured the imagination of scholars. And last though not the least of all defects to our eyes is that such a big volume dealing

with so different subjects should be lacking in prolegomena, though the author has a peculiar delight in writing a dedication by way of exalting his native village, Kanchrapara or Kānchanpalli.

Barring these defects the book, we hope, will be widely accepted by those who are in need of such books and the defects if removed in a later edition will make the volume under review a complete book of diligent research and sound scholarship.

H. R.

United India and Indian States.

EDITOR :

K. S. K. IYENGER.

TELEGRAMS :

"UNITED."

MANAGER :

MRS. K. IYENGAR.

Delhi ; 14th March, 1931.

STRAY THOUGHTS.

Stray Thoughts is the modest title of a bulky and learned volume, by Mr. S. C. De (11, Ray Street, Elgin Road, P. O, Calcutta), which is really five books, each complete with a separate index and separate paging, bound together and given one common title. The first of these books deals with public speeches in ancient and medieval India, as may be gleaned from Sanskrit

and Prākrit literature (chronologically arranged). In this the author points out after giving a number of Sanskrit quotations with their translations, that though forensic oratory and eloquent appeal to the masses are rare in the literature of ancient and medieval India, still carefully prepared speeches addressed to select audiences are to be found, specially in the epics. Mr. De has the frankness to admit that as the instances adduced by by him are culled mostly from literature and not from life, they are to some extent artificial, though at the same time he asks us to remember that literature "receives its chief value from the stamp and esteem of ages through which it has passed." There is the view of Dr. Keith that India produced no oratory despite the distinct power often displayed both in the epics and classical *Kāvyas* of the rhetorical presentment of a case by opposing disputants. While noting this view, Mr. De labours to prove that the ancient Hindus understood the value of sober history. Dr. Buhler's criticism, however, that the Pandits had a greater liking for the wonderful legends of the heroic age and for the no less marvellous stories of those kings whom for one reason or another they had lifted out of the sphere of matter of fact history, than for sober history or for sober biography, has been left practically unanswered by Mr. De, because it would lead 'to tracing the history of Brāhmanic psychology from the earliest time ; a task beyond the competency of the present writer.' In concluding this subject, Mr. De criticizes Dr. Keith's view that the belief of the Indians in the Law of Karma is responsible for their lack of historical sense.

The second book includes the two subjects "Action in Oratory" and "The Sublime and the Ludicrous in Literature". With a remarkable wealth of illustrations, Mr. De has in the first of these articles, brought out the value of action in oratory and in the second he has analyzed and illustrated, with quotations from English, Sanskrit and Bengali literature, the elements of the sublime and the ludicrous in literature, such as irony, wit and humour. Book No. III contains three articles, the first of which shows how Ceylon is culturally one with India, and how even the Sinhalese language has a number of common words with a Sanskritic language like the Bengali. The second article, mainly on the basis of the Geographical material in the Rāmāyan and of Ceylonese traditions and history, shows the authenticity of the main incidents of the Epic, contesting the view that the Rāmāyan is a mere nature-myth, that Lankā had no real existence, and that Simhala and Lankā are not identical. It has also been shown that the statement that the Rāmāyan was at first composed in Pāli or in some other Prākrit and then translated into Sanskrit, does not stand the test of scrutiny. The third article is devoted to the condition of the Indian Aryan Society in the time of the Rāmāyan. It brings out the accuracy of most of the geographical details mentioned in the epic, sums up the then prevalent ideas about such institution as kingship and describes what may be gleaned about the administration of justice, the existence of arts, the condition of women, religious rites and ceremonies etc. in that age. Mr. De thus points out that the Aryan

Society in India as depicted in the Ramayan must have attained a high degree of civilisation more than three thousand years ago. He also draws attention to the continuity of that civilization in its essentials up to the present day as a conclusive proof of its excellence. Book IV describes the author's visit to Bombay, Nasik, Anegundi, Hampi and Chitrakuta. As all, excepting the first of these, have connection with the story of the Ramayan, and the history of Vijayanagar, the journey naturally recalled to his mind many incidents from history and the Epic, and this lends interest to his account of his trips. The last Book or Part of the volume is a short essay on "Why should we read the works of Kalidasa?" Here the author draws attention to certain good points of these works and also stresses their importance as "they are likely to help us in solving some of the difficult problems of the present day." The whole work is characterized by deep scholarship and particularly bears evidence of the author's thorough study of the Ramayan and the extraordinarily wide range of his reading.

Opinion of Professor S. N. Chatterjee, M. A., Secretary Town School, Howrah.

I thank you very much for your kindly presenting

me a copy of your 'Rāmāyaner Prakrita Kathā'. I have read the book carefully, and also with some profit to myself, as you have tried in the book to fix the positions of many places of antiquarian interest through which Rāmachandra is said to have passed during the period of his exile as depicted in Vālmiki's Rāmāyan. Your description of Dandakāranya, Janasthān, Panchabati, Kiskindhyā has cleared many misconceptions in the mind of the reading public, and you have certainly thrown a flood of light on many portions of the great Epic, which so long stood veiled for want of authentic information. Had I seen the book during the course of its preparation, I would certainly have requested you to introduce maps of those parts of the Deccan which have reference to Rāmāchandra's movements ; for the photos of the important sites that have been inserted in the book do not appear to serve the purpose I refer to. Although there may be some difference of opinion about the origin of the terms "Bānar" and "Rākshas" in the great Epic, still the interest you have created in the matter is really commendable. The book requires to be widely read. If the book had been slightly modified to suit the requirements of young boys, it could have been used as a textbook in some of the upper classes of High schools.

শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র দে, M. A., I. E S. (অবসরপ্রাপ্ত) প্রণীত "রামায়ণের প্রকৃত কথা", "Kālidāsa and Vikramāditya" এবং "Stray Thoughts" নামক তিনখানি পুস্তক আমি আদ্যোপান্ত মনোযোগসহকারে পাঠকরিয়া পরম প্রীতি লাভকরিয়াছি। গ্রন্থকার

প্রাচীন পুস্তকসকল হইতে ভারতের তৎকালীন ঐতিহাসিক তত্ত্ব দ্যোতনাকল্পে যে আয়াস স্বীকারকরিয়াছেন, গভীর গবেষণা করিয়াছেন ও অনুরূপ সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা সাতিশয় প্রশংসনীয় জ্ঞান করিলাম। আমি ইহা জাতীয় ইতিহাসের অংশবিশেষ বলিয়া গ্রহণ করিলাম। মন্তব্য গ্রহণের ধারা দেখিয়া আমার Shakespeare এর বিখ্যাত দার্শনিক সমালোচক Gervinus এর সমালোচনা স্মরণ হইল। এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচারে সমাজের অশেষ মঙ্গল হইবে বলিয়া আমার পূর্ণ বিশ্বাস। গ্রন্থকার মহাকবিদের যে সকল অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা হইতে, আমার ধারণা, অবসর-অভাবে যাঁহারা কালিদাস ও বাল্মিকীর মূল অধ্যয়নে অক্ষম তাঁহারা ইঁহাদের অতুলনীয় শ্রেষ্ঠ অংশগুলির কথঞ্চিৎ রসাস্বাদ ও সৌন্দর্য্যগ্রহণে সক্ষম হইবেন। ইহা প্রায় ইংরাজীর Dodd's Beauties of Shakespeare এর অনুরূপ হইয়াছে।

১৭ ফাল্গুন—
১৩৩৯ সাল।

শ্রীকান্তিচন্দ্র দেব শর্ম্মণঃ
গঙ্গোপাধ্যায়স্য।

I have read with much interest the book "Rāmāyana-kathā", "Stray Thoughts" and "Kalidās and Vikramāditya" by Babu Satis Chandra De, M. A., I. E. S. (retired), a veteran educationist. His attempts to localise, now, the old holy places of historical importance and the inferences drawn by him from the descriptions of the old world-poets have been admirable. I think the energy displayed by him in this direction has been crowned with success. These books, no doubt, are mighty factors towards the spread of culture and knowledge, as they inculcate basic truths, underlying all ethical

codes of the civilised world. Such works are the blessings of a country.

Bhupendra Kumar Basu,
1 March, 1933.

কৃষ্ণনগর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র দে, এম. এ., বি. এল., আই. ই. এস্ প্রণীত "রামায়ণের প্রকৃত কথা" নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভকরিলাম। গ্রন্থের আবরণের পারিপাট্য, ১১ খানি সুন্দর চিত্রের সমাবেশ, গ্রন্থের বর্ণনার মাধুর্য্য ও গবেষণার ভব্যত্ব বিবেচনায় দেড়টাকা মূল্য অধিক হয় নাই। গ্রন্থকর্ত্তা প্রথম অংশে রামায়ণের প্রতিপাদ্যবিষয়ের বিবরণ দিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যা, চিত্রকূট ও নাসিকের দ্রষ্টব্য মন্দির, আশ্রম, পর্ব্বত, নদী ও গহ্বরের চিত্রসহ নিজের অভিজ্ঞতামূলক অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্রের সময়ে রামায়ণের সমাজ কিরূপ ছিল তাহার বিস্তৃত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা এই গ্রন্থের এক বিশেষত্ব। দ্বিতীয় অংশে গ্রন্থকর্ত্তা কিষ্কিন্ধ্যা, বিজয়নগর ও লঙ্কার বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন। এই অংশে প্রদত্ত কিষ্কিন্ধ্যার তুঙ্গভদ্রানদী ও পম্পাসরোবর, বিজয়নগরের পম্পাপতি-মন্দির এবং সিংহলের কাণ্ডি-নগরস্থিত বুদ্ধদেবের দন্তমন্দির ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের কেন্দ্র অনুরাধপুরস্থ মহাস্তুপের চিত্র অতি মনোরম। গ্রন্থের শেষে সিংহলী ও তৎসদৃশ বাঙ্গালা কথার দৃষ্টান্ত এবং গ্রন্থোক্ত নামসূচী প্রদত্ত হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস গ্রন্থকারের "Stray Thoughts" নামক বৃহৎ পুস্তকের কতকগুলি বিষয় এই গ্রন্থে অনূদিত হইলেও "রামায়ণের প্রকৃত কথা" একখানি অভিনব মনোহর গ্রন্থরূপে সমাদৃত হইবে। বঙ্গদেশীয় বিদ্যালয়সমূহের পারিতোষিক-

পুস্তক এবং সাধারণ পাঠাগারে ব্যবহৃত পুস্তকরূপে ইহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীহেমচন্দ্র সরকার এম. এ,
প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক
ও
প্রেসিডেন্সী বিভাগের বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক।

গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী—মূল্য দুইটাকা চারি আনা, ডাকমাশুল স্বতন্ত্র—গ্রন্থকার সতীশ চন্দ্র দে; ১১ রায় ষ্ট্রীট, এল্‌গিন্ রোড ডাকঘর, কলিকাতায় প্রাপ্তব্য; কাপড়ে বাঁধা, পৃষ্ঠা ৬০০।

আমার এই গ্রন্থরচনার প্রথম উদ্দেশ্য—আমাদিগের গ্রামের ন্যায় বিশিষ্ট পল্লীগ্রামের (কাঁচরাপাড়ার) বর্ত্তমান অবনতির কারণ নির্দ্দেশ এবং কি উপায় অবলম্বনকরিলে পুনরায় এই প্রকার গ্রামের উন্নতি হইতে পারে তাহার নির্দ্ধারণ। দ্বিতীয়তঃ—কাঁচরাপাড়াগ্রামের অধিবাসীদিগকে (যাঁহারা গ্রামে বাস করিতেছেন এবং যাঁহারা বিদেশে আছেন) গ্রামের মঙ্গলের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবার নিমিত্ত উদ্বুদ্ধ করা। তৃতীয়তঃ—কাঁচরাপাড়ানিবাসী—সেনশিবানন্দ, কবিকর্ণপূর, শ্রীনাথপণ্ডিত (কৃষ্ণদেব-বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠাতা), জগদানন্দপণ্ডিত, বাসুদেব দত্ত প্রভৃতি, গৌরাঙ্গদেবের ভক্তমণ্ডলীর বিষয় জনসাধারণকে জ্ঞাপন। চতুর্থতঃ কাঁচরাপাড়ানিবাসী বিখ্যাত কবিবরদ্বয়ের—কবিকর্ণপূরের এবং ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তের গ্রন্থাবলীর সমালোচনা এবং তাঁহাদিগের স্মৃতি-বার্ষিকীর অনুষ্ঠান। আমার পঞ্চম উদ্দেশ্য চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ-বিষয়ক গোবিন্দদাসের করচার ঐতিহাসিকতার বিষয়ে পুনরালোচনা এবং চৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্যভ্রমণের স্থানগুলি-নির্দ্ধারণ।

আমার শেষও মুখ্য উদ্দেশ্য—ভগবৎপ্রতিম আদর্শ-মানব চৈতন্যদেবের আমাদিগের কাঞ্চনপল্লীতে শুভপদার্পণের এবং তাঁহার কাঞ্চনপল্লীনিবাসী ভক্তগণের স্মৃতি-বার্ষিকীর অনুষ্ঠান।

হাওড়া জজ আদালতের প্রবীণ উকিল পরমভাগবত পরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের "গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী" সম্বন্ধেঅভিমত—

"আমার বিশেষ সৌভাগ্য-ক্রমে গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দে মহাশয়ের সহিত আলাপ হয় এবং তাঁহাকে একখানি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ আমি পড়িতে দিই। উক্ত গ্রন্থের কৃপায় তাঁহার হৃদয়ে এক নূতন ভাবের উদয় হয়। মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদগণ বিশেষতঃ কাঁচরাপাড়ানিবাসী সেন শিবানন্দ ও বাসুদেব দত্ত ও অন্যান্য ভক্তগণ সম্বন্ধে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে বহু গ্রন্থ আলোচনা করিয়া 'গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী' গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদগণ এবং কাঁচরাপাড়াসম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারা যাইবে।

আশা করি মহাপ্রভুর কৃপায় গ্রন্থকার ভক্তিরাজ্যে অগ্রসর হইবেন। যদ্যপি এই গ্রন্থপাঠে একটী পাঠকেরও হৃদয়ে ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হয় তাহা হইলে আমিও সার্থক হইব।

Opinion of Professor J. N. Sen Msc. (Gold-medallist) and Research-scholar and Viceprincipal N. D. College, Howrah—

"I have looked through the book entitled 'Gaurānga-

deva and Kanchanapalli' by Principal S. C. De, M. A., B. L. I., E. S. (Retd). The author is wellknown for his sound scholarship among educational circles. After retirement from active service he has devoted his time and attention to the betterment of Bengali literature. In this book he has surveyed the condition of Bengal villages in the early fifties of the last century and specially of Kānchanpalli or Kanchrapara, once a prosperous village in the district of Nadia, and now reduced to ruins, and has suggested practical steps towards improving the condition of the villages of Bengal. He has next passed on to the writings of the great poet Iśvarachandra Gupta of the same village and has nicely brought out the points of excellence of his numerous writings. He has indeed done a great service to the Bengali literature by drawing the attention of the public to the almost forgotten writings of this great poet. Kānchanpalli was visited at one time by the Great Religious Reformer Śri Chaitanya; and this has led the author to the teachings of this Great Man who is regarded as an incarnation of God. He has brought his scholarship to bear on this intricate and abstruse subject and has shown that the cult of Vaishnavism stands for spiritual democracy and that the evil effects of the Caste-system which have been eating into the vitals of the Hindu Society are absent here. The book will prove to be a valuable contribution to Bengali literature for ripe scholarship and original thought on the social and religious aspects of Bengalee life.

অগ্রজপ্রতিম

শ্রীযুত সতীশ চন্দ্র দে এম. এ, বি. এল,

করকমলেষু—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার লিখিত 'গৌরাঙ্গদেব ও কাঞ্চনপল্লী' নামক সুবৃহৎ গ্রন্থখানি মনোযোগসহকারে আদ্যোপান্ত পড়িয়া আনন্দিত ও উপকৃত হইলাম। আপনার এই গ্রন্থরচনার সাধু উদ্দেশ্য বর্ত্তমান সময়ে সকলেরই গ্রহণীয়। আমাদের এই প্রাচীন ও সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ধ্বংসের পথে আসিয়াছে, আপনি সেই গ্রামকে আবার সমুন্নত করিতে চাহেন। অন্যান্য উপায়ের মধ্যে গ্রামের অতীতের গৌরবের মহিমাময়ী স্মৃতি জনসাধারণের চিত্তে সম্যকরূপে উদ্দীপিত করিবার জন্যই বহু চিন্তা ও পরিশ্রমের দ্বারা এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

গৌরাঙ্গদেবের জীবনী ও ধর্ম্মসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা বহু পরিশ্রমের ফল। স্থান, কাল প্রভৃতি বিষয়ে অনেক মতভেদের যেরূপ সুমীমাংসা করিয়াছেন তাহাতে আশাকরি এই গ্রন্থখানি পড়িয়া সকলেই উপকৃত হইবেন। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশ ও সমাজ যাহা চাহিতেছে, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জীবন ও ধর্ম্মের সুযুক্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ আলোচনা হইলে তাহা যে পাওয়া যাইবে, ইহাও আপনি অতি উত্তমরূপে দেখাইয়াছেন। আপনার অভিপ্রেত উৎসব ও স্মৃতিসভা গুলির অনুষ্ঠান আমাদের কাঞ্চনপল্লীগ্রামে অচিরে আরম্ভ হউক, ও আপনি যেরূপ সুযুক্তিপূর্ণ ও উদার প্রণালীতে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জীবনী ও ধর্ম্ম বুঝিয়াছেন, দেশের ছেলে মেয়েরা সেইভাবে এই ধর্ম্ম বুঝিয়া দেশের কল্যাণসাধনের জন্য একতাবদ্ধভাবে নিযুক্ত হউক,

ইহাই আমার প্রার্থনা।

শিক্ষা বিভাগের উচ্চতমশ্রেণীর কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া আপনি এই অবসরের যেরূপ সদ্ব্যবহার করিতেছেন, অশেষ পরিশ্রম করিয়া দেশের সাহিত্য, ধর্ম্ম, ইতিহাস ও সমাজের সেবায় যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন, আমাদের দেশের প্রতিভাশালী শক্তিমান্ ব্যক্তিগণের জীবনে তাহা অতীব বিরল। আপনি সুস্থদেহে দীর্ঘজীবী হইয়া জীবনের এই কল্যাণব্রত উদ্যাপিত করুন। ইতি—

স্নেহার্থী শ্রীনৃত্যলাল মুখোপাধ্যায়।
(Retired Assistant Surgeon, F. T. S. etc.)